গল্প-পঞ্চাশৎ

আশাপূর্ণা দেবী

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

গ্রন্থপরিচয়

আশাপূর্ণা দেবীর ছোট-গল্প যে-কোন কারণেই হোক—বাংলাদেশের সব শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকাদের কাছেই বড় প্রিয়। সেজন্য তাঁর ছোট-গল্পের চাহিদা খুব বেশী। আর সেই কারণেই তাঁর উপর সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলির অনুরোধ ও দাবী-দাওয়ার অন্ত নেই। সেই অনুরোধ রাখতে ও দাবী মেটাতে তাঁকে অজস্র ছোট-গল্প লিখতে হয়। অথচ পুস্তকাকারে—যা বই বেরোয় তার মধ্যে গল্প ও উপন্যাসের একটা হারাহারি সামঞ্জস্য রাখতেই হয়; আর তার ফলে সেই সব ছোট-গল্পের অনেকগুলিই আজ পর্যন্ত উক্ত সাময়িক-পত্রাদির পৃষ্ঠাতেই রয়ে গিয়েছে, বৃহত্তর পাঠক-সমাজের সামনে আসে নি। আমাদের ইতিপূর্বে প্রকাশিত বিভূতি-ভূষণ মুখোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-পঞ্চাশৎ জনপ্রিয় হওয়ায় আমরা এক রকম জোর করেই তাঁর কাছ থেকে এই পঞ্চাশটি গল্প 'আদায়' করে তাঁর অনুরাগী পাঠক-পাঠিকাদের মনের মত শোভন সুমুদ্রিত এই গ্রন্থটি প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছি। যে ধরনের গল্প-রচনার জন্য তিনি বিখ্যাত—নির্বাচনের সময় সেই শ্রেণীর রচনার দিকেই আমাদের দৃষ্টি ছিল, তা বলাই বাহুল্য। প্রসঙ্গত আর একটি কথাও বলা প্রয়োজন, এই সংকলনের কোন গল্পই আজ পর্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। ইতি—

প্রকাশক

সূচী

খবরটা কেশব রায় প্রথম পেলেন নীলকণ্ঠের কাছে। পেয়ে অবাক হয়ে গেলেন।

হ্যাঁ, শুনে প্রথমটা রাগ আসবারও অবস্থা হয় নি। এসেছিল বিস্ময়। নতুন গিন্নীর স্পর্ধা দেখে অসহ্য বিস্ময়ে প্রথমটা হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন কেশব রায়, তারপর ক্রোধে ফেটে পড়েছিলেন। বলেছিলেন—বটে! ওর ওই শুঁটকো কোলকুঁজো ভাইটার ভরসায় হারামজাদী কেউটের গর্তয় হাত দিতে এসেছে? আচ্ছা, আমিও রাঘব রায়ের ব্যাটা কেশব রায়।

কেশব রায় যাকে হারামজাদীরূপ সভ্য বিশেষণটিতে অভিহিত করলেন, সেই নতুন গিন্নী কিন্তু আইনত কেশব রায়ের রীতিমত মাননীয়া গুরুজন। মহিলাটি হচ্ছেন পিতা রাঘব রায়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কদম। ব্যাপারটা এই —বুড়ো বয়সে রাঘব রায় এক বন্ধুর পৌত্রীর বিবাহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে, বন্ধুর মা-বাপ-মরা ঘাড়ে-পড়া ভাগ্নীটিকে করে বসেছিলেন বিয়ে—এবং বিনা নোটিশে বাড়িতে এনে উপস্থিত করেছিলেন! স্ত্রীবিয়োগের আঠার বছর পরে এই অধঃপতন!

ছেলে কেশবের তখন চার-পাঁচটি ছেলে মেয়ে।

কদম কেশবের চাইতে বছর পনের-ষোলর ছোট।

একেই তো এই অভাবনীয় এবং অসহনীয় বিয়ে। তার উপর শুনতে পাওয়া গেল, কদমের বাপ নাকি রাঘব রায়েদের চাইতে অনেক নিচু ঘর। কাজে কাজেই কেশব বাপের এই বুড়ো বয়সের কীর্তিটিকে কোনদিনই যথোপযুক্ত সম্মান দিতে রাজী হল না! ঠাকুর্দা মাধব রায় গ্রাম-প্রান্তের যে বাগ্দী মহিলাটিকে নেক্‌নজরে দেখতেন, কদমের আসন তার সমতুল্যই হল কেশবের মনোরাজ্যে।

কিন্তু মুস্কিল এই, একে রাঘব রায় একেবারে অন্দর মহলে এনে তুলেছেন। তাই আক্রোশ আর ঘৃণাটা বরং আরও বেশি।

হয়তো কদম যদি নম্র নত স্বভাবের হত, আপনার এই উড়ে-এসে-জুড়ে-বসাটাকে অনধিকার প্রবেশ মনে করে কুণ্ঠিত হত, কেশবের বৌকে শাশুড়ীর মত শ্রদ্ধা সম্মান করে চলত, কালেখ্যে কেশবের মন কিছুটা নরম হত। কিন্তু হয়েছিল বিপরীত।

পঁচিশ বছর বয়েস অবধি মামার বাড়ির অনেক লাঞ্ছনার ভাত নীরবে হজম করেছে কদম, নিজের দিন-আসার অপেক্ষায়। আর, পাঁচটা নাতি-নাতনীওলা বুড়োকে বিয়ে করতে এক কথায় রাজী হয়েছিল শুধু প্রতিষ্ঠার আশায়। তাছাড়া

—মামী ভাগ্নীকে পতিগৃহে পাঠাবার কালে গয়না কাপড়ের মত অসার বস্তু না দিয়ে, দিয়েছিল কিছু সারালো উপদেশ।

সেই উপদেশ অনুসারে অষ্টমঙ্গলার কনে কদম বাড়ির ঝি রাঁধুনী আশ্রিতা অনুগৃহীতাদের প্রতি ভ্রুকুটি করে বলেছিল—তোমরা আমায় 'নতুন বৌ' 'নতুন বৌ' কর কি জন্যে? আমি কি এ সংসারের বৌ?

থতমত হয়ে রাঁধুনীটা বলেছিল—তাহলে কি নতুন বৌমা বলব?

—কেন বৌমাই বা বলবে কেন? তুমি তো শুনলাম পুরনো কালের লোক! কেশবের মা—মানে বাবুর প্রথম পক্ষকে কি বলতে?

রাঁধুনী বিস্ফারিত-নেত্রে বলেছিল—তাঁকে? তাঁকে তো সকলেই গিন্নীমা বলত।

—বেশ, আমাকে তাহলে নতুন গিন্নীমা বলবে।

বলাবাহুল্য এহেন সরস ব্যাপারটি আরো সরস আর পল্লবিত হয়ে সারা সংসারে ছড়িয়ে পড়ল। অতঃপর ব্যঙ্গোক্তি হিসেবে 'নতুন গিন্নী' 'নতুন গিন্নী' উচ্চারিত হতে হতে, সেই শব্দটাই কায়েমী হয়ে গেল। তবে মা কথাটা নিতান্ত মুখোমুখি সম্বোধনের ক্ষেত্র ব্যতীত কেউই উচ্চারণ করতে রাজী হত না!

যাক, তার জন্যে কদমের কিছু এসে যায় না।

সে অক্লেশে কেশবকে 'কেশব' ও তার বৌকে 'বৌমা' বলে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করে নিল। কেশব অবশ্য জীবনে কদমের সঙ্গে বাক্যালাপ করেন নি, কিন্তু বয়সে পাঁচ সাত বছরের ছোট শাশুড়ীকে কেশবের বৌ একদিন বলেছিল —অতবড় মানুষটাকে নাম ধরে ধরে কথা কও, তোমার লজ্জা করে না?

কদম ঠোঁট উল্টে উত্তর দিয়েছিল—লজ্জা আবার কিসের? অতবড় মানুষটার বাপকে কানে ধরে ওঠাচ্ছি বসাচ্ছি, আর তার ছেলের নামটুকু করতে লজ্জা?

বৌ নিজের কানের রক্তিমা লুকোতে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিল।

বলাবাহুল্য ভাঁড়ারের চাবি আঁচলে বাঁধতেও দেরি হয় নি কদমের। তার আচার আচরণ দেখে বেশ বোঝা গিয়েছিল, সে একেবারে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়েই রণক্ষেত্রে নেমেছে।

তা' এসব হল সাত আট বছর আগের কথা।

এখন অন্য হাল।

বছর দুই হল রাঘব রায় গত হয়েছেন, অতএব কদমের সৌভাগ্যশশীও অস্ত গেছে। কেশবের বৌ হৃতগৌরবের পুনরুদ্ধারে লেগেছে, এবং কেশব ভাবছেন

পাঁচ বছরের ছেলেটা সমেত কদমকে কিছু মাসোহারার বন্দোবস্ত করে তার মামাতো ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। এমন সময় এই সংবাদ! শুনে মনের গায়ে জলবিছুটির যন্ত্রণা জাগল!

নাবালক ছেলের পক্ষ থেকে কদম সম্পত্তি ভাগের মামলা তুলেছে। কেশব রায়ের সঙ্গে আট-আনা বখরা!

নাকে সর্দি, পেটে পিলে, হাতে মাদুলি, গলায় বাঘনখ, পুঁইয়ে-পাওয়া সেই ছেলেটার সঙ্গে আট-আনা বখরার কথা শুনে কেশব রায় তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বললেন—বটে! ভেবেছিলাম কিছু মাসোহারা দেব। এক পয়সাও দেব না। দেখি নতুন গিন্নীর হিম্মত। কোর্টে প্রমাণ করব রাঘব রায়ের ও বিয়ে বিয়েই নয়,—'নিকে'। কিসের বিয়ে? এ বংশের কেউ সাক্ষী আছে? পুরুত গিয়েছিল এ বাড়ির? পাকা দেখা হয়েছিল? আগে থেকে কানে শুনেছিল কেউ? কিছু না! ও ছেলে রাঘব রায়ের অবৈধ ছেলে!

কেশবের বৌ সকৌতূহলে বলে—আর এই যে এতকাল ধরে নতুন গিন্নী এ বাড়িতে রয়েছে, তার কি যুক্তি দেবে?

কেশব রায় অগ্রাহ্য ভরে বলেছিলেন—ফুঃ! বেঁচে থাকতে ঢের পুরুষবেটাছেলে অমন ঢের কুকীর্তি করে থাকে। হাড়ী বাদ্দীর মেয়ে এনে ঘরে তুলছে, এ তো তবু বামুন! তোমার স্বামীর মতন নিষ্কলঙ্ক চাঁদ তো সবাই হয় না?

নিষ্কলঙ্ক চাঁদের মহিমায় বিগলিত বৌ কৃতার্থের হাসি হেসে বলেছিল—হ্যাঁগো, তাহলে আদালতে প্রমাণ হবে, ওদের সত্যি কোন দাবি-দাওয়া নেই?

—নিশ্চয়! বামুন হলেও, কি শ্রেণীর বামুন ওরা? আচার্যি বামুন! ওদের সঙ্গে আমাদের কাজ হয়? এই তো—এক মস্ত প্রমাণ রয়েছে আমার হাতে। তা'পর গাঁ-সুদ্ধু সাক্ষীও আমার হাতে।

কেশব রায়ের গুষ্টি সাতপুরুষে ডাকসাইটে মামলাবাজ। কাজেকাজেই কদমের এই আকাশ-স্পর্শী স্পর্ধায় রেগেই জলে মরেছিলেন কেশব রায়, ভয়ে মরেন নি। কিন্তু কাল বদলেছে; এখন নাকি আইন সব সময় দুর্বলের পক্ষে।

ক্রমশই দেখা যাচ্ছে যতটা অবহেলায় এ মামলা নস্যবৎ করে দেবেন ভেবেছিলেন কেশব রায়, তেমনটি ঠিক হচ্ছে না। বরং কেস্ ক্রমেই খারাপ হয়ে পড়ছে, অবস্থা জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে।

ওদিকে কদমের মামাতো ভাই, তস্য শালা, এবং তস্য স্যাঙাৎ এসে এ সংসারে

কায়েমী আসন গেড়েছে। সে নাকি আবার সদ্য-পাসকরা উকিল। তাদের খাওয়া-মাখা ফূর্তি-আমোদে এ পক্ষের চোখের তারা ট্যারা হয়ে যাচ্ছে। তাদের হাসির হুহুঙ্কারে এ পক্ষের কানের পর্দা ফাটছে। বাড়ি ভাগ হয় নি বটে, তবে রাঘব রায় মরতে মরতে হাঁড়ি ভেন্ন হয়েছিল, এবং জানলাদরজার কপাটের সাহায্যে পাঁচিল তোলার কাজ যতটা সম্ভব চালানো হচ্ছিল।

আজকাল প্রায়ই কোর্ট থেকে এসে শয্যা নিচ্ছেন কেশব। গরমে আনাগোনা করে ভীষণ নাকি মাথা ধরে।

বৌ ছুটে এসে প্রশ্ন করে—হ্যাঁ গো কি হল ?

কেশব রায় গম্ভীরভাবে বলেন—সে তুমি বুঝবে না।

—আহা, হার-জিত তো বুঝতে পারি ? কারা হারছে, কারা জিতছে ?

—শেষ রায় বেরোবার আগে ও বোঝা যায় না! ধর্মের ধুরন্ধর এক জজ এসেছেন এখন, সেই ভয়। সবদিক সুরাহা হয়, যদি ওই লক্ষ্মীছাড়া হারামজাদাটা ওলাউঠো হয়ে মরে।

বলে উঠে বসেন কেশব রায়।

বলা-বাহুল্য এই লক্ষ্মীছাড়া হারামজাদাটি আর কেউ নয়, কদমের পাঁচ বছরের পুত্র মানিকলাল। মানিক কেশবের পরম পূজনীয় পিতৃদেবের পুত্র হলেও তার উল্লেখে উক্ত সভ্য বিশেষণটি ছাড়া আর কিছু ব্যবহার করেন না কেশব রায়। কদমের ক্ষেত্রে তারই স্ত্রী-সংস্করণ। ও ছাড়া ওদের বিষয়ে আর কোন শব্দ মুখে আসেই না কেশবের।

ছেলেপুলের মা কেশব-পত্নী মনে মনে একবার শিউরে উঠে নিরুচ্চার উচ্চারণে 'ষাট' বানায়। তারপর বেজার মুখে বলে—মামলার হার-জিতে মরণ বাঁচনের কথা কেন ?

—কেন ? কেন, তার তুমি কি বুঝবে! তোমার তো বাপের বিষয় নয়! তোমার তো আর কোর্টে দাঁড়িয়ে উঁচু মাথাটা হেঁট হচ্ছে না।

—তা তুমি যে বলেছিলে ওদের নেয্য পাওনা কিছু নেই ?

—নেই-ই তো!—রক্ত চক্ষে ঘরের মাঝখানে পায়চারি করে বেড়ান কেশব রায়।

বৌ সভয়ে বলে—উকিল ব্যালিস্টার নেয্য-অনেয্য বুঝবে না ?

—না। বুঝবে না! ধমক দিয়ে ওঠেন কেশব রায়—যা বোঝ না, তা নিয়ে কথা কইতে এস না।...উঃ! এখন ভাবছি ছোঁড়া যখন জন্মেছিল, ধাই মাগীকে

হাত করে নুন খাইয়ে মারি নি কেন!

যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ!

কী রোগীর বেলায়, কী মোকদ্দমার বেলায়।

রোগী মরমর হলে লোকে দূরদূরান্তর থেকে বড় ডাক্তার আনতে ছোটে, কেস্ মরমর হলে দূরদূরান্তরে ছোটে উকিল ব্যারিস্টার আনতে। গোয়াড়ীর উকিলে আর কুলোয় না, এখন কলকাতা থেকে উকিল আনাচ্ছেন কেশব রায়। কিন্তু তেমন ভরসা কেউই দিচ্ছে না। কদমের সঙ্গে রাঘব রায়ের বিবাহটা বৈধ প্রমাণিত হয়ে গেছে, এবং অবলা বিধবা ও নাবালক শিশুটির প্রতিই আদালতের ষোল আনা সহানুভূতি দেখা যাচ্ছে।

বলা বাহুল্য সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টার ক্রটিও হয়নি কদমের পক্ষ থেকে। আদালতে হাজির হওয়ার দিন হলেই সেদিন সোডা দিয়ে মাথা ঘষে, বেছে বেছে আধ-ময়লা থান পরে এবং মুখের ভাব যতটা ক্লান্ত ক্লিষ্ট করে তোলা সম্ভব তা' করে।

যতক্ষণ শ্বাস, সেই হিসেবেই বড় এক আইনজ্ঞ পুরুষের পরামর্শ নিতে গিয়েছিলেন কেশব, ফিরলেন দেড়টার গাড়িতে। মন-মেজাজ যতটা সম্ভব তিক্ত।

সেই ভোর থেকে টিপিটিপি বৃষ্টি পড়ছে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। স্টেশনে নেমে দেখলেন বৃষ্টিটা ধরেছে মাত্র, আকাশের অবস্থা একই। কোন ট্রেনে ফিরবেন বলে যাননি কাজেই স্টেশনে গাড়ি প্রস্তুত নেই; মনে করলেন, দূর ছাই আর ভাড়াটে গাড়িতে কাজ নেই, হেঁটেই চলে যাই। ঠিক এই মুহূর্তে মানুষ এবং কথা আদৌ ভালো লাগছিল না বলেও হয়তো এই সিদ্ধান্ত।

বড় রাস্তা ছেড়ে ঘোষের পুকুরের পাড়-বরাবর বাঁকা রাস্তাটা ধরলেন কেশব রায় শর্টকাটের জন্যে নয়, নির্জনতার জন্যে। যাচ্ছিলেন আপন মনে, হঠাৎ অদূরে তাকিয়ে দুই চোখ কপালে উঠে গেল; একেবারে পুকুরের ধার ঘেঁষে ঘুরে বেড়াচ্ছে কে ও? গোপ্লা না? এর মানে? এরা ভেবেছে কি? আজকের দিনে—ছেলে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্দি হয়ে বসে আছে! 'এরা' অর্থে অবশ্য কেশবের বৌ। গোপ্‌লা বা গোপাল কেশবের ছোটছেলে। বাড়ি থেকে এতটা এলই বা কেন?

তাড়াতাড়ি এগিয়ে যান কেশব ছেলেটাকে ধরবার জন্যে। কিন্তু এসেই দাঁড়িয়ে পড়েন আর যেন তীব্র একটা ঘৃণার শিহরণে সমস্ত শরীর সিরসিরিয়ে ওঠে তাঁর!

মনে হল একসঙ্গে একমুঠো কেঁচো দেখেছেন যেন !

গোপাল নয়, মানিক !

মানিক ঝড়ে-পড়া কাঁচা তেঁতুল সংগ্রহ করছে। পথচারীর প্রতি দৃক্‌পাত নেই তার।

ঘৃণার শিহরণের সঙ্গে সঙ্গেই একটা আক্রোশের আগুন জ্বালা ধরিয়ে দেয় সর্বাঙ্গে। এই, এইটে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ! তাঁর আট-আনার ভাগীদার ! পূর্বজন্মের মহা-মহাশত্রু ! কেশব রায়ের মনে পড়ে বেশ কিছুকালের মধ্যে ছেলেটাকে তিনি দেখেন নি। অর্থাৎ দেখতে পান নি। পরমশত্রুর নজর থেকে কদম ছেলেকে ভয়ে ভয়ে সরিয়ে রাখে। বোধকরি আজ কেশবের কলকাতা যাওয়ার খবর ও-তরফে পৌঁছেছে। তাই মানিকের এই ছুটি। তাছাড়া আরও কারণ, মামলা জেতার মানত করে মা আনন্দময়ীর বাড়ি হোম বসাতে গেছে কদম। তিনদিন তিনরাত সেই হোমের আগুন জ্বালিয়ে রাখতে পারলে জয় অবশ্যম্ভাবী।

কেশব রায় অবশ্য এতকথা জানতেন না।

তিনি শুধু দেখলেন ছেলেটা কি ভাবে কে জানে মার আওতা থেকে ছিটকে এখানে এসে পড়েছে !

নাকে সর্দি, পেটে পিলে, হাতে মাদুলি, গলায় বাঘনখ।

সহসা একটা ভয়াবহ হিংস্র ইচ্ছে পেয়ে বসে কেশব রায়কে ! আইন-বিরোধী, সভ্যতা-বিরোধী, মানবতা-বিরোধী সাংঘাতিক একটা ইচ্ছে !······বাঘনখ-লটকানো চড়াই পাখির মত ওই শীর্ণ গলাটা নিজের নখে বিঁধে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে।

আধ মিনিটের কাজ !

আধ মিনিটেই পরমশত্রু নিপাত হয়ে যায় !

চারিদিক তাকিয়ে দেখলেন কেশব রায়। বাদলা-দুপুরের অস্বস্তিকর আবহাওয়া দেশসুদ্ধ লোককে বোধকরি ঘরে পুরে রেখেছে। রাস্তায় জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই। এমনিতেই এ রাস্তাটা জনবিরল, আজ একেবারেই জনশূন্য। দাঁতের পাটি দুটো কিড়মিড়িয়ে ওঠে কেশবের, দশটা নখ সমেত হাত দুটো যেন নিস্‌পিস্ করতে থাকে ! হাতের যে ইচ্ছেটা অদম্য হয়ে ওঠে, সে হচ্ছে প্যাকাটির মতো ওই কুৎসিত দেহটাকে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে পুকুরের জলে ছুঁড়ে ফেলে দেবার।

এই ত সুযোগ !

কে টের পাবে ?

কেঁচোটাকে চটকে পিষে টান্ মেরে পুকুরের জলে ফেলে দিয়ে, ফের যদি কেশব ফিরতি-ট্রেন ধরে কলকাতায় ফেরেন ? সেখানে গিয়ে কাজের অছিলা দেখিয়ে কোন এক আস্থাভাজন আত্মীয়ের বাড়িতে রাতটা কাটাতে পারলেই কেল্লা ফতে !

ভোরের গাড়িতে তিনি যে এখান থেকে গেছেন সেকথা অনেকেই জানে। বেলা বারোটা অবধি উকিলের বাড়ি ছিলেন, কাজেই সেটা পাকা দলিলে উঠে আছে। সন্ধ্যা থেকে বাকী রাত্তিরটার প্রত্যেক্ষ সাক্ষী যোগাড় করতে পারলেই প্রমাণ হয়ে যাবে, সকাল থেকে পরদিন সকাল অবধি কেশব রায় কেষ্টনগর ছাড়া।

কে তাহলে খুনের দায়ে ফেলতে পারবে কেশব রায়কে ?

'লক্ষ্মীছাড়া হারামজাদা'টার কণ্ঠনালীটুকুর দিকে তাকিয়ে দেখেন কেশব রায়। একমাত্র চড়াই পাখির তুলনাই চলে। নিজের এই সাঁড়াশী-সদৃশ আঙুলগুলোর দিকেও তাকান। আধমিনিটও নয়, সেকেণ্ড কয়েক !···

হ্যালা-ক্ষ্যাপা ছেলেটা তখন হাঁ করে পুকুরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, কাঁচা তেতুল চুষছে !

এক পা এক পা করে এগোতে থাকেন কেশব রায়।

পরবর্তী দৃশ্যগুলো পর পর ভেসে ওঠে মনের মধ্যে।

বুক চাপড়ে মাথার চুল ছিঁড়ে কাঁদছে কদম···তারপর থোঁতামুখ ভোঁতা করে নীরবে মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে উঠছে !

নাবালক ছেলেই যদি পটল তুলল, কার দাবী নিয়ে তবে মামলা চালাবে সে ?

চূর্ণ-দর্প কদমের সেই পরাজিত মুখ কল্পনা করে পুলকে প্রাণ উথলে ওঠে কেশবের ! নিঃশব্দে আর দু'পা এগিয়ে যান।

কিন্তু সহসা বিদ্যুৎ-বিকাশের মত একটা কথা খেয়াল হয়। গলাটেপার দাগ, বড় সর্বনেশে দাগ ! ওই দাগ থেকেই শেষ পর্যন্ত দাগী আসামীকে টেনে বার করে পুলিশ ব্যাটারা ! তার চাইতে ঠেলে পুকুরের জলে ফেলে দিলেই তো—

ঠিক ঠিক !

এই হচ্ছে উত্তম ! একেবারে পাড়ের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে হতচ্ছাড়া ছোঁড়া, পেছন থেকে এতটুকু একটু ধাক্কা। ব্যস···শব্দও হবে না, এত হাল্কা। আর হলেই বা টের পাচ্ছে কে ?

অসাবধানে জলে ডুবে যাওয়া ছাড়া এর আর অপর কোন ব্যাখ্যা হবে না!···চমৎকার।

এগোতে থাকেন কেশব রায়। কাছে, আরো কাছে। ঘন ঘন নিশ্বাস বইতে থাকে। ওঠা-পড়া করে বুক!···কে জানে হত্যা-উদ্যত চেহারা কি রকম হয়! কে জানে কি ভয়াবহ মূর্তি হয়ে উঠেছিল কেশবের। কে জানে অস্ফুট কোন শব্দ তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে পড়েছিল কিনা! হঠাৎ মানিক পুকুরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ফিরে দাঁড়ায়—আর সামনে এই যমরাজ-মূর্তি দেখেই ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে পিছু হাঁটতে সুরু করে!

এক পা দু'পা! একেবারে পুকুরের কানায়।

সত্যিই বড় দাদাকে সে যমের মতই ভয় করে।

এদিকে কেশব?

প্রত্যেকটি লোমকূপে তাঁর পুলক-রোমাঞ্চ!

নরহত্যার দায়ে পড়তে হবে না। ছেলেটা নিজেই কাজ হাল্কা করে দিচ্ছে কেশবের! আর দু'তিন পা!

হাঁ করে একটা ভয় দেখালেই তো ব্যস্! ফিনিশ!

না, চীৎকারও দরকার নেই।

বাতাসে শত্রু থাকে!

চোখ গোল করলেই হবে। কেশবের "চোখ গোল" দেখলেই মাথা গোলমাল হয়ে যায় মানুকের। পরীক্ষিত ব্যাপার!

আগুনের ভাঁটার মত গোল গোল দুটো ভাঁটাকে আরও বিস্ফারিত করে এগিয়ে যেতে থাকেন কেশব, সভয়ে ছেলেটাও এক পা এক পা পিছু হটতে থাকে।

:

সারাদিনের বৃষ্টির ফলে ফস করে কর্দমাক্ত পুকুরপাড়ের একটা ধ্বস্ ভেঙে পড়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটাকে এক ঝট্‌কান দিয়ে টেনে এনে গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে প্রচণ্ড হুঙ্কারে ধমকে ওঠেন কেশব রায়—কোন্ চুলোয় যাচ্ছিস হারামজাদা? মরবি না কি?

শেষ অবধি অভিভাবকদের হাতে আত্মসমর্পণ করতেই হল। বিপত্নীক ছেলেকে কেউ বিধবা মেয়ের মত শুধু সজল সহানুভূতি দেখিয়ে ছেড়ে দেয় না। তাকে আবার নতুন জালে জড়িয়ে দিতে না পারা পর্যন্ত ওপরওলাদের বিবেক বাগ মানে না।

অবিশ্যি বিশেষ করে সুকোমলদের মত কমবয়সীদের কথা বলছি। যারা সত্যিই সহানুভূতির পাত্র। যারা দু'দিনও সংসার করতে পারে নি। যার তরুণী বধূ এতটুকু একটু চিহ্নও রেখে যায় নি।

দ্বিতীয়বার বিয়ের প্রস্তাবে যথারীতি প্রথমদিকে খুবই আপত্তি করেছিল সুকোমল, কিন্তু শেষ অবধি সে আপত্তি টিঁকল না। টিঁকল না—হয় তো নিজের মধ্যেই ক্রমশ ভাঙা-খুঁটি আঁকড়ে বসে থাকবার জোর সে খুঁজে পাচ্ছিল না বলে।

এবারে বিয়ের প্রধান ঘটকিনী বড় মাসী।

বোধ করি মেয়েটি তাঁর শ্বশুর-বাড়ির তরফের। তা বড় মাসী বুদ্ধিমতী। টুক্ করে একবার সম্মতি আদায় করে নিয়েই তিনি যবনিকার অন্তরালে চলে গেছেন, এবং সেখানে বসে নিঃশব্দে ব্যাপারটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। মা পিসীমাও নীরব। কারণ আগের বৌয়ের জন্য মন তাঁদের আজও ব্যথাতুর।

নেহাৎই ছেলের মুখ চেয়ে এ কাজে প্রবৃত্ত হওয়া, নইলে সে বৌয়ের মুখ ভোলবার নয়। তাঁরা যা করছেন নিঃশব্দেই করছেন।

কিন্তু পিস্তুতো বোন সাবিত্রী এসে যেন সুকোমলের নিস্তব্ধ শান্তি তচ্ নচ্ করে দিল। সাবিত্রী এ বাড়িতেই মানুষ হয়েছে, এ বাড়িতে তা'র অপ্রতিহত প্রতাপ। আগের বৌকে সে দেখে নি, স্বামীর সঙ্গে বিদেশে ঘুরছিল, এবারে সুবিধে করে এসেছে।

যাকে দেখে নি, তার জন্যে শোক হবার কথা নয়, তাছাড়া—তার মতে দ্বিতীয়াকে যে গ্রহণ করতে চলেছে প্রথমার জন্য শোক প্রকাশ করাটা তার পক্ষে 'ধাষ্টামো'।

আসামাত্রই সুকোমলকে সে প্রথম সম্ভাষণ করল—ও কমলদা বড্ড যে ফাঁকি দিয়েছিলে সেবার? দেখলে তোমার বিয়ের নেমন্তন্ন না খেয়ে ছাড়লাম না?

সুকোমল গম্ভীরভাবে বললে—কখন এলে?

—ছ-ঘণ্টা! কাল বিয়ে, তুমি আজও আপিস যাচ্ছ তা কি জানি?

ভাবলাম দশদিন থেকে ছুটি নিয়ে বসে আছ।

—ভুল ধারণাটা ভেঙেছে তাহলে?

—তা তো ভাঙল!...যাক, কালও যাবে না তো? বলে হি হি করে হেসে উঠল সাবিত্রী।

পিসীমা আড়ালে মেয়েকে তিরস্কার করলেন—ওর সামনে বিয়ে নিয়ে অত হাসি-ঠাট্টা করছিস কেন বাপু? ওর মন-টন ভাল নেই।

সাবিত্রী চরম অবজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ ঠোঁট উল্টে বলে—হুঁঃ, মন ভাল নেই? আরও কত শুনব! আবার যখন টোপর মাথায় দিতে পারছে—

—সে কথা বলে খোঁটা দিতে পারিস না বাছা, এই বয়েস থেকে কি সন্ন্যাসী হয়ে থাকবে? তা বলে—

—আমি ওসব 'তা-বলে'র ধার ধারি না। আমি সে বার কমলদার বিয়েতে আমোদ করতে পাই নি, এবারে চুটিয়ে আমোদ করব!

চায়ের পেয়ালাটা ঠক্ করে টেবিলে বসিয়ে দিয়েই সাবিত্রী ভুরু কুঁচকে বলে—এখনও টেবিলে তোমার 'প্রথমা'-কে ফুলের মালা পরিয়ে বসিয়ে রেখেছ? এটা কিন্তু ঠিক করছ না কমলদা!

ছেলেবেলায় ওর বাচালতার জন্যে ঢের গাঁট্টা মেরেছে সুকোমল, কিন্তু এখন এঁটে উঠতে পারে না।...জীবনের পরিণতির দিক দিয়ে সুকোমলের চাইতে অনেক ওপরে উঠে গেছে সাবিত্রী, অবস্থাতেও উঠে গেছে অনেকটা। অফিসারের স্ত্রী প্রায় সমবয়সী পিসতুতো বোনের বাচালতা সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই।

কমলকে চুপ করে থাকতে দেখে সাবিত্রী আবার বলে—চুপ করে রইলে যে? এ ছবি এখানে রাখা চলবে না!

চকিতে একবার ছবির দিকে দৃষ্টিপাত করে সুকোমল গম্ভীরভাবে বলে—কেন?

—ওর আবার 'কেন' কি? পুরনো প্রেয়সীর স্মৃতি আঁকড়ে বসে থাকা তোমার নবাগতা সহ্য করবে কেন?

—সহ্য করবে না? মানুষ তার সমস্ত পুরনো স্মৃতি মুছে ফেলুক, এই কি তোমরা—মেয়েরা চাও?

—এক্ষেত্রে অন্ততঃ!...তুমি যে আগের বৌয়ের ছবির গলায় রোজ ফুলের মালা ঝোলাবে, আর সে বেচারা পুট পুট করে তাই দেখবে, তা চলবে না!

—হিংসেয় বুক ফেটে মরে যাবে ?

—যাবেই তো। একশ'বার। যাবে না—কেন, তাই বল ? তা ছাড়া—এ ছবি রাখবেই বা কেন ? ওর সামনে তুমি নতুন বৌকে—

—তর্কে তোর সঙ্গে কখনও জিতি নি আমি, কারণ যুক্তির বালাই তোর নেই। তর্ক করব না। শুধু জিজ্ঞেস করি—তোদের মেয়েদেরও তো মৃত সন্তানের ছবি সামনে ঝুলিয়ে রেখে পরবর্তী শিশুটিকে আদর করতে কই বাধে না ?

সাবিত্রী নাক সিঁটকে গালে হাত দিয়ে বলে—ও মা কী ঘেন্নার কথা ! কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা ! ছি ছি ! নাঃ ! বুদ্ধিশুদ্ধি তোমার লোপ পেয়েছে কমলদা !

—কেন বুদ্ধিহীনতার কি প্রমাণ পেলে ? আমার মতে স্ত্রী গেলে, দ্বিতীয়বার স্ত্রী গ্রহণ যত গর্হিত, তা'র চাইতে ঢের বেশি গর্হিত সন্তান গেলে আবার সন্তান আবাহন। সেই মাতৃস্নেহই তো আবার উজাড় করে দেবে নতুনকে ? দুধ খাওয়াবে ঘুম পাড়াবে কোলে করবে। কোথাও বাধবে না ! স্ত্রী তো তবু পরের মেয়ে !

সাবিত্রী অভ্যাসে-সাধা ঠোঁটের ভঙ্গী করে বলে—পাগলের পাগলামি শুনে তো সংসার চলবে না। মোট কথা এ ছবি অন্তত এত চোখের সামনে রাখা হবে না। রাখতে হয় তো—এই—এইখানে !

টপ্ করে ছবিটা তুলে নিয়ে দরজার মাথায় একটা ব্র্যাকেটে তুলে রেখে সাবিত্রী বলে—দেখ এখন, ছোটগিন্নী এখান থেকেও নির্বাসন দেয় কি না।···যাক—তোমার আলমারির চাবিটা একবার দাও তো ?

ড্রয়ার থেকে চাবিটা বার করে দিতে গিয়ে সুকোমল সন্দিগ্ধভাবে বলে—কি হবে ?

—দরকার আছে দাও না !

—শুনিই না দরকারটা ?

—ডাকাতি করব ! শুনলাম না কি অধিবাসের তত্ত্বয় দিতে ছ'খানা মোটে শাড়ি এসেছে !···

—তা হবে !

—আহা ! কিছু জানেন না, কচি খোকাটি ! বলি তোমারই না হয় সেকেণ্ড এডিশন, তার তো তা নয় ? তা ছাড়া আমি তত্ত্ব সাজাব—

—আরও কিছু কাপড় দেওয়াই যদি বিধি হয়, তো—দাও গে ! কি চাও টাকা ? কত চাই ?

সাবিত্রী বলে—কেন, আবার মেলা কতকগুলো টাকা খরচ করে একগাদা শাড়ি কেনার দরকার কি? শুনলাম—সে বৌয়ের তিনভাগ শাড়ি আনকোরাই আছে, সেগুলো দিতে দোষ কি?

চায়ের পেয়ালা ধরা হাতটা কি কেঁপে উঠল, বুকের সঙ্গে সঙ্গে?···সাবধানে ওটাকে নামিয়ে রেখে সুকোমল সাবিত্রীর বেপরোয়া মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—দোষ গুণের কথা থাক, বাজারে আর শাড়ি মিলবে না এমন তো নয়?

—তা ওগুলো নিয়ে তুমি করবে কি? সে এসে তো পরবেই! এখন তবু সৌষ্ঠব করে চারটি সাজিয়ে দেওয়া যেত!

—ওগুলো পরতেই হয় এমন কোন আইন আছে?

—জানি না! না পরে ছাড়বে! সাবিত্রী এবার রেগে উঠে দাঁড়ায়। তর্ক সে ভালবাসে, তর্কের গন্ধ পেলে রক্ষে নেই কিন্তু এ রকম ঠাণ্ডা প্রতিবাদে ওর গায়ে জ্বালা ধরে। তাই উঠে যাবার সময় দুই হাত উল্টে বলে যায়—আমার আর কি! ও রকম দুঃখীর মত তত্ত্ব সাজাতে পারব না—সাজাব না! চুকে গেল ল্যাঠা!···মামী নিজেই সাজাক!

সাবিত্রী চলে যাবার পর অনেকক্ষণ সেই শূন্যতার দিকে তাকিয়ে থাকে সুকোমল! সব মেয়েই কি এই রকম? এই রকম অসার ফাঁকা? সাধনাও কি এই মেয়েই ছিল? শুধু স্বল্প অবসরে টের পাওয়া যায় নি!

তা হতে পারে না!

নিজের মনকে দৃঢ় করে সুকোমল, সে সম্ভব নয়! সব মেয়েই যদি এমনি অসার হত—পুরুষ জাতি তাকে সহ্য করত কি করে? সাবিত্রীর স্বামী অতীন্দ্রবাবুর জন্য করুণা হয় সুকোমলের।

যে চাবি সাবিত্রীর হাতে দিতে গিয়ে দেয় নি, সেই চাবির রিংটা রাত্রে বার করল সুকোমল। অনেক রাত্রে। বাড়ির সবাই যখন আগামীদিনের সমস্ত গোছগাছ করে রেখে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়েছে!

এ চাবি সাধনার গায়ের গয়নাগুলির সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সাধনার মা! সব কিছুই দিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। একটা নাতি-নাতনী হয় নি, যে তার স্বার্থে কিছু আগলাবেন। সুস্থ মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিলেন আদর করে, সে মেয়েকে আর ফেরৎ দিতে পারেন নি বলে জামাইকে আর সেই অবধি মুখ দেখান নি তিনি।

সাধনার বাবার দেওয়াই আলমারি।

উপরের দু'টো তাক বোঝাই সাধনার জিনিস, নিচের দিকে সুকোমলের। এইভাবেই গুছিয়ে রেখে গিয়েছিল সাধনা! নিজের প্রয়োজনে মাঝে মাঝে খুলতে হয়, কিন্তু উপরের তাকে কোনদিন হাতে ঠেকায় নি সুকোমল। যেমন আছে থাক। সাধনার গোছানো!

কোন সময়ই খুলবে না ভেবে একবার নিজের জামা-কাপড় বার করে নেবার ব্যবস্থা করেছিল, কিন্তু বার করে নিতে কেমন মায়া হল।...মনে হল অলক্ষ্যে বসে সাধনা ম্লান সুরে বলছে—আমি তো বাধ্য হয়ে তোমার সঙ্গ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি, ও-গুলোকে আর আলাদা করছ কেন? আমরা যে দুজনে একদিন একত্রিত ছিলাম, সে স্মৃতি ওদের মধ্যে থাক না।

আলাদা করা হয় নি।

আজ ধীরে ধীরে আলমারিটা খুলল সুকোমল, গভীর রাতে ঘরের দরজায় খিল এঁটে!...এই আরশি-বসানো চমৎকার আলমারিটা ঘরের জায়গা জুড়ে থাকবে, আর ঘরের ঘরনী সেটা ব্যবহার করতে পাবে না, এ হয় তো হবে না। কে জানে ...হয় তো এসেই সে সর্বগ্রাসী দখল শুরু করে দেবে! কে জানে সে সাবিত্রীর মতই মনোবৃত্তিওলা মেয়ে কিনা। সাবিত্রী ভয় ধরিয়ে দিয়েছে।

তার চাইতে সরানো থাক সব। মনের নিভৃত-গোপনের ছবির মতই লুকনো থাক সাধনার অনেক আকাঙ্ক্ষার বস্তুগুলি।

কত শাড়ি, কত জামা, কত অসংখ্য টুকিটাকি!

নববিবাহিতার অপর্যাপ্ত সঞ্চয়ের উপরও জমা হয়েছে, পিত্রালয়ের আর শ্বশুরালয়ের দু'টি বছরের আদরের উপহার! পুজোয় শীতে রথে দোলে নববর্ষে জন্মদিনে—কারণে অকারণে।

দু-বছরে আর কটিই বা পরে শেষ করেছিল! বাপের বাড়ি যাবার সময় নিয়েও যায় নি কিছু। শুধু পরিপাটি করে গুছিয়ে রেখে গিয়েছিল।

সাধনার হাতের গোছানো জিনিসগুলি স্থানভ্রষ্ট হল. এতদিন পরে!...সমস্ত জিনিসগুলো বিছানার উপর স্তূপীকৃত করে যেন ক্লান্ত হয়ে একটু বসল সুকোমল ...জামা কাপড়ের অন্তরালে এত ছেলেমানুষী জিনিস ছিল কে জানত! কৌটোই কত! একটি প্লাস্টিকের কৌটোয় চারটি কাঁচের চুড়ি, একটা কাগজের বাক্সে নানা রঙের পশমের নমুনা। ছোট্ট কৌটোয় সোনালি টিপ, উপহারে পাওয়া হরেক রকমের সিঁদুর-কৌটো!

একটি কাশ্মীরী-কাজ-করা কাঠের বাক্সে যত্নে তুলে রাখা আছে সুকোমলের কাছে পাওয়া স্বল্প কয়েকখানি চিঠি।...সাধনার প্রকৃতিটাই কি এমনি গোছানো ছিল?...না, সে মনে মনে টের পেয়েছিল চিরদিনের জন্য বিদায় নিচ্ছে?

নাঃ, তা কেন ভাববে?

এতটুকু অসুস্থতার আভাস নিয়েও তো যায় নি। গিয়ে জর হল, আর মারা গেল!

নাঃ! এসব কাউকে দেখতে দেবে না সুকোমল!

লুকিয়ে সরিয়ে রাখবে!...

এই অতৃপ্ত-বাসনার বস্তুগুলির উপর দস্যুতা সহ্য করতে পারবে না সে।

খাটের তলায় একেবারে ভিতরের দিকে ঢোকানো ছিল, একটা মস্ত বড় স্টীল ট্রাঙ্ক। সাধনার বিয়ের। নিচু হয়ে অনেক কষ্টে ট্রাঙ্কটাকে টেনে বার করল সুকোমল আস্তে আস্তে নিঃশব্দে।

এই ট্রাঙ্কটাই শেষবারে বাপের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল সাধনা। এর মধ্যে করেই আবার তাঁর ব্যবহৃত সম্পত্তিগুলি ভরে ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন সাধনার মা। সেই অবধি এমনিই সরানো আছে চোখের সামনে থেকে। দৈহিক ব্যথার জায়গাটাতেও যেমন হাত দিতে ভয় করে, মানসিক ব্যথার স্থানটি স্পর্শ করতেও তেমনিই ভয় করে বৈ কি!

সাবিত্রীদের হয় তো করে না, তবু অনেকের করে।

এ ট্রাঙ্কের চাবিও রিঙে আছে। আলমারি খুলতে তেমন কুণ্ঠা আসে না, যেমন আসে বাক্স খুলতে। তবু—খুলে ফেলল সুকোমল। ঘুমন্ত ডালাটা যেন মৃদু একটা আর্তনাদ করে দাঁড়িয়ে উঠল!

গয়নার বাক্সটা, আর সামান্য কিছু শাড়ি জামা। যেগুলি কয়েকদিন পরবে বলে নিয়ে গিয়েছিল।...আধখানা ব্যবহার করা একটা স্নোর শিশি, মলিন হয়ে যাওয়া প্যাড্ সমেত আধকৌটো পাউডার।

সাধনার মাও কি সাবিত্রীর দলের? চোখের সামনে থেকে সমস্ত চিহ্ন নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চেয়েছিলেন? না কি অকস্মাৎ আঘাতে দিশেহারা মাতৃহৃদয় ভেবে-ছিল সুকোমলের কাছে জিম্মা করে দিলেই বুঝি সব ঠিক থাকবে।

ট্রাঙ্কের জিনিসগুলো বার করে ফেলে আবার একটি একটি করে সব গুছিয়ে তুলল সুকোমল;...গুছিয়ে তুলল আলমারি থেকে বার করা সেই স্তূপীকৃত ভার।

…দরজার মাথায় তুলে রাখা ফটোখানা নামিয়ে নিয়ে তুলে রাখল কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে। মনে মনে যে কথা সহস্রবার বলেছে সেই কথাই চুপি চুপি উচ্চারণ করল…আমায় ক্ষমা কর সাধনা !

ডালা বন্ধ হতে চায় না, আস্তে আস্তে হাতের চাপ দিয়ে বন্ধ করল ডালা।… তারপর চাবিটা কলে ঢুকিয়ে অনড় হয়ে বসে থেকে এক সময় আরও আস্তে ঘুরিয়ে দিল !

যেন শুধু সাধনার জীবনের এই বস্তুর সঞ্চয়গুলিই নয়, আপন হৃদয়ের সমস্ত সঞ্চয়ও নিভৃতে কোথাও লুকিয়ে রেখে চাবি বন্ধ করে ফেলল সুকোমল !

এ সঞ্চয়ের উপর কারো হাত পড়তে দেবে না, এ সঞ্চয় সরিয়ে রাখবে এ ঘর থেকে অন্য ঘরে !

মৃত্তিকা

নড়বড়ে চৌকি, ছেঁড়া তোশক, তেলচিটে বালিশ। আর মাথার কাছে দুরূহ বিজ্ঞানের বই !

পুরো দশহাত মাপের ধুতি দু'খানার বেশি নেই, সত্যিকার আস্ত শার্ট আছে মাত্র একটা।…সেগুলো ব্যবহার হয় বাইরে বেরোতে। এ ঘরের চৌকাঠের ভিতর ঢুকলেই সেগুলো তুলে রাখা হয় সযত্নে, বাজে খরচ করবার মত দুঃসাহস নেই।

এ ঘরে ঢোকার পর যাতে লজ্জা নিবারণ হয়, সে হচ্ছে—ছেঁড়া ধুতির ভগ্নাংশ দিয়ে তৈরি অভিনব লুঙ্গি। আর 'গেঞ্জি' বলে এখনও যেটাকে চালানো হচ্ছে— সেটা হয় তো এক সময় ঠাশ-বুনুনি ছিলো, এখন 'সামারকুল্' হয়ে গেছে।… অন্ততঃ এ বাড়ির চাকর যতীন তাই বলে।

সেই গেঞ্জি আর সেই ধুতি পরেই ত্রস্তেব্যস্তে ঘরের ভেজানো দরজা খুলে বেরিয়ে এল কাঞ্চন। অবাক হয়ে বলল—ডাক্তারবাবু! আপনি ?

ডাক্তার বিশ্বাস গম্ভীর মৃদুস্বরে বললেন—তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে কাঞ্চন !

বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল কাঞ্চনের। 'কথা!' তার সঙ্গে আর ডাক্তারের কি এমন কথা থাকতে পারে, যার জন্যে তিনি নিজে এই রাত্রে তার

দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন? তবে কি এই শেষ আশ্রয়টুকুও খসল? ডাক্তার বিশ্বাসের মাধ্যমেই কি সেই সংবাদটা শুনতে হবে?

নাকি, কাঞ্চনের সেই 'মরীয়া প্রস্তাবে'র প্রতিক্রিয়া এটা?···হ্যাঁ, কয়েকদিন আগে ডাক্তার বিশ্বাসের কাছে প্রস্তাব করেছিল কাঞ্চন, অর্থের বিনিময়ে ব্লাড্-ব্যাঙ্কে রক্ত দিতে প্রস্তুত সে। টাকার বড় দরকার তা'র। টাকা চাই—টাকা। অথচ সে চাহিদা প্রচুর নয়, মাসে মাসে সামান্য কয়েকটি করে টাকা। যাতে কাঞ্চনের পড়ার খরচটা চলে যায়।

ডাক্তার একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে আরও মৃদু এবং কিঞ্চিৎ কোমল গলায় বলেন—একটা বিশেষ গোপনীয় কথা, সময় হবে তোমার এখন?

সময় হবে!

কাঞ্চন তটস্থ হয়ে ওঠে। তা'র আবার সময়ের মূল্য! ডাক্তার বিশ্বাস নিজে তা'র কাছে এসে, বিনীত প্রশ্ন করছেন, দুটো কথা কইবার মত সময় কাঞ্চনের হবে কি না!···পৃথিবী কি উল্টে গেল নাকি?

—কী আশ্চর্য, কি যে বলেন? আসুন!···বলেই নিজের ঘরের দিকে তাকায় কাঞ্চন এবং পরবর্তী কথা দিয়ে কথাটা শেষ করে—কোথায় যে বসবেন!

—না বসব না—ডাক্তার বিশ্বাস কাঞ্চনের ছেঁড়া গেঞ্জি পরা কাঁধের উপর ডান হাতের থাবাখানি চাপিয়ে বলেন—এখানে হবে না—এস আমার সঙ্গে, গাড়িতে কথা হবে।

গাড়িতে!

ডাক্তার বিশ্বাসের গাড়িখানাকে মনশ্চক্ষে একবার দেখে নেয় কাঞ্চন। সেই তেল-পিছলোনো বিরাট গাড়িখানার মধ্যে ঢুকতে হবে কাঞ্চনকে, বসতে হবে সেই স্প্রীঙের গদির উপর! কেন এই অঘটন?

ডাক্তার তাকে কিঞ্চিৎ স্নেহ করেন বটে, কিন্তু সে স্নেহ করুণা-মিশ্রিত। এমন অন্তরঙ্গতা দেখাননি কোনদিন।···যাক্, আজ কেন যে দেখাচ্ছেন সে প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় এখন নেই। এখন শুধু আদেশ-পালন। কুণ্ঠিতভাবে বলে—আচ্ছা যাচ্ছি, কাপড়টা বদলে নিই—

ডাক্তার সস্নেহ-হাস্যে বলেন—থাক্ থাক্, কাপড় বদলাবার দরকার নেই, গাড়ি থেকে তো নামছি না আমরা। খানিকটা চক্কর দিয়ে আসা যাক, যেতে যেতেই কথা হবে।

অগত্যাই ছেঁড়া চটিটার মধ্যে পা গলিয়ে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে রেখে ডাক্তারের অনুসরণ করে কাঞ্চন।...ঘরে চুরি যাবার মত জিনিস আছে বলে এ সাবধানতা নয়, খোলা দরজা দিয়ে পাছে তার ভিতরের শ্রীহীনতা লোকের চোখে পড়ে যায় এই ভয়! অথচ এই নিয়ে বাড়ির বামুন-চাকরে মিলে শুনিয়ে শুনিয়ে কত হাসাহাসি করে। নাম দিয়েছে 'লাখ-টাকার বাবু'।

তবু সে উপহাস না শোনার ভান করে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে হয়, তবু তাদের মনিববাড়ির করুণার দান—দুবেলা দু-পাত ভাত খেয়ে আসতে হয় মাথা হেঁট করে গিয়ে! এ অপমানে বিচলিত হবার উপায় কাঞ্চনের নেই।...তাকে টিঁকে থাকতে হবে আপন সাধনায়।

অপমানে যখন চোখ ফেটে জল আসতে চায়, এ আশ্রয় ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছে হয়, তখন কষ্টে নিজেকে দমন করে, মনে মনে জপ করে—"এ আমার তপস্যার বিঘ্ন, এ আমার একাগ্রতার পরীক্ষা।...আমাকে টিঁকতেই হবে, বাঁচতেই হবে, জ্ঞান অর্জন করতেই হবে।"

বড়লোকের বাড়ি, গেটে ঢুকতেই বাঁ-ধারে নিচু নিচু কখানা ঘর, চাকর-বাকরদের জন্য। তারই একখানায় আশ্রয় পেয়েছে আকাশকুসুম-স্বপ্নে বিভোর জ্ঞানতপস্বী কাঞ্চনকুমার।

মা-বাপ হারা গ্রাম্যবালক কাঞ্চন, কেমন করে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, ছেঁড়া চটি আর ছেঁড়া প্যাণ্ট সম্বল করে কলকাতায় এসে কলেজে ভর্তি হল, কেমন করে তিনটে পাশ করল স্কলার-শিপ নিয়ে, সে ইতিহাস নতুন নয়।...সেই দুঃসাধ্য সংগ্রাম আর অসাধ্যসাধনের ইতিহাস এই হতভাগ্য দেশের অনেক অসহায় ছাত্রের জীবনের খাতায় লেখা আছে। কিন্তু কাঞ্চনের আশা আরও উচ্চ। আরও সুদূর-বিস্তারী।...সে ডক্টরেট পাবার দুরন্ত ইচ্ছা নিয়ে 'থিসিস' লিখতে চায়...চায় সমুদ্র-পাড়ি দিয়ে নব নব বিদ্যার অনুশীলন করতে। সে যাই হোক—কথা হচ্ছে আশ্রয়দাতার উপকারের সূত্রে 'ডাক্তার-বাড়ি যাওয়া-আসা' করতে করতে ডাক্তার বিশ্বাসের সঙ্গে পরিচয় হয় কাঞ্চনের এবং কেন কে জানে তদবধি এই দরিদ্র ছেলেটিকে একটু স্নেহের চক্ষে দেখে থাকেন ডাক্তার। দেখা হলেই ডেকে দুটো কথা বলেন। কয়েকখানি মূল্যবান বই দিয়ে সাহায্যও করেছেন একবার। কিন্তু সে সবই করুণার চিহ্ন। এমন নিজে এসে গাড়িতে তুলে নিয়ে গোপনীয় কথা বলার মত অন্তরঙ্গতায় সুযোগ দেন নি কোনদিন।

প্রথমে খুব খানিকক্ষণ নিঃশব্দে গাড়ি চালিয়ে গেলেন ডাক্তার, সত্যিই চক্কর খেলেন লেক্‌-এর রাস্তায়।…আর মৌন প্রতীক্ষারত কাঞ্চন ভাবতে লাগল আকাশ-পাতাল।

কি কথা! কেমন কথা?

…যা বলতে ডাক্তার বিশ্বাসকেও সাহস সঞ্চয় করতে হচ্ছে।…সে কথার সঙ্গে কাঞ্চনের কি সম্পর্ক?

অনেক প্রতীক্ষার শেষে, প্রায় ফেরার মুখে ডাক্তার বিশ্বাস তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করলেন।…না, আর নার্ভাস নেই ডাক্তার, সহজ শান্ত গলায় বলে ফেললেন সাধারণ একটা কথার মত।

বিয়ে করবে কাঞ্চন?

অগাধ বড়লোকের একমাত্র মেয়েকে?…না, কানা-খোঁড়া কিছু নয়, আস্ত মেয়ে! কুশ্রী? মোটেই না, রূপসীই বলা চলে বরং। সুখের ঘরেই তো রূপের বাসা।…এক কথায় অর্ধেক রাজত্ব আর একটি রাজকন্যা! কাঞ্চন হাত বাড়ালেই সেই স্বপ্নাতীত সৌভাগ্য হাতে আসে কাঞ্চনের, শুধু—

হ্যাঁ শুধু—

শুধু সেইটুকু যদি স্বীকার করে নেয় কাঞ্চন, আধুনিক উদারতা নিয়ে, প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে! আর বাস্তববুদ্ধি নিয়ে! বরাত একেবারে ফিরে যাবে কাঞ্চনের, শেষ হবে এই নির্লজ্জ নিষ্ঠুর জীবন-সংগ্রামের! জ্ঞানের তপস্যায়, বিজ্ঞানের অনুশীলনে নিশ্চিন্তে জীবন কাটিয়ে যেতে পারবে। অন্নচিন্তা চোখ রাঙাবে না কোনদিন, অন্য কোন চিন্তাই থাকবে না। নিজের লাইব্রেরী, নিজের গবেষণাগার …এককথায়—বহির্জগতের সকল সুখ-সুবিধা করায়ত্ত করে অন্তর্জগতের মধ্যে বাস করতে পারবে সে। ··শুধু যদি—

গাড়ি থেকে নামবার সময় ডাক্তার ওর সেই জালিগেঞ্জি-ঢাকা পিঠটা একবার চাপড়ে দিয়ে বলেন—আজই একখুনি তোমার উত্তর চাইছি না আমি, চট্ করে বলতে পারবে না জানি। ভাববার জন্যে সময় দিচ্ছি।…কত চাও? চব্বিশ ঘণ্টা? আটচল্লিশ ঘণ্টা?

এতক্ষণের স্তব্ধ নির্বাক ছেলেটা, এই প্রথম কথা বলে, প্রায় অস্ফুটকণ্ঠে—তিনটে দিন সময় দিন আমায়—

ডাক্তার বিশ্বাস কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে গম্ভীরভাবে বলেন—বেশ!

তাই হবে! আমার অবশ্য ধারণা, যে কোন বিষয় ডিসাইড করতে একটা রাতই যথেষ্ট।...তা ছাড়া—দুটোদিন অপেক্ষা করতেও ইচ্ছুক নয় তারা, তবু তোমার কথাই থাক। তিনদিন পরেই আসব আমি। এই সময়ই আসব।...আশা করি তোমার ভবিষ্যৎ উন্নতির অনুকূলেই রায় দেবে তুমি। তোমার মা-বাপ নেই, কোন অভিভাবকের রক্তচক্ষু নেই, বিয়ে দেবার মত বোন নেই, আসলে সমাজের কোন দায়ই তোমার নেই! একটা বদ্ধমূল পুরনো কুসংস্কারকে আঁকড়ে থেকে, তাকে তোমার উপর প্রভুত্ব করতে দিলে, নির্জলা বোকামিই হবে।...আচ্ছা ভেবে দেখ—একদিকে তোমার স্বপ্ন, সাধনা, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, আর অপরদিকে একটা তুচ্ছ কুসংস্কার!...দেখ কাকে প্রাধান্য দেবে।...আচ্ছা ...গুড্ নাইট।

দীর্ঘ বলিষ্ঠ-দেহী ডাক্তার দৃঢ় পদক্ষেপে গাড়িতে গিয়ে ওঠেন, আর স্টিয়ারিঙে হাত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্খলিত পদে এগিয়ে গিয়ে জানলার নিচেটা চেপে ধরে কাঞ্চন।

ডাক্তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

কি হল! এখনই কি উত্তর ঘোষণা করে ফেলতে চায় কাঞ্চন, এত বড় একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মূলে কুঠারাঘাত করে?

—কিছু বলতে চাও?

—হ্যাঁ!...কণ্ঠস্বর কিন্তু এখন আর স্খলিত নয়, দৃঢ়ই। দৃঢ় স্থির কণ্ঠে বলে কাঞ্চন—সময় নেবার দরকার নেই, আমি রাজী!

ডাক্তার গম্ভীর স্নিগ্ধকণ্ঠে বলেন—ভালো করে ভেবে বলছ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু একটু আগেই তুমি ভাববার জন্যে অনেকটা সময় চাইছিলে কাঞ্চন!

—তার আর দরকার নেই! মনস্থির করে ফেলেছি আমি।

—দেখ, আমি কিন্তু কোন তাড়াহুড়ো করি নি?

—তার জন্যে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে!

—তাহলে রাজী? বলতে পারি তাদের?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বেশ! শুনে খুশীই হলাম! শুধু সে পক্ষ আমার বন্ধুলোক বলেই নয় কাঞ্চন, বুঝলে? আমি তোমারও ভাল চাই! যে সাধনায় ব্রতী হয়েছ তুমি, সে সাধনা দরিদ্রের নয়! অভাব অনটন, প্রতিকূল অবস্থা সব কিছু অতিক্রম করে

৬৪০৮

সাফল্য অর্জন করার যে প্রতিভা, সে হল দুর্লভ জিনিস! দৈবাৎ দেখা মেলে তার।…তা নইলে—অর্থের প্রাচুর্যই হচ্ছে সাফল্যের সহায়!…তুমি মনস্থির করে ফেলতে পারলে দেখে সত্যিই খুশী হয়েছি!…আমার যৌবনে, আমিও যদি এ রকম কোন চান্স পেতাম, হয়তো অবহেলা করতাম না। ভাগ্যের দান বলেই গ্রহণ করতাম!

…আচ্ছা যাও নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোওগে!

নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোবার নির্দেশ দিয়ে গেলেন ডাক্তার!

কিন্তু ডাক্তারের নির্দেশ মানা কি এতই সহজ?

ঘুম আসবে আজ কাঞ্চনের?

একদিকে সহস্রবাহু প্রসারিত প্রলোভন দুর্বার আকর্ষণে টানতে চায়, আর এক দিকে মুমূর্ষুর ক্ষীণ কণ্ঠের আহ্বানের মত তুচ্ছ একটু সংস্কারের নিষেধ!…তবু এক কথায় নিক্তির পাল্লাটা নেমে পড়ে না কেন?…এত চিন্তা কিসের? সত্যিই তো—সমাজশাসন মানবার কোন দায়ই তো তার নেই!…কেন তবে সে রাজী হবে না? সে শিক্ষিত, সভ্য, আধুনিক!…এটুকু উদারতা থাকবে না তার? এক অসতর্ক কুমারী মেয়ের অজ্ঞাত সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকার করে নেওয়ার মত উদারতা!

কাঞ্চনের এই উদারতায় সেই বেচারী মেয়েটার জীবন রক্ষা হবে, রক্ষা হবে এক সম্ভ্রান্ত ভদ্র পরিবারের মান-সম্ভ্রম!

মানুষ কি ভুল করে না?

সে ভুলকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবে না অপর মানুষ?

ছোট্ট একটা জিনিসকে অনেক বড় করে দেখবার দরকার কি?

বরকর্তা ডাক্তার বিশ্বাস।

কন্যাকর্তা তাঁর একান্ত সুহৃদ ডাক্তার মজুমদার! বরকন্যা বিদায়ের কালে, বিশ্বাস মজুমদারের কাঁধে হাত রেখে মৃদুস্বরে বললেন—তুমিও চল না?

মজুমদার আরও গম্ভীর আরও মৃদুস্বরে বললেন—পারছি না! বড় টায়ার্ড লাগছে! তুমি গেলেই হবে—তুমিই তো সব।

গাড়ি হুস্ করে বেরিয়ে গেল—বরকনে, একটা দাসী, আর ডাক্তার বিশ্বাসকে নিয়ে।

না, সেই নড়বড়ে-চৌকি-পাতা কাঞ্চনের পরিচিত আস্তানায় নয়, এক অচেনা রাজপ্রাসাদে!

ডাক্তার বিশ্বাস অভিনব সজ্জায় সজ্জিত একখানা ঘরে ওদের বসিয়ে প্রসন্নমুখে বলেন—নাও এই তোমাদের বাড়িঘর। সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না কর এবার!

অবগুণ্ঠনের আড়াল থেকে দুটি কুণ্ঠিত চোখ তার 'কাকাবাবু'র মুখের দিকে চাইতে গিয়ে নিজেকে নিচু করে নিল!

ডাক্তার বিশ্বাস সহজভাবে বলেন—বাড়িটা বিরাট, বুঝলে কাঞ্চন, এখানে স্বচ্ছন্দে তোমার লাইব্রেরী ল্যাবরেটরী সব কিছুই করা চলবে! আর কোন ঝক্কিই পোহাতে হবে না তোমাকে। বুঝতেই তো পারছ, মজুমদারের অনেক সন্তান মারা গিয়ে এই একমাত্র মেয়ে, মা-বাপের প্রাণের পুতুল।···আশা করি সেই স্নেহের উপযুক্ত মর্যাদা তোমার কাছেও পাবে মনু!···আচ্ছা মনুমা, তুমি বরং একটু বিশ্রাম কর। আমি কাঞ্চনকে তার বাড়িটা দেখিয়ে নিই!···এখানে আছে কে?···মানে কে কে এসেছে?

নববধূ মাথা নেড়ে মৃদুস্বরে বলে—জানি না! মা আসবেন বোধ হয়।

কাঞ্চনকে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখান ডাক্তার বিশ্বাস। স্বপ্নাহতের মতই অনুসরণ করে চলে কাঞ্চন।···কাল থেকে তো স্বপ্নাহত হয়েই আছে সে! যা কিছু ঘটে যাচ্ছে, তার কোনটাই যে সত্য বলে বিশ্বাস হবার মত নয়!···এই উপকরণ আর আসবাবে-ঠাসা বাড়িটা নাকি তার নিজস্ব!

এত প্রাচুর্য! এত উপকরণ! এত জিনিস মানুষের ব্যবহারে লাগে? এ সবের ব্যবহার-পদ্ধতিই বা কি?

আবু হোসেনের মত হঠাৎ-রাজা কাঞ্চনকে আর ডাক্তারবাবুকে দেখছে, আর দাস-দাসীরা সসম্ভ্রমে সেলাম করে সরে দাঁড়াচ্ছে!

আত্মীয়-স্বজনের অভাব থাকলেও, দাসদাসীর অভাব নেই বাড়িতে!

ঘুরতে ঘুরতে ক্ষণে ক্ষণেই মনে হতে থাকে কাঞ্চনের, দু-দুজন বুদ্ধিমান ডাক্তার এই উন্নত বিজ্ঞানের যুগে পারিবারিক সম্ভ্রম রক্ষার অন্য কোন উপায় খুঁজে পেলেন না? পথের ভিখিরীকে ডেকে এনে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে সেই সমস্যার সমাধান করলেন? এটা একটা আশ্চর্য বৈকি!

এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন মনুর মা, স্বয়ং মজুমদার-গৃহিণী!···একান্তে কাছে ডেকে চোখের জলে ভেসে কাঞ্চনের হাত ধরে বললেন—তোমাকে আর কি

বলব বাবা, দেবতা তুমি! সব জেনেশুনেই আমার মন্থুকে নিয়েছ!...তোমার কাছে লুকোছাপা করবো না, ডাক্তারী বুদ্ধিতে অনেক পরামর্শই করেছিলেন দুই বন্ধুতে মিলে, আমি কেঁদেকেটে নিবৃত্ত করেছি—। বলি এত বড় পাপ আমি হতে দেব না। আর—শুধু তোমাদের মান-সম্মান বজায় হলেই তো চলবে না, মন্থু আমার মনভাঙা হয়ে গেলে বাঁচবে না!...তুমি আমার মন্থুর মনের দিকে তাকিও বাবা! ওকে যেন হেনস্থা কোর না! ওর দোষ নেই, ও অবোধ! দোষ আমারই অসাবধানতার!

অভিজাত ঘরের ধনী একটি মহিলা, করুণা ভিক্ষা করেন কাঞ্চনের কাছে—পরশু পর্যন্ত যে কাঞ্চন যতীন চাকর আর বামুন ঠাকুরের পাশের ঘরে শুয়েছিল, নড়বড়ে সেই চৌকিটার উপর।

আচার-অনুষ্ঠানের পালা শেষ হলে নবদম্পতি যখন নির্জন হল, প্রথম কথা কয়ে উঠল কনে। মৃদু স্বরে বলে উঠল—আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে!

ঘুমের জন্য অনুমতি চাওয়া নয় শুধু জানিয়ে দেওয়া।

ত্রস্তব্যস্তে কাঞ্চন যে উত্তরটা দিল, তার ভাষাটা শোনা গেল না, ভাবে মনে হল—'সে কি? নিশ্চয়! ঘুমিয়ে পড়!'

মুহূর্তেই ঘুমিয়ে পড়ল বৌ।

কাঞ্চন ভাবল নিশ্চয় খুবই ঘুম পেয়েছিল, না হলে এত চড়া আলোর নিচে এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তে পারে?

কাঞ্চনের অত তাড়াতাড়ি ঘুম এল না, চুপচাপ বসে রইল অনেকক্ষণ। ভাবল ...ঘুমিয়ে পড়ে কাঞ্চনকে বরং বাঁচিয়েই দিয়েছে বৌ, নইলে কি কথা বলত সে?

নিদ্রিতার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখল।

বিষণ্ণ ক্লান্ত পাণ্ডুর! তবু ভারি সুন্দর।

ভাবল এই মুখের অধিকারিণীকে কখনো 'হেনস্থা' করা যায়?

মনে মনে বলে—স্নেহ আর সহানুভূতি দিয়ে তোমার সমস্ত গ্লানি মুছে নেব আমি।

তা নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে কাঞ্চন, স্নেহে ভালবাসায় ডুবিয়ে দেয় স্ত্রীকে।...

দারিদ্র্য আজীবনেও অভ্যাস হয় না, কিন্তু প্রাচুর্যের অভ্যাসে দেরি লাগে না! সেদিনের স্বপ্নাহত কুণ্ঠিত কাঞ্চন, এখন স্বচ্ছন্দেই গৃহকর্তার ভূমিকা অভিনয় করে

চলেছে।···মন্নুর স্বাস্থ্যের জন্য উৎকণ্ঠার অবধি নেই তার—বকে, শাসন করে, মমতায় বিগলিত হয়।

মজুমদার গৃহিণী বলেন—'দেবতা'। শুধু আড়ালে নয়, সামনেও।

দুই ডাক্তার বন্ধু আড়ালে সপ্রশংস স্বরে বলেন—সত্যিই ছেলেটা মহাপ্রাণ! এতটা আশা করা যায় নি।

আবার মৌখিক প্রশংসাতেই কর্তব্য শেষ করেন না তাঁরা, নিজেদের প্রতিশ্রুতিও পালন করেন। নিচের তলার প্রকাণ্ড হলটা পরিণত হয়েছে কাঞ্চনের লাইব্রেরী ঘরে। প্রায় প্রতিদিনই কিছু না কিছু করে সংগৃহীত হচ্ছে মূল্যবান গ্রন্থরাজি। ভরে উঠছে কাঞ্চনের ঘর, ভরে উঠছে কাঞ্চনের মন!

এদিকে তিলে তিলে ভরে উঠছে একখানি দেহ, লাবণ্যে আর সুষমায়··· ক্লান্তিতে আর কোমলতায়!

মন্নুর মা এসে চুপি চুপি মেয়েকে শিক্ষা দিয়ে যান—বেশি শুয়ে বসে থাকিস নে মা, যতটা পারবি কাজ করবি, তাতে ভাল হবে।

মেয়েকে তিনি সমানেই এখানে রেখে দিয়েছেন, নিয়ে যান নি নিজের কাছে, জামাইয়ের মন বাঁধবার কৌশল হিসেবেই বোধ হয়! যত কাছে কাছে থাকবে, ততই তো কাছাকাছি হবে। মনের কাছাকাছি, আত্মার কাছাকাছি!

নিজের কাজের ফাঁকে ফাঁকে এক একবার উঠে আসে কাঞ্চন, স্তম্ভিত বিস্ময়ে 'হাঁ হাঁ' করে বলে—ঘর ঝাড়ছ তুমি? বিছানা পাতছ তুমি? এই ভিজে কাপড়গুলো মেলে দেবার লোক খুঁজে পেলে না বাড়িতে? তোমার ঝি-চাকর-গুলো সব একযোগে ধর্মঘট করেছে না কি?···রেখে দাও রেখে দাও শীগগির। শুয়ে পড় লক্ষ্মীমেয়ের মত!

মন্নু হাসে। মধুর ম্লান হাসি।

—মা বলেছেন কাজ করতে!

কাঞ্চন উদ্বিগ্ন আর অবাক হয়ে বলে—মা বলেছেন? তোমার মা? বল কি? কেন বল তো? গরীবের বৌ হয়েছ বলে নাকি গো?

—জানি না।—বলে পালাতে চেষ্টা করে মন্নু।

কাঞ্চন অবশ্য যেতে দেয় না, হাত ধরে ফেলে কাছে বসিয়ে বলে—তোমার শরীরের এই অবস্থা, এখন কাজ করতে বলেছেন কেন, বললে না যে?

—বাঃ বলছি তো জানি না। বললেন 'ভালো হবে'।

—কি জানি বাবা! কাঞ্চন দুই হাত উল্টে বলে—মেয়েদের ব্যাপারই আলাদা!

কাঞ্চনের কথার উত্তরে কি একটা পরিহাসের কথা মুখে আসে মন্থর, কিন্তু চুপ করে যায়! তার যে প্রতিপদে বাধা, প্রতিপদে সঙ্কোচ।

কাঞ্চন তার স্বাস্থ্যের জন্য অহরহ উদ্বেগ প্রকাশ করে, কিন্তু তার বাইরে তার বেশি আর নয়। মন্থর প্রাণের অন্তরালে আর একটি যে প্রাণ-স্পন্দন ধ্বনিত হচ্ছে, কথা ইঙ্গিতেও উল্লেখ করে না কাঞ্চন। মন্থর যেন একটা রোগ হয়েছে, সেই রোগের জন্যই স্নেহময় স্বামী হিসেবে সতর্ক করে, শাসন করে, মমতা করে!

অবশেষে একদিন মজুমদার-গৃহিণী এসে বলেন—এবার তো ওকে নিয়ে যেতে হয় বাবা! আর আমার কাছ থেকে দূরে রাখতে ভরসা হয় না। তুমি কি বল?

মৃদু হেসে কাঞ্চন বলে—কী মুস্কিল, এর জন্যে আমার অনুমতি নিতে হবে নাকি?

—তুমি দেবতা, বলবার কিছু নেই আমার, তবু ওটা বলা নিয়ম। তাহলে একটা ভালো সময় দেখে, কাল পরশুর মধ্যেই—

কিন্তু যে অন্ধকারের জীব পৃথিবীর আলো দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে সে কি পাঁজীর 'ভালো সময়ের' জন্য অপেক্ষা করে?···সেই রাত্রেই ঝন্‌ঝনিয়ে টেলিফোন বেজে ওঠে চারিদিকে···দু-তিনখানা গাড়ি ছুটোছুটি করতে থাকে এ-বাড়ি থেকে ওবাড়ি···ওবাড়ি থেকে লেডি ডাক্তার আর নার্সের বাড়ি!

ছুটোছুটি করেন মজুমদার গিন্নী···উপর থেকে নিচে, নিচে থেকে উপরে।

আর শিক্ষিত সভ্য জ্ঞানতপস্বী কাঞ্চন নিচের তলায় নিজের গ্রন্থাগারে নির্লিপ্তের মত একা চুপচাপ বসে বসে ভাবতে থাকে···বাঙলা দেশে শিশুমৃত্যুর হার নাকি ভয়াবহ, লক্ষ লক্ষ শিশু নাকি পৃথিবীর আলো দেখবার আগেই অন্ধকারের রাজ্যে নির্বাসিত হয়।

সহস্রবার মনকে চোখ রাঙালেও ঘুরে ফিরে শুধু ওই এক কথাই মনে পড়ে।

কিন্তু যে অশ্বত্থের বীজ ভাঙা ইঁটের খাঁজে বাসা বাঁধে, সে ঝড়ে উড়ে যায় না, টিঁকে থেকে, বিরাট দেয়ালে ফাটল ধরায়!

কাঞ্চনের সমস্ত চিন্তা ডুবিয়ে দিয়ে শাঁখ বেজে ওঠে ওপরতলায়। দাসীটা

বাজাচ্ছে, বেপরোয়া জোরে!

শাঁখের শব্দ রাত্রে এতো চড়া লাগে?…বুকের ভিতর হাতুড়ির ঘা মারে?

শাঁখ হাতে করেই ছুটে এসেছে ঝিটা। একেবারে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে ডাক দেয়—জামাইবাবু, সন্দেশ কই? সন্দেশ? রাত পোয়ালে একশটাকার সন্দেশ আনাতে হবে, অমনি না!…চলুন এখন দেখবেন—ফুটফুটে সোন্দর খোকা! সন্ত দেখলে দিন ক্যাণ দেখতে হয় না!…ওমা চুপচাপ বসে যে? আহ্লাদে হাত-পা উঠছে না নাকি? চলুন? এখনকার কালে এ্যাতো লজ্জা কেউ করে নাকি?

চমকে ওঠে কাঞ্চন, ওঃ, এতক্ষণ মনে আসছিল না এই শব্দটা! লজ্জা! লজ্জা! যে বোবা বিদ্রোহ মনের মধ্যে ঝড় বহাচ্ছিল তার অপর একটা নাম লজ্জা! এখন এই দাসদাসী, নার্স ডাক্তার, মজুমদার পরিবারের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব, সকলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে তাকে প্রসন্নমুখে, প্রথম পিতৃত্বের খুশির ভূমিকা অভিনয় করতে?…শুধু আজ নয়, আজ থেকে আজীবন চালিয়ে যেতে হবে সে অভিনয়)

কী লজ্জা! কী লজ্জা!

কেমন করে যে সে উপরে উঠে সেই নীল-আলো-জ্বালা ঘরটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, নিজেই জানে না কাঞ্চন।…হয়ত বাচাল ঝিটা একরকম ঠেলতে ঠেলতেই নিয়ে গিয়েছিল।

কোলাহল শান্ত হয়ে গেছে, তাই চড়া আলোটা নিভিয়ে দিয়ে মৃদু নীল আলোটা জেলে দেওয়া হয়েছে।

ঘরে আর যারা আছে তাদের দিকে বুঝি চোখও পড়ে না কাঞ্চনের, বিস্মিত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে…মুদ্রিত-চক্ষু নিদ্রিত নিথর এক নারীমূর্তির দিকে, যার শয্যার একাংশে তেমনি নিঃঝুম একটু মাংসপিণ্ড!

কে এরা?

এদের কাউকেই কি চেনে কাঞ্চন? এদের সঙ্গে কোথাও কোন যোগ আছে তার?…এই কি সেই মনু? যাকে এই পাঁচ ছ-টা মাস স্নেহে সোহাগে ডুবিয়ে রেখেছিল সে, নিতান্ত প্রেমময় স্বামীর মতই!

কাঞ্চন কি জানত না ওর অন্তরালে এক অদৃশ্য সত্তা তিলে তিলে আপন মূর্তি রচনা করে চলেছে?

তবে ?

তবে কেন এত অপরিচিত লাগছে ওকে ? এত দূরবর্তী ?…না না, এরা কাঞ্চনের কেউ নয়, কাঞ্চনের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই। ওরা অচেনা ওরা অসহ্য !

হ্যাঁ হ্যাঁ অসহ্য !

নেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দাসীটা হেসে হেসে বলে—যাই বলুন মা, আপনার জামাই যেন কেমন কেমন ! জানেও না কিছু, আঙুলে ছুটো তিনটে আঙটি, তার থেকেই নয় একটা খুলে দিয়ে ছেলের মুখ দেখতে হয় ? না টাকা, না সোনা, অমনি ছেলের মুখ দেখল! আবার নেবে গেল দেখ, যেন ছুটে পালাল ! পাছে আবার আমরা 'সন্দেশ সন্দেশ' করে আবদার করি তাই !

মজুমদার গৃহিণী শ্রান্ত কণ্ঠে বলেন—থাম্ বাবু, মেলা চেঁচাসনি, মন্থ চমকে উঠবে।…জামাই আমার বরাবরই অমনি লাজুক !

বরাবরই লাজুক ?

না, এইমাত্র টের পেয়েছে কাঞ্চন—'লজ্জা' কি বস্তু ?

তা নইলে—এখনই বা অমন পালাতে শুরু করেছে কেন, রাতের নির্জন রাস্তা ধরে—নিঃসম্বল শূন্য হাতে ?

শুধু নিচে নেমে একবার যেন সেই বড় হলটার দরজায় এসে থমকে দাঁড়িয়েছিল না ?…একটা দীর্ঘনিশ্বাস কি ছড়িয়ে পড়েছিল নির্জন ঘরের থমথমে বাতাসে ?

না না ! নিশ্বাস নয় ! নিশ্বাস নয়। মুছে যাক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ…মুছে যাক সাফল্যের স্বপ্ন।…ধুয়ে মুছে যাক নির্ভাবনায় জ্ঞান-চর্চার স্বযোগ ! এখন শুধু পালাতে হবে, অনড় অসহায় ছোট্ট ওই মাংসপিণ্ডটার কাছ থেকে।…যত দূরে পারা যায় !…দ্বিতীয়বার যাতে দেখতে না হয় ওকে।

হয়তো আবার দেখা দেবে দুঃসহ বেকার জীবন, হয়তো—গায়ে পরে-থাকা এই শার্টটাই একমাত্র হয়ে উঠবে, হয়তো আবার একটা নড়বড়ে চৌকি জোটাও দুষ্কর হবে, তবু পালান ছাড়া উপায় নেই !…এতটুকু একটা মাংসপিণ্ড যে এতবড় হয়ে দেখা দেবে, এ ধারণা কি আগে ছিল কাঞ্চনের ?

গাড়ি থেকে নেমে করবী একবার বাড়ির সামনে থমকে দাঁড়াল। বাড়িটা থমথমে নিস্তব্ধ! রোগিণীকে বোধ হয় ব্রোমাইড্ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। আর বাড়ির প্রত্যেকটি লোক হাঁটছে পর্যন্ত নিঃশব্দে।

গেটে ঢোকবার আগে করবী ড্রাইভারকে বলল—আচ্ছা শরৎ, তুমি তাহলে বিকেল চারটের মধ্যেই এসো! দেরি করে ফেল না, বাবুর ফেরার আগেই ফিরব।

ড্রাইভার ছোকরা মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে গাড়ি ঘোরাল!···আর করবী —মুখে যেটুকু বা ঔজ্জ্বল্য ছিল সেটুকুকে বিষাদের তুলি বুলিয়ে মুছে নিয়ে ধীর পায়ে বাড়ি ঢুকল।

ঢুকেই সোজা উঠে গেল তিন তলায়। মাকে দেখতেই সংসার ফেলে চলে আসা, তবু করবী দোতলায় মায়ের ঘরের পাশ কাটিয়ে তিন তলায় বাপের কাছেই আগে গেল।

পুরন্দরবাবু যথারীতি বই-কাগজের সমুদ্রে ডুবে বসেছিলেন, মেয়েকে দেখে মুখ তুলে চাইলেন। চশমাটা নাক থেকে খুলে টেবিলে রেখে বললেন—এসেছ?

গলার স্বর শুনলেই বোঝা যায় আসাটা অপ্রত্যাশিত নয়, দুর্লভও নয়। নিত্য নিয়মিতই হয়তো। সত্যিই করবী প্রায় রোজই আসে। মায়ের কোলের মেয়ে বলেই শুধু নয়, সংসারে তার সুবিধেও আছে। ছেলেপুলে নেই, গাড়ি আছে।

—ওঁকে দেখে এলে?

—না বাবা, এসেই আপনার কাছে চলে এসেছি। মা বোধ হয় ঘুমোচ্ছেন।

—ঘুম নয়—অজ্ঞান। সকালবেলাই ব্রোমাইড্ দিতে হয়েছে।

—ওতে—মানে খালি খালি ব্রোমাইড দিলে জীবনীশক্তি নষ্ট হয়ে যায় না বাবা?

পুরন্দরবাবু মুখ তুলে একটু হাসলেন। চশমাটা তুলে নিয়ে রুমালে মুছতে মুছতে বললেন—যায় বৈকি।

—তবে?

—কি আর করা যাবে বল? এ ছাড়া উপায় কি?

উপায় নেই, সে কথা করবীও জানে। তবু অনাবশ্যক এই কথোপকথন চালাতেও হয়, নইলে কি কথা কইবে বাপের সঙ্গে! সময়োপযোগী আর কোন্ কথা খুঁজে পাবে?

মায়ের অসুখের আগের কথা মনে পড়ল। কোলের মেয়ে হলেও একার সংসার বলে এসে থাকতে করবী কখনই পারত না, কিন্তু বেড়াতে প্রায়ই আসত। বাপের জন্য হয়তো নতুন কোন খাবার তৈরি করে, কি ভাইদের জন্যে রকমারি কিছু তরকারি রান্না করে টিফিন ক্যারিয়ারে ভর্তি করে হাসতে হাসতে এসে ঢুকত! আর হৈ হৈ পড়ে যেত বাড়িতে। দাদারা যে যে বাড়িতে উপস্থিত থাকত, সামনে এসে সহাস্য প্রশ্ন করত—কি, আজকে আবার, কি বানানো হয়েছে? 'ডিমের আকাশকুসুম'? 'মুরগীর মোহেন-জো-দাড়ো'?

মা হয়তো ভাঁড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হাসি-হাসি অথচ বকুনি-বকুনি স্বরে বলে উঠতেন—গাড়ির সীটে বসিয়ে এনেছিস্ তো? নাঃ তোর গাড়িতে বাপু আমার আর কোনদিন বসা চলবে না।

করবী সজোর-প্রতিবাদে প্রমাণ করতে বসত, সারা পথ সে গাড়ি আর শাড়ি বাঁচিয়ে কি ভাবে হাতে করে শূন্যে ধরে এনেছে টিফিন কৌটোটাকে।

বাপের কথা তখন কে বা মনে করত। কতক্ষণ পরে মনে পড়ত···তাই তো—বাবার কাছে তো যাওয়া হয় নি, প্রণাম করা হয় নি বাবাকে। তখন ছুটত ত্রুটি সংশোধন করতে।

এইভাবেই বসে থাকতেন পুরন্দরবাবু। কাগজের সমুদ্রে ডুবে। মেয়েকে দেখে একটু হেসে বলতেন—এসেছ? আজ আবার নতুন কিছু রান্না করা হয়েছে বুঝি?

তারপর আবার ডুবে যেতেন আপন গভীরতায়, ভুলে যেতেন মেয়েকে। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে টুপ করে এক সময় পালিয়ে আসত করবী।

ঘর নয়, সংগ্রহশালা!

মানবজাতির মনস্তত্ত্বের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ হচ্ছে দিনের পর দিন ধরে। অজস্র বই, অজস্র পত্রপত্রিকা। এ সমস্তই পুরন্দরবাবুর দরকার, সব তাঁর নখদর্পণে।

বিরাট এক ইতিহাস লিখছেন পুরন্দরবাবু, "মানবজাতির মনোন্মেষের ইতিহাস"। বছর পাঁচেক ধরে লিখছেন, হয়তো আরও পাঁচ সাত দশ বছর ধরে লিখবেন! কোটি কোটি বছর আগেকার পটভূমিকায় যার সুরু আর শেষ হবে যার ভবিষ্যৎ যুগের দরজার সামনে। এ হেন বিরাট গ্রন্থ কি দু-চার দিনে লেখা যায়?

অবিশ্যি যে শান্তি-স্নিগ্ধ মন আর স্বচ্ছন্দ পরিবেশ নিয়ে লেখা সুরু করেছিলেন

পুরন্দর মল্লিক, ঠিক তেমনটি বজায় থাকলে হয়তো—অনেক দ্রুত কাজ এগোত, কিন্তু সে জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে পুরন্দর মল্লিকের। পুরন্দর মল্লিকের স্ত্রী পাগল হয়ে গেছেন। বদ্ধ পাগল।

বছর দুই আগে হঠাৎ একদিন তিনতলার সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট লেগে দেখা দিয়েছিল মস্তিষ্ক বিকৃতির সূচনা। সেই থেকে নীরজা পরিণত হয়েছেন উন্মাদিনীতে।

নীরজা পাগল হয়ে যেতে পারেন, এ কেউ কোনদিন ভাবে নি। আনন্দময়ী হাস্যমুখরা একটি উজ্জ্বল মহিলা ছিলেন নীরজা, ছিলেন স্বামী ও সন্তানদের প্রতি অপরিসীম স্নেহশীলা। আপন গৃহগণ্ডীর বাইরে আর যে কোন একটি জগৎ আছে, অথবা সে জগৎ থাকার প্রয়োজন আছে, এ কোনদিন অনুভব করতেন না নীরজা। এই গণ্ডির মধ্যেই তিনি সুখী, এই গণ্ডি-কাটা জগতের তিনিই মধ্যমণি —এ-ই তাঁর আনন্দ ছিল।

পাঁচ বছর আগে—যখন একটি বিখ্যাত কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক স্বামী পুরন্দর মল্লিক বলা-কওয়া নেই হঠাৎ তাঁর অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে দিলেন, বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে অদম্য-উৎসাহে লিখতে সুরু করলেন এই "মানব-জাতির মনোন্মেষের ইতিহাস", তখনও নীরজা হাসি মুখেই মেনে নিয়েছিলেন স্বামীর এই খামখেয়াল! প্রতিবাদ করেন নি।

অবিশ্যি টাকার অভাব তাঁকে পেতে হয় নি। শ্বশুরের—অর্থাৎ পুরন্দরের বাবার দরুন টাকা ছিল বিস্তর। তবু—সহজ সুস্থ মানুষটা চাকরি ছেড়ে দেবে এ কোন্ স্ত্রী বরদাস্ত করে?

কিন্তু নীরজা করেছিলেন। অম্লান মুখেই করেছিলেন। সেই নীরজা হঠাৎ মাথায় একটু ধাক্কা খেয়ে পাগল হয়ে গেলেন!

পুরন্দরের পক্ষে এর চাইতে মর্মান্তিক কষ্ট আর কি আছে!

—মার চাইতেও বাবার জন্যেই আমার বেশি কষ্ট হয় রে ছোড়দা! ম্লান উদাস মুখে বললে করবী।

কমল সায় দিলে—তা সত্যি!···অথচ দেখ, আগে বাবার কাছে আর কতটুকুই বা ঘেঁষতাম আমরা?

—বাবার সহ্যশক্তিটা কী অসাধারণ ভাব? এই যে আজ দু-বছর ধরে কী

কাণ্ডই না করে চলেছেন মা, একদিনের জন্যে একটু অসহিষ্ণুতা দেখি নি।...করবী বলে।

—আমরা তো মাঝে মাঝে কত অতিষ্ঠ হয়ে যাই—বললে বিমল।

তিন ভাই তিন বোন জমায়েত হয়েছে এক জায়গায়। গল্প চলছিল—বহুবিধ প্রসঙ্গ নিয়ে, আপাতত এসেছে মায়ের অসুখের প্রসঙ্গ।

ছজনে একত্র হওয়া সচরাচর বড় ঘটে না, আজ ঘটেছে।

ভাইরা অবশ্য বাড়িতেই থাকে, কমল আর বিমল এখনো পড়ুয়া, বড় নির্মল সম্প্রতি কি একটা কাজে ঢুকেছে। তবে বিয়ে হয় নি এখনো, তাই ভাইবোনদের মজলিশ থেকে উস্‌খুস করে উঠে যাবার চেষ্টার কারণ কিছু নেই।

করবী প্রায়ই আসে, পূরবী আর সুরভি তেমন আসতে পারে না। তবু সুবিধে পেলেই আসে।

নীরজা কত আনা-নেওয়া করতেন, কত আদর-যত্ন করতেন মেয়েদের, কত দেওয়া-থোওয়া করতেন, আজ তিনি অপারগ হয়েছেন বলে কি মেয়েরা বাপের বাড়ি আসা ছেড়ে দেবে? না, এত অকৃতজ্ঞ তারা নয়।

—আজ এখনও ঘুমোচ্ছেন—শান্ত গলায় বললে সুরভি—এসে অবধি ঘরে ঢুকিই নি!

—ঢুকেই বা কি করবি? পূরবী বলল—সেদিনে আমি যেদিন এসেছিলাম জেগেই তো ছিলেন, চেঁচামেচিও করছিলেন না, খোকাটাকে সামনে নিয়ে গেলাম। কত করে বোঝাতে চেষ্টা করলাম—'মা এই তোমার সেই টুটুল সোনা, একবার একে দেখ, কোলে নাও না একটু, গ্রাহ্যই করলেন না। হাত নেড়ে বুঝিয়ে দিলেন —নিয়ে চলে যাও। অথচ আমার টুটুলকে কী ভালই বাসতেন!

এই এক স্বভাব পূরবীর, কেবল নিজের ছেলে-মেয়েদেরকে এগিয়ে দিতে চেষ্টা করবে মায়ের কাছে। যদিও তার এ চেষ্টাকে এরা কেউ সমর্থন করে না, তবু এখন আর কেউ প্রতিবাদ করে উঠল না। গত দিনের কথা, সে নিয়ে আর কথা বাড়িয়ে লাভ কি?

এখন সকলেরই মন বিষণ্ণ ব্যথাতুর! মায়ের জ্ঞানশূন্যতা তো পীড়াদায়ক বটেই, আরও পীড়াদায়ক নীরজার বিকৃত চিত্তের বিকৃতির প্রকাশটা। চিরদিনের ভক্তিমতী নীরজার আজ স্বামীর প্রতি কি অদ্ভুত মনোভাবই গড়ে উঠেছে! আশ্চর্য! তাঁর ধারণা তাঁর অসুখের জন্যই পুরন্দরই দায়ী!

তাই বিজাতীয় এক আক্রোশ তাঁর পুরন্দরের উপর।

ডাক্তারেরা অবশ্য বলেন—এইটাই স্বাভাবিক। অস্বাভাবিক মস্তিষ্কের স্বভাবই এই—সবচেয়ে প্রিয়জনকেই সন্দেহ করা। সব থেকে আপন ব্যক্তির উপরই আক্রোশপরায়ণ হয়ে ওঠা।

কিন্তু ডাক্তারদের এ থিয়োরি পুরন্দরের ছেলেমেয়েকে প্রবোধ দিতে পারে না, তারা তবুও ভাবে মায়ের এটা অন্যায়, অন্যায় আর নিষ্ঠুর অবিচার। ভাবে যতই পাগল হোন তবু তো মানুষ। কি করে ভুললেন পুরন্দরের স্নেহ প্রেম দরদ?

তারা তো জানে!

তারা তো সবই জানে!

তাই সবাই মিলে যখন আলোচনা করে এ নিয়ে, তখন বাপের দুঃখ ভেবেই, মন তাদের বেশী ব্যথাতুর হয়ে ওঠে। অবিশ্যি মায়ের এই দুঃখাবহ অবস্থা কি তাদের মনকে ক্লিষ্ট করে না? করে—খুবই করে, কিন্তু একটা চৈতন্যহীন জীবের উপর—যার সঙ্গে মনের আদান-প্রদান হচ্ছে না,—তার উপর কতক্ষণ সহানুভূতি রাখা যায়?

অনেক সময়ই তাই রাগ আসে মায়ের উপর। আর শ্রদ্ধায় মন অবনত হয়ে আসে বাপের প্রতি।

সত্যি, একটি বারের জন্যে রেগে উঠতে দেখল না তারা পুরন্দরকে।

—কতক্ষণ এ রকম আচ্ছন্ন হয়ে থাকবেন? প্রশ্ন করল সুরভি। সে আসে সবচেয়ে কম, তাই সবচেয়ে অনবহিত।

নির্মল বলল—সকাল সাতটায় দেওয়া হয়েছে, এই খানিক পরেই আবার চেঁচাতে সুরু করবেন।

—এখন তো আর ওষুধ খাওয়ানো যায় না?

—নাঃ! ওই—জোর করে ফুঁড়ে দেওয়া!

—দেওয়া যায়?

—সহজে কি আর দেওয়া যায়?…নির্মল সামান্য হাসে—চিহ্ন থেকে যায়!…এই দেখ না। বাহুমূলে ছোট্ট একটু ছড়ের দাগ দেখায় নির্মল।

—কী সর্বনাশ! দাদা! পাগলের নখের বিষ রক্তে মিশে গেলে কী না হতে পারে দাদা?

—হতে তো অনেক কিছুই পারে, করা যাবে কি?

—ডাক্তার এসেছিল?

—আজকাল শশী বলে ছোকরাটা আসছে।

শশী এদের ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার!

—ডাক্তাররা কী বলেন?

বলেন তো—এরকম কেস সারে। বংশে যখন কোন হিস্ট্রী নেই, চোট্ লেগে ব্রেনটা ইয়ে হয়ে গেছে, তখন সারার আশা ছাড়া যায় না।

—কিন্তু এভাবে অনবরত ঘুম পাড়িয়ে রাখলে জীবনীশক্তি কমে যাবে না?

করবী আর একবার তার সন্দেহ ব্যক্ত করে।

—তা হয়তো যাবে, তবে সাধারণতঃ এসব 'কেস'-এ জীবনীশক্তি খানিকটা বেড়ে যায়।

সবজান্তার ভূমিকা গ্রহণ করে উপরোক্ত মন্তব্যটি প্রকাশ করে নির্মল।

বামুন ঠাকুর এসে দরজায় দাঁড়ায়। রান্না প্রস্তুত হয়েছে তার সঙ্কেত।

—চল্, মা না-জাগতে খেয়ে আসি।

—আমি খেয়ে এসেছি। করবী বলে।

—রবিবারে এত সকাল সকাল খেয়ে এসেছিস্?

—আমার আবার রবিবার! আজও তো 'ও' কাজে বেরিয়েছে!

পূরবী ঠোঁট বাঁকিয়ে বলে—'পয়সা' 'পয়সা' করেই লোকটা গেল।

কথা কেউ গায়ে রাখে না। দশ বছরের ছোট বোনও না। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় করবী—তা বড়দি, বাড়ি বসে থাকার চাইতে ভাল।

পূরবীর বর নামে উকিল, বাড়িতেই বসে থাকে।

পূরবী কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে থাকে।

মনের গলদ কেটে যায় খাবার ঘরে গিয়ে, আহারের আয়োজন-প্রাচুর্যে। পূরবীই নিজে থেকে ডাকে—আয় না রুবি, কিছু না খাস মাছ খা একটু।

—কিছুই পারব না বড়দি!

—খুব পারবি!...উঃ কত রকম রেঁধেছ ঠাকুর?

বিমল হাসে—আমি আজ নিজে বাজার গিয়েছিলাম, তোমরা আসবে বলে!

অতঃপর মাছের গুণাগুণ বর্ণনার সঙ্গে উঠেছিল সিনেমার প্রসঙ্গ, হঠাৎ একটা চীৎকার উঠল।...বন্য জন্তুর আর্তনাদের মত তীব্র চীৎকার।

দীর্ঘ দু-বছর ধরে পরিচিত আছে এরা এ চীৎকারের সঙ্গে।

—সর্বনাশ করেছে!

—তোমরা থাক, আমি যাচ্ছি। করবী বলল। ও খাচ্ছিল না, বসেছিল।

—তুই একা পারবি সামলাতে?

—বাবা নিশ্চয়ই নেমে এসেছেন!

কথাটা ঠিক!

পুরন্দর নিশ্চয় নেমে এসেছেন। এ চীৎকার শুনে তিনি স্থির থাকতে পারেন না।

উপরে উঠে গিয়ে দেখল ঠিক তাই। পুরন্দর এসে কাতর মুখে দাঁড়িয়ে আছেন দরজার কাছে, আর নীরজা নিজের কপালে করাঘাত করে চেঁচাচ্ছেন—তবু মরছি না আমি! তবু মরছি না! হে ভগবান, তবু মরছি না!···দূর হয়ে যাও! আমি তো তোমার সামনে আর যেতে চাই না, তুমি আসো কি করতে? লজ্জা করে না? মুখ দেখাতে লজ্জা করে না?

করবী বাপের পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে। পাখার রেগুলেটারটা শেষ প্রান্তে টেনে দিয়ে আদরের সুরে বলে—মা—ওমা, ওসব কি কথা হচ্ছে? দেখ না—আমরা এসেছি যে! সব্বাই এসেছি। বড়দি, মেজদি, আমি! তোমার পূরবী, সুরভি আর করবী! বুঝতে পারছ না?

—পারছি!

ঘাড় কাৎ করলেন নীরজা আচ্ছন্নের মত!

—আমরা তোমায় দেখতে এসেছি মা!

—দেখতে এসেছ? দেখতে এসেছ কেন?

—তোমার যে অসুখ করেছে মা!

—অসুখ করেছে? কে বলেছে অসুখ করেছে?

হঠাৎ বিপরীত ফল ফলে। স্তিমিত ভাব বদলে ফের উগ্র হয়ে ওঠেন নীরজা।

—মিথ্যে কথা! বানানো কথা! অসুখ নয়—অসুখ নয়—তোরা জানিস না, আসল কথা জানিস না।

সহসা ঠাঁই ঠাঁই করে খাটের বাজুতে মাথা ঠুকতে থাকেন নীরজা।

করবীর সাধ্য নয় সামলায়।

পুরন্দর এগিয়ে আসেন, স্ত্রীর মাথাটা তুলে ধরে কোমলকণ্ঠে বলেন—ছি, কি হচ্ছে? দেখ তো কি রকম লাগল?

—দরদ দেখান হচ্ছে?

তীব্র একটা হাসির ঢেউ খেলে যায় ঘরে—হাসির সঙ্গে কথা—ও রুবি, দেখ দেখ দরদ দেখান হচ্ছে। কত ভেকই জানে মিন্‌সে!

লজ্জায় মাথা হেঁট করে করবী।...বাপের দিকে চাইতে পারে না। অবাক হয়ে ভাবে সুস্থ অবস্থায় জীবনে তো কখনও একটি অরুচিকর শব্দ উচ্চারণ করেন নি নীরজা, এখন রসনায় এমন শৈথিল্য এল কি করে? অনভ্যস্ত ভাষা মুখে যোগায় কোথা থেকে?

পুরন্দর এই দু'বছরে চিকিৎসা পদ্ধতি অনেকটা আয়ত্ত করেছেন বৈকি! এবার আর কোমল গলা নয়, ধমকের সুরে বলেন—কী হচ্ছে কী? ছেলেমেয়েদের সামনে এই সব খারাপ কথা বলছ?

ব্যস, কেঁদে ফেললেন নীরজা।

ডুকরে কেঁদে উঠে, বলেন—বলব না কেন? আমি যে পাগল হয়ে গেছি!

ততক্ষণে আরও পাঁচ ছেলেমেয়ে ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। বিমল এগিয়ে গিয়ে মার গায়ে হাত রেখে বলে—কে বলল তুমি পাগল হয়ে গেছ? ছিঃ! মাথায় চোট লেগে সব ভুলে যাচ্ছিলে কিছুদিন। এখন তো ভাল হয়ে গেছ মা!

—ভাল হয়ে গেছি? নীরজা ফ্যাল্ ফ্যাল্ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন—ভাল হয়ে গেছি? তোরা বলছিস?

—বলছিই তো! এই তো এখন কি আর কিছু ভুলে যাচ্ছ? দেখ না—চিনতে পারছ না আমাদের?

—চিনতে পারব না তোদের?

সহজ মানুষের মত স্বাভাবিক একটু হাসি হেসে ফেললেন নীরজা!

হাসি ফুটল ছেলেমেয়েদের মুখে—বল তো আমরা কে? নাম বল তো সকলের?

—কি যে বলে! সত্যি পাগল পেলি না কি আমায়?

পূরবী এগিয়ে আসে, বলে—মা তোমার টুটুল এবার অভিমান করে আসে নি।

আবার টুটুল!

সাত বছরের ধাড়ি ছেলেকে নিয়ে দিদির এই আদিখ্যেতা কারুরই ভাল লাগে না।

নীরজাও বিরক্তি-কুটিল দৃষ্টিতে তাকান মেয়ের দিকে।

—তুমি সেবার ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে, তাই টুটুলের অভিমান হয়েছে।

—অভিমান হয়েছে? নীরজা মুখ ভেঙিয়ে বলে ওঠেন—তা তোমারই বা মান-অভিমান নেই কেন? আবার আস কোন লজ্জায়? তোমাকেও তো দূর করে দিয়েছিলাম সেদিন।

ছেলে-মেয়েরা হতাশ-দৃষ্টিতে তাকায়।

নাঃ! আশার আর কিছুই নেই। বিদ্যুৎবিকাশের মত এক এক সময় যেটুকু সুস্থতা দেখা যায় তাতেই বেচারারা আশায় উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, কিন্তু মুহূর্তেই সে আশা বিলুপ্ত হয়।

নীরজার মুখে এই কথা! ধারণাই করা যায় না।

পূরবী আরক্ত-মুখে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। যত পাগলই হোন নীরজা, তবু বিশেষ করে তার উপরই তুচ্ছতাচ্ছিল্য ভাবটা সহ্য হয় না পূরবীর।

—বড়দিও একটা পাগল।···সুরভি বলে নিচু গলায়।

হঠাৎ আবার একবার হেসে ওঠেন নীরজা। হেসে উঠে বলেন—হুঁ, ধরা পড়েছে রাইরাধা!

তারপরই চাপা গলায় বলেন—ওঁকে এ-ঘর থেকে চলে যেতে বল।

—কেন মা, বাবা থাকুন না!

—আঃ! যা বলছি কর না! দেখছ না—উনি কী রকম অতিষ্ঠ হচ্ছেন!··· বই লিখতে হবে যে বই! মহাভারতের মতন মোটা বই! মানুষের রোগ অসুখ দেখবার সময় আছে? দূর করে দে, দূর করে দে!···

করবী বাবার মুখের দিকে তাকায়···মুখ দেখতে পায় না, জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন পুরন্দর।···

মমতায় মনটা ভরে যায় করবীর। ভাবে বড়দি এতটুকু কথার এদিক-ওদিকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল, আমরাও অনেক সময় কত অসহিষ্ণু হয়ে উঠি, আর বাবা কী সহ্যটাই করেন।

—তবু গেল না? তবু দাঁড়িয়ে রইল?

উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন নীরজা।

নির্মল বাবাকে চোখের ইশারা করে। ধীরে ধীরে বেরিয়ে যান পুরন্দর কেমন

একটা স্খলিত ভঙ্গিতে। করবী মায়ের প্রাণে করুণা সঞ্চারের আশায় বিষণ্ণ গলায় বলে—বাবাকে এমন কর কেন মা?

—কেন করি?…নীরজা সহসা উঠে বসেন, বলেন—বলব, তোকেই বলব। এদের সব চলে যেতে বল। শুধু তুই থাক একা। তুই আমার বড় ভাল মেয়ে!…যা, তোরা সবাই পালা দিকি একটু।

নীরজার এ ভঙ্গি ওদের সকলেরই অতি পরিচিত।…এক এক সময় এক একজনকে 'ভাল' বলে মনে হয় নীরজার। অন্তরঙ্গ মনে হয়। তখন শুধু তার কাছেই আসল কথা বলতে বসেন।

নীরজার আসল কথাও এদের মুখস্থ।

চুপি চুপি নীরজা এই কথাই বোঝাতে চেষ্টা করবেন—পাগল নীরজা হয় নি, আসলে পাগল হয়ে গেছেন পুরন্দর। নীরজাকে শুধু সকলে মিলে 'পাগল' বানিয়ে রেখেছে।

তারপর কাকুতি-মিনতি করতে থাকবেন—ডাক্তারের হাত ছাড়িয়ে, আর এ বাড়ির গণ্ডি কাটিয়ে, নীবজাকে কোথাও সরিয়ে নিয়ে যেতে। দূর কোন বিদেশে। …অন্ততঃ এ বাড়ি ছাড়া আর কোথাও।…

প্রতিশ্রুতি চাইবেন, কিন্তু যদি দেখেন ছেলে-ভুলোনোর মত "আচ্ছা নিয়ে যাব" বলে স্তোক দেওয়া হচ্ছে তাঁকে, তাহলেই যাবেন ক্ষেপে।…সেই ক্ষ্যাপাটা এরা জানে, তাই তর্ক করে, প্রতিবাদ করে, তবু আচ্ছা বলে না সহজে।

…এরা চলে যেতেই নীবজা বলে ওঠেন—এখনও তোরা তোদের বাপের স্বরূপ চিনতে পারলি না?

—পেরেছি। করবী বলে।

—কি চিনলি?

—খুব ভাল।

—তাহলে ছাই চিনেছিস্। একের নম্বরের বদমাইস, বুঝলি? ওর ওই বই লেখার সুবিধের জন্যে ও একদিন সকলকে মারবে, বুঝেছিস? সকলকে খুন করবে। …কি, চুপ করে রইলি যে?

—কি বলবো?

—কেন, হক্ কথা বলতে পারিস না?…আচ্ছা বদমাইস যদি না হয়, তাহলে নিশ্চয় পাগল? হ্যাঁ, নিশ্চয় পাগল!

—তাই হবে!

তবে আমাকে তোরা এমন জব্দ করে রেখেছিস কেন? আমায় ছেড়ে দে? একজনের বদলে আর একজনকে পাগল বলবি?···আমি তো ঠিকই আছি, আমায় কেন তবে—

করবী বলে—আচ্ছা মা, তুমি যদি ঠিক আছ তাহলে অত চেঁচাও কেন? বুঝতে পার তো চেঁচাও? আগে এমন করতে?

অদ্ভুত একটা হাসি ফুটে ওঠে নীরজার মুখে। ফিস্ ফিস্ করে বলেন—আহা বুঝছিস না, শান্ত মানুষের পার্ট করেই জীবন গেল, চেঁচাতে তো কখনও পাই নি, তাই এই ছুতোয় চেঁচিয়ে নিচ্ছি। তোরা রাগ করতে পারবি না, বলবি 'মা পাগল' কেমন মজা? হি-হি-হি!

করবী হতাশ হয়ে বাইরের দিকে তাকায়।···রাস্তার ওদিকে একটা তিনতলা বাড়ি—জানলায় পর্দা দুলছে।···

ওরা কেমন সুখী!

করবীদের সুখের সংসারে কে আগুন লাগাল!

নীরজা এক মিনিট অপেক্ষা করেই আবার অন্য প্রসঙ্গে এসে যান—জামাইকে বলেছিলি?

আগ্রহে উন্মুখ হয়ে ওঠে নীরজার মুখ। জ্বল্ জ্বল্ করতে থাকে দুই চোখ।

করবী মলিন গলায় বলে—বলেছিলাম!

সত্যিই বলেছিল সে বরকে। বলেছিল মাকে নিয়ে বিদেশ যাবার কথা।··· বলেছিল—আচ্ছা একটিবার মার কথা শুনেই দেখ না? উপকার হতেও তো পারে।

করবীর বর উড়িয়ে দিয়েছিল সে-কথা। উত্তর দিয়েছিল—"পাগলের কথামত চললে যদি তার উপকার হত, তাহলে আর ভাবনা ছিল না। তাছাড়া আমি কোন ভরসায় এ রকম এক পাগলের দায়িত্ব নেব?"

—নিয়ে গেলে মা সেরে যাবেন!

—ওই আনন্দেই থাক।

—ডাক্তারে তো বলেছে রক্তে কিছু দোষ পায় নি।

—ডাক্তারে অমন অনেক কিছু বলে।

করবীর 'বলেছিলাম' শুনেই উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন নীরজা, বলেন—কবে নিয়ে

যাবে বলেছে ?

—তা তো কিছু বলে নি, বলেছে এখন বড্ড কাজ !

—হুঁ হুঁ বুঝেছি ! নীরজা আবার শুয়ে পড়েন। চোখের উপর হাত চাপা দিয়ে বলেন—সব হারামজাদাকেই চিনলাম !···যা বেরো। বেরিয়ে যা ঘর থেকে !

করবী পূরবীর মত রাগ করে না।

শুধু হতাশ নিশ্বাস ফেলে।···আর আশা করবার কি আছে ? এতদিন হয়ে গেল, বাড়ছে বৈ কমছে না।

জামাইয়ের সম্বন্ধে এই কটূক্তি নীরজার মুখে ?···সভ্য ভদ্র মার্জিতরুচি সেই নীরজা ? নাঃ ধারণাই করা যায় না। নীরজা অবশ্য নিজের কাজের কৈফিয়ৎ দেন। কোন একজনকে ডেকে হেসে হেসে ভারি যেন একটা কৌতুককর কথা এই ভাবে চোখ টিপে টিপে বলেন—যাকে যা বলবার ইচ্ছে ছিল, এইবেলা বলে নিচ্ছি, বুঝলি না ? মজা মন্দ নয়, কি বলিস ?

এক এক সময় মনে হয় বুঝি কথাগুলো সত্যি। যাকে বলেন তার বুক কেঁপে ওঠে। কিন্তু তারপরই সব ভেস্তে যায়।

হয়তো হি হি করে হেসে ওঠেন নীরজা, নয় তো বা ডুকরে কেঁদে ওঠেন।

সেই নীরজা ! স্বামীতে ভক্তিমতী, সন্তানে স্নেহবতী, নম্রস্বভাবা নীরজা !

কিন্তু ধারণা করা যায় না, এমন কত ঘটনাই ঘটে জগতে। কে জানত পুরন্দর মল্লিকের বাড়ি এমন ঘটনা ঘটবে ! শুধু ডাক্তারেই বাড়ি ভর্তি হয়ে উঠবে তা নয়, ডাক্তারের সঙ্গে আসবে পুলিশ !

পাগলে আত্মহত্যা করে ?

—করে বৈ কি—ডাক্তার বলে,—নিশ্চয় করে ! পাগলেই তো করে।

পুলিশকে বোঝাতে একটু বেগ পেতে হয়েছিল, তবু বুঝল শেষ পর্যন্ত। সত্যি মাঝ-রাত্রে নীরজাকে তিনতলার ছাতে তুলে নিয়ে গিয়ে কেউ ঠেলে ফুটপাথে ফেলে দিয়েছে এমন কথা তো বিশ্বাসযোগ্য নয় ?

ডাক্তার বলে—মাথায় চোট লেগে উনি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গিয়েছিলেন, সেটাও হয়তো ঠিক নয় ! এখন মনে হচ্ছে অপ্রকৃতিস্থ হয়েই হয়তো সিঁড়ি থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন একেবারে নিচেয়।···যেমন আজ পড়লেন ছাদ থেকে। ওইটাই ঝোঁক !

স্তব্ধ হয়ে গেছে বাড়ি।

স্তব্ধ হয়ে গেছেন পুরন্দর!

বাপের মুখের দিকে তাকাতে পারে না ছেলেমেয়েরা।···নীরজা যে তাঁর কি ছিলেন, তা তো জানে এরা। আজ দুটো বছরই না হয় এ রকম হয়েছে।

তাও—বিছানায় পড়ে থেকেও—বুঝি নীরজা প্রাণটা ভরে রেখেছিলেন পুরন্দরের।

এ কী হল!

এ কি শোচনীয় পরিণতি ছিল নীরজার কপালে!

আবার তিন বোন একত্র হয়েছে।

শুধু বোনেরাই নয়, তাদের স্বামীপুত্র, এবং আরও যে যেখানে আছে।··· এসেছেন পুরন্দরের যত আত্মীয়-আত্মীয়া।

'গোলমাল' করবার নিষেধ ঘুচে গেছে, আর আসবেন না কেন? পাগলিনী নীরজার পারলৌকিক কাজ কি ভাবে হবে সেটা জানবার কৌতূহলকে তাঁরা ঠেকাবেন কি করে?

কিন্তু পুরন্দর যে আর মোটেই নিচে নামছেন না! বারণ করে দিয়েছেন সকলকে, কেউ যেন তাঁকে বিরক্ত না করে। অনবরত লিখে চলেছেন পাতার পর পাতা।···মানবজাতির আদিম ইতিহাস! যে যুগে মানুষে আর পশুতে প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য ছিল না।···লিখছেন—প্রামাণ্য পুঁথি উল্টোচ্ছেন··· খাতাপত্র খুঁজে না পেলে তচ্‌নচ্‌ করে ফেলছেন, আবার—আবার ডুবে যাচ্ছেন কাগজের সমুদ্রে।

—এখনও আলো জ্বলছে বাবার ঘরে। দাদার দরজায় টোকা দিয়ে বলল করবী। নির্মল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল। রাত তিনটে।

—বাবাকেও কি আমরা হারাব দাদা?

কি করব বল? বারণ করে দিয়েছেন—

—বাবার বারণটা কি তাঁর প্রাণের চাইতে বড় হল দাদা? আজ তিনবেলা খান নি। তুমি জোর করে বলগে খেতে ঘুমোতে।

—আমি?

নির্মল কেমন অসহায়ের মত বলে—আমার সাহস হচ্ছে না। মা গিয়ে অবধি বাবার সঙ্গে কথাই কইতে পারি নি আমি।

—সে তো কেউই পারছি না। তবু বাঁচাতে তো হবে বাবাকে। একটু কিছু খাওয়াতে হবেই।

—সেই তো ভাবছি।

—তুমি না পার আমিই যাচ্ছি।

—তাই বরং যা। দেখ যদি তোর কথায় কিছু খান।

ছুটো সন্দেশ আর এক গ্লাস জল নিয়ে উঠে যায় করবী।

কতক্ষণ ?

কতক্ষণ হল উপরে উঠে গিয়েছিল করবী ? কয়েক মিনিট, না কয়েক যুগ ?···

হঠাৎ কি ভূমিকম্প হল ? যে ভূমিকম্পে বাড়ির ভিৎ নড়ে ওঠে !· হ্যাঁ ভয়ঙ্কর একটা গর্জন শোনা গেল, তার সঙ্গে থালা-বাসন পড়ার একটা ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ।

এ আওয়াজে সবাই উঠে এসেছে বিছানা থেকে। বোকার মত এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। কারুর যে কিছু করণীয় আছে, তা আর মনে পড়ছে না।

মাঝ-রাতে উঠে এ-দৃশ্য দেখতে হবে, এ-কথা কে ভেবেছিল !···কে ভেবেছিল ঠিক তেমনি করে সিঁড়ির একেবারে শেষ ধাপে তালগোল পাকিয়ে পড়ে থাকবে করবী, যেমন করে নীরজা পড়েছিলেন ছুবছর আগে রাত ছুটোর সময় !

তফাতের মধ্যে সেদিন পুরন্দরও সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছিলেন তিনতলা থেকে। উদ্‌ভ্রান্তের মত তাকিয়ে দেখেছিলেন নীরজার তালগোল পাকানো দেহটার দিকে !

আজ তিনি নেমে আসেন নি, সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে গর্জন করছেন—সহ্য করব না, কিছুতেই সহ্য করব না ! আমার কাজে ব্যাঘাত আমি সহ্য করব না। যে বাধা দিতে আসবে, তাকেই ফুটবলের মত স্যুট্ করব, টুঁটি ধরে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেব !···শেকড় সুদ্ধু উপড়ে ফেলে দিয়েছি, তবু ভীড় বাড়াচ্ছে ! সহ্য করব না, বেশিদিন সহ্য করব না !···মায়া, মমতা, দরদ ! বুজরুকির জায়গা পায় নি ! সব বাজে, সব বোগাস্ !

নম্বুকাকা ডাকাডাকি করছেন, সন্দেশের থালাটা হাতে নিয়ে ছুটে যেতে যেতেও থমকে দাঁড়াল তুতুন। তারপর দুই চোখ বড় করে বলল—ওঃ লাভলি!

রাঙামাসী যেন অবোধ, দুই চোখে তাঁর বিশ্বের বিস্ময়—কি রে তুতুন? কি দেখে হঠাৎ এত—

—ওঃ রাঙামাসী! কী ফাইন দেখাচ্ছে তোমার খোঁপাটাকে!

—খোঁপা? ওঃ!...রাঙামাসী যেন এতক্ষণে তুতুনের চোখ বড়র দিশে পেলেন। হাত তুলে খোঁপার গায়ে একবার আলতো স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে নিয়ে বললেন—আর বলিস নে। সেই অবধি লজ্জায় মরে যাচ্ছি।

—কেন লজ্জা কিসের গো?

—দূর দূর! খোঁপায় ফুল পরবার বয়েস আর আছে না কি?

তুতুন মুচকি হেসে বলে—তাতে কি? বেশ তো দেখাচ্ছে।

—ওই তো—রাঙামাসী হতাশায় ভেঙে পড়ছেন যেন,—ওই বেশ দেখানোর জ্বালাতেই তো চব্বিশ ঘণ্টা অস্থির। তোদের রাঙামেসোর তো কাণ্ডজ্ঞানের বালাই নেই? এই আছে মানুষ উদোমাদা সন্নিসী, এই কি খেয়াল চাপল নিউ মার্কেটে গিয়ে ফুল নিয়ে এলো গাদা গাদা, মালা আনল জোড়া জোড়া, নাও তাকে খোঁপায় পর গলায় পর! না পরলেই রসাতল!

—বল কি রাঙামাসী? এই ব্যাপার? যাই বল রাঙামেসোকে দেখলে কিন্তু—

—আর বলিস কেন। বর্ণচোরা আম! এই দেখ না এখানে এই হাজার লোকের মাঝখানে টুকু করে এক ফাঁকে এসে মালাগাছটা চাপিয়ে দিয়ে গেল মাথায়। লজ্জায় মরছি সেই থেকে—

রাঙামাসীর এই বর্ণনার সঙ্গে রাঙামেসোকে মিলোতে গিয়ে খুক খুক করে বিষম খায় তুতুন।...ওদিকে সন্দেশ সন্দেশ রব উঠেছে। অতএব উত্তর মুলতুবি রেখে বিষম চাপতে চাপতেই ছুটে চলে যেতে হল তুতুনকে।

নম্বুকাকা ওর হাত থেকে থালাটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে পরিবেশক ছোকরাদের হাতে চালান করে ধমকে ওঠেন—সন্দেশ আনতে যে বুড়ো হয়ে গেলি? সাধে বলি মেয়েদের দিয়ে কোন কাজ হয় না?

—না হয় না—তুতুন বিষম খাওয়াটা শেষ করে নেয়...খক্ খক্ খক্—মেয়েদের যে কত জ্বালা জান না তো? পড়তে যদি আমার অবস্থায়—

হাসতে হাসতে চোখ মুখ রক্তবর্ণ করে কাঁদো-কাঁদো হয়ে ওঠে তুতুন।

—কিরে কি হল?

—উঃ! নন্তুকাকা, সে এক কাণ্ড!

—হেসেই তো মরছিস। কাণ্ডটা কী?

—কাণ্ড—মানে, ইয়ে—সে এক দৃশ্য!...বলছি—বাবা—বলছি, এক গেলাস জল দাও আগে—

হাসির গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ইত্যবসরেই এসে জুটে যান বাঁশীপিসি আর আশুকাকা, সেজদি আর রত্নাবৌদি।

—ব্যাপার কি? এত হাসি কিসের?

তুতুন ক্রমশই বাড়াচ্ছে—ও সেজদি, রাঙামাসী—উঃ!

রাঙামাসী!

ওঃ! তাই!

অতএব হাসা চলে। কারণটা না জানলেও চলে। রাঙামাসী যে।...হি হি হি...কি হল? হা হা হা...হয়েছেটা কি?...খি খি খু খু...খুব বুঝি?

—মারা যাব সেজদি, ঠিক মারা যাব—

—মরবি মরিস, বলে তবে মর! হি হি হি।

—ও সেজদি, রাঙামাসীর খোঁপায় গোড়েমালা!...বেলফুলের!

—গোড়েমালা? বেলফুলের? রাঙামাসীর খোঁপায়?

হো হো হো! হি হি হি! হা হা হা!- হাসির ঐকতান বাদন।

—রোস রোস—ওতেই শেষ নয়, আরও আছে।...রাঙামেসো নাকি চুপি চুপি—মালা নিয়ে হি হি হি! খোঁপায়—চাপিয়ে দিয়ে—

অ্যাঁ!! কী বললি? রাঙামেসো?

এরপর আর ভিজে-ছাদের জলকাদার বাধা মানা চলে না, বজায় রাখা চলে না সিল্কের শাড়ির মায়া! লুটিয়ে লুটিয়ে আর দুলে দুলে হাসতেই হবে। নন্তুকাকা আর আশুকাকা পুরুষমানুষ হলেই বা, মাটিতে গড়িয়ে না হোক দাঁড়িয়েও হেসে হেসে দুলতে হবে তাঁদের।...না হেসে উপায় কি? রাঙামাসী যে! তার ওপর গোড়েমালা!

হাসি থামিয়ে বাঁশীপিসি বলেন—তবে যে একটু আগে বলছিল—ও আমাকে পৌঁছে দিয়েই চলে গেল ভাই—ওর শরীর ভাল নয়—নেমন্তন্ন বাড়ির খাওয়া ওর সয় না—

—ওগো তার ফাঁকেই 'টুপ করে'! বর্ণচোরা কি না!

—কি বললি? বর্ণচোরা?

—আমি বলি নি বাপু! রাঙামাসীর নিজমুখনিঃসৃত বাণী! তিনিই বললেন দেখতে ওই রকম সন্নিসী সন্নিসী, আসলে বর্ণচোরা—

—রক্ষে কর তুতুন, থাম! আর হাসিয়ে মারিস নি।

—বিশ্বাস না হয় দেখে এসো।

—ও বাবা! রাঙাদি যে একেবারে—ইয়ে—আপনাকে যে একেবারে চেনাই যাচ্ছে না রাঙাদি!...নন্তুকাকা যেন যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালেন—আজকের এই লগনসার বাজারে এ রকম মোটা মালা মেলাই দুষ্কর! কত নিয়েছে?

—কপাল আমার! গাঁটের-কড়ি খরচা করে মালা কিনে চুলে দেব? পাগল তো নই? পাওনা জিনিস রে ভাই, পাওনা জিনিস!

—ওঃ তাই বলুন! আমি ভাবছিলাম বুঝি জামাইবাবু নিউমার্কেট থেকে—

—তা আর নয়?—খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলেন রাঙাদি—তোমাদের জামাইবাবু না হলে আর গিন্নীর খোঁপায় ফুলের মালা দোলাতে আসবে কে?... এখানেই লাভ হল! ওই যে—কে যেন ছেলেটি তোমাদের বর-কনের মালা আনছিল, কি খেয়াল চাপল তার আমার খোঁপায় একটা মালা চাপিয়ে দিয়ে গেল! খামখেয়ালী ছেলেটা!

—তাই নাকি? মালা আমাদের আশু এনেছিল না?

মুহূর্তের জন্য কি একবার কেঁপে উঠলেন রাঙামাসী? নাঃ! এ রকম ঢের আক্রমণ তাঁর গা-সহা। মাথা নেড়ে বললেন—ও-মা না-তো!...ওই যে ওই ছেলেটি—কি যেন নাম, ঠিক মনে পড়ছে না—ফরসা, রোগা, ঢ্যাঙা!...দিয়ে গেল আহ্লাদ করে, তাই আর খুলি নি। লজ্জার মাথা খেয়ে মাথায় বয়ে বেড়াচ্ছি।

কাজের বাড়ি দাঁড়িয়ে কথা বলার সময় নেই। নন্তুকাকার ঘাড়েই আবার মেয়েদের খাওয়ানোর ভার। ছুটে চলে যেতে হল নন্তুকাকাকে, আর একটা ব্যাচ বসিয়ে দিতে হবে।

—রাঙাদি খেয়েছেন নাকি?—বাঁশীপিসি খোঁজ নিতে এসে থমকে দাঁড়ালেন। যেন থমকে যেতে বাধ্য হয়েছেন এই ভাব।—ওব্ বাবা! রাঙাদি? এখনো তো আপনার প্রাণে বেশ শখ আছে দেখছি?

...কেন রে বাঁশী—রাঙামাসী অবাক চোখে তাকান—পরেছি তো শুধু এই

একটা ঢাকাই শাড়ি, আর সাদাসিধে এই অর্গ্যান্ডি লেসের ব্লাউসটা! বিয়ে বাড়িতে একটুও সাজব না?

—শাড়ি ব্লাউসের কথা কে বলছে? আমি বলছি খোঁপার কথা! যাই বলুন—আপনাকে প্রায় দশ-পনেরো বছর কম বয়েস দেখাচ্ছে।

—হ্যাঁ দশ-পনেরো বছর! কি যে বলিস ভাই! তবে হ্যাঁ, তোদের জামাই-বাবু মাঝে মাঝে বলে বটে—"তোমার বয়েসটা কি উল্টো দিকে এগোচ্ছে?"

—বলেন তো? তাহলেই বুঝুন? চিন্তাশীল ব্যক্তিরা যে প্রত্যেকে একই কথা চিন্তা করে থাকেন, এই তার আর একটি প্রমাণ!

—চিন্তাশীল? চিন্তাশীল না হাতী। ঘোর খামখেয়ালী! এই দেখ না, খোঁপায় একগাছা মালা জড়ানো দেখে এত স্ফূর্তি হল যে, স্ফূর্তির চোটে এই হাজার লোকের ভিড়ের মধ্যে—

হেসে লুটিয়ে পড়লেন রাঙামাসী, কথার শেষাংশ উহ্য রেখেই।

—রাঙামাসীমা, শুনলাম না কি আপনি খান নি? সব ব্যাচ শেষ হয়ে গেল যে? চলুন?—রত্নাবৌদি এসে দাঁড়ালেন মাসশাশুড়ীর প্রতি বধূজনোচিত সমীহর ভাব মুখে ফুটিয়ে। রাঙামাসীর খোঁপার দিকে তার দৃষ্টি পড়েছে এমন মনে হয় না।

রাঙামাসী অন্যমনস্কভাবে আলতো একটু হাত তুলে খোঁপার মালাটা ঠিক করে নেন।

রত্নাবৌদি তবু উদাসীন। অন্ধ না কি?

—তোমরা সব খাবে না বৌমা?

—হ্যাঁ এই যে, এই সঙ্গে বাড়ির মেয়েরাও বসছে, চলুন চলুন। আগের ব্যাচে খেলেন না, শুনছি নাকি ফ্রাই সব ফুরিয়ে গেছে।

এ হেন দুঃসংবাদেও কিন্তু রাঙামাসীর আপসোস নেই। নিমন্ত্রণ বাড়িতে যারা দুটো ভালোমন্দ খাবার বাসনায় আসে, রাঙামাসী সে দরের লোক নয়। তাছাড়া বাড়িতে তাঁর অভাব কি? কাজেই রাঙামাসী অবিচলিত চিত্তে বলেন—গেছে, বাঁচা গেছে! তোমাদের পাঁচজনের সঙ্গে বসে খাওয়া নিয়ে কথা! খেতে যাব কি, সেই থেকে মনের মধ্যে যেন তোলপাড় করছে।

রত্নাবৌদির মুখে শিশুর সারল্য।—কোন্ সময় থেকে মাসীমা?

—আমার চেহারায়—মানে আর কি—সাজে-টাজে অদ্ভুত কিছু দেখছ না?

—অদ্ভুত? কই না তো?—রত্নাবৌদির মুখে ভোরের শিউলীর চারুতা।

রাঙামাসী মাথাটা একটু ঘুরিয়ে দেখান—দেখ তাহলে—

—ওঃ মালা? বাঃ বেশ মালাটি তো!

—শুধু ওইটুকুই তো শেষ নয় বৌমা, এর মধ্যে কথা আছে।

—কথা? মালার মধ্যে কথা?

রত্নাবৌদি যেন বসে পড়তে চান।

রাঙামাসী তাঁর দিকে রীতিমত ঘনিষ্ঠ হয়ে সরে আসেন, চুপি চুপি বলেন—তোমার ওই—ছোট পিসশ্বশুরটি লোক কেমন বল তো বৌমা? বাঁশীর বর?

—ও, বাঁশী পিসেমশাইয়ের কথা বলছেন? খুব ভাল লোক তো? চমৎকার লোক!

—চমৎকার? রাঙামাসীর সুগোল দুটি চোখ গুপ্ত রহস্যের ছায়ায় ঘোরালো হয়ে আসে—তোমরা অবশ্য তাই জানো! আমিও তাই জানতাম! কিন্তু আজ যা দেখলাম—

রাঙামাসী যেন লজ্জায় বাক্যহত হন।

—কি দেখলেন রাঙামাসী?

—দেখলাম আর কি—রাঙামাসী একটা নিশ্বাস ফেলেন—মানে বলছি যে—ওনার স্বভাব-চরিত্র বাছা তেমন সুবিধের নয়।

—সে কি রাঙামাসী?

—তবে আর বলছি কি? আহা বেচারা বাঁশীর জন্যে দুঃখ হয়! ওকে যেন এসবের কিছু বল না বৌমা! আমিও বলি নি।

—কিন্তু বাঁশী পিসেমশাই তো—

—হ্যাঁ সহজে বিশ্বাস হয় না বটে।—রাঙামাসী নিতান্ত ফিস্‌ফিস্ স্বরে কি একটু বলে নিয়ে, সাধারণ স্বরে বলেন—রাগে আমার ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে গেছল মা, ইচ্ছে হল খোঁপা থেকে টান মেরে খুলে ওর নাকের ওপর ছুঁড়ে মারি।

—মারলেই পারতেন।

—পারতাম! কিন্তু মায়া হল বৌমা, মায়া হল। ঠাট্টার সম্পর্ক হিসেবে দিয়েছে, এ নিয়ে একটা সীন ক্রিয়েট করলে বাঁশী বেচারা মর্মাহত হবে।

—তা এখনও তো কই ফেলে দেন নি?

—এখন? এখন আর—যাকগে—রয়েছে থাকগে! ফুলের মালা, ওর আর কি অপরাধ? চল যাই—আমার জন্যে তো আবার সবাই বসে রয়েছে।

খাওয়া মিটতেই তলব পড়ল লেবুদিদিমার দরবারে। লেবুদিদিমা, মানে রাঙামাসীরও যিনি মাসী। যাঁর সুবাদে এ বাড়িতে নেমন্তন্ন রাঙামাসীর।

—শোন্, ইদিকে আয়! বোস।

চল্লিশোত্তীর্ণা রাঙামাসী ভয়ে জড়সড় হয়ে সত্তরোত্তীর্ণা মাসীর পায়ের কাছে বসলেন।

—বলি—কী কীর্তি করে বেড়াচ্ছিস শতেকখোয়ারি?

গোল গোল দুটি চোখে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকান রাঙামাসী।

—তোমাকে আনাই আমার ঝকমারি হয়েছিল মা! তোমার নামে সবাই মুখ বেঁকিয়েছিল, আমিই মায়ায় পড়ে আনালাম। আমার সুরেশ তো তোমার নামে খড়্গহস্ত, ওকে লুকিয়ে খোকাকে পাঠিয়েছিলাম নেমন্তন্ন করতে। তা আমার মুখখানা একেবারে ডুবিয়ে দিলি?

—কি করেছি মাসীমা, বুঝতে পারছি না তো?—গরু চোরের মত চোখ পিট্‌পিট্ করতে করতে শুধান রাঙামাসী।

—না, তা বুঝতে পারবে কেন? ছি ছি! তোর বয়সী মাগীরা নাতি-নাতনী নিয়ে জড়িয়ে সংসার করছে, আর তুই কি না এমনি করে ঢলিয়ে বেড়াচ্ছিস? বাঁজা বলে কি কচি খুকী আছিস? বলি খোঁপায় ফুলের মালা জড়িয়ে লোক হাসিয়ে বেড়াচ্ছিলি কেন সর্বনাশী?

রাঙামাসী অশ্রুভরা চোখে মাথা হেঁট করে বলেন—ফুল আমার বড় ভাল লাগে মাসীমা!

—ভাল লাগে, বাড়িতে ফুলের বিছানায় শুয়ে থেক। পাঁচজনের সামনে এ কি? পরেছিস পরেছিস, নিজের মুখে চুনকালি লেপেছিস বেশ করেছিস, ও সব কথা বলেছিস কেন? বাঁশী রেগে একেবারে আগুন হয়ে বেড়াচ্ছে, বাড়িসুদ্ধ সবাই হাসাহাসি করছে—আমারই লজ্জায় গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করছে·· জামাই আমার অমন ঋষিতুল্য, তার সঙ্গে এতকাল ঘর করেও এখন তোমার এমন প্রবৃত্তি? ছিঃ!

সহসা রাঙামাসীর ভাব পরিবর্তন হয়। তিনি মাথা তুলে বলে ওঠেন—ফুল পরেছি, হাসাহাসি করতে পারে, বাঁশীর রাগের কি হল?

—হবে না? তুই মিছে করে ওর সোয়ামীর নাম জড়িয়ে কেলেঙ্কারের গপ্‌পো করবি, আর ও বুঝি আহ্লাদে ভাসবে?

—ওর স্বামীর নামে?—রাঙামাসী দুই গালে দুহাত থাবড়ে বলেন—ও মা

সে কী? কি ঘেন্না! তার নামে আবার আমি কি বললাম?

লেবুদিদিমা সন্দিগ্ধ স্বরে বলেন—কেন, বলিস নি, বাঁশীর বর নাকি আচমকা পেছন থেকে তোর খোঁপায় মালা জড়িয়ে দিয়েছে।

রাঙামাসী ঠাস ঠাস করে চড় বসান নিজের গালে—ও মা আমি কোথা যাব! অমন বিশ্রী কথা কে রটিয়েছে, ছি ছি! ফুলটুনির খোকাটা তখন "লাঙাদিদা" "লাঙাদিদা" করে কাছে এসে কি খেয়ালে একটা মালা নিয়ে আমার মাথায় বসিয়ে দিলো। ছেলেমানুষের আহ্লাদ-করে-দেওয়া উপহার, তাই সেটা ফেলি নি। দোষ হয়ে থাকে, এই ফেলে দিচ্ছি।

খুলতে উদ্যত ভঙ্গিতে হাতটা একবার উঠিয়েই অন্যমনার মত সে হাত নামিয়ে নিয়ে রাঙামাসী বলেন—ছেলেটা বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে? হয় নয় ডেকে জিজ্ঞেস করো?

ফুলটুনির বছর চারেকের ছেলেটা অদূরে অকাতরে পড়ে ঘুমোচ্ছে, তাকে ডেকে সাক্ষ্য দেওয়ানোর প্রস্তাব করা, একমাত্র রাঙামাসীর পক্ষেই সম্ভব।

লেবুদিদিমা মুখ বাঁকিয়ে বলেন—হ্যাঁ! ওকে যাবো সালিশ মানতে! আমি তো আর ক্ষেপি নি! তাহলে বলি—রত্না নাত-বৌয়েরই বা সাহস হয় কি করে, এসব কথা রটাতে? আর ওর দরকারই বা কি?

—দরকার আর কি, মজা দেখা! গোলমালের বাড়িতে একটা গণ্ডগোল তুলে দিল! তোমায় আমি বলছি মাসী, সুরেশদার ছেলের বৌটি বাপু সুবিধের হয় নি। দেখছি তো সমস্ত দিন! ভাসুর শ্বশুর জ্ঞান নেই, সবাইয়ের সামনে হাসাহাসি তর্কাতর্কি! মাথায় একটু কাপড় নেই—

লেবুদিদিমার এজলাসে আসামীর বদল হয়। তিনি নাক কুঁচকে বলেন—ওর কথা আর বলিস নে! লজ্জা সরমের বালাই মাত্র নেই। মুখে বেশী কথা কয় না, ভেতরে ভেতরে ধিঙ্গী অবতার!

—তার ওপর আবার এই রকম কথা বানানো রোগ! ছি ছি!

লেবুদিদিমা ভারীমুখে বলেন—জানি না বাছা, কার কথা সত্যি, কার কথা বানানো। তোমার কথা নিয়ে এদিকে তো একেবারে টি টি পড়ে গেছে! তুমি কাকে নাকি বলেছ জামাই নিজে গোড়েমালা এনে দিয়েছে, কাকে বলেছ আশু দিয়েছে, আবার নাত-বৌয়ের কাছে এই অকথা-কুকথা বলেছ—

রাঙামাসী একটু বিজয় গৌরবের হাসি হেসে বলেন—তাহলেই বোঝ মাসী, কাদের কথা বানানো। আমি তো পাগল নই যে, পাঁচজনের কাছে পাঁচ রকম

কথা বলব ? ফুলটুনির ছেলের ঘুম ভাঙলে জিগ্যেস কোর কাল।...আচ্ছা চললাম মাসীমা।

—এসো বাছা! মতিবুদ্ধি একটু ভাল কোর। লোকে যেন গায়ে ধুলো না দেয়।

গাড়িতে উঠতে উঠতে রাঙামাসী অভিমান-ক্ষুব্ধস্বরে নন্টুকাকাকে বলেন—চললাম ভাই! খুব আহ্লাদ করে বিয়ে বাড়িতে এসেছিলাম, তা খুব শিক্ষা হল।

নন্টুকাকা মুচকে হেসে বলেন—প্রতিনিয়ত শিক্ষালাভ করতে করতেই তো আমরা জীবনের পথে এগিয়ে চলেছি রাঙাদি!

আগামীকাল বরকনে বিদায়।

রাঙামাসীকে কেউ যেতে বলে নি, রাঙামাসী নিজেই ড্রাইভার ছোকরাকে চুপি চুপি বলে রেখেছিলেন—কাল একবার সময় করে এস তো? বরকনে বিদেয়ের আগে—

সে ছোকরা রাঙামাসীকে নামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করে—কাল কখন আসব মাসীমা?

রাঙামাসী নেতিবাচক একটু হাত নেড়ে তাড়াতাড়ি দোতলায় উঠে যান।... কণ্ঠ রুদ্ধ, কথা দিয়ে নিষেধ করবার ক্ষমতা নেই।

সিঁড়িতে উঠেই প্রথম ডানহাতি ঘরটার সামনে একবার থমকে দাঁড়ালেন রাঙামাসী। ব্যাঘ্র গর্জনের মত একটা গর্জন ঘরের মধ্যে গম্ গম্ করছে! অর্থাৎ লেবুদিদিমার 'ঋষিতুল্য' জামাই নিদ্রা গেছেন! রাঙামাসী বাড়িতে ফিরেছেন কি না ফিরেছেন, জানবার দরকার নেই তাঁর। তিনি ঋষিকল্প নিয়মী। রাত দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর কম্বলশয্যা বিছানো হয়ে যায়। দরজাতে পর্দা ঝুলছে, সেও কম্বলের। সহসা দৃঢ় হস্তে পর্দাটা সরিয়ে ভিতরে ঢুকে দাঁড়ালেন রাঙামাসী!

নিয়মে আর যোগব্যায়ামে মজবুত দেহী মানুষটির এই সামান্য পদধ্বনিতে ঘুম ভাঙল না। ভাঙেও না। রাঙামাসীর অস্থির, চঞ্চল, ক্রুদ্ধ, কোন পদক্ষেপণের শব্দেই কখনও ভাঙে না।

অরুচি-জন্মে-যাওয়া পরিচিত দৃশ্য!...সেই নীল বাল্বের মৃদু আলো, সেই মাথার কাছে টেবিলে মা কালীর পট, সেই পাশের দিকের তাকে সাজান সাধন-

তন্ত্রের তথ্য-গ্রন্থের সারি, সেই এ পাশে অজিনাসন সম্বলিত পূজার 'আসন', সেই চৌকির তলায় রাত্রের ভুক্তাবশিষ্ট শ্বেত পাথরের থালা বাটি গ্লাস।···কোন নতুনত্ব নেই, নেই কোন বৈচিত্র্য।

শিথিল হাতের মুঠো থেকে পর্দাটা ঝুলে পড়ে। সরে এসে সিঁড়ির বাঁ পাশের ঘরে ঢোকেন রাঙামাসী।···কে বলবে একই বাড়ির মুখোমুখি ঘর! এটি একখানি প্রাচীন ও আধুনিক, সব কিছু বিলাস উপকরণে বোঝাই অতি-সজ্জিত ঘর।··· রাঙামাসীর বিয়ের সময় পাওয়া তাঁর বাবার দেওয়া সমস্ত ফার্নিচার এই ঘরে ঠাসা আছে, তার উপরে জমেছে রাঙামাসীর সারাজীবনের সঞ্চয়! তিলে তিলে তিল-ভাণ্ডেশ্বর!

একটা ঘরে তিনখানা বড় আরশি! তিন দেওয়ালে আলো!

ঘরের দরজাটায় খিল লাগিয়ে বড় আলোটা জ্বেলে দিয়ে আরশির সামনে এসে দাঁড়ালেন রাঙামাসী!

খানিক আগে এইখানে দাঁড়িয়েই সেজে গেছেন।

প্রসাধনের নানাবিধ উপকরণ ইতস্ততঃ ছড়ানো, তাড়াতাড়িতে তুলে রেখে যাওয়া হয় নি।

পাউডারের তুলিটা হাতে তুলে নিয়ে ভাল করে আর একবার আরশির মধ্যে চেয়ে দেখতে গিয়েই চমকে উঠলেন রাঙামাসী।···কে ও? ওর মধ্যে থেকে কে তাকিয়ে আছে রাঙামাসীর দিকে? চাকার মত গোল কালো একখানা মুখে অশ্রুপাতে বিকৃত ফুলো ফুলো দুটো চোখ, গালের উপরকার পেণ্টটা ধুয়ে মুছে গিয়ে কপালের সঙ্গে বেমানান বিশ্রী দেখাচ্ছে।···আঁট সাঁট অর্গ্যাণ্ডি লেসের ব্লাউস আর ইস্ত্রী-মটমটে ঢাকাই শাড়ি জড়ানো দেহ, তবুও যেন ব্যাঙের মত শিথিল থপ্‌থপে লাগছে। ঘণ্টা কয়েক আগে কি এই দেহখানিই দেখেছিলেন রাঙামাসী, আরশির সামনে ঘুরে ফিরে? আর দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন আপন কলা-কৌশলের কৃতিত্বে!

প্রসাধনে একটু ত্রুটি ছিল—খোঁপায় মালা, আজকাল যেটা খুব চল হয়েছে। সেইটুকুই সেরে নিয়েছিলেন বিয়েবাড়ি গিয়ে। অথচ লজ্জা-লজ্জাও করছিল, সেই লজ্জা ঢাকতেই না নানা গল্পের অবতারণা?···কি করবেন কোনটাই যে ওরা বিশ্বাস করতে চায় না।

কিন্তু কি হয়েছে তাতে?

ওদের কি ক্ষতি হচ্ছিল?

শুধু শুধু ওরা কেন···কেন অকারণ এই নিষ্ঠুরতা ওদের ?

খোঁপা থেকে মালাগাছটা টেনে খুলে ফেলেন রাঙামাসী, আর অনেক চেষ্টা, এবং অনেক কৌশলে সংগৃহীত সেই বেলফুলের গোড়েমালাটা কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ছড়িয়ে ফেলে মুহূর্ত-কয়েক ধবধবে বিছানা পাতা পালঙ্কের উপর চুপ করে বসে রইলেন, সামনের সাদা দেওয়ালটার দিকে শূন্য দৃষ্টি মেলে।···ওই দৃষ্টির মধ্যেই কি স্থির হয়ে আছে রাঙামাসীর সারাজীবনের ছায়া ?

সহসা পাশের বালিশটা ঠেলে মাটিতে ফেলে দিয়ে রাঙামাসী বিছানায় আছড়ে পড়লেন উপুড় হয়ে। পালঙ্কটা দুলে কেঁপে উঠল, আর অনেকক্ষণ ধরে কাঁপতে থাকল থেকে থেকে।···

অবোধ

দরজার কড়ানাড়ার শব্দে চমকে উঠলেন নিরুপমা। নিরুপমার দরজার কড়া নড়ল ?

এ আবার কোন বিস্মৃত যুগের অনুভূতি ! না, বোধ হয় শোনবার ভুল। নিরুপমার দরজার কড়া আর নড়ে না। কে আসবে ? কে আছে নিরুপমার ? সম্পর্কের সূত্র ধরে টানলে হয়তো আছে অনেকেই, কিন্তু নিরুপমার দরজায় এসে কড়া নেড়ে ডাক দেবে এমন কেউ নেই জগতে। যা আসে সবই পাড়ার লোক। খুব বেশি না হলেও বাঁড়ুয্যে গিন্নী আসেন মাঝে মাঝে, 'কালীতলা'য় যাবার পথে পড়ে বলে 'যোগিনী ঠাকুরঝি' আসেন সময় সময়। আর আসে সুবালা গয়লানী, আর তার ছেলে শম্ভু। ওদের সঙ্গে নিতান্তই একটা প্রয়োজনের সূত্রে যোগ রাখতে হয়।

ভোরের অন্ধকারে চুপি চুপি সুবালার গোয়ালে গিয়ে রাশীকৃত গোবরের সদ্গতি করে দিয়ে আসেন নিরুপমা। অনেক গরু সুবালার, মস্ত ব্যবসা, হাতে বাত বলে ঘুঁটে ঠুকতে পারে না। নিরুপমার সঙ্গে তাই এই ব্যবস্থা। ঘুঁটে বিক্রির পয়সা অর্ধেক সুবালার, অর্ধেক নিরুপমার। পয়সাটা দিতে আসে শম্ভু। সুবালাও আসে সেই পয়সায় চালটা নুনটা কিনে দিয়ে যেতে।

পাড়ার সকলেই জানে এ কথা, তবু এই গোপন দুঃখের কথা তুলে কেউ আলোচনা করে না। তাদের এই মহত্ত্বটুকুর জন্যে ভারি কৃতজ্ঞ নিরুপমা। অবিশ্যি, বাগানের কলাটা মূলোটা দিয়ে সাহায্য তারাও করে, নইলে কি আর এতদিন নিজের ভিটেয় থেকে অস্তিত্ব বজায় রেখে চলতে পারতেন?

কিন্তু সে কথা থাক, তারা কেউ কড়া নেড়ে আসে না। উঠোনের দিকের বেড়ার ঝাঁপ ঠেলে ঢোকার কৌশল সকলেরই জানা। এ যে বাইরের দরজা! ···কড়াটা আবার নড়ে উঠল সজোরে। নাঃ, নিশ্চয় পাড়ার কোন দুষ্টু ছেলের কাজ। হঠাৎ-জেগে-ওঠা খেয়ালের খেলা। বিরক্তিভরেই উঠে এলেন নিরুপমা, বকবেন বলে! কিন্তু দরজা খুলতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। শুধু চির-অভ্যাসে মাথার কাপড়টা টানতে ডান হাতটা একটু উঠল।

দু'টি কমবয়সী ছেলে।

সুবেশ সুকান্তি। সন্দেহ নেই যে কলকাতা থেকে এসেছে। বাড়ি ভুল করে নি তো!

—কাকে চাও, বাবা?

একটি ছেলে তড়বড় করে বলে উঠল—এটা কবি অনন্ত বাগীচার বাড়ি তো? আমরা তাঁর মাকে চাই।

দরজা খুলে দিশেহারার মত তাকিয়ে ছিলেন নিরুপমা, কথাটা শুনে যেন আচমকা হোঁচট খেলেন। অনন্ত বাগচী! হঠাৎ শ্মশানের চিতাভস্ম অন্বেষণ করবার বাসনা কেন এদের?

—এটাই স্বর্গত কবি অনন্ত বাগচীর বাড়ি তো?

সপ্রতিভ ছেলেটি আবার প্রশ্ন করে।

নিরুপমা ঘাড় কাৎ করলেন।

—আচ্ছা—ইয়ে—আপনিই কি তাঁর—

—হ্যাঁ আমিই তার মা! কি বলবে বল?

এবারে পিছনের ছেলেটি ইতিউতি তাকিয়ে বলে, আমরা একটা দরকারী কথা বলতে এসেছিলাম—

কথা বলতে গিয়ে মাঝখানে যেভাবে থেমে যায় তাতে বুঝতে দেরি হয় না এরা একটু বসতে চায়। নিরুপমা বুঝতে পারেন না, তাঁর সঙ্গে আবার কি দরকার থাকতে পারে। তবু বললেন—আচ্ছা, এস তাহলে এই ঘরে।

একখানিই ঘর, দ্বিতীয় ঘরখানা ও-বছরের বর্ষায় পড়ে গেছে। দুটো ঘরের

জিনিস একটা ঘরে বোঝাই করা, তারই একপাশে সরু তক্তাপোশটা, যার মাথার দিকে নিরুপমার অকিঞ্চিৎকর বিছানাটা গোটানো।

তক্তাপোশেরই একপাশে বসল ছেলে দুটি। তাকিয়ে দেখল চারিদিকে। ভালো জিনিস কিছুই নেই, তবু জিনিসে ঠাসা ঘর। একটা পুরনো সংসারের বংশানুক্রমিক সঞ্চয়! পায়াভাঙা সিন্দুক, কব্জাভাঙা ট্রাঙ্ক, চটা-ওঠা ক্যাশবাক্স থেকে সুরু করে কি আছে আর কি নেই। বাক্স সিন্দুক ছাড়াও আছে ছিঁড়ে-যাওয়া লেপ-তোশকের তুলো, গায়ে দেবার মত বড় কাঁথা, নিরুপমার কাছে অর্থহীন মোটা মোটা তাকিয়া আর বালিশ কটা, ইঁদুরে কাটা কম্বল, রং-জ্বলা সতরঞ্চ, আছে মরচে-ধরা লোহার বাসনের গোছা, বঁটি কাটারি হামানদিস্তে, আছে ঝুড়ি চুপড়ি কুলো ডালা বারকোস, আছে শিশি বোতল, কড়ির বোয়েম, কাঁচের জার, সম্পূর্ণ একটা সংসারে যে জিনিসগুলো সর্বদা প্রয়োজনীয় ছিল। নিরুপমার আর কোনো কিছুতেই প্রয়োজন নেই। একটা পিতলের সরা আর ঘটি, একখানা কানাভাঙা পাথর, শুধু এই, এইতেই চলে যায় তাঁর। হ্যারিকেন দুটো তাও তোলা আছে জানলার মাথায় তক্তায়। একটা ডিব্‌রি জ্বালবার কেরোসিন, তাও থাকে না সব দিন, অন্ধকারে হাতড়ে কাজ চালিয়ে নেন।

ছেলে দুটি খুব নিরীক্ষণ করে চারিদিক দেখছিল, নিরুপমা একটু অপেক্ষা করে বললেন—কই বাবা, কি বলবে বলছিলে?

—ও হ্যাঁ—কুণ্ঠিত হাস্যে একজন বলে—হ্যাঁ, বলছি! আচ্ছা—ইয়ে উনি কোন্ ঘরে বসে লিখতেন?

নিরুপমা কেমন থতমত খেয়ে বলে ফেলেন—কে লিখতো?

—আপনার ছে—মানে কবি অনন্ত বাগচীর কথা বলছি।

নিরুপমা বোধ হয় শুধু 'লেখা' কথাটার অর্থগ্রহণ করতে পারলেন না, ম্লান ভাবে বললেন—এই ঘরেই লেখাপড়া করেছে বরাবর।

অপর ছেলেটি এইবার নড়েচড়ে সঙ্গীকে উদ্দেশ করে বলে—আচ্ছা অশোক, কাজের কথাটা হয়ে যাক্। আধ ঘণ্টার মধ্যে ট্রেন—

—হ্যাঁ, বলছিলাম কি—আমরা কলকাতা থেকে এসেছি, একটা উদ্দেশ্য নিয়ে—

অতঃপর নিজেদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে তারা।

শুনে প্রথমটা মানেই বুঝতে পারেন না নিরুপমা। বোঝা সম্ভবও নয়।

নিরুপমা যে জগতে বাস করেন, সেখানে এমন হাওয়া পৌছয় না যে নিরুপমা ওয়াকিবহাল থাকবেন, বাঙলাদেশ আজ কতখানি গুণের সমঝদার হয়ে উঠেছে।

নিরুপমা জানেন না বাঙলাদেশ এখন সারা বছর ধরে শুধু জয়ন্তী-সভা আর স্মৃতি-সভা নিয়েই আছে। হাতের কাছে গুণী খুঁজে না পেলে কবর খুঁড়েও টেনে বার করছে। 'জয়ন্তী' শব্দটাই নিরুপমা জীবনে শুনেছেন কিনা সন্দেহ।

কবি অনন্ত বাগচীর জন্ম-জয়ন্তী করতে চায় ওরা। করতে চায় কবির জন্মভিটায়।

'মৃত্যুর পর জন্ম হয়' এ সত্য অবশ্য নিরুপমার জানা, কিন্তু মৃত্যুর পর জন্মতিথি উৎসব হয়, এ কথা আজই প্রথম শুনলেন। অনেক বিস্ময় আর অনেক প্রশ্নোত্তরের পর যখন ওদের ইচ্ছেটা নিরুপমার মস্তিষ্কের কোটরে পৌছলো তখন নিষ্প্রভভাবে বললেন—কিন্তু এটা তো তার জন্মমাস নয়।

—তাতে কি ?···ছেলেটি সোৎসাহে বলে—বছরের কোনো এক সময় তো জন্মেছিলেন ? বেঁচে থাকলে কত বয়েস হত সেইটা শুধু বলে দিন, সব ঠিক করে নেব।

নিরুপমা যেন আর কথা কইতে পারছিলেন না, ওদের কথাগুলো ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা ভাবে মাথার মধ্যে আসছে যাচ্ছে···নিজে কি বলছেন নিজেরই মাথায় ঢুকছে না. তবু ক্লিষ্ট স্বরকে যতটা সম্ভব সহজ করে বলেন—চব্বিশে পড়েই চলে গেল, আর গিয়েছে এই এগার বছর—

—তাহলে—পঁয়ত্রিশ ? আচ্ছা ঠিক আছে। সামনের রবিবারে সব ব্যবস্থা করছি আমরাই সব করে নেব, ফুলটুল যা কিছু কলকাতা থেকে সব আনা হবে, আপনি শুধু এই ঘরটা খালি করে রেখে দেবেন।

ঘরটা খালি করে দেবেন !

এ আবার কি এক নতুন ধাক্কা ! এই ঘরটাকে খালি করবার উপায় আছে নাকি ?

নিরুপমা করুণভাবে বললেন—কিন্তু বাড়িতে তো আর জায়গা নেই বাবা—কোথায় সরাবো ? আর একটা ঘর ভেঙে পড়ে আছে—

ছেলেটি উড়িয়ে দেবার ভঙ্গিতে ব্যস্তভাবে বলে—যা হোক করে করে দেবেন, একদিনের জন্যে বৈ তো নয় ? রাত্রে আবার সব ঠিক করে নিতে পারবেন।

ঘরের 'জিনিস' গুলো তাদের চোখে এমনই মূল্যহীন যে এগুলো সরানো নিয়ে কেউ ভাবনায় পড়তে পারে এমন খেয়ালই হয় না তাদের। আঠারো-

উনিশের ছেলে, যে কাজে মেতেছে সেই কাজের সুবিধে ছাড়া আর কিছুই তাদের দৃষ্টিপথে পড়ে না।

নিরুপমার পক্ষে সব ঠিক করে নেওয়া যে কি, সে ধারণাই কি আছে ওদের ?

ট্রেনের সময় হয়ে যাচ্ছে, ওরা এবার উঠল।

উঠে দাঁড়িয়ে বলল—আচ্ছা তাহলে ওই কথাই রইল ? এই অশোক কিম্বা আমি একজন কেউ সকালের ট্রেনে এসে সব সাজিয়ে-টাজিয়ে ফেলব। বিকেলের ট্রেনে বাকী সবাই এসে পড়বেন।...সভাপতি হচ্ছেন কবি মৃণালকুসুম, প্রধান অতিথি হবেন নীহার চাকলাদার এম. এল. এ, মানে উনিই সব খরচপত্র করবেন কি না! আরো কয়েকজন কবি সাহিত্যিক ইত্যাদি আসবেন, রীতিমত ভাল করেই এটা করব ঠিক করেছি আমরা।...আচ্ছা অশোক, আজ তাহলে ওঠা যাক্, ট্রেন ছেড়ে দেবে শেষটা।...কার্ডটা তাহলে এই ভাবে ছাপানো হোক—

"স্বর্গত কবি অনন্ত বাগচীর পঁয়ত্রিশতম জন্ম-বার্ষিকী" কি বলিস্ ? দূর, 'বার্ষিকী' কথাটা বড্ড সেকেলে হয়ে গেছে, 'জয়ন্তী' হোক না।

কথা বলতে বলতে বেরিয়ে যায় ওরা। একটা কথা শুধু কানে আসে নিরুপমার..."দুএকটা রঙিন শাড়ি-টাড়ি যোগাড় করে আনতে হবে দেয়ালগুলো চাপা দিতে, যা দেয়ালের অবস্থা।"

দেয়ালের মত নিথর হয়েই অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন নিরুপমা খোলা দরজার সামনে।...তারপর সহসা সমস্ত চিন্তার মাঝখানে বিদ্যুৎশিখার মত মনে পড়ে গেল, উনুনে কি যেন চড়িয়ে এসেছিলেন।...ওঃ হ্যাঁ, চারটি মূলোর শাক সিদ্ধ করতে চাপিয়েছিলেন। আজকের আহারের উপকরণ। এইবার ত্বরিত পায়ে রান্নার দিকে চলে গেলেন নিরুপমা।...কিন্তু অনির্দ্দিষ্ট কাল আগুনে বসানো থাকলে শাকগুলো অবিকল ঠিক থাকবে এমন আশা করা যায় না। শাক তো আর মানুষ নয়!

হ্যাঁ, পিতলের সেই সরাখানা মেজে সাফ করতে খুব বেগ পেতে হয়েছিল নিরুপমার। রান্না ? সেদিন আর মোটেই মন লাগল না।...সারাদিন ধরে খালি মনে বাজতে লাগল রবিবার, রবিবার।...আজকের বারটা কি ? শম্ভু এলে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে।...ঠিক মনে নেই বুধবার না বেস্পতিবার।

একাদশীটা কবে পড়বে এইটুকু জেনে নেওয়া ছাড়া, বার-তারিখে আর কি দরকারই বা পড়ে ?

নিরুপমার বুকের মধ্যে অনেক ঢেঁকির পাড় পড়িয়ে, তিনটি অনিদ্র রাত পার করিয়ে রবিবার এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়ল দুটি ছেলেই। উৎসাহের চোটে কেউই থাকতে পারল না বোধ হয়।

শম্ভুকে দিয়ে অনেক জিনিসই বার করিয়েছিলেন নিরুপমা, কতক রান্নার চালার নিচে, কতক ভাঙা ঘরের কাঠামোটার আড়ালে, কিছু বা উঠোনে। তবু কিছু ছিল। মানুষ তো বিধাতা পুরুষের মত চটপটে নয় যে এক সেকেণ্ডে ঘর খালি করে দিতে পারবে? মানুষের অনেক দেরি লাগে। সকালেও কিছু কিছু টানাটানি করছিলেন নিরুপমা, ওরা এসে হাত লাগাল। ব্যাস্, তার পরে যে কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল! সারাদিনটা কোন ফাঁকে কেটে গেল। হঠাৎ এক সময় দেখলেন নিরুপমার চির-অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরটা আলোয় ভাসছে।

পাঞ্চলাইটের তীব্র আলো থেকে মুখটাকে একটু আড়াল করে জানলায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ক্রমশ কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়লেন নিরুপমা। এরা কে? কখন জড়ো হল এত লোক? বিয়ে-বাড়ির মত দেখতে এই ঘর নিরুপমার সেই ঘরটা নাকি! এত বড় ঘর আবার কবে ছিল তাঁর? দেয়ালে দেয়ালে রঙীন সিল্কের শাড়ির আবরণ। শতরঞ্চের ওপর সাদা চাদর বিছানো টানা লম্বা মেজে। মাঝখানে চৌকি পাতা, তার পাশে ফুলদানিতে বড় বড় তোড়া ···চৌকির ওপর ক-খানা বইয়ের মত কি যেন, তার ওপর এক গাছা বড় রজনীগন্ধার মালা বিছানো।···

নিরুপমা যে কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন মনে করতে পারেন না, বুঝতে পারেন না বেঁচেই আছেন কি না। মৃত্যুর পরেই বোধ করি এরকম একটা আত্মবিস্মৃতি আসে।···তবে একটা কথা বুঝতে পারলেন, ওঃ এই! এইজন্যই ছেলে দুটি তাকে বারবার প্রশ্ন করছিল অনন্তর কোন ফটো আছে কি না। থাকলে ওই চৌকির ওপর বসিয়ে দিত সে ফটো। ওই বড় মালাটা বোধ হয় অনন্তর ফটোতেই পরিয়ে দিত।

অনন্ত মারা যাবার পর কিছুদিন পর্যন্ত তার একটা ফটো নেই বলে বড় আক্ষেপ হয়েছিল নিরুপমার, কিন্তু আজ যেমন যন্ত্রণার মত একটা অনুভূতি হচ্ছে, এমন হয় নি কোনদিন। বুকের মধ্যে কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠছে!

পিছন থেকে বাঁড়ুয্যে গিন্নী সকৌতূহলে চুপি চুপি বললেন—সর্ ত মেজবৌ, আমি একটু দেখি। চমকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি সরে এলেন নিরুপমা। সচেতন হয়ে গেলেন।

বাঁড়ুয্যে গিন্নীর পিছনে পাড়ার আরো কয়েকটি মহিলা উঁকিঝুঁকি মারতে থাকেন, সুবালা গয়লানী এদিকে পাত্তা না পেয়ে ঘুরে বাইরের দরজা চেপে দাঁড়িয়েছে। তার অত আব্রু নেই। এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে হঠাৎ এক সময় নিচু হয়ে কি যেন একটা কুড়িয়ে আঁচলে ঢাকা দিয়ে নিয়ে সরে পড়ে সুবালা—চোখটা অন্ধকারে চকচক করছে। কড়া আলোয় পালিশ-ঝলসানো ক-জোড়া জুতো পড়ে রয়েছিল অনেক বাজে জুতোর অরণ্যে। একজোড়া জুতো ঠিক শম্ভুর পায়ের যুগ্যি।

ঘরের মধ্যে তখন মধ্যবয়সী একটি ভদ্রলোক শান্ত গলায় বলে চলেছেন—"আজ তার মরদেহ আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু তাঁর স্বল্পায়ু-জীবনের মধ্যেও যে সম্পদ তিনি রেখে গেছেন, বাঙলাদেশ তাতে চিরঋণী থাকবে।"

কে একজন নিচু গলায় বলল—ছবি নেই!

উত্তরটাও শোনা গেল—একটা ব্যঙ্গ-হাস্যের জালের মধ্যে দিয়ে—নাঃ, ছবি-টবি নেই। তাহলে আর বাঙলাদেশ বলেছে কেন?

শান্ত কণ্ঠ বলে চলেছে—তরুণ কবি অনন্ত বাগচীর কবিতা—স্বপ্নের নয়, ভাবের নয়, 'বোধে'র। এর ক্রিয়া হয় মস্তিষ্কের মধ্যে। অনন্ত বাগচীর জীবনদর্শন ছিল সম্পূর্ণ স্বকীয়—রবীন্দ্রোত্তর যুগে সে সব কবি রবীন্দ্রানুগ পন্থা পরিত্যাগ করে, আপন পথ সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন বা নিয়েছেন, কবি অনন্ত বাগচী তাদের মধ্যে—"

'অনন্ত' নামটা বারবার সচেতন করে তুলছে, স্থির হয়ে শুনবার চেষ্টা করছেন নিরুপমা, কি এরা বলছে। কিন্তু ওঁরা কি বাঙলা কথা বলছেন? একবর্ণও বোঝা যাচ্ছে না কেন তবে? 'অনন্ত'র নামটা ছাড়া আর কোনো কথাটাই যেন ঠিক বাঙলা নয়।

বাঁড়ুয্যে গিন্নী জিভে একটা শব্দ করে বলেন—আহা, মরে যাই। যেমন পোড়া কপাল মেজবৌয়ের, তাই এমন ছেলেকে বিসর্জন দিয়ে বসে আছে। কী গুণী ছেলেই ছিল! কি বা বয়েস হয়েছিল, তবু না কি দু দুখানা কেতাব লিখে রেখে গেছে। একখানা আমার নিবারণকে দিয়েছিল সে বার। আহা, তখন কি এত জানি!

নিরুপমারও মনে পড়ল দুবার দুখানা হলদে কাগজের মলাট দেওয়া খানকয়েক কাগজের সমষ্টি, অনন্ত তার হাতে এনে দিয়েছিল, কলকাতার কলেজে পড়ার সময়। বলেছিল তার নিজের লেখা। নিরুপমা পড়তে গিয়ে পড়তে

পারেন নি, ছাই লেগেছিল। বরং ছেলেকে ধমকই দিয়েছিলেন, পড়ার সময় বাজে কাজ করাতে।...ধমক খেয়ে হাসত ছেলেটা।

সে বই পড়ে এরা এত সব বলছে? না কি নিরুপমার অজ্ঞাতসারে অসম্ভব কিছু, অদ্ভুত কিছু করে রেখেছিল অনন্ত? আজ সেটা প্রকাশ পেয়ে গেছে, তাই এরা এত অবাক হচ্ছে?

শান্ত কণ্ঠ নির্বাক হয়ে গেছে। সভার সকলে মাথা নিচু করে যেন ভাবসমাধিতে বসে। শুধু একটি ছেলে চৌকিতে রাখা একখানা হলদে মলাটের চটিবই মালার তলা থেকে টেনে নিয়ে চোখের সামনে খুলে ধরে কতকগুলো শব্দ উচ্চারণ করে যাচ্ছে।

'সংগ্রাম' 'রক্তক্ষয়' 'নৈরাশ্য' 'অপমৃত্যু' এমনি সব শব্দ, আলাদা আলাদা করে মানে বোঝা যায়, একসঙ্গে বলে গেলেই সব কেমন ঘুলিয়ে যায়। বইটা এ-হাত ও-হাত হচ্ছে। একটির পর একটি ছেলে একটু করে পড়ছে।...আবার কথা বলাবলি করছে। থিয়েটারের দর্শকের মত নিষ্পলক হয়ে দেখছেন আর শুনে যাচ্ছেন নিরুপমা।

বাঁড়ুয্যে গিন্নী চলে গেলেন, কাজ কামাই করে কে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? এবারে জানলা অধিকার করেছেন যোগিনী ঠাকুরঝি।

সুবালা ঘুরে এসেছে। নিজস্ব ধারণায় 'ফিস্‌ফিস্' করে প্রশ্ন করলো—এরা সব কারা, দিদি?

যোগিনীর উত্তর আরো চুপিচপি—থাম, গলাবাজি করিস নে। এরা সব অনন্তর বন্ধু।

অনন্তর বন্ধু!

নিরুপমার মনে হয়, কে যেন থেকে থেকে তাঁর চৈতন্যের ওপর হাতুড়ি পিটিয়ে চলেছে।......অনন্তর বন্ধু এরা? এইসব চকচকে ছেলেরা?...এত ভাল ভাল বন্ধু ছিল অনন্তর?

একদিনের একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল নিরুপমার। কে জানে কেন কতদিনের কত কথার মধ্যে সেই ছবিটাই চোখে ভেসে উঠলো।...সাবুর বাটিটা নামিয়ে রেখে বিকৃতমুখে বলেছিল অনন্ত—এখানের বাজারে কি একটা কমলালেবুও পাওয়া যায় না, মা?

যায় কি যায় না, নিরুপমাই বা জানবেন কোথা থেকে। অনুগতর মধ্যে

সুবালা। শম্ভুটাও তখন বালক মাত্র। পাড়ার একে ওকে দিয়ে যা হয় কিছু আনিয়ে নিয়ে দিন চালানো।...তা ছাড়া কমলালেবু ডালিম আঙুর আপেলের ফরমাশ করবেন কি দিয়ে? কানাকড়ি নিয়ে যার খেলা!

হঠাৎ শম্ভুটা ছুটে এল—বামুন-মা, তোমাকে ডাকতেছে ওনারা।

—আমাকে! নিরুপমা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকান।

—হ্যাঁগো তোমাকে। ফটক তুলবে নাকি। চল না তুমি।

নিরুপমা তবু যেতে চান না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অশোক ছেলেটি এসে পাকড়াও করে নিয়ে গেল।

ক্যামেরাও এনেছে ওরা। অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই কিছু। আড়ষ্ট জড়সড় নিরুপমাকে চৌকির পিছন দিকটায় কোন রকমে বসিয়ে রেখে গুছিয়ে-গাছিয়ে 'বাবু' হয়ে বসল সবাই।...বিদ্যুতের মত এক চমক আলো ঝলসে উঠল সকলের মুখের ওপর।...নিরুপমার মুখেও পড়ল।

ঠিক কালকের কাগজেই না হোক, দুদিন পরের তারিখে নিশ্চয় বার হবে— "কবির জন্মভিটায় কবি-জননীসহ অনুরক্ত-মণ্ডলী।...ডান পার্শ্বে শ্রীনীহার চাকলাদার ও বামে শ্রীমৃণালকুসুম বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা যাইতেছে।"

আড়ষ্ট হয়েই উঠে এলেন নিরুপমা, তার পরই একটা গোলমাল কানে এল... জুতো জুতো, কার নাকি জুতো হারিয়েছে!

ঠিক কত রাত্রে যে শুতে এলেন নিরুপমা বুঝতে পারেন না। ওরা যেন গভীর রাত্রির স্তব্ধতাটা নামিয়ে রেখে চলে গেছে।

ওরা যা কিছু এনেছিল সব গুছিয়ে নিয়ে গেছে। সিল্কের শাড়ি, শতরঞ্চ, ধোওয়া চাদর, পাম্পলাইট। ফুলের তোড়াগুলোও তুলে দিয়েছে এম. এল. এ.-র গাড়িতে, মালাগাছটা কে একজন হাতে জড়িয়ে নিয়েছিল।......

নীরন্ধ্র অন্ধকার ঘরে শুধু ফুলের গন্ধটা যেন একটা অশরীরী আত্মার মত ভেসে বেড়াচ্ছে।

সারা উঠানে আগাছা গজিয়ে আছে, ভাঙা ঘরে বেশ খানিকটা জঙ্গল। কোনোখান থেকে এক ছিটে আলো আসবার আশা নেই। এই ঘরে যে কিছুক্ষণ আগে আলোর সমারোহ গেছে সে আর বিশ্বাস হচ্ছে না।

দীর্ঘকাল এই বাড়িতে একা কাটিয়েছেন নিরুপমা, কোনদিন ভয় করে নি, আজ যেন ভয়ের মত একটা অস্বস্তি পেয়ে বসেছে। ঘুম আসছে না কিছুতেই।... ফুলের গন্ধ এত অস্বস্তিকর? কিন্তু তা ছাড়া ঘুম না হবার আর তো কোন

কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না নিরুপমা।

অন্ধকারের মধ্যেও তীক্ষ্ণদৃষ্টি ফেলে ফেলে ঘরের শূন্যতাটা অনুভব করতে চেষ্টা করলেন। দেখা যাচ্ছে না কিছু, তবু শূন্যতার অনুভূতি ধরা পড়েছে।...

...সেই বিরাট পর্বতের বোঝা আবার ঘরে তুলতে হবে। শম্ভুকে বলতেও লজ্জা করবে, কিন্তু নিরুপমার নিজের সাধ্যের অতীত যে।...ভোরবেলা যখন ঘুঁটে দিতে যাবেন সুবালার বাড়ি, বলে আসবেন শম্ভুকে।

এই মাদুরটা আর বালিশটা ছাড়া আর কোন জিনিসেই যে আর কোন দরকার নেই নিরুপমার, ভবিষ্যতে কোনদিন দরকার হবে না, সে কথা মনে পড়ে না।...বরং মনে হতে থাকে, খালি ঘরটা খাঁ খাঁ করছে বলেই হয়তো গা-টা এমন ছম্‌ছম্‌ করছে।

বার বার উঠে জানালা খুলে খুলে দেখতে থাকেন নিরুপমা ভোর হয়েছে কিনা।...আজকের রাতটা কি বেশি বড়? আজকের অন্ধকারটাই বা এত গাঢ় কেন?

শোক

অফিস বেরোবার মুখে ফুটপাতে পা ফেলতেই সামনে পিয়ন, চিঠি আর বই হাতে। ব্যস্ত হাতে জিনিস দুটো নিয়ে ঘুরে আবার অন্দরমুখো হতে হল শক্তিপদকে। ফেলে দিয়ে যেতে হবে প্রতিভার কাছে। বইটা দেখবার দরকার নেই, বোঝাই যাচ্ছে "ছায়াছবি"। প্রতিভার প্রাণের প্রিয় সিনেমা পত্রিকা। বুধবারে বুধবারে নিয়মিত আসে।

চিঠিটাও প্রতিভারই। পোস্টকার্ডে লাইন কয়েক লেখা।

বর্ধমানের চিঠি। প্রতিভার বাপের বাড়ির।

এত ব্যস্ততার সময় চিঠি পড়বার কথা নয়, তবু চলতি পথে চোখটা আপনি বুলিয়ে গেল কালো কালো লাইন কটার উপর, আর সঙ্গে সঙ্গে যেন চোখ দুটো পাথরের হয়ে গেল শক্তিপদর। সেই নিস্পলক পাথরের চোখ দুটো নিয়ে আরও একবার চিঠিটা পড়ল শক্তিপদ, আরও একবার! নাঃ সন্দেহের আর অবকাশ নেই। বাহুল্যকথা-বর্জিত নির্ভুল সংবাদ। প্রতিভার কাকার হাতের স্পষ্টাক্ষরে লেখা!

মা মারা গেছেন প্রতিভার।

টেলিগ্রামের কথা স্বপ্নেও ভাবেন নি কাকা, চিঠিতেই জানিয়েছেন—"গত রাত্রে তোমাদের মাতৃদেবী স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন। সামান্য কয়েকদিনের জ্বরে তিনি যে এভাবে আমাদের মায়া কাটাইবেন, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমরা সকলেই অত্যন্ত কাতর হইয়াছি। দাদা নাই, বৌদিও গেলেন, এখন তুমিই আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা-স্থল। অতএব পত্রপাঠ চলিয়া আসিয়া আমাদের সান্ত্বনা দান করিবে।"

পরবর্তী আশীর্বাদজ্ঞাপক লাইন দুটো পড়বার ক্ষমতা আর থাকে না শক্তিপদর, শুধু মিনিট দুয়েক কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে। সেই অবস্থায় সিনেমার ছবির মত পরপর অনেকগুলো ছবি তার মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে। দেখা ছবি নয়, আনুমানিক ছবি। এই মর্মান্তিক চিঠির মর্ম এখন প্রতিভাকে জানালে, কী বিপদে পড়তে হবে শক্তিপদকে, তারই ধারাবাহিক দৃশ্য।

বলাবাহুল্য ম্যালেরিয়াগ্রস্ত বিধবা শাশুড়ীর মৃত্যু-সংবাদে শক্তিপদ নিজে ভয়ানক একটা কিছু শক্ পায় নি, কিন্তু মা-অন্ত-প্রাণ প্রতিভা এ সংবাদে কী কাণ্ড করবে সেই ভেবেই বুক শুকিয়ে ওঠে বেচারার।

যে ভাবনাটা প্রথম মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, সে হচ্ছে অফিসের ভাবনা। আজকের মত অফিস যাওয়াটি তো খতম! অথচ কপালের ফেরে আজই মাসের পয়লা তারিখ। শক্তিপদদের অফিসে আবার এমন বদখত নিয়ম যে, দৈবাৎ পয়লা তারিখে কামাই হয়ে গেলে, সাত তারিখের আগে আর সে মাইনে উদ্ধার হয় না! ভাবতেই মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে একটা হিমপ্রবাহ বহে যায় শক্তিপদর। তা ছাড়া—প্রতিভাকে সামলানো!

প্রতিভার প্রকৃতি, আর তার সঙ্গে তার মাতৃশোক যোগ করে দেখতে গিয়ে হৃৎপিণ্ডটাও বরফ হয়ে ওঠে বেচারার।

প্রতিভার মাতৃশোক!

তায় আবার আকস্মিক শোক!

সেই অভূতপূর্ব ঝটিকা কল্পনা করতে করতে, সহসা কিংকর্তব্যবিমূঢ় লোকটা কর্তব্য নির্ধারণ করে ফেলে।

নাঃ এখন নয়। এখন চেপে যাওয়া যাক!

আচমকা গিয়ে এ ভাবে বলা অসম্ভব।

তার চাইতে এখন নিঃশব্দে চুপি চুপি সরে পড়াই শ্রেয়। এসে যা হয় হবে। বললেই হবে—অখন তাড়াতাড়ির সময়—ওরে বাবা! শক্তিপদ কি পাগল হয়ে

গেছে! প্রতিভার মাতৃবিয়োগের সংবাদ পেয়ে তাড়াতাড়ি অফিস গিয়েছিল শক্তিপদ, এই কথা জানাতে হবে প্রতিভাকে?

ও হয় না!

তাহলে?

তবে কি পকেটে করে নিয়ে যাবে? যেন যাবার মুখে হাতে পেয়ে না পড়েই ভুলে পকেটে ভরে নিয়ে চলে গিয়েছিল, বাড়ি ফিরে জামা খুলতে গিয়ে—নাঃ! সেও শক্ত কথা!

বর্ধমানের চিঠি দেখেও ভুলে সেটাকে পকেটে নিয়ে সারাদিন নিশ্চিন্ত হয়ে অফিসে কাজ করাই কি মার্জনাযোগ্য অপরাধ?

আজ কদিন চিঠি আসে নি বলে ব্যস্ত হচ্ছে না প্রতিভা?

ভাবতে ভাবতে বিদ্যুৎ-চমকের মত—বুদ্ধির একটা দীপ্তি খেলে গেল শক্তিপদর মগজে! তাই তো! এটা তো এতোক্ষণ মাথায় আসে নি! সত্যিই তো, পিয়ন যে শক্তিপদর হাতে চিঠিটা দিয়ে গেছে, তার কি কোন প্রমাণ আছে?

এই তো প্রায়ই সে বাইরে থেকে জানলা গলিয়ে ভেতরে ফেলে দিয়ে যায়। আজও দিত, শক্তিপদকে দেখতে পেল বলেই না? হায় হায়! আর এক মিনিট আগে অফিস বেরিয়ে যায় নি কেন শক্তিপদ? তাহলে তো এত দুশ্চিন্তার কিছুই পোহাতে হত না তাকে?

যাক! শক্তিপদই বাইরের জানলা দিয়ে ফেলে দিয়ে যাবে।

চিন্তার অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে আর একবার ভেবে নেয় শক্তিপদ। না, সেটা ঠিক হবে না। পাড়ায় কত চেনাশুনো লোক, কে হয়তো দেখে ফেলবে। কি ভাববে? তার চাইতে ভেতর থেকেই জানলার নিচে রেখে দিয়ে যাওয়া ভাল!

যাকে বলে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে, সেইভাবে বসার ঘরের কাছাকাছি এসে কান খাড়া করে দাঁড়াল শক্তিপদ। এই ঘরেই চিঠি ফেলে দিয়ে যায় পিয়ন।

প্রতিভা কোথায়?

অবশ্যই রান্নাঘরে। খুন্তি নাড়ার শব্দ আসছে। আসছে মাছ-ভাজার মধুর সৌরভ। চট করে এদিকে আসবে না তাহলে।

ধীরে ধীরে জানলার কোলের কাছে রাখল বইটা আর চিঠিটা। বইটার উপর দিকেই চিঠি থাক! হ্যাঁ এই ঠিক! নইলে 'ছায়াছবি' দেখা মাত্রই তো বিশ্ব-সংসার ভুলে যাবে প্রতিভা, নিচে আর কিছু পড়ে আছে কিনা দেখবে কি তাকিয়ে?

চিঠি উপরে থাক। লেখা অংশটা বুকে নিয়ে। নিজেই দুঃসংবাদটা পেয়ে যাক প্রতিভা। ভগ্নদূতের দুরূহ কর্তব্যের বোঝা হতে মুক্তি পাক শক্তিপদ! কান্নাকাটির বড় ঝড়টা, শক্তিপদর চোখের আড়ালে ঘটুক। শক্তিপদ যখন ফিরবে, অবশ্যই প্রতিভা কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠবে ততক্ষণে।

এত কথা ভাবতে কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডের বেশি লাগে নি। চিন্তা যে বাতাসের চাইতে দ্রুতগামী।

'ছায়াছবি'র প্যাকেটটার উপরে চিঠিখানা বিছিয়ে রেখে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল শক্তিপদ, তেমনি নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়লো বাড়ি থেকে। আর বেরিয়ে গিয়েই বুকটান করে অনেকখানি মুক্ত বাতাস ভরে নিল বুকের খাঁচাটার মধ্যে।

আঃ! কী হালকা লাগছে নিজেকে!

খুব বুদ্ধিটা এসে গেল মাথায়।

অফিসে গিয়ে কিন্তু এ হালকা ভাবটা আর থাকে না! বরং একটা অপরাধ-বোধের ভার মনটাকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। বারে বারেই মনে হতে থাকে, প্রতিভা যদি বড্ড কেঁদে কেটে হাত-পা ছেড়ে দেয়, খোকাটার কী দুর্গতি হবে!

হয়তো সারাদিনে দুধই জুটবে না বেচারার ভাগ্যে!

অনেকবার ভাবল সকাল করে বাড়ি ফিরে যাই, কিন্তু তারই বা জাস্টি-ফিকেশন কি? কেন ফিরল সকাল করে? অতএব চোখ কান বুজে কাটাতে হবে দিনটা।

যা করে ফেলেছে তার আর চারা নেই।

ভাজা মাছ উঁচু তাকে তুলে রেখে, রান্নাঘরের বাকী একটু-আধটু কাজ সেরে এদিকে এল প্রতিভা। মনটা চঞ্চল রয়েছে, শক্তিপদ বেরিয়ে গেছে কতক্ষণ হল, রাস্তার দোর বন্ধ করা হয় নি! তবু তো খোকাটা কাঁদছে না তাই রক্ষে! দোরটার খিল লাগিয়ে এ ঘরে এসে ঢুকতেই চোখ পড়ল জানলার নিচে চিঠি আর বইয়ের মোড়কে।...ওঃ এসে গেছে ছায়াছবি? এ সপ্তাহে বিশিষ্ট তিনজন অভিনেত্রীর সঙ্গে পত্রিকা-প্রতিনিধির সাক্ষাৎকারের বিবরণী প্রকাশ হবার কথা আছে।

এল কখন?

শক্তিপদ যখন বেরোবার জন্যে পোশাক পরছে, তখনও তো আসে নি!

এই যে বর্ধমানের চিঠিও এসে গেছে! কিন্তু কাকার হাতের লেখা কেন? বিজয়া দশমীর চিঠি ছাড়া, কাকা তো কখনও—মা ভাল আছেন তো?

বাতাসের চাইতে চিন্তা দ্রুতগামী, সকলের ক্ষেত্রেই।

হাত বাড়াতে বাড়াতেই এত কথা ভাবা হয়ে যায়। আর হাতে নিয়ে চোখ বুলিয়েই স্তব্ধ হয়ে মাটিতে ধুলোর উপরেই বসে পড়ে প্রতিভা!

এ কী! এ কী কথা!

এ কোন্ বার্তা বহন করে এসেছে তিন পয়সার এই কার্ডখানা? মা নেই? প্রতিভার মা নেই? আর সেই না থাকার খবরটা এসে পৌঁছলো নিতান্ত সাধারণ দু ছত্র চিঠির মাধ্যমে?

প্রতিভার মাতৃবিয়োগের সংবাদটা কি তুচ্ছ একটা কুশল-অকুশল-সংবাদের মত মূল্যহীন? আর এমনি অদ্ভুত একটা পরিবেশের মধ্যে সে সংবাদ জানতে হল প্রতিভাকে? একলা বসে বসে জানতে হল তার মা নেই! দশ মিনিট আগে এলো না চিঠিটা? তাহলে শক্তিপদ থাকত। থাকত প্রতিভার শোকের প্রচণ্ডতা বোঝবার দর্শক। শক্তিপদ থাকলে—এখুনি শোকাহত উদ্‌ভ্রান্ত প্রতিভাকে নিয়ে ছুটত হাওড়া স্টেশনে।

না, ট্রেনের সময় না থাকলে ট্রেনের জন্যও অপেক্ষা করতে রাজী হত না প্রতিভা, পাগলের মত ছুটে যেতে চাইতো ট্যাক্সিতে করে।···আর শক্তিপদ নিশ্চই তাতে প্রতিবাদ করত না।

প্রতিভার এত বড় দুঃখের সময় কৃপণতা করবে, এমন হৃদয়হীন লোক শক্তিপদ নয়! ট্যাক্সি থেকে নেমেই মায়ের বিছানাটার কাছে আছড়ে পড়ত প্রতিভা, ছুটে এসে সান্ত্বনা দিতে বসতেন কাকা খুড়ী পিসীমা! আসত পাড়ার লোক। মা হারিয়ে কত কষ্ট হয়েছে প্রতিভার, জানতে পারত সবাই!

কিন্তু এ কী হল? শোকের সমারোহের দিকটা একেবারে নিভে গেল যে! এমন কী চীৎকার করে একবার কেঁদে উঠবে, তারও যেন প্রেরণা আসছে না! একা বাড়িতে হঠাৎ ওভাবে কেঁদে উঠতে পারা যায়?

বড়রা যা পারে না, ছোটরা তা অক্লেশেই পারে। তাই সহসা উদ্দাম চীৎকার পাড়া মাথায় করে তোলে দশ মাসের খোকন! আপন মনে বসে খেলছিল ঘরের মধ্যে, হঠাৎ কি হল?

দ্বিতীয় ব্যক্তিহীন বাড়িতে, ছেলের এহেন চীৎকারে, ছুটে না গিয়ে উপায় কি? এইমাত্র মা মরার খবর পেলেও যেতে হয়।

আর কিছু নয়, বড় একটি কাঠপিঁপড়ে!

মোক্ষম করে কামড়ে ধরেছে ছোট্ট কচি একটি আঙুলের ডগায়। তা দশ মাসের ছেলের পক্ষে, এ কাঠপিঁপড়ে কাঁকড়া বিছের সামিল। ছেলে ভোলাতে মাতৃশোক ভুলে যেতে হয়। আর ছেলে একটু ভুললে, বাড়ি মাৎ-করা একটি পোড়া গন্ধে সচকিত হয়ে মনে পড়ে প্রতিভার, ওবেলার রান্নার পরিশ্রম বাঁচাতে এ বেলা নিভন্ত উনুনে একটু ছোলার ডাল চড়িয়ে এসেছিল। যাক সদ্‌গতি হয়ে গেল সে ডালের। নিভন্ত আগুনও সময় বুঝে প্রতিশোধ নেয়।

ডাল যাক্, কিন্তু ডাল চড়ানো ডেকচিটা পুড়ে গেলে তো চলবে না। এই সেদিন কিনেছে প্রতিভা চার-চারখানা পুরনো কাপড় দিয়ে।

ছেলে কোলে করেই ডেক্‌চি নামিয়ে রান্নাঘরে শিকল তুলে দিয়ে আবার এসে চিঠিখানার কাছেই বসল প্রতিভা। আবার একবার তুলে নিল হাতে। যেন আবার পড়লে অন্য কিছু আবিষ্কার করা যাবে। যেন সহসা দেখা যাবে, এতক্ষণ কি একটা ভুলই দেখেছিল প্রতিভা।

কিন্তু না, ভুলের অবকাশ কোথাও নেই।

প্রতিভার মা সত্যিই নেই। বর্ধমানের সেই বাড়িটায় ছুটে গিয়ে সর্বত্র অনুসন্ধান করে বেড়ালেও তাঁকে আর দেখতে পাবে না প্রতিভা। বাবা কোন শৈশবে মারা গেছেন, তাঁকে তো মনেই পড়ে না, মা ছিলেন তার সব।

তাহলে—এই হয়ে গেল!

প্রতিভার জীবনের সর্বপ্রথম শোক, আর সবচেয়ে প্রধান শোক, এমনি নিরুত্তাপ মূর্তি নিয়ে দেখা দিয়ে গেল!

এরপর আবার এখুনি উঠতে হবে প্রতিভাকে, যখন ঝি আসবে, আর যখন ছাগল-দুধওলা আসবে। কথা কইতে হবে তাদের সঙ্গে। অন্ততঃ ঝিটাকে বলতেই হবে কি ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেছে প্রতিভার জীবনে। নিজ মুখেই বলতে হবে। না বললে তো সহজ মানুষের মত ব্যবহার করতে হয়, তাহলে—পরে আবার ঝিটা বলবে কি? আর অতবড় ভয়ানক কথা শুনে নিশ্চয়ই ঝিটা আসবে প্রতিভার শোকে সহানুভূতি জানাতে। হয়তো বা সুযোগ পেয়ে অন্তরঙ্গতায় গলে গিয়ে মনিবানীর গায়ে মাথায় হাত বুলোতেই আসবে। অসহ্য। অসহ্য। তা ছাড়া—শক্তিপদ দেখবে, মা মরার খবর পাবার পরও প্রতিভা উঠেছে, হেঁটেছে—ছেলেকে দুধ খাইয়েছে।

ছেলেটা কান্নার পর মায়ের কোল পেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, প্রতিভা গুম্ হয়ে

বসে থাকে ঘুমন্ত ছেলে কোলে নিয়ে।

বেলা গড়িয়ে যায়...তিনটে বাজে, ছাগল-দুধওয়ালার ঘন্টির আওয়াজ পাওয়া যায়।

স্থির সংকল্প করে উঠে পড়ে প্রতিভা।

হ্যাঁ, পিয়ন কখন এসে চিঠিটা দিয়ে গেছে,—প্রতিভা জানে না! সে তো পিঁপড়ে-কামড়ানো ছেলের কান্না নিয়েই ব্যস্ত। সারাদিন কেঁদেছে ছেলে। কাজেই ঘরদোর জানলা দরজার দিকে তাকিয়ে দেখবার ফুরসুতই পায় নি প্রতিভা। যার সাক্ষী—ছায়াছবির প্যাকেট খোলা হয় নি। জানলার নিচে ঠিক পিয়নের ফেলে দেওয়ার ভঙ্গিতে বইটা আর চিঠিটা রেখে দিয়ে উঠে পড়ে প্রতিভা, ছোট গ্লাসটা নিয়ে ছাগল দুধওলাকে দোর খুলে দিতে যায়। দুধ নিয়ে যথাস্থানে রেখে আবার একবার জিনিস দুটোর দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়াল, বইয়ের কাছে চিঠিটা নয়, তার চাইতে বইয়ের তলায় চাপা পড়ার ভঙ্গিতে থাক! আনাগোনার পথে একবারও নজরে পড়ে নি এটা কি সম্ভব? আর চিঠি দেখলেই তো ব্যস্ত হয়ে দেখা উচিত, কদিন ধরে যখন বর্ধমানের চিঠি আসে নি বলে ভাবছে প্রতিভা?

'ছায়াছবি?' থাক্ না!

সেটা পড়ে আছে তো—আছেই। ছেলে যার সারাদিন কেঁদে পাগল করছে, তার কি আবার সিনেমার বই নিয়ে বসবার সময় হয়?

প্রতিভার বাড়া ভাতটা রান্নাঘরে পড়েছিল বুঝি। ঝি এসে চেঁচাচ্ছে। তা কি করবে প্রতিভা? সারাদিন মাথার যন্ত্রণায় যে মাথা তুলতে পারে নি সে! খাবে কি করে? ও ভাত ঝি তার ছেলেদের জন্যে নিয়ে যাক্!

যথারীতি উনুনে আগুন পড়ে। বিকেলের খাবার তৈরি সুরু হয়! শক্তিপদ ভালবাসে আস্ত আস্ত পটল ভাজা আর কুচো কুচো আলু ভাজা দিয়ে গরম লুচি। সেইটাই হোক। প্রতিভার তো আর কিছু হয় নি। প্রতিভা তো ঠিকই আছে।

বাড়ির দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল শক্তিপদ!

কান্নার আওয়াজ আসছে কি?

কান খাড়া করে থাকতে থাকতে অকারণেই মনে হয় আসছে বুঝি। তারপর ভুল ভাঙে।...কি হল তবে? উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে একা চলে যায় নি তো বর্ধমানে?... না, তাহলে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ থাকবে কি করে? কিন্তু এত নিস্তব্ধ

কেন? তবে কি মূর্ছা?

কে জানে হয়তো—মূর্ছা হয়েই পড়ে আছে প্রতিভা, হয়তো খোকাটা পড়ে গিয়ে মাথা ফাটিয়েছে। ছি ছি, সকালে কী অবিমৃষ্যকারিতাই করেছে শক্তিপদ!

আস্তে আস্তে কড়াটা একটু নাড়ল, তারপর একটু জোরে, তারপরে আরও জোরে।...এবারে দোর খুলে গেল। খোলার কর্ত্রী স্বয়ং প্রতিভা।

সহজ সাধারণ কণ্ঠে প্রশ্ন করছে—আজ এত দেরি হল যে?

দেরি!

হ্যাঁ দেরি একটু হয়েছিল শক্তিপদর, বাড়ি ঢোকবার সাহস সঞ্চয় করতে।

কি যে উত্তর দেয় শক্তিপদ, নিজেই বুঝতে পারে না, কিন্তু ততক্ষণে প্রতিভা অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছে।

—আজ যা কাণ্ড হয়েছে জান? তুমিও বেরোলে আমিও রান্নাঘর থেকে আসছি,—দোরটা বন্ধ করব বলে, ঠিক সেই সময় খোকনটা হঠাৎ পরিত্রাহি চীৎকার। ছুটে আসি—কি হল? কি হল? ওমা, দেখি না—মোক্ষম একটি কাঠপিঁপড়ে একেবারে কামড়ে ধরেছে, পায়ের আঙুলে। টেনে ছাড়াতে পারি না। একটু রক্তই বেরিয়ে গেল! সেই থেকে কি যে কান্না ধরল ছেলে! সারাদিনে বিরাম নেই। অস্থির হয়ে গেলাম একেবারে। দেখ না সংসারের দিকে তাকিয়ে, ঘরে দোরে ঝাড়ু পড়ে নি, নিজের চুল বাঁধা হয় নি, নাস্তানাবুদ কাণ্ড! —এই এতক্ষণে একটু খেলছেন বাবু!

দিশেহারা শক্তিপদর দৃষ্টি অবশ্য খোকার দিকে নেই। দালানের জানলার নিচে আঠার মত আটকে আছে সে দৃষ্টি! শক্তিপদর কৌশল তাহলে ব্যর্থ?

এখনও পড়ে আছে ওটা? ঠিক একই অবস্থায়?

কিন্তু ও তো শুধু বই, চিঠি কই?

চিঠি কই, সে অনুসন্ধান এখন করা চলে না। আচমকা দেখে ফেলে কুড়িয়ে নেবার ছলেও না। এখন খোকার পিঁপড়ে-কামড়-রূপ মহা-অনর্থপাতের প্রসঙ্গ আলোচিত হচ্ছে। কাজে কাজেই খোকনকে কোলে নিতে হল, নিতে হল তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে। কারণ গরম লুচি ঠাণ্ডা হয়ে যাবার ভয় দেখিয়েছে প্রতিভা। বলেছে বেশি করে না খেলে রক্ষে রাখবে না!

তারপর অন্যমনস্কচিত্তে এসে কুড়িয়ে নিয়ে দেখা, পিয়নটা কোন্ ফাঁকে কি

ফেলে গেছে। অবশ্য প্রতিভা যখন চোখের আড়ালে।

কিন্তু চিঠি কই?

চিঠির জন্যে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বইটা তুলতেই চিঠিটার খোঁজ মিলল।

আশ্চর্য! নিজে হাতে করে উপরে রেখে গেছে—শক্তিপদ। কারোর তো হাত পড়ে নি, তবে এটা বইয়ের তলায় আশ্রয় পেল কি করে? আর কার্ডের কোণে এটা কি?—স্পষ্ট এই দাগটা?

গবেষণা করবার জন্য আর সময় ক্ষেপণ করা চলে না।

চিঠিটা হাতে নিয়ে বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে পড়ে স্খলিত স্বরে উচ্চারণ করতে হয় শক্তিপদকে—ওগো শুনছো! এ কী ব্যাপার? কী মাথামুণ্ডু লিখেছেন তোমার কাকা?

শুনে প্রতিভা এসে দাঁড়ায়, সরল মুখ, মন্থর গতি। সাধারণ কৌতূহল প্রশ্ন—চিঠি এসেছে বর্ধমানের? কাকা লিখেছেন? হঠাৎ কাকার এত অনুগ্রহ। কই কি লিখেছেন? ওকি অমন চুপ করে রয়েছ কেন? বল না কি লিখেছেন? ওগো?

যেন প্রতিভা ভুলে গেছে, সে নিরক্ষর নয়।

মাটিতে বসে পড়ে, মাথায় হাত দিয়ে শক্তিপদ হাপ্‌সে বলে—যা লিখেছেন, তা যে বিশ্বাস করতে পারছি না! অ্যাঁ! একি সম্ভব!

প্রতিভা বিচলিতভাবে মাটিতে বসে পড়ে কাতর আর্তনাদ করে ওঠে—স্পষ্ট করে বল না গো কি হয়েছে? আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না! আমার মার কিছু হল নাকি গো?

শক্তিপদ বিষাদাচ্ছন্ন গলায় বলে—হ্যাঁ প্রতিভা, মা—আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন!

সমস্ত পাঁজরগুলো কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে শক্তিপদর।

আর বুক-ফাটানো চীৎকারে আকাশ ফাটিয়ে কেঁদে ওঠে প্রতিভা—ওগো, কী কথা শোনালে গো! এ তুমি কী শোনালে আমাকে? বিনা মেঘে এ কী বজ্রাঘাত?

চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই—মূর্ছায় এলিয়ে পড়ে প্রতিভা! কিন্তু না পড়বে কেন? সমস্তটা দিন তো মূর্ছাহত হয়েই ছিল সে। এদিকে কুঁজোর ঠাণ্ডা জল ওর চোখে-মুখে ঝাপটা দিতে দিতে ক্রমাগতই ভাবতে থাকে শক্তিপদ—আচ্ছা, চিঠিটার স্থান পরিবর্তন হল কি ভাবে? আর চিঠির কোণে অত স্পষ্ট হয়ে ফুটে রয়েছে কেন একটা হলুদমাখা বুড়ো আঙুলের ছাপ!

কসাই

কান্না! কান্না!

একটানা একঘেয়ে কুৎসিত একটা কান্না! এ কান্না শুনলে মমতা আসে না, করুণা আসে না, আসে বিদ্বেষ বিরক্তি। তবু ভোলাতে হয়, আদর করবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে হয়। রুগ্ন ছেলেটাকে সামলাতে হিমসিম খেয়ে যায় সমরেশ, অথচ কমলার দেখা নেই।

রান্না ঘরে কী এত কাজ হচ্ছে ভেবে পায় না সমরেশ। সংসারে আরও দুই বৌ রয়েছে, রয়েছেন বিধবা দিদি, বড়বৌয়ের মেয়েটাও শাড়ী ধরেছে ইদানীং, তবু কমলাকেই বা রুগ্ন ছেলে ফেলে রান্নাঘরে পড়ে থাকতে হয় কেন, এ প্রশ্ন করবার জন্যে বারবার এগিয়ে গিয়েছে সমরেশ, ফের ফিরে এসেছে।

জানে সমরেশ গিয়ে রান্নাঘরের দোরে হানা দিয়ে এ প্রশ্ন উচ্চারণ করলে, পরে কমলাই সমরেশকে আস্ত রাখবে না। হয়তো বা রাগ করে আরও দেরি করবে, ছেলেটার দুর্গতি তাতে বাড়বে বৈ কমবে না।

রোগাছেলের দুর্দশা করে, সংসারের বয়স্থ পোষ্যদের ষোলো আনা সেবার নৈবেদ্য সাজানোর চেষ্টায় সমস্ত সময়টা ব্যয় করার মধ্যে কি মনস্তত্ত্ব আছে? সমরেশ ভাবতে থাকে অথচ কমলার কথায় বার্তায় অভিযোগে অনুযোগে এমন একটা ক্ষোভ প্রকাশ পায়, যাতে বোঝা স্বাভাবিক, বাধ্য হয়েই এমন হৃদয়হীনতা করতে হচ্ছে বেচারাকে।

সত্যিই কি তবে সমরেশের আত্মীয়-পরিজন এত নিষ্ঠুর? মানুষ—মেয়ে-মানুষ এত নিষ্ঠুর হয়?

ওদিকে কিন্তু কমলাও মনে মনে অস্থির হয়ে উঠছে। ছেলের কান্নার ধরনে বুঝছে সমরেশ আর পারছে না। কিন্তু করবে কি, আজ যে তার রান্নার পালা। কমলা যদি পালা ফাঁকি দিতে চায়, চলবে কেন?

কচি ছেলে আর কার নেই? কার হচ্চে না? রোগ অসুখই বা কার ছেলের নেই? তবে হ্যাঁ কমলার মত ছেলেকে এমন বেয়াড়া আবদেরে করে মানুষ করে না কেউ, এই যা। এ ধরনের কথা বেশি বলেন বড়-জা। এক থালা রুটি বেলে কমলার উনুনের দিকে ঠেলে দিয়ে তিনি বলে ওঠেন, "কান্না! কান্না! বাপস্! বাড়িসুদ্ধ লোকের কানে তালা ধরে গেল। ছেলে বটে একখানা সেজ বৌয়ের। দেখতে তো চামচিকেটি, গলা যেন ভাঙা কাঁসর!"

কমলা সেই বেলা রুটির গাদা, আর মাখা ময়দার পর্বতের দিকে তাকিয়ে হতাশ নিশ্বাস ফেলে বলে, "আজ যে এত কান্না কেন কাঁদছে! কি জানি

ভেতরে ভেতরে কিছু যন্ত্রণা হচ্ছে কি না।"

বড়-জা মুখ বাঁকিয়ে বলেন, "তুমি আর বোকনা সেজ বৌ, কবে আবার তোমার ছেলে না কাঁদে! মা ঘরে গিয়ে কোলে করে বসে নেই, সেই যন্ত্রণা। জ্বর নেই জ্বালা নেই পরিত্রাহি কেঁদেই চলেছে, ঢের ঢের ছেলে দেখেছি বাবা, এমন ছেলে সাতজন্মে দেখি নি।"

বিধবা ননদ সেই মাত্র ঠাকুর ঘর থেকে নেমে আসেন, এবং তীব্র ভাষায় বড় ভাজকেই সমর্থন করেন, "ভর সন্ধ্যেবেলা ছেলের চীৎকারে পুজোপাঠ মাথায় উঠলো গা? কী ছেলেই জন্মেছে! অমন ছেলেকে নুন খাইয়ে মারতে হয়! মানুষের ছেলে চেঁচাচ্ছে, কি জানোয়ারে চেঁচাচ্ছে বোঝবার উপায় নেই।

ননদ কটুভাষিণী হলেও মিথ্যাভাষিণী নয়। সত্যিই ছেলেটা চীৎকার করে যেন জানোয়ারের কণ্ঠে। কে জানে কোথায় আত্মগোপন করে আছে এই চীৎকারের কারণ। কোথায় অবস্থান করছে এই কান্নার উৎস? ডাক্তারে হার মেনেছে, তবে 'হার মেনেছে' এটা স্বীকার করে না—বলেই বলে "এ্যালার্জি।"··· সম্পূর্ণ অচেনা নতুন আমদানী এই নামকে কেউ রোগ বলে স্বীকার করে না। তাই হাসি টিটকারিই চলে। ভাবটা যেন আবদেরে ছেলেকে 'রুগ্ন' বলে চালাতে চায় কমলাই, ছেলের দোষ ঢাকতে।

ননদের তীব্র ঘোষণায় চোখে জল এসে যায় কমলার। কি একটা বলতেও যায় হয়তো, কিন্তু ঠিক এই সময় সমরেশ এসে জীর্ণ শীর্ণ ছেলেটাকে প্রায় ঠক্ করে রান্নঘেরের দোরে বসিয়ে দিয়ে চীৎকার করে বলে ওঠে, "পিণ্ডির যোগাড় আর শেষ হচ্ছেনা? ও কাজ আর কাউকে দিয়ে হতে পারে না? না হয় বাজার থেকে পাঁউরুটি এনেই গেলা হোক না?"

বোঝা যায় ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করে গেছে সমরেশের।···কথাটা বলে চলে যায় সে।

মুহূর্তের জন্য উপস্থিত সকলেই চুপ করে যায়। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যই। পরক্ষণেই খন্ খন্ করে ওঠেন বড়-জা, "যাও গো, যাও সেজ বৌ, ছেলে কোলে করে ঘরে বোস গে। দেখলে তো বাড়িসুদ্ধ লোকের 'পিণ্ডদান' হয়ে গেল! পষ্ট করে বললেই হয় বৌ রাঁধতে পারবে না। ছেলেকে চিমটি কেটে কাঁদিয়ে, এমন ঠেস দিয়ে 'কথা' শুনিয়ে দিয়ে যাবার দরকারটা কি ছিল?"

কমলা ব্যস্ত হয়ে হাত ধুয়ে বোধ করি ছেলেকে তুলতেই যাচ্ছিল, এই কথায় সহসা ওর মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। উঠে গিয়ে রোগা ছেলেটার পিঠে এক চড়

বসিয়ে দিয়ে আবার এসে নীরবে রুটি সেঁকতে থাকে।

কিন্তু ছেলে তো আর তাতে ভয়ে 'কাঠ' হয়ে যাবে না? সে এ ব্যাপারের প্রতিশোধ নিতে ছাড়ে না। ফলে ছেলের জেঠা কাকা সকলেই ছুটে দেখতে আসেন ব্যাপারটা কি! আসেন মানে আসতে বাধ্য হন। কান্না চব্বিশ ঘণ্টাই শুনছেন তাঁরা, শুনে শুনে কানে তালা ধরে গেছে সত্যি, কিন্তু এ যে একেবারে অসহ্যেরও অতিরিক্ত।

'সেজ বৌ কোথাও চলে গেছে কিনা' এই প্রশ্নে পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে সবাই। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কমলার জেদ থাকে না, রান্না ছেড়ে উঠে এসে ছেলে ধরতে হয় তাকে।…"আপদ তো মরেও না" বলে ছেলের পিঠে আরও একটা চড় বসিয়ে তুলে নিয়ে চলে আসে।

ভেবেছিল ঘরে এসে সমরেশকে দেখে নেবে এক হাত। কিন্তু এসে দেখল সমরেশ ঘরে নেই, বেরিয়ে গেছে।

পুরুষের সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে তবু বহির্বিশ্বের এতটুকু আস্বাদ পাবার উপায় আছে, ঘর-সংসারের এই অবোধ মেয়েরা তাতেও বঞ্চিত। কিন্তু তাদেরও তো সহ্যের একটা সীমা আছে? মরীয়া হয়ে ক্রন্দনরত ছেলেটাকে টানতে টানতে উঠে যায় কমলা তিনতলার ছাদে।

থাকবে সে, এখানেই বসে থাকবে। যদি এতেই বাড়ির লোকের কানের শান্তি হয়। ছেলে চুপ করাবার সাধ্য আর তার নেই।

চৈত্রের এলোমেলো বাতাস বইছে, রাত নটার কম নয়…এখানে উঠে এসে সহসা যেন একটা নতুন জগৎ আবিষ্কার করে। বাড়ির মধ্যে এটুকু মুক্তিও তো আছে। এটুকু হতেও বঞ্চিত থাকে সে? ছেলের কান্না থামাবার কিছু মাত্র চেষ্টা না করে নিজেই উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে থাকে!

আর আশ্চর্য, হঠাৎ এক সময় অনুভব করে কই আর কাঁদছে না তো!…মুখ ফিরিয়ে দেখে—বসা ছেলেটা কখন শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সহসা একটা কথা মনে হয় কমলার!

গরমের জন্যে কাঁদে না তো ছেলেটা? হয়তো তাই! সমরেশ খালি ঠাণ্ডা লাগার বাতিকে ছেলেকে আষ্টেপৃষ্ঠে মুড়ে রাখতে চায়, বেচারা ওই জন্যেই কাঁদে। কাল থেকে যাহোক করে সন্ধ্যেবেলা একবার ছাদে এসে ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে যাবে। কাছে সরে গিয়ে আঁচলটা তার গায়ে ঢাকা দিয়ে চুপ করে বসে থাকে। নাঃ নিজে থেকে কিছুতেই নামবে না সে, সমরেশ এসে সাধ্যসাধনা করুক তবে।

বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে দিব্যি চলে যাওয়া হল বাবুর।

বাতাস উদ্দাম হয়ে ওঠে রাত্রি গভীর হবার সুযোগে। মৃদু জ্যোৎস্নায় ছেলের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন ভয় ভয় করে কমলার···আরও নিবিড় হয়ে কাছে সরে এসে আবার শুয়ে পড়ে।

খানিক পরেই সমরেশ এসে দাঁড়ায়! সাধ্যসাধনার দিকে যায় না। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, "এর মানে কি? এই হাওয়ায় শুধু মাটিতে শুইয়ে রেখে দিয়েছ? খুন করতে চাও না কি ছেলেটাকে?"

কমলা অবশ্য নিরুত্তর।

এত সহজে কথা কওয়া চলে না।

"নিয়ে চল—ডাক্তারবাবু এসেছেন!"

ডাক্তারবাবু!

আর অভিমানের বায়নাক্কা রক্ষা করা চলে না।—ধড়মড় করে উঠে বসে কমলা। বিহ্বলভাবে বলে, "ডাক্তারবাবুকে ডাকতে গিয়েছিলে?"

"না তো কি হাওয়া খেতে গিয়েছিলাম? এ কী! কী হয়েছে? এ যে একেবারে জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে!" নিচু হয়ে নিজেই ছেলেটাকে তুলতে গিয়ে চমকে উঠেছে সমরেশ!

কমলা ভীত কম্পিত হয়ে হাতটা বাড়ায়, সমরেশ 'ছেড়ে দাও' বলে ওর হাতটা ছুঁড়ে সরিয়ে দিয়ে, ছেলে নিয়ে নিজেই চলে যায়। এবং নিয়ে যেতে যেতেই নতুন লক্ষণটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।···ভীতিকর···গা ছমছমে লক্ষণ!···কঠিন কঠোর একটা স্পর্শ! ডাক্তারের কাছাকাছি গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে হতাশ ভাবে বলে, "ডাক্তার সেন, এর ঘাড়টা যে একেবারে শক্ত হয়ে গেছে!"

নিঃশব্দ···নীরব স্তব্ধতা!

কুৎসিত কান্না-হীন শান্ত মৌন বাড়ি! আর কারও কানে তালা লাগবার মত যন্ত্রণা নেই।···হ্যাঁ শুধু সেই কান্নাটাই চুপ হয় নি, সকলেই একটু চুপ হয়ে গেছে।···শুধু মাঝে মাঝে অস্ফুট একটা শব্দ—

কিন্তু স্তব্ধতা আর ক'দিনের জন্যে? একার সংসার তো নয়? অনেকের স্বার্থে গঠিত সংসার একজনের জন্য ক-দিন সহানুভূতি প্রকাশ করবে? তাছাড়া সকলেরই মাত্রাজ্ঞান আছে, কতটুকুর জন্যে কতটুকু খরচ করা দরকার সে সবাই জানে।

ব্যাপারটা ক্রমশঃ থিতিয়ে যায়···সব কিছুই যথানিয়মে চলে, শুধু কমলার রান্নার 'পালা'র দিনগুলো ভেঙেচুরে গর-হিসেব হয়ে গেছে। ওকে আর কেউ

ডাকে না। অগাধ অবসরের সমুদ্রে ডুবে নিঃঝুম হয়ে দিবারাত্র পড়ে থাকে কমলা নিজের ঘরে।

অফিস থেকে এসে ক্লান্ত দেহ থেকে ঘামে ভেজা শার্টটা খুলতে খুলতে শ্রান্ত বিরক্ত স্বরে বলে সমরেশ, "এ ভাবে শরীর নষ্ট করার কোন মানে আছে? একটা অসুখ বাধিয়ে বসলে কারুরই কোন লাভ নেই?"

বিরক্তির স্বরটা বুকে বাজে। হঠাৎ উঠে বসে কমলা তীক্ষ্ণ আর তীব্র বিদ্রূপের স্বরে বলে, "ওঃ তুমিও এখুনি লাভ-লোকসানের হিসেব কষতে বসছো? তার মানে এখুনি আমাকে উঠে জোয়াল কাঁধে নিতে বলছো কেমন?"

"সে সব কিছুই বলি নি আমি, শুধু বলছি এ ভাবে ইয়ে করে একটা রোগ বাধিয়ে বসবে শেষটা!"

"যাক যাক শাক দিয়ে আর মাছ ঢেকো না! আমার জন্যে তো তোমাদের দরদ উথলে উঠছে···স্বার্থপর! তোমরা সবাই স্বার্থপর"—কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতা আর রাখতে পারে না কমলা, হঠাৎ ডুকরে কেঁদে ওঠে, "এ সংসারের কারুর প্রাণে দয়া নেই! এই তো আমি পড়ে আছি, দিব্যি চলে যাচ্ছে সংসার, শুধু তখনই ছেলেটাকে মেরে ফেলতে—"আরও ডুকরে ওঠে কমলা, "শেষদিন অবধি তাকে ফেলে রেখে হেঁসেল সামলেছি আমি! কেউ বলে নি, ''আহা ওর ছেলে মরছে। কসাই! তোমরা সব্বাই কসাই!"

কিন্তু এত বড় ভয়ঙ্কর অভিযোগেও তো কই বিচলিত হয় না সমরেশ। আপন পরিজনদের হৃদয়হীনতার জন্য ত্রুটি স্বীকার করে না, করে না তাদের কটু সমালোচনা। বরং একটু হাসে। ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপের ধারালো হাসি।···যে হাসি কেবলমাত্র মেয়েদেরই একচেটে, সে হাসি পুরুষের মুখে দেখলে কেমন যেন ভয় করে।

সেই ধারালো হাসি হেসে সমরেশ বলে, "কসাই আমরা, না তুমি?''

"আমি!''

"হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি! তোমরা মেয়েমানুষ জাতটাই তাই!···তোমরা পুত্রশোকের যন্ত্রণা সইতে পারো, তবু সইতে পারো না—দুটো বাক্যযন্ত্রণা! এতটুকু "কথা'' সয় না তোমাদের! গায়ে ফোস্কা পড়ে! মুমূর্ষু ছেলেটার মরণ-যন্ত্রণার কান্নাকে অবহেলা করে, সংসারের কাজ না করলে কেউ ফাঁসি দিত তোমায়? না হয় দুটো কথা শোনাত! তার বেশি তো নয়? সেটুকু সহ্য করতে পারতে না তুমি? না, সে তোমরা পারো না, তাহলে যে ত্রুটিশূন্য কর্তব্য করতে পারার

অহঙ্কার খর্ব হবে। সে অহঙ্কার কারও জন্যের খর্ব করতে পারো না তোমরা, স্বামীর জন্যে নয়, সন্তানের জন্যে নয়। আর নিজের এই বিকৃতির বোঝা হালকা করতে চাও অন্যের নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে। আত্মসর্বস্ব স্বার্থপর তোমরা, কাউকে ভালবাসতে পারো না, ভালবাস একমাত্র নিজেকে !"

তোয়ালেখানা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সমরেশ। আর নির্নিমেষ নেত্রে নির্বোধের মত সেই দিকে তাকিয়ে থাকে কমলা।

তার অনেক যত্নে গড়া আত্মসমর্থনের প্রাসাদটা যেন সমরেশের একটি ফুঁয়ে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে।···সে প্রাসাদটা তাহলে ইটের নয়, তাসের ? আর সেই তাসগুলোকেই যে মজবুৎ ইঁট ভেবে গেঁথে গেঁথে সাজিয়ে তুলেছে এতদিন ? কী হাস্যকর ! কী লজ্জা !

রুগ্ন ছেলের উপর মমতাহীনের মত ব্যবহার করেছে সে অপরের হৃদয়হীনতা আর নিষ্ঠুরতায় নিরুপায় হয়ে নয়, করেছে আপন স্বার্থপরতায় ?···ও যখন অভিযোগে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চেয়েছে, তখন সমরেশ মনে মনে তাকে করেছে ঘৃণা ?

নারী-প্রকৃতি

'চুরি' নামক কাজটা অবশ্য রক্ত-মাংসের মানুষেই করে থাকে, কিন্তু দৈব দুর্বিপাকে চোর যদি কখনো ধরা পড়ে যায়, অপর সাধু ব্যক্তিরা চোরের মত মারবার সময় তার দেহটাকে আর রক্ত-মাংসের বলে মনে করে না।

অমনি একটা দুর্বিপাকের নমুনা আজকে দেখা গেল।

লোকটারও অবশ্য দুঃসাহসের শেষ নেই। বলতে গেলে—প্রায় সন্ধ্যা-রাত্রে একটা ফ্ল্যাট বাড়িতে ঢুকেছে চুরি করতে।—নয়ই বা কেন, কলকাতা শহরে দশটা সাড়ে দশটা রাতকে 'সন্ধ্যেরাত'ই বলে।

সন্দেহ নেই—কাঁচা চোর, নইলে চুরি করবার আগেই অমন হাতে হাতে ধরা পড়ে যায় ?—ধরা যখন পড়ল, তখন 'চোরের মার' না খেয়ে পালাবে কোথায় ? 'মার শালাকে' 'ধর শালাকে' ধ্বনিতে জায়গাটা গম্ গম্ করতে থাকে। চাঁদা করে মার লাগালেন তাকে তিন তিনটে ফ্ল্যাটের বীর পুরুষরা !—

…মার খেতে খেতে হতভাগা যখন আধমরা হয়ে গেছে, তখন প্রহার কর্তাদের হুঁস হল, তাই তো—মাত্রাটা বোধ হয় বড় বেশী হয়ে গেছে। আর —চোর ছোকরা প্রতিবাদ করে নি, অপরাধ অস্বীকার করে নি।

দোতলার তারানাথ বাবু বললেন—যাক যাক অনেক হয়ে গেছে মশাই, এবার ছেড়ে দিন।

—ছেড়ে দেবো? বলেন কি? অমনি ছেড়ে দেবো? পুলিশের হ্যাণ্ডওভার করিয়ে দেবো না? বললেন একতলার শচীনবাবু, চোর যার রান্নাঘরের পিছনে ধরা পড়েছে।

তারানাথ গলা নামিয়ে বলেন—আহা হা আবার ওসব ফ্যাসাদের মধ্যে যাওয়া কেন? উল্টোচাপ খেতে চান? আইনকে তো অলরেডি নিজেদের হাতে নেওয়া হয়েই গেছে, আবার কেঁচেগণ্ডূষ করে আইনের শরণ নিতে যাওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? প্রহারটি তো সোজা দেওয়া হয় নি!

পরামর্শটা যে সৎপরামর্শ সেটা হৃদয়ঙ্গম হয় শচীনবাবুর, কারণ পুলিশের নাম উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গেই তিনতলার দীনেশবাবু আর তাঁর ভাগ্নে উত্তেজনা-সৃষ্টিকারী ব্যক্তিটিকে ছেড়ে দিয়ে নিঃশব্দে খসে পড়েন।

শচীনবাবুর এলাকাতেই চোর ধরা পড়েছে, কাজেই আক্রোশ এবং দায়িত্ব তাঁরই বেশী। তিনি মুরুব্বী তারানাথের কাছে অতএব 'কিং কর্তব্য' এই প্রশ্ন করেন।

তারানাথ উদার ভঙ্গিতে বলেন—ওই তো বললাম, দিয়ে দিন ছেড়ে। যথেষ্ট শিক্ষা তো দিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর এ পাড়ায় মাথা গলাতে আসবে বলে মনে হয় না।…যাঃ ব্যাটা যাঃ! বেরো! অনেক পুণ্যে এ যাত্রা তরে গেলি! মনে রাখিস—এ কেমন শক্ত ঘাঁটি! চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে রাজপুত্তুর, সাজগোজের বাবুয়ানাটিও কম নয়, চুরি করতে এসেছিস কোন্ লজ্জায়?

শচীনবাবু দ্বিগুণ উৎসাহে বহু আলোচিত এই কথাটিই ফের উচ্চারণ করেন —বাস্তবিক, দেখলে কে বলবে ভদ্রলোকের ছেলে নয়?

—ভদ্রলোকের ছেলে নয়; তাই বা কে বলছে—আপনাকে? আজকাল ভদ্রলোকের ঘরেই চোর জোচ্চোর বেশী! বোঝাই যাচ্ছে বাড়ি থেকে নেশা ভাঙের পয়সা জোটে নি। তাই এই দুষ্প্রবৃত্তি।

রাত দশটা।

সংসারের দৈনন্দিন কর্মপ্রবাহ স্তিমিত হয়ে এসেছে। তিন বাড়ির মহিলা

মণ্ডলীর কেউ পরবর্তী দিনের জন্যে তরকারি কুটে রাখছিলেন, কেউ ঘুমন্ত শিশুপুত্রটিকে ঘুম থেকে তুলে দুধ খাওয়াবার যোগাড়জোড় করছিলেন, কেউ কেউ বা কাজ সেরে গল্পের বই অথবা পশমের তাল নিয়ে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করছিলেন।

কর্তাদের এখন আহারের সময় হয় নি, তাঁদের দিকে থেকে তাগাদা এলেই উঠে পড়তে হবে।

তারানাথ আর শচীনবাবুর দোতলায় তারানাথের ঘরে দাবার ছক পেতে বসেছিলেন।···এমন সময় চোর ধরা পড়ে গেল।

লেগে গেলো হৈ চৈ। যে যেখানে যে অবস্থাতে ছিল, "পড়ি তো মরি" "মরি তো পড়ি" করে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হল।

তাদের বিরাগ আর বিস্ময়, করুণা আর কাঠিন্যের মিশ্রিত কাকলী উত্তাল হয়ে উঠল;···উন্মাদ হয়ে উঠল বীরপুরুষদের বীর হুঙ্কার। আর হতভাগ্য চোরের গায়ের ওপর ঝরতে থাকলো প্রহারের শিলাবৃষ্টি। প্রহারের প্রশস্ত ক্ষেত্র হিসেবে মানুষের সৃষ্টিকর্তা যে মানুষকে এক-একখানি পিঠ দিয়েছেন, সে কথা আর কেউ ভাবে না। যেখানে খুশি, আর যত খুশি প্রহার চলতে থাকে,—যতক্ষণ না লোকটা প্রায় অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায়!

পড়ে যাবার পর তবে পাঁচজনের চৈতন্য হয়। এবার 'ক্ষ্যামা' দেওয়া দরকার।

অতঃপর যথাকর্তব্যের দায় যে শচীনবাবুর, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে দুই সংসারের দুই কর্তা গুটিগুটি নিজ নিজ আস্তানার দিকে অগ্রসর হন। গৃহিণীরাও অনুগামিনী হন।—

কর্তব্যের বোঝা মাথায় নিয়ে 'থ' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন শচীনবাবু। এবং তার বিধবা বোন সুনীলার এতক্ষণে মনে পড়ে এই বিরাট কোলাহলের মধ্যে তার নিজের ভাজ প্রতিভার কোন অংশ ছিল না।

প্রতিভা নিজের ঘর থেকে বেরোয় নি!

সুনীলা স্তম্ভিত হয়ে ভাবলে ঘুমিয়ে পড়েছে সন্দেহ নেই, কারণ সন্ধ্যের কাজ মিটবামাত্রই বিছানায় গা এলিয়ে বই বুকে করে দিব্যি একচোট ঘুম লাগানো যে প্রতিভার নিত্যকর্মের অন্তর্গত! কিন্তু তাই বলে—এই কাণ্ডর মধ্যেও? ঘুমই তো? মরা নয় তো! তবে?···রোসো ওর ঘুম আমি ভাঙাচ্ছি।

গিয়ে দেখলে চিরাচরিত নীতিতে ঘুমিয়ে যে পড়েছে তাও নয়, জেগেই

আছে প্রতিভা!···জেগে জেগে একখানা উপন্যাস ধ্বংস করছে।

সুনীলা তীব্রকণ্ঠে বলে ওঠে,—নতুন বৌ!

প্রতিভা ধীরে সুস্থে বই মুড়ে রেখে বলে—কি বলছেন মেজদি?

সুনীলা বলে—ধন্যি বলি তোমাকে নতুন বৌ, জেগে জেগে ঘরে বসে আছ?

—বসে তো নয় মেজদি, শুয়েছিলাম!···ভারি নিরীহভাবে উত্তর দেয় প্রতিভা।

—শুয়েছিলে সে তো দেখতেই পাচ্ছি। অবাক করলে বটে! এই কাণ্ড-কারখানা ঘটে গেল বাড়িতে, সাত পাড়ার লোক ছুটে এল আর তুমি দিব্যি শুয়ে রইলে? সেই যে বলে না—"দোজ পক্ষের বৌকে বিধাতা পুরুষ ভেন্ন মাটিতে গড়েন", সে কথা দেখছি নেহাৎ মিথ্যে নয়।

শচীনের প্রথম পক্ষের স্ত্রী অরুণা ছিল সুনীলার সঙ্গে একবয়সী, সম্পর্কটাও ছিল—'হরিহরে'র মত। সেই স্ত্রী মারা যাওয়ার পর শচীন যখন সুনীলার সঙ্গে বয়সের অনেক তফাৎ-ওলা এই প্রতিভাকে বিয়ে করে আনল, অকারণে বৌটার ওপরই কেমন যেন একটা জাতক্রোধ দাঁড়িয়ে গেল সুনীলার। কারণে অকারণে তাকে দুকথা শুনিয়ে দেবার সাধু ইচ্ছেটাকে সুনীলা কোন সময়েই দমন করতে পারে না। নইলে—এখনকার ব্যাপারটায় কিছু আর তিরস্কারের কথা ওঠে না!

তা ধৈর্যগুণ প্রতিভারও আছে বৈ কি।

অকারণে এমন তীক্ষ্ণ মন্তব্যেও বিচলিত হয় না, একটা হাই তুলে বলে, সবাই মিলে ভিড় করে আর বেশী কি লাভ হত মেজদি? কর্তাদের তো কর্তব্যপালনে ত্রুটি হয় নি?···আহাম্মকটা মরেছে বোধ হয়?

সুনীলাকে জ্বলিয়ে দেবার পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট। ও তিক্ত স্বরে উত্তর দেয়—ঠেস দিয়ে কথা বলবার কোন দরকার নেই নতুন বৌ! চোরকে হাতে পেলে লোকে 'চোরের মারই' মেরে থাকে। কে আবার জামাই গায়ে হাত বুলোতে যায়!···কিন্তু তোমার প্রাণে যদি এতই মায়া, উঁকি দিয়ে কোন্ একবার দেখতে গেলে? দোতলার গিন্নী তেতলার গিন্নী আমরা তো মার দেখে কেঁদেই মরছিলাম।

—মরছিলেন বুঝি? চোরের ওপর এত দরদ?···অনুচ্চ একট হাসি শোনা গেল।

—তোমার মত পাষাণপ্রাণ সকলের নয় নতুন বৌ!···যদিও ভাজের কাছে

মান খোয়াতে রাজী নয় সুনীলা, কিন্তু এমন একটা সমারোহের কাহিনী বর্ণনা না করেই বা থাকে কি করে? বিশেষ সে দৃশ্য থেকে যে বঞ্চিত আছে তার কাছে? ...তাই যেন বাতাসকে উদ্দেশ করেই বলে—ছোঁড়াটারও সহ্যশক্তিকে বলিহারি দিই বাবা! সেই যে ঘাড় গুঁজে রইল 'টুঁ' শব্দ করল না গো! 'বাপ রে' নয় 'মা রে' নয়, 'ছেড়ে দাও' নয়, একেবারে পাথর। এত যে শাসানো হল কেন এসেছিলি তাই বল? কিছুতে উত্তর দিল না!

—উত্তর দেবার আবার কিছু আছে না কি মেজদি? বলবে—'চুরি করতে এসেছিলাম'!

—আহা বানিয়ে বানিয়েও তো কিছু বলতে পারত? আমার তো—ইচ্ছে করেছিল, মরুক গে বাবা মিছে করেও না হয় হলুক—'বুঝতে পারি নি মশাই, বাড়ি ভুল করে ঢুকে পড়েছি'—

—চোর হলেই যে মিথ্যেবাদী হতে পারবে তার কি মানে আছে মেজদি? হয়তো সত্যবাদী চোর!

—কথা শুনলে হাড় জ্বলে যায়।...চোর আবার সত্যবাদী!

এক মুখে নানারকম উল্টো পাল্টা কথা কয় সুনীলা রাগের সময়!

প্রতিভা খাট থেকে নেমে পড়ে বলে—যাক গে, পর্বগুলো মিটেছে? না কি এখনো কিছু বাকি আছে? আজ আর খাওয়া-দাওয়া হবে না, না কি?... খিদেয় মারা যাচ্ছি বাবা।

অবাক করলে নতুন বৌ, ছি ছি! মানুষের চামড়া কি তোমার গায়ে নেই এর মধ্যে আবার তোমার খিদেও পেল?

—ও মা! কেন মেজদি, খিদে পাবে না কেন?

—ঢঙের আর শেষ নেই—বলে মেজদি গট গট করে চলে যান—বোধ করি রঙ্গস্থল পুনর্দর্শনের আশায়।—

কিন্তু ভাজের সঙ্গে কথা না কইলেই বা চলে কি করে? তাছাড়া—কথা না কয়ে যে থাকতেই পারে না সে। এক চক্কর বাইরে থেকে ঘুরে এসে আবার ডাক দেয়—নতুন বৌ, আবার বই মুখে করে শুলে? ওঠ দিকিন, তোমাদের ওই 'হীটার', 'মিটার' কি আছে, জ্বেলে বড় কেটলিটা করে খানিক জল চাপিয়ে দাও। উনুনের আঁচ চলে গেছে।

প্রতিভা তটব্যস্তে উঠে বলে—এখুনি দিচ্ছি মেজদি। যাঁরা চোর ঠেঙিয়ে কাহিল হয়ে পড়েছেন তাঁরা চা খাবেন বুঝি? ক পেয়ালা আন্দাজ জল দেব?

—চা?···এই রাত বারোটায় চা খাবে লোকে?···উঃ কি রত্নই ঘরে এনেছে দাদা। ওগো চা হবে না, শুধু গরম জল চাই। দাদা তো এখন এক নতুন ফ্যাসাদে পড়ল। পুলিশে-টুলিশে না দিয়ে দূর করে তো তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন লোকটাকে, কিন্তু যাবে কি, উঠে দাঁড়াবে এমন সাধ্যি নেই। শুয়ে পড়ে আছে চোখ বুজে। মারবার সময় সবাই হাতের সুখ করে নিল, এখন চোর-দায়ে ধরা পড়তে পড়লেন আমার দাদাটি! ডাক্তার ডেকে দেখাতে গেলেও তো এখন সাতশ কৈফিয়ৎ দেখাতে হবে? উল্টে নাকি এঁদেরই শাস্তি হবে তাতে। দাদা তাই বলছে—খানিকটা গরম জল করে রক্ত-টক্তগুলো একটু ধুইয়ে আইডিন দিয়ে, গরম দুধ খানিক খাইয়ে দিয়ে একটা রিকশায় তুলে পথে ছেড়ে দেবে। এখন দাও দিকি গরম জলটা—

—ও আমার দ্বারা হবে না বাবা, ইচ্ছে হয় আপনি করে দিন। চোরের জন্যে এত মায়া নেই আমার!—

বলে আবার বইটা খুলে ধরে প্রতিভা।

খুরে খুরে দণ্ডবৎ! বৌ বটে!—বলি চোর হোক, ছ্যাঁচড় হোক রক্তমাংসের মানুষ তো বটে—

এবারে উঠে পড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে দালান থেকে কেটলিটা আনতে আনতে দালানের এক পাশে শুয়ে পড়ে-থাকা লোকটার দিকে এক নজর তাকিয়েই হঠাৎ হেসে উঠে বলে—রক্তমাংসের মানুষ? ও মা সে কি? কি যে বলেন মেজদি? আপনি আমি হলে পারতাম অমন মুখ বুজে আধ-মরা হতে? হয়তো—চেঁচিয়ে-মেচিয়ে যা খুশি বলে বসতাম! চোরের শরীরের ধাতুই আলাদা।

প্রহারে বিধ্বস্ত ব্যক্তিকে ফার্স্ট-এড্ দিয়ে শচীনবাবু রীতিমত তৃপ্ত স্বরে হাঁক দেন—কই গো, বেশ কষে গরম করে আদা দিয়ে এক গেলাস চা করে দাও দিকিন? নতুন বৌ—এ কি এই রাত একটার সময় সুপুরি কাটতে বসেছ?—ওই কাজটা এখন মস্ত দরকারী হল?

প্রতিভা মুখ তুলে বলে—হল না? কালকের মত সুপুরি কাটা নেই যে! পান থেকে চুনটি খসলে চলে না, সুপুরি খসলে চলবে?···চোরের সেবার জন্যে যে ঘুম হচ্ছে না দেখছি।

—তা কি করব? খাল কেটে কুমীর আনা হয়েছে, এখন কামড় খেতে হবে বৈ কি! গোড়াতেই—সোজা থানায় নিয়ে গেলেই হত—

—ভাগ্যিস!

—ভাগ্যিস মানে?

—মানে—বলছিলাম—তাহলে তো আর এতগুলি ভদ্রলোকের হাতের সুখ হত না? যাকগে, চা করে দিলেই কি খাবে ও?

—খাবে বোধ হয়! আর কতক্ষণ যুঝবে! রাখ তোমার সুপুরি। যাও চট করে। নীলি যে আবার এতক্ষণে মালা জপ করতে বসল।

—এখন?

—হুঁ, বলছিল—জপ বাকি রয়েছে নাকি।...দাও দাও চট করে।...রাত তো কাবার হয়ে এল। তুমি চা কর, আমি একবার দেখি তিনতলায় ওদের কাছে একটু আর্নিকা পাওয়া যায় কি না। ওকে ওই ছোট ঘরটায় তুলে দিয়েছি...রাতটা থাকুক, কি আর করা যাবে। এত রাতে ছাড়তে যাওয়াও তো বিপদ।

শচীনবাবু ওপরে উঠে যেতেই এতক্ষণে প্রতিভা পাশের ছোট ঘরটায় উঁকি মারে। বলতে গেলে এটা কাঠ ঘুঁটের ঘর, পায়া-ভাঙা ইট-ঠেকানো একটা চৌকি আছে, তাতেই শোওয়ানো হয়েছে লোকটাকে।

ঘরে এসেই বিনা ভূমিকায় প্রশ্ন করে প্রতিভা—এমন আহাম্মুকের মত ধরা পড়তে গেলে কোন লজ্জায়? যা হোক কিছু বানাতে পারলে না?

চোর শুধু বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

প্রতিভা চাপা উত্তেজিত স্বরে বলে—বোকার মত চিঠিখানা সঙ্গে আন নি তো?...

—সঙ্গেই আছে। মায়ায় পড়ে ছিঁড়ে ফেলতে পারি নি।

এই প্রথম গলার স্বর শোনা যায় লোকটার।

—চমৎকার! সঙ্গেই আছে না আর কারুর হাতে গিয়ে পড়েছে? সকলে মিলে তো পকেট সার্চ করছিল?

—ওটা নেয় নি বলেই মনে হয়।

—মনে হয়? দেখ—দেখ শীগগির! ফেরৎ দিয়ে দাও বলছি। এখনও ভয় আছে।

লোকটা মৃদু হেসে বলে—ভয়? আমি তো জানতাম—'ঘৃণা লজ্জা ভয় তিন

থাকতে নয়'! আচ্ছা এই নাও—! কিন্তু শুধু চিঠিটাই ফেরৎ চাও না চিঠির মর্মটাও ফেরৎ চাও প্রতিভা?…

—না না! সে ঠিক আছে, বদলাবে না।

—ভাল!

—আর তোমার মত? দেখলে তো আমাকে? টের পেলে তো কত বড় নিষ্ঠুর মেয়েমানুষ আমি?…সহ্য করতে পারবে?…ভেবে দেখ—এখনও সময় আছে।

—ভাবার প্রশ্ন আর ওঠে না।

—যাক আজকে তো ফেলিওর! আবার কবে কি করতে পারবে?

—আজই বা বাধা কি? এত খেটে-খুটে শচীনবাবু কি আর একটুখানি ঘুমিয়ে পড়বেন না?

—বারে তাই বলে—এই যে—তিন তলায় ওষুধ আনতে গিয়ে জমে গিছলে দেখছি! চায়ের অর্ডার দিয়ে তো চলে গেলে, এখন এনাকে সাধ্য-সাধনা করছি—খাবেন কি না। না খেলে অকারণ খেটে মরি কেন! তা মুখে আর বাক্যি-ঐক্যি নেই।…তোমার যেমন বাতিক। রাতের অন্ধকারে ধরে টেনে ফুটপাথে বসিয়ে দিয়ে আসবে তা নয়। খাইয়ে-দাইয়ে চাঙ্গা করে গাড়ি করে বাড়ি পাঠাবার শখ। দেখ আবার যাবার সময় কিছু না হাতিয়ে নিয়ে যায়। চোরকে বিশ্বাস কি?

শচীনবাবু গলা খাটো করে বলেন—কি যে বলেন—কি যে বল। ওর নড়বার ক্ষমতা আছে?

—কি যে বল! চোর আবার কি না পারে।

কথাটা মিথ্যা বলে নি প্রতিভা।

চোর কি না পারেই বটে।…শেষ রাত্রে উঠে পালাবার শক্তি সংগ্রহ করল কি করে লোকটা এই আশ্চয্যি।…

অন্ধকারে খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে প্রতিভা নিচু গলায় প্রশ্ন করল—কবে আসছ তাহলে?—দেরি কোর না। আর পারছি না।

—আজই তো হতে পারে প্রতিভা। এখুনি। ক্ষতি কি?

—না না!…পাঁচজনে যে শেষকালে বলবে—"ছি ছি চোরটার সঙ্গে—" সে আমি সইতে পারব না।

—লোকের কথা তো তুমি শুনতে আসবে না প্রতিভা?

—তা হোক, মানসম্ভ্রম বলে একটা জিনিস নেই?

মন্টি

মেয়েটার মা নেই বলেই হোক অথবা তার অদ্ভুত প্রকৃতির জন্যেই হোক ছেলেবেলা থেকে বরাবরই তাকে একটু প্রশ্রয় দিয়ে এসেছি।

পাশের বাড়ির মেয়ে, বছর চার পাঁচ বয়সে মা-হারা। বাপ যথানিয়মে প্রথমার বিরহ-জ্বালা নিবারণ করেছিলেন দ্বিতীয়াকে এনে তদবধি 'মন্টি' প্রায় সরকারী সম্পত্তি।

শুনতে পাই নাকি মন্টির বিমাতা মন্টিকে স্নেহপাশে বদ্ধ করতে চেষ্টার ত্রুটি রাখেন নি, কিন্তু মন্টি সে চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে হয়ে উঠেছে উদ্ধত, অবাধ্য, পাড়া-বেড়ানী। বাপও ওকে এঁটে উঠতে পারে না।

লেখাপড়ার ধার ধারে না, সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি পরের বাড়িতেই কাটায়, কচি মুখে পাকা পাকা কথা কয়, ঘরের কথা পরের কাছে ফাঁস করে।

তবুও কেন জানি না, ওর প্রতি আমার বিশেষ একটু স্নেহ আছে চলতি কথায় যাকে প্রশ্রয়ই বলা চলে।

ওকে আমি লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করি, ভূতের থেকে সুরু করে ভগবানের পর্যন্ত বহুবিধ গল্প বলি, খেলার জিনিস সরবরাহ করি।

ওর খেলার জিনিস মানে অবশ্য পুতুল খেলনা নয়। লাট্টু, মারবেল ঘুড়ি, ক্যারম বোর্ড, সচরাচর এই সবেই ওর দরকার। কারণ মন্টির কোন সঙ্গিনী নেই, সবকটাই সঙ্গী।

তবে মন্টি অকৃতজ্ঞ নয়, লোকের কাছে আমার পরিচয় দেবার কালে বলে— "আমার বন্ধু"।

মাঝে মাঝে ওর ঔদ্ধত্যে আর দুর্দান্তপনায় বিরক্ত যে না হই তা নয়, তিরস্কারও করতে ছাড়ি না। মন্টি তার প্রতিশোধ নিতে আমার লেখার কপি ছিঁড়ে দেয়, বইয়ের পাতায় কালি ঢালে, বিছানাপত্র লণ্ডভণ্ড করে চেয়ার উল্টে দিয়ে দুম্‌দুম্ করে চলে যায়। মনে হয় না আর কোন দিন আসবে।

কিন্তু পরদিনই দেখি ভোর বেলাই এসে হাজির হয়েছে। হয়তো ভিজে ন্যাকড়ার টুকরো নিয়ে ঘষে ঘষে বইয়ের পাতার কালি তুলছে, নয় তো—গঁদের শিশি পেড়ে পাতলা কাগজ মেরে মেরে ছেঁড়া কপি জুড়ছে।

হাসব না রাগব বুঝে উঠতে পারি না, তবু রাগ দেখাতে বলি—মন্টি, তুমি আমার কোন জিনিসে হাত দিও না।

বলা বাহুল্য 'তুমি' সম্বোধনটাই রাগ প্রকাশক।

'তুমি' শুনলেই মন্টি একটু ম্রিয়মাণ হয়ে যায়।

—আচ্ছা এইটা ঠিক করে দিয়ে চলে যাব—বলে হেঁটমুণ্ডে কাজ করে চলে।

আমি বলি—চলে যেতে তো বলি নি, জিনিসে হাত দিতে বারণ করেছি।

মণ্টি জিনিসটা নামিয়ে রেখে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে—তার মানেই তাই। 'যার নাম ভাজা চাল তার নামই মুড়ি'। তোমার জিনিসে হাত দিতে পাবে না, আর তোমার ঘরে আসবে, লোকে কি ভিখিরী নাকি?

অগত্যা আমাকেই আবার একটু মিষ্টবচন প্রয়োগ করতে হয়, নইলে কেমন যেন অস্বস্তি হতে থাকে। খানিকক্ষণ পরেই মণ্টি যে কে সেই!

আমাদের বড় বৌদি বলেন—মেয়েটা কী হ্যাংলা বাবা, মেজঠাকুরপো ধমকও তো বড় কম দেন না, তবু চোদ্দ বার ঘুরে ঘুরে আসে।—আর আমার খুকী? কেউ কোন দিন দেখেছে, কখনও কাকা বলে আদর কাড়িয়েছে?

বৌদির 'খুকীর' অনেক দিন বিয়ে হয়ে গিয়েছে। যখন এ সংসারে ছিল, তখন তার মায়ের শাসনের দাপটে খুকী—কাকা কেন—স্বয়ং তার পিতৃদেবের কাছেও কোনদিন আদর কাড়াবার কথা ভাবতে পারে নি। বৌদির মতে মেয়েমানুষকে 'মানুষ' করবার কৌশল একমাত্র মেয়েমানুষেই বোঝে, পুরুষের এক্তারে ছেড়েছ কি মাথায় চড়ে বসে আছে।

আগে বৌদির এ থিয়োরির প্রতিবাদ করতাম, কিন্তু ইদানীং ফি-হাত মণ্টির উদাহরণ দিয়ে দিয়ে বৌদি আমাকে মূক করে ছেড়েছেন।

এখন অবিশ্যি মণ্টি বড় হয়েছে, কথঞ্চিৎ ভব্যিযুক্তও হয়েছে, তবে পুরনো অভ্যাসগুলো বিশেষ কিছু ছেড়েছে এমন নয়। রাগলে এখনও জ্ঞান থাকে না তার।

লেখাপড়ার ধার ধারে নি কোন দিন, কিন্তু বরাবর গল্পের বইয়ের যম। আর অলিখিত আইনে আমিই ওর বই সরবরাহের যন্ত্র।

কদিন বইয়ের যোগানটা ঠিক মত হয় নি, মণ্টি এসে ধপ্ করে একখানা পড়ে-ফেলা বই টেবিলে ফেলে দিয়ে বলে—লাইব্রেরী গিয়েছিলে কাল?

সত্যি বলতে কি, সময় পাই নি—বিনীত ভাবে বলি—আজ ঠিক যাবো।

—আজ যাবে কি না সে কথা তো জিজ্ঞেসা করা হয় নি, কাল গিয়েছিলে কি না তাই জানতে চাইছি।

—উঃ যেন জজ সাহেব এলেন, যাই নি যাঃ!

—বেশ! বেশ! ফের যে বই আনবে সে আমার মরা মুখ দেখবে।

রেগে বলি—দেখ্ মন্টি, দিন দিন বড্ড বাজে হয়ে যাচ্ছিস। এসব দিব্যি-দিলেশা দিতে শিখছিস কোথায়?

মন্টি চেয়ারে বসে পা দোলাতে দোলাতে অম্লান বদনে বলে—একটা ভাল বন্ধুর কাছে শিখেছি।

—ভাল বন্ধু! বাঃ বাঃ, 'ভাল' কথাটার নতুন মানে শিখলাম বটে। সে ভাল বন্ধুটি কে? তোর ওই বটু নাকু শিশির ফেলু এদের মধ্যে কোনটি?

—ওদের মধ্যে! দূর, ওরা আমার বন্ধু না কি?

—ওরা তোর বন্ধু নয়? বলিস কি রে! আমি তো জানতাম ওরাই তোর প্রাণের বন্ধু।

—প্রাণের না হাতী! ওরা তো খেলার সঙ্গী, ওকে বন্ধু বলে না। প্রাণের বন্ধু আলাদা।

চমৎকৃত হয়ে বলি—সেটা তাহলে কি রকম জীব? মানুষের থেকে বাড়তি দুটো পা আছে বুঝি তার?

মন্টি স্বচ্ছন্দে ভেঙিয়ে বলে—আহা আদিখ্যেতা! নভেল লেখেন আর 'প্রাণের বন্ধু' মানে জানেন না। যার সঙ্গে হৃদয়ের ভালবাসা হয় তাকে কি বলে?

শুনে একটু গম্ভীর হয়ে যাই, বলি—হঠাৎ হৃদয়ের ভালবাসাটা হল কার সঙ্গে?

আমার গাম্ভীর্যে মন্টির অভিমান—এই নিয়ম, তাই সেও অভিমান ভরে গম্ভীর হয়ে বলে—

—বলবো না।

—শুনতে আমি চাইও না, তবে তোমার বাবাকে এ খবরটা জানিয়ে দিতে হবে। দেওয়া উচিত।

বাবার নামে যেন জ্বলে ওঠে মন্টি।

অবশ্য এটা নতুন নয়, বরাবরই জ্বলে, তবে ক্রোধ প্রকাশের ভাষাটা ক্রমশঃ পরিবর্তিত হয়ে চলেছে এই আর কি।

কিন্তু আজকের ভাষাটা আমারও ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়। 'বাবা! বাবা আমার কাঁচকলা করবে'—এইটাই শুনতে আশা করেছিলাম, কিন্তু ও স্বচ্ছন্দে বলে কিনা—বাবা! বাবা আমাকে শাসন করবে! কোন্ মুখে করবে শুনি? পাকাচুল বুড়ো, এখন বৌ নিয়ে সিনেমা যাবার শখটি ষোল আনা, উনি আবার লোককে শাসন করতে আসবেন!

রাগে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে গেল। নাঃ বৌদি ঠিকই বলেন। ক্রুদ্ধস্বরে বলি—

—দেখো মন্টি, তোমার তো আজকাল অনেক ভাল ভাল বন্ধু জুটেছে তাদের সঙ্গেই মেশো গে, এখানে আর আসতে হবে না।

মন্টি যেন অবাক হয়ে যায়, দুই চোখ গোল করে বলে—তাড়িয়ে দিচ্ছ?

—তাড়িয়ে দেওয়ার কথা হচ্ছে না, আমি এ সব পছন্দ করি না। কতদিন বলেছি মা বাপের সম্বন্ধে ভদ্রভাবে সমীহ করে কথা বলতে হয়। বলিনি?

—বলেছ।

—তবে?

—কত তো ভাবি তোমার কথা শুনব. ওদের ঢং দেখলে যে ভক্তি উড়ে যায়, কি করব!

হঠাৎ ভারি হাসি পেয়ে যায়, তবু কষ্টে হাসি চেপে বলি—আর ওই সব ভালবাসাটাসা, ওসবও আমার দুচক্ষের বিষ বুঝলে? খুব খারাপ ওসব।

নিশ্চয় বুঝছি, কোন হতভাগা বয়াটে ছোকরার পাল্লায় পড়েছে। যতই ধুলো মেখে রুক্ষ চুলে ঘুরে বেড়াক, তবু তো মেয়ে! চোদ্দ পনের বছর বয়েসও হল! কে জানে কোন্ ছেলেটা হঠাৎ 'মন্টি'কে 'মরামুখ' দেখবার দিব্যি শেখাচ্ছে। পাড়ায় নতুন নতুন ভাড়াটে আমদানি হয়েছে বটে কিছু কিছু।

মন্টি আমার কথা শুনে কোন কথা না বলে গালে হাত দিয়ে চেয়ার ছেড়ে মাটিতে বসল।

—কি হল? হঠাৎ মাটিতে বসলি যে?

—তুমি এই সব পছন্দ কর না? তোমার এসব দুচক্ষের বিষ! তবে এসব লেখা হয় কেন ঝুড়ি ঝুড়ি? তোমার সব গপ্পতেই তো খালি ভালবাসা—আর ভালবাসা।

অনেক কষ্টে হাস্য দমন করে বলি—ও সব বইতে লিখতে হয়। সত্যিকার মানুষ কি বইয়ের গল্প?

মন্টি একটুক্ষণ চুপ করে বসে মাটিতে আঁচড় কাটে, অতঃপর মুখ তুলে বলে—আচ্ছা বেশ! ওকে তাহলে তাই বলব।

অবোধ জীবটাকে নিয়তির হাতে ভাসিয়ে দেওয়া যায় না, শত রাগ হলেও না। তাই শান্ত ভাবে বলি—কিন্তু 'ও' টা কে?

—ওই তো হলদে বাড়ির নতুন ভাড়াটেদের ছেলে।

যা ভেবেছি তাই। চিনে রাখতে হবে ছেলেটাকে।

বললাম—কত বড় ছেলে ?

—আমার চাইতে বড়।

—তোর চাইতে তো আমিও বড়—ধমকে উঠি আমি—বয়েস কত ? লেখাপড়া করে ? না শুধু পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে ভাব করে ?

মন্টি করুণভাবে বলে—বয়েস জানি না। লেখাপড়া তো করত, দুবার ফেল করেছে বলে ওর বাবা রাগ করে বলেছে পড়া ছাড়িয়ে নেব। আর কারুর সঙ্গে ভাব করে নি, শুধু আমার সঙ্গে।

যত শুনি তত চমৎকৃত হয়ে যাই।

ভেবেচিন্তে বলি—যে ছেলে দুবার ফেল করে সে তো বাঁদর, তার সঙ্গে মিশিস কেন ? মিশবি না খবরদার !

মন্টি নিজ স্বভাবে ফিরে আসে, উঠে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত দিয়ে বলে—ঈস। তাই বৈ কি ! ফেল করলে মানুষে আর মানুষ থাকে না, বাঁদর হয়ে যায় ! ওকথা আমি বিশ্বাস করি না। সবাইয়ের যদি ঘ্যান ঘ্যান করে পড়তে ভাল না লাগে !

—যাদের ভাল লাগে না, ভদ্রলোকে তাদের বাঁদরই বলে।

মন্টি অবশ্য বিনা প্রতিবাদে ওর প্রাণের বন্ধু সম্বন্ধে এ অপবাদ সহ্য করে যাবে এমন আশা করি নি।

ও সতেজে বলে—বলুক গে, বলতে তো আর পয়সা লাগে না। ফেল করেছে বলে কি আর বুদ্ধি নেই ওর ? তুমি তো শুধু গপ্‌প লেখ, ও গপ্‌পও লিখতে পারে, পদ্যও লিখতে পারে।

হো হো করে হেসে উঠি, হেসে বলি—তাহলে তো দেখছি আমার অন্ন মারা গেল। তা এতদিন এসব শুনি নি তো। কবে থেকে ভাব হয়েছে ?

—আগের রোব্‌বার থেকে !...ভাব হওয়ার কথা কাউকে বলতে বারণ করে দিয়েছিল যে তিলু।

—তবে বললি কেন ?

—তোমাকে না বলে স্বস্তি হচ্ছিল না যে। তিলুটার একটা কিন্তু ভারি দোষ আছে, তোমাকে দেখেনি তবু তোমার ওপর রাগ।

পরম কৌতুক অনুভব করি। এ তো মন্দ নয়, একটা মজার গল্পের প্লট পাওয়া পাওয়া গেল। গম্ভীর হওয়ার ভানে বলি—কেন, আমার অপরাধ ?

—ওই তো মজা, শুধু শুধুই। বলে—"ও বাড়িতে চব্বিশ ঘণ্টা যাস কেন ? যে বুড়োটা বই লেখে সে তোর কে হয় ?" এই সব।...আমিও আচ্ছা করে

শুনিয়ে দিয়েছিলাম, বললাম—ও আমার চিরকালের বন্ধু হয় তা জানিস। শুনে রাগ করে এক ঘণ্টা কথাই কইল না, তার পর পায়ে পড়ে রাগ ভাঙাই।

আমি স্তম্ভিত বিস্ময়ে বলি—পায়ে পড়ে? ছি ছি ছি! তোমার একটু মান অপমান জ্ঞান নেই?

—মান অপমান?

মন্টি একটু সমঝে নেয়, তারপর অগ্রাহ্যভরে বলে—তাতে কি? আগের দিন তিলুও তো আমার পায়ে পড়েছিল।

পাড়ায় এ হেন একটি রত্নের আবির্ভাব-সংবাদ জেনে বিমোহিত হয়ে যাই। বুঝি—'রতনে রতন চেনে' এ প্রবাদটি কত সারগর্ভ।

তবু মনটা দমে যায়।

কাণ্ডজ্ঞানহীন এই মেয়েটার সম্বন্ধে দুশ্চিন্তার অন্ত থাকে না। খাওয়ার সময় পার হয়ে যাচ্ছে বলে মণ্টিকে বাড়ি থেকে ডাকতে আসায় ও চলে যায়, আর আমি বসে বসে অনেক কিছু ভাবতে থাকি।

তিলু-নামধারী গুণনিধিটিকে একবার দেখা দরকার, কোন বংশের কুলতিলক কে জানে! অন্ততঃ তার বাপটিকে ডেকে এ বিষয়ে একটু আলোকপাত করা উচিত।

আগুন তো অবোধরাই জ্বালে, কিন্তু অবোধের হাতে জ্বালানো বলে সে আগুন কিছু আর তার স্বভাবধর্ম পালন করতে ছাড়ে না।

পরদিন কোর্ট থেকে ফিরে দেখি মন্টি এসে নিবিষ্ট হয়ে আমার একটা অসমাপ্ত লেখা পড়ছে।

এইটা আমার ভারি বিরক্তিকর, বারণও করেছি ঢের দিন। বিরক্তি গোপন না করেই বলি—মন্টি ফের?

মন্টি তাড়াতাড়ি ওটা চাপা দিয়ে বলে—বাবাঃ বাবাঃ খেয়ে তো ফেলি নি, এই থাকল।...সকালে বলেছিলাম ওকে সে কথা।

অবাক হয়ে যাই, কাকে কি কথা বুঝে উঠতে পারি না।

—হাঁ হয়ে যাচ্ছ কেন, তিলুকে সেই কথাটা বলবার কথা ছিল না?

তিলু!

ওঃ!

কিন্তু—কি কথা! মনে করতে পারলাম না। বললাম—কি বল তো?

—আহা সেই যে বলেছিলে না, 'মানুষ তো আর গল্প নয়'! সেই কথা বললাম ওকে, শুনে ও—

হঠাৎ মন্টি ঢোক গিলে চুপ করে যায়।

মন্টিও বলতে থামে এমন কি কথা? জননী বাগদেবী ওর রসনাকে যে স্বাধীনতা দিয়ে পাঠিয়েছেন সে তো দেবেরও অপ্রাপ্য।

—শুনে ও 'কি'?···বলি আমি।

—ও বলেছে আমাকে বিয়ে করবে।

—বাঃ! চমৎকার! এ যে প্রতাপ দেবদাস সবাইকে হার মানাল। ···বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ হাসি না হেসে পারি না।

—ঠাট্টা করছ?

মন্টি হাস্যবদনে পরিতৃপ্ত স্বরে বলে, হ্যাঁ! তিলু বলে 'বইয়ের গল্প তো আকাশ থেকে পড়ে না, সে গল্প মানুষের জীবনেরই ছবি।'

যাক উপযুক্ত উপদেষ্টা জুটেছে তাহলে মেয়েটার, ওর ভবিষ্যৎ জীবনটা ঝরঝরে করে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করবে বোঝা যাচ্ছে।

ভেবেছিলাম এ ব্যাপারের একটা উপসংহার হওয়া দরকার এবং সে 'সংহার-কার্যে' আমাকেই একটা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হবে। কারণ মেয়েটাকে যথার্থই স্নেহ করি।

মাতৃহীন বলেই হোক আর অদ্ভুত স্বভাবের জন্যই হোক, কে জানে কেন!

নিরবধিকাল মানুষের চিন্তায় আর বিধাতার কাজে যে বিরোধিতা চলে আসছে, তারই ফলে সেই দিনই একটি ট্রাম দুর্ঘটনার অংশীদার হতে বাধ্য হলাম।

প্রথমটায় খানিকটা বিস্মৃতি, তারপর খানিকটা গোলমাল, তারপর খুব খানিকটা যমযন্ত্রণা। এইগুলোর পর যখন ধাতস্থ হলাম তখন দেখলাম হাসপাতালের খাটে শুয়ে আছি।

তিন সপ্তাহ থাকতে হবে।

দাদা বৌদি দেখতে আসেন···ভাইঝি শ্বশুরবাড়ি থেকে এসে দেখে যায়··· বন্ধু-বান্ধবদের আসার বিরাম নেই, কিন্তু মন্টিকে দেখি না। যদিও ভেবেছিলাম ও কি আর না এসে ছাড়বে। একদিন বৌদিকে 'বলি-বলি' করেও থেমে গেলাম। নাঃ বৌদি মন্টির ওপর যা প্রসন্ন সে তো আমার অবিদিত নেই।

শুয়ে শুয়ে ভাবি…কি জানি সেই হতভাগা ছেলেটা আরও কি 'কাব্যি' করছে!

দিন বাইশ পরে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরলাম।

বাড়িতেও বিছানা পাতা আছে—আরও কিছুদিন শুয়ে থাকতে হবে। পায়ে এখনও প্লাস্টার করা।

দাদা বৌদি আমার যত্নের ত্রুটি হবার কোন ছিদ্র রাখেন নি দেখলাম। নিশ্চিন্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আর কিছুক্ষণ পরেই দেখলাম দরজায় মন্টি।

আমি না দেখার ভান করে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকি, দেখি বেচারা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে থেকে ধীরে ধীরে দরজা থেকে সরে যায়।

আহা, আর নিষ্ঠুরতা সাজে না, হাঁক দিয়ে বলতে হয়—চলে যাচ্ছিস যে?

এইটুকুরই অপেক্ষা ছিল, মুহূর্তে মন্টি ঘরে ঢুকে বিছানার এক পাশে বসে পড়ে বলে—তুমি তো কথা কইবে না।

আমি গম্ভীরভাবে বলি—না কওয়াই উচিত ছিল। আর কেউ হলে কইত না।

আমার এই তুচ্ছ কথাটা যে এমন বিপর্যয় ঘটাবে তা কে জানত।

সহসা বিছানার একাংশে উপুড় হয়ে পড়ে মন্টি, এবং উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের মধ্যে উচ্চারণ করে—আমার কি দোষ, আমি কি নিজে যেতে পারি? আমি কি জানি হাসপাতাল কোথায়? আমার কি মন কেমন করত না?

মন্টির কান্না!

মণ্টির চোখে জল!

এ কী অভূতপূর্ব দৃশ্য! নাঃ কখন দেখেছি বলে মনে পড়ল না। অপ্রতিভ হতে পথ পাই না। ব্যস্ত হয়ে বলি—আরে আরে কী মুস্কিল, ঠাট্টা করেছি রে বাপু। আমি কি জানি না তোর খুব মন-কেমন করছিল। সত্যিই তো কি করে যাবি, তোকে কি কেউ নিয়ে গিয়েছে।

মণ্টি উঠে বসে, জলভরা চোখ ঝঙ্কার দিয়ে বলে—তিলে মুখপোড়াকে বললাম —নিয়ে চ, উজবুকটা বলে কিনা—আমিই বা কি করে জানব কেমন করে হাসপাতাল যেতে হয়।

শোন কথা! কানাকড়ার ক্ষ্যামতা নেই ওনার, আবার বিয়ে করবার শখ। গলায় দড়ি অমন বেটাছেলের! সেই দিনই জন্মের আড়ি করে দিয়ে এসেছি।

খুব খোশামোদ করতে এসেছিল, আমি বলে দিলাম—যাঃ বেরো, তুই তো একটা মেয়েমানুষ! মেয়েয় মেয়েয় বিয়ে হয়!

আমি বলতে যাচ্ছিলাম—তা তুই নিজে তো একটা বেটাছেলের সামিল—বলা হল না, বৌদি ঘরে ঢুকলেন। গম্ভীরভাবে বললেন—মণ্টি বাড়ি যাও, তোমায় ডাকতে এসেছে।

—পরে যাবো।

—রাত্তির নটা বাজে, দেখেছ?

—দেখেছি।

—আচ্ছা বেহায়া মেয়ে বাবা! বাপ যে সেদিন বিতিয়ে লাল করে দিল, একখুনি ভুলে গেলি? ফের এ বাড়িতে এলে মেরে পিঠের ছাল চামড়া তুলে দেবে বলে নি? বলি কচি খুকী সাজবার পথ আর রেখেছিস?

মন্টি কাঠের মত মুখ করে বসে আছে।

শুয়ে ভয় হয়ে যায়, কি জানি কি করে বসেছে। জানিই তো অবোধেই আগুন জ্বালে।

ভয়ে ভয়ে বলি—কি হল হঠাৎ?

—কি হয়েছে ওকেই জিজ্ঞেস করো, বলুক নিজে মুখে।—বলে বৌদি একটু তিক্ত হাসি হাসেন।

আর সেই হাসিই বোধকরি মণ্টির গায়ে বিষ ছড়িয়ে দেয়। বৌদি ঠিকই বলেন মেয়েকে মেয়েই বোঝে। বৌদি বুঝেছিলেন এই হাসিটুকুই ওকে ক্ষেপাবার পক্ষে যথেষ্ট।

কারণ কথার সঙ্গে সঙ্গেই মণ্টি দাঁড়িয়ে ওঠে, আহত বাঘিনীর মত ক্রুদ্ধ গর্জনে বলে—বলব তার ভয়টা কি? বলতে আমি ভয় পাই নাকি? বলেছিই তো…ওই আমার আসল প্রাণের বন্ধু! ওকেই আমি বিয়ে করব।

স্তম্ভিত হয়ে বলি—তবে যে একখুনি বলছিলি—"তিলে মুখপোড়া! বললি—জন্মের আড়ি হয়ে গেছে ওর সঙ্গে?"

মণ্টি বৌদিকে ছেড়ে আমার দিকে মুখ ফেরায়, সেই একই বাঘিনীর ভঙ্গিতে বলে—তিলের কথা কে বলছে, আমি তো তোমার কথা বলছি। তোমাকেই আমি সত্যি ভালবাসি, তুমি কদিন ছিলে না, কেঁদে কেঁদে মরছিলাম আমি। কই তিলে মামার বাড়ি যাওয়ায় তো কান্না পায় নি। সেই থেকেই তো ধরতে পারলাম তোমাকেই আমি—

বৌদি মুখে আঁচল দিয়ে টিপে টিপে হাসতে থাকেন, আর আমি বীরোচিত গর্জনে ধমকে উঠি—বটে, এই সব পাকামি শেখা হচ্ছে? পাড়ার যত হতচ্ছাড়া ছেলেগুলোর সঙ্গে মিশে উচ্ছন্ন গেছ একেবারে? যা বাড়ি যা! খবরদার এ-মুখো হবি তো দেখে নেব। বেয়াদপ বেয়াড়া মেয়ে!

হয়তো বৌদি দাঁড়িয়ে ওরকম বিশ্রীভাবে না হাসলে এতটা রূঢ় হতাম না, হয়তো হেসে ফেলতাম, কিন্তু এখন আর হাসি আসছে না।

মণ্টি মুহূর্তখানেক বোকার মত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ ছুটে পালিয়ে যায়। "আস্ত পাগল" বলে বৌদিও বেরিয়ে যান, শুধু আমিই ভাঙা পা নিয়ে চুপ করে শুয়ে থাকি নিরুপায় চিত্তে।

কিন্তু পা না ভাঙলেই বা কী উপায় করা সম্ভব হত? মণ্টি যখন পেরাম্বুলেটারে চড়ে রাস্তায় বেড়িয়ে বেড়াত, আমি তখন রীতিমত 'চালের সঙ্গে নির্ভুল টাই বেঁধে কোর্টে যাওয়া-আসা করছি। কালসমুদ্রের এই দুস্তর ব্যবধান ও এমন অনায়াসে লঙ্ঘন করল কি করে!

এও একটা কৌতুককর গল্পের প্লট বৈকি, কিন্তু এ প্লটকে কাজে লাগাতে পারব বলে মনে হয় না, কোথায় যেন একটা বিরাট ক্ষতির গভীর শূন্যতা অনুভব করছি।

নিশ্চয় টের পাচ্ছি—ভোর না হতেই ছুটে এসে, জল-ন্যাকড়ার টুকরো ঘষে ঘষে নিজে ঢালা এই কালির দাগটা মুছতে বসবে না মণ্টি।

ছেলেবেলায় রাগ হলেই ও নিজের খেলার জিনিস নিজে ভেঙেচুরে তচ্‌নচ্‌ করত, ভাবতে চেষ্টা করছি আজও হয়তো শুধু রাগ করেই···কিন্তু কই, তাতেও ঠিক মন থেকে সায় পাচ্ছি না যেন। এও এক আশ্চর্য!

এ গল্প আমার নয়, দ্বিজেশ উকিলের।

দ্বিজেশ উকিল বলেছিল—গল্পের প্লট চাও তো আমাদের কাছে এস। আমাদের নথিপত্রের ভেতরে অনেক রংদার গল্প পাওয়া যায় হে! ও তোমাদের বানানো গল্প তার ধারে কাছেও পৌছতে পারে না। এই তো সেদিনকে—একটা বেহারী ছোকরা আর একটা বাঙালী মেয়ে—

সবিনয়ে বলেছিলাম—বেহারী-বাঙালীর গল্প থাক দ্বিজেশ, তুমি বরং শুধু বাঙালীর গল্পই বল।

দ্বিজেশ মুচকে হেসেছিল—ও, তুমি যে আবার ভারি নীতিবাগীশ। মনে ছিল না। তবে থাক, আমার একজন পরিচিত লোকের একটা ব্যাপার বলছি শোন। তারপর এ-কথা সে-কথার পর বলেছিল গল্পটা। গল্প তো নয় সত্যি ঘটনা। শুধু নাম-ধামটাই পাল্টে বলেছে।

মাঝারি গোছের একটা মফস্বল শহরে ছিল ওরা। ধরে নাও—শৈলেন আর সরযূ। নিঃসন্তান দম্পতি। ভালবাসাবাসি করে বিয়ে ওদের নয়, মা বাপে ধরে দেওয়া বিয়েই। কিন্তু কূল উপছে পড়া ভালবাসার সাগরে ভাসত দুজনে।

বিয়ের সাত আট বছর পরেও যে এমন আবেগ-সমৃদ্ধ ভালবাসা বজায় থাকতে পারে, সে কথা ওদের নিজে চক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।

দ্বিজেশ বলল—হ্যাঁ তখন আমি '———'তেই প্র্যাকটিস করতাম।...
বাড়ির গিন্নী রেগে গেলেই ওদের ভালবাসার নজীর তুলে ধরে খোঁটা দিতেন আমাকে। বোধ হয় পাড়ার সব গিন্নীরাই তাঁদের কর্তাদের দিতেন। কারণ শৈলেনের দিক থেকে যেন আবেগটা ছিল বেশি প্রবল।

আমি স্টাডি করে দেখেছিলাম লোক-দেখানো আদিখ্যেতা সে নয়, সত্যিকার গভীরত্ব ছিল। একবার বুঝি সরযূ ওর বোন না কার অসুখ শুনে কলকাতায় চলে এসেছিল চার-পাঁচ দিনের জন্যে, শৈলেন কাজের খাতিরে আসতে পারে নি। বললে বিশ্বাস করবে না, লোকটা এই চার পাঁচ দিন ভাতই খেল না। রাঁধুনীটাকে ছুটি দিয়ে শুধু চা বিস্কুট খেয়েই কাটিয়ে দিল।

আমাদের কোর্টেই কাজ করত। কার মুখ থেকে কার কানে কথা যায়, সকলে ক্ষেপিয়ে মারতে লাগল—"শৈলেনবাবু বিরহে অন্নজল ত্যাগ করেছেন—" তাতে লজ্জাও নেই সরমও নেই।

কটা দিন পরে বৌ ফিরল, হতভাগা যেন বাঁচল। মনের আনন্দে সেদিন সকলের চায়ের দাম মিটিয়ে দিল নিজের পকেট থেকে।

কিন্তু গ্রহনক্ষত্রের ক্রুরতা মানুষকে কখন একটানা স্বস্তিতে থাকতে দেয় না। এ হেন একটি সুখী দম্পতির শান্ত-স্নিগ্ধ জীবনটুকু বোধ করি চক্ষুশূল হল তাদের। তাই তাদেরই চক্রান্তে সেই জীবনের উপর এল এক কুৎসিত বিপর্যয়!···সেই কথাই বলছি!

সময়টা ছিল বোধ হয় শীতকাল, কিন্তু, দুতিন দিন ধরে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থেকে সেদিন সকাল হতে টিপি টিপি বৃষ্টি সুরু হয়েছে। একেই মফস্বলের শীত, তার উপর আবার বর্ষা। সোনায় সোহাগা।···হাড়ের মধ্যে যেন কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

সকলেই সকাল সকাল ফিরব ঠিক করে বেরোবার আগে চা-টা জুৎ করে খেয়ে নিচ্ছি, হঠাৎ দেখি শৈলেন উঠে দাঁড়িয়ে বলছে—'আমি চললাম'!

—সে কি হে, চা খেয়ে যাবে না?

—নাঃ! আমার মনটা কেমন ভাল লাগছে না। আপনারা খান আমি যাই।

আমরা ঠিক করেছিলাম শেয়ারে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে যে যার আস্তানায় ফিরব। কারণ হাঁটবার দিন সেটা নয়। কাজেই শৈলেনের একা চলে যাওয়ার প্রস্তাব সমর্থন করলাম না কেউই।

সবাই বলতে লাগল বাতিকটা একটু কমাও হে শৈলেন, বৌ আর কার নেই? ভালবাসাবাসিও অল্প-বিস্তর সকলেরই আছে হে। তোমার মত এত বৌ-পাগলা তো কেউ নয়। এই রকম বৌ-পাগলাদের বৌ-ই ঘর ভেঙে পালায়।"

সামান্য পরিহাস। কিন্তু শৈলেনের মুখখানা যেন পাঙাশ হয়ে গেল। চুপ করে বসে থাকল একখানা চেয়ারে। কিন্তু মনে হতে লাগল কে যেন ওকে এখানে বেঁধে রেখেছে। মুখে আসছিল বলি—"শৈলেনের দেহটাকে তো আটকে রাখা হয়েছে, কিন্তু বেচারার দেহাতীত আত্মাটি বোধ হয় "আনারবাগের" সেই ছোট্ট হলদে একতলা বাড়ির থানায় পৌঁছে গেছে এতক্ষণে।

বললাম না। বয়সে বড্ড তফাৎ। তাছাড়া—পদমর্যাদায় তো তফাৎ আছেই বিলক্ষণ।—ও হল কোর্টের কেরাণী।

যাই হোক আমাদের আড্ডা ভাঙল। দুটো গাড়ি নিয়ে পাড়া বুঝে গাড়ি ভর্তি করা হল। শৈলেন আমার পাড়ার, ও আছে আমারই পাশে। আরও কে কে যেন ছিল।

বেলা বোধ করি তখন সাড়ে তিনটে। বৃষ্টিটা ধরেছে, কিন্তু আকাশ থমথমে অন্ধকার। পথে জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই। গাড়িটাও চলেছে টিকিয়ে টিকিয়ে।

ঘোড়াটার উপর মায়া করে কিছু বলছি না।

হঠাৎ যেই মাত্র গাড়ি 'আনারবাগে'র কাছাকাছি এসে মোড় নিয়েছে—দেখি একটা ঝি-গোছের মেয়েলোক শখের যাত্রার তাড়কা রাক্ষুসীর মত দুহাত তুলে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে আসছে।

সঙ্গে সঙ্গে শৈলেনও কি রকম যেন একটা চীৎকার করে চলন্ত গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। বলা বাহুল্য গাড়িও থামল।

—"ব্যাপার কি হে?"

—"আমার বাড়ির ঝি!"

ততক্ষণে ঝিটা কাছে এসেও গেছে।

ঝিটার অসংলগ্ন 'হাউ হাউ' থেকে পাঠোদ্ধার করে যা বুঝলাম তা হচ্ছে এই, সে যথারীতি কাজ করতে এসে দূর থেকে দেখছিল দরজা হাট করে খোলা। এই অসাবধানতার জন্যে মনিব-গিন্নীকে বকবে বলে যেই তাড়াতাড়ি ঢুকেছে দেখে দরজার কাছেই গিন্নী আর অদূরে একটা ডাকাতের মত দেখতে দস্যি জোয়ান লোক মরে পড়ে আছে। মাথাটা তার একদম চৌচির। রক্তে ভেসে যাচ্ছে উঠোন।

ঝিটা বলতে বলতে দু হাতে চোখ ঢেকে বলে—"বাবু গো সে কি দিশ্য।"

আশ্চর্য! এই জন্যেই কি শৈলেন্ অমন হয়ে উঠেছিল?…তাই কি ওর মন বলছিল একটা কিছু ঘটেছে!

যাই হোক সে দৃশ্য আমরাও দেখলাম!

ঘটনাটা বুঝতে বিশেষ অসুবিধে হল না। শৈলেনের স্ত্রী অজ্ঞান হয়ে থাকা সত্ত্বেও অনুমানেই বোঝা গেল।

বদমাইসটাকে চিনতামও আমি—দ্বিজেশ উকিল হাসল—দুনিয়ার যেখানে যত বদমাইস আছে তাদেরই তো চিনছি জীবন-ভোর! জগতে যে কোথাও কোন ভাল লোক আছে, এ আর বিশ্বাস হয় না। হুঁ কি বলছিলাম—কি যেন নাম ছিল লোকটার মনে নেই, বিড়ি পাকানো ছিল পেশা। অবশ্য ওটা বাইরের ভেতরের পেশার খবর ছিল আমাদের খাতায়। ওর বহু দুষ্কর্মের ইতিহাস সযত্নে তোলা ছিল সে খাতায়। সে যাক—শাস্তিটাও পেয়েছে তেমনি শোচনীয়।

জ্ঞান হতে শরযু বলল—বসে থেকে থেকে শীত ধরে যাচ্ছিল বলে ভেবেছিল

কাঠের উনুন জ্বেলে একটু চা তৈরি করে খাবে। ঘর থেকে বেরোতেই দেখে পাঁচিল টপ্‌কে উঠোনে নামছে লোকটা।

দেখেই বুকের রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল তার, আর—ভয়ঙ্কর একটা ভয়ে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে, দালানে দাঁড় করিয়ে রাখা বাটনাবাটা শিলের মোটা নোড়াটাকে দু হাতে ধরে ছুঁড়ে মেরেছিল লোকটার মাথা লক্ষ্য করে। তারপর ওর চৈতন্য জগতে আর কিছু ছিল না। শুধু জ্ঞানশূন্যতার একটা ধোঁয়াটে অন্ধকারের মধ্যে ঝলসে উঠেছিল একটা রক্তের ঢেউ।...

দরজা খুলে ছুটে পালিয়ে যাবার চেষ্টা যদি সে করে থাকে, অজ্ঞানেই করেছে।

তারপরই বুঝতেই পারছ?...দ্বিজেশ উকিল বলে—দিন দুপুরে খুন! তা আবার—খুনী একটি ছাব্বিশ বছরের তরুণী। ছোট্ট মহকুমা শহরটা যেন ভিৎসুদ্ধ দুলতে লাগল!

ভেবেছিলাম এ খুনকে খুন বলে গণ্য করা হবে না। তাছাড়া আমরা আছি। কিন্তু—কে জানত একটা বদ-স্ত্রীলোক হতভাগাটার স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়ে—মামলা লড়বে।

আর কিছু নয়, উকিল মুন্সেফের কারসাজি! ওই করতেই তো আছি আমরা! আগুনকে নিভতে দিই না, ইন্ধন দিয়ে দিয়ে জীইয়ে রাখি! যাই হোক—সেই শয়তানী যে মুরগীর ডিম বেচত তা জানতাম না। ও এই বলে মামলা ঠুকল—ডিমের দর করতে সরযূ না কি ওর সোয়ামীকে ডেকেছিল, দরে বনে নি বলে রাগের বশে হাতের কাছে যা পেয়েছে ছুঁড়ে মেরেছে!

এতক্ষণে আমি একটা কথা বলি। বলি—এমন গল্পও আদালতে ওঠানো যায়?

—আদালতে? হেসে ওঠে দ্বিজেশ—আদালতে যে রকম গল্প ওঠানো যায়, সে তোমাদের গল্প-লেখকদের ধারণার বাইরে, কল্পনার সীমা থেকে অনেক অনেক দূরে। তা নইলে আর এদের এই হাস্যকর গল্প হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়ায়? উঃ সেই মামলার সময় যদি শৈলেনকে দেখতে। যেন উন্মাদ পাগল! হাজার রকম কথা কানাঘুষোয় শুনতে পাচ্ছে। কেউ বলছে ফাঁসি হবে, কেউ বলছে দ্বীপান্তর হবে, কেউ বা কমিয়ে বলছে—অন্তত পাঁচ সাতটি বছর জেল।

দিশেহারা শৈলেন কেবল আমাদের হাতে পায়ে পড়ছে। যে করে হোক সরযূকে বাঁচাতে হবে। শুধু প্রাণে বাঁচাই নয় মানসম্ভ্রম নিয়ে পাঁচজনে কথা বলছে, সরযূ মরমে মরে আছে, এ আর ও সহ্য করতে পারছে না।

কেবল বলে—আদালতে বলব আমি খুন করেছি। আরও অনেক পাগলামির কথাই বলে। অবিশ্যি মাথার ঠিক থাকাও শক্ত ছিল। সত্যি বলতে—খুনী স্বামীকে বাঁচাতে স্ত্রী প্রাণপাত করে লড়ছে, এ কেস হামেশাই আমাদের হাতে আসে। কিন্তু এ রকম উল্টো কেস কোন ভদ্র ঘরে—তাও রাজা জমিদার নয়, সেরেফ মাছিমারা কেরাণীর ঘরে—বড় একটা দেখা যায় না।

যাই হোক শৈলেনের ব্যাপারটায় এমন কিছু বাহাদুরি ছিল না, যে কোন স্বামীই এক্ষেত্রে ভিটে-মাটি বেচে, কাবলীওলার কাছে ধার করে যে প্রকারে হোক মামলা লড়তই। শৈলেনই তাই করেছে। তার বেশি কিছু করে নি।

অধিকন্তুটা হচ্ছে তার মরীয়া অবস্থাটা। বেশ বোঝা যেত দরকার হলে ও সরযুর জন্যে নরকে যেতে পারে, বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত ধাওয়া করতে পারে।

আড়ালে ছেলেছোকরারা ঠাট্টা করে বলত—'মদ্দা সাবিত্রী।' কথাটা সত্যি, সাবিত্রীর মতই বোধ করি জীবন পণ করেছিল সে। বিপদের মুখ থেকে, দুঃখের মুখ থেকে, অপমানের মুখ থেকে, স্ত্রীকে রক্ষা করতে সে সব করতে প্রস্তুত।

সরযুকৃত এই খুনটাকে অবশ্য কেউই ঘৃণার চক্ষে দেখে নি। পাড়া-পড়শী মহিলারা পর্যন্ত না। ওভাবে বিপদমুক্ত না হলে সরযুর কী সর্বনাশ ঘটতে পারত সেকথা ভেবে শিউরে উঠেছে সবাই! তাই—তার কাজকে সমর্থন না করে পারে নি কেউ। এ তো আর নরহত্যা নয়, আত্মরক্ষা! আত্মার সম্ভ্রম রক্ষা।

আমার গিন্নী কথা উঠলেই বলতেন—"ভাগ্যিস হাতের কাছে পাথরটা ছিল!" অর্থাৎ এটা সরযুর পক্ষে ভাগ্যের কৃপাই।

জামিনে খালাস ছিল সরযু। মামলা হাইকোর্টে উঠতে কলকাতায় আসতে হল। যেদিন আদালতে তার ডাক পড়ত, ও পক্ষের জেরার মুখে পড়তে হত, সেদিন যদি শৈলেনের যন্ত্রণা দেখতে! খালি ছটফট করত আর বলত—দ্বিজেশদা, ও মরে যাবে। নিশ্চয় মরে যাবে। এত লাঞ্ছনা সয়ে আর বাঁচবে না ও।

—আর সরযু? আমি বলি।

—তাঁর আবার উল্টো ব্যথা! সে বলত "ফাঁসিই যাই, আর জেলেই যাই, অনুতাপ করব না। মনে জানব ধর্ম রাখতে প্রাণ গেল। ভাবনা শুধু ওর জন্যে! আমার কিছু হলে ও কি আর বাঁচবে?" মেয়েটা বুঝলে, এদিকে বেশ শক্ত ছিল। জলজ্যান্ত আস্ত একটা মানুষকে খুন করে ফেলেছে বলে যে বিশেষ কোন

আত্মগ্লানি অথবা মানসিক কোন অবস্থান্তর—তা দেখতাম না। সে বিষয়ে বলত একটা কথা—সেই ভয়ঙ্কর সময়টার কথা আমি মোটে ভাবি না দ্বিজেশদাদা, চোখ বুজে এড়িয়ে যাই। মনে করি সে সরযু আর কেউ।

—এ পর্যন্ত বেশ বুঝছি, কিন্তু শেষটা কি হল তাই বল?

—হল আবার কি! হল—বেকসুর—খালাস!

—বেকসুর খালাস?

আবার কি!...হবেই জানতাম। শুধু উকিল ব্যারিস্টারদের কারসাজিতে আর সেই হতভাগা মেয়েলোকটার জেদে এতটা ভুগতে হল। শৈলেনের পক্ষের কৌঁসুলী জজকে প্রশ্ন করল, একটা ক্ষ্যাপা কুকুর কামড়াতে আসছে দেখে তাকে ইঁট ছুঁড়ে মারা যদি দণ্ডনীয় অপরাধ না হয়, এটাই বা হবে কেন?...জজ উত্তর দিতে পারল না। মামলা ফেঁসে গেল! বৌকে নিয়ে মহাসমারোহে কালীঘাটে পুজো দিয়ে এল শৈলেন!

দ্বিজেশ নস্যির কৌটো বার করে বাঁ হাতের তেলোয় ঠুকতে লাগল।

আমি বললাম—তারপর?

—তারপর? ধীরে সুস্থে হাতের নস্যি ঝেড়ে কৌটোর মুখ বন্ধ করে পকেটে রেখে দ্বিজেশ উকিল বলল—তারপর শৈলেন জেলা-শহরে ফিরে এসে বিরাট ভোজ দিল।...টাকা ছিল না, ধার করে দিল।...যাকে যাকে চিনত, কাউকে বাদ দিল না। অনেকদিন অমন একটা বড় ভোজ হয় নি ওখানে।

আমি ঠোঁট বাঁকিয়ে বলি—এটা আর এমন কি একটা গল্প হল? যে কোন সাহসী মেয়েই এই রকমই করত, বাহাদুরির কিছু নেই।

—বাহাদুরি, না সরযুর বাহাদুরির কথা তো বলছি না।...বলে দ্বিজেশ পানের কৌটো বার করল। হাত বাড়িয়ে বলল—নেবে নাকি একটা?

—দাও একটা।...যাই বল তোমার গল্পে কোন বিশেষত্ব নেই।

—গল্পটা তো এখনও বলি নি—বলে দ্বিজেশ পানের কৌটোটির ঢাকা বন্ধ করে সযত্নে রুমাল দিয়ে মুছে পকেটে রাখল।

—গল্পটা এখনও বল নি?

—না। আর একটু আছে। সেইটুকুই গল্প! তারপর—শৈলেন সরযুকে ত্যাগ করল।

—ত্যাগ করল!

—হ্যাঁ। ত্যাগ করল।

—বল কি ? তার মানে ? তার কি সন্দেহ হল—

—না না, সে-সন্দেহ হয় নি। বদমাইসটার হাতে সরযূ একবার পড়লে যে এ পরিস্থিতি হতে পারত না, সে তো কচি ছেলেতেও বোঝে—সরযূর মান গেলে যে সে হতভাগার প্রাণটা যেত না,—এবং সরযূ নিজের প্রাণটা রাখত না এ শৈলেন মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছিল।

আমি অবাক হয়ে বলি—তবে ?

—'তবে ?' তবে হচ্ছে এই—শৈলেন বলল—খুনী স্ত্রী নিয়ে ঘর করতে সে পারবে না।

—অ্যাঁ!

—হুঁ! বলল! স্পষ্টই বলল আমার কাছে—যে হাত দিয়ে ও একটা জল-জ্যান্ত মানুষকে মেরে ফেলেছে, সে হাত দিয়ে আমার ভাত রাঁধবে, আমায় খেতে দেবে, আমার সেবা করবে এ আমি বরদাস্ত করতে পারব না দ্বিজেশদা।

বললাম—চমৎকার! খাঁটি প্রেমের নমুনা বটে!

দ্বিজেশ উকিল মাথা নেড়ে বলে—উঁহু, সে তুমি বলতে পার না ভায়া। ভালবাসায় ওর ভেজাল ছিল না।

—বটে ? তবে এটা কি ?

—এটা যে কি, সে কথা বোঝা ভারি শক্ত ভাই! বোধ হয় এরই নাম সংস্কার। যা দয়া মায়া স্নেহ প্রেম বিচার বিবেচনা বুদ্ধি যুক্তি—সব কিছুর চাইতে শক্তিশালী।

—তোমার একথা আমি স্বীকার করি না। লোকটা পাষণ্ড! কিন্তু মামলা তো চলছিল অনেকদিন ধরে, এ যাবৎ করছিল কি ? স্ত্রীর মুখ দেখছিল না ?

—আরে তা কেন ? দুবেলাই তো দেখছিল। তবে ঠিক স্বামী-স্ত্রীর মত বসবাস করতে তো পায় নি, আদালতের হুকুমে বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকতে হয়েছিল। তাছাড়া হতভাগার কি তখন জ্ঞানগম্যি ছিল ? মন্ত্রের সাধন অথবা শরীর পতন, এমনি একটা নেশার ঘোরে কাটাচ্ছিল।···ভেবেছিলাম—সব মিটে গিয়ে বৌ পেয়ে হাতে স্বর্গ পাবে ছোকরা। তা নয়—হরিষে বিষাদ। অথচ সরযূকে ত্যাগ করতে ওর প্রাণ যে ফেটে যাচ্ছিল তাও বুঝতে পারছিলাম।

—হুঁ, স্বীকার করছি একটা গল্প শোনালে বটে! কিন্তু তারপর ?

—তারপরও শুনতে চাও ? তারপর—মানে সরযূকে বিদায় দেওয়ার পর কিছুদিন কেঁদে কেঁদেই বেড়াল ছোকরা। তারপর হঠাৎ একদিন কাউকে বলা কওয়া নেই দুম্ করে একটা বিয়ে করে বসল। দেখেছি বৌকে, কেলে কুচ্ছিৎ

একটা মেয়ে! সেই অবধি ওখানেই আছে শুনেছি। ঘর-সংসার করছে। আমি-তো তারপর চলে এলাম! অনেক চেষ্টাচরিত্র করে এখানে—

রেগে উঠে বলি—তুমি কি করলে সে কথা জানবার জন্যে কে মরছে? সরযূ কি করল তাই বল?

দ্বিজেশ উকিল আর একবার নস্যির কৌটো বার করে হাতের তেলোয় ঠুকতে ঠুকতে বলল—সে আমি কেমন করে বলব? আমি তো তার গার্জেন নই যে কী করল আমায় বলতে আসবে? বেঁচে আছে কি মরে গেছে, বেঁচে থাকলে কোথায় আছে, সে খবর কে রাখতে যাচ্ছে বল? যাদের যত কেস্ হাতে আসে, তাদের বাকী জীবনের সুখ-দুঃখের ভাবনাও যদি ভাবতে হয় তাহলে তো আর 'করে খেতে' হয় না।...হয়তো মেয়েটা বেঁচেই আছে। ভাই ভাজের সংসারে দাসীবৃত্তি করে খাচ্ছে...হয়তো বা সে আশ্রয়ও জোটে নি, পথেই নামতে হয়েছে।......যদি শুনি পরের বাড়ি ঝি-গিরি করে খাচ্ছে, আশ্চর্য হব না। যদি শুনি অধঃপাতের তলায় তলিয়ে গেছে তাতেও অবাক হব না।

ওর এই নির্মম উদাসীনতায় সর্বাঙ্গ জ্বলে গিয়েছিল। ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলাম, সেইটাই ওর পক্ষে উচিত। পৃথিবীর ওপর প্রতিশোধ নিতে নরকের রাস্তা বেছে নেওয়াই উচিত ছিল ওর।

দ্বিজেশ উকিল মৃদু হেসে বলেছিল—ওহে ভায়া, ওসব বড় বড় কথা হল নাটক নভেলের কথা! বাস্তব জীবনে সে রাস্তা ইচ্ছে করে বেছে নেবে। তেমন উন্মাদিনী আর কজন হয় বল? ঘটনাচক্রের ধাক্কা খেতে খেতে শেষ অবধি নরকে পৌঁছে যায়—এই পর্যন্ত।...অবিশ্যি দুঃখের পরীক্ষায় জয়ী হয়ে সম্মানের জগতে টিঁকে যাওয়ার উদাহরণই কি আর নেই? আছে! জগতে সবই আছে। ইচ্ছে করলে ভালটাই ভেবে নিতে পার। তবে—সচরাচর যা ঘটে তাই বলছি।

রাবণের আমলে স্বর্ণলঙ্কায় দেশলাইয়ের চলন ছিল কি-না, অথবা—লঙ্কাদহন কালে হনুমানকে চকমকি ঠুকতে হয়েছিল কি কাঠে কাঠে ঠোকাঠুকি করতে হয়েছিল সপ্তকাণ্ড রামায়ণের কোনো কাণ্ডেই সে কথার উল্লেখ নেই।

তবে—'লঙ্কাকাণ্ডটা' শেষ পর্যন্ত যত বিরাট মূর্তিই ধারণ করুক, আগুন যে শুধু শুধু জ্বলে না, জ্বালতে হলে অমনি একটা তুচ্ছবস্তুর প্রয়োজন অপরিহার্য একথা অস্বীকার করবে কে?

একটা নগর ধ্বংস করতে একটি দেশলাই কাঠিই যথেষ্ট। অবশ্য যদি বারুদের পরিমাণটা থাকে উপযুক্ত।

কিন্তু একটিমাত্র দেশলাই কাঠির অভাবেও যে লঙ্কাকাণ্ড ঘটে যাওয়া অসম্ভব নয়, সকাল বেলাই সে কথা প্রমাণ করে ছাড়ল—জহর আর জয়ন্তী।

ঘুম থেকে উঠে এসে উনুনে আঁচ দিতে বসেই বুকটা ধড়াস্ করে উঠল জয়ন্তীর, দেশলাইয়ে একটাও কাঠি নেই! কালকেই সে দেখে রেখেছিল বাড়িতে যেখানে যে কটা দেশলাই ছিল, সব কটাই যেন ষড়যন্ত্র করে একযোগে জবাব দিয়েছে, সাবাবাড়িতে একটা দেশলাই কাঠি নেই।

কাল সন্ধ্যাবেলায়ই জহরকে বলে আনিয়ে রাখবার কথা, নিশ্চিত মনে পড়বার জন্যে আঁচলের কোণে একটা গিঁট পর্যন্ত বেঁধে রেখেছিল, কিন্তু কোথা দিয়ে যে সন্ধ্যাটা কেটে গেল!

সন্ধ্যা থেকে রা ত্তর দুপুর পর্যন্ত।

মনে পড়তেই অতর্কিতে একটা হাসির আভাস মুখে খেলে গেল জয়ন্তীর, সময়-অসময়ে জহরের পকেটের দেশলাইটা থাকে ভরসা, কিন্তু কাল রাত্তিরে পকেটের দেশলাইটা শেষপর্যন্ত নিঃশেষ করেছে জহর যথেচ্ছ ধূপ জ্বেলে জ্বেলে।

কী যে পাগলামিতে পেয়েছিল কাল জহরকে। বন্ধুর বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে প্রাণে একেবারে স্ফূর্তির জোয়ার এসে গিয়েছিল বাবুর। ফেরবার সময় কি না দুগাছা গোড়ে-মালা আর এক প্যাকেট ভাল ধূপ কিনে এনে হাজির।

সেই ধূপগুলো জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে পকেটের দেশলাইটা একেবারে শেষ করল বসে বসে।...স্মরণশক্তিকে সাহায্য করতে শাড়ির আঁচলে কষে গিঁট দিয়ে রেখেছিল জয়ন্তী, গিঁট সমেত সে শাড়িখানাই তো খাটের তলায় পড়ে আছে... অবহেলার অভিমানে।—ট্রাঙ্ক খুলে আকাশী রঙের জরিপাড় এই শাড়িখানা পরতে হয়েছিল জয়ন্তীকে।

তারপরেও যদি—দেশলাই ফুরিয়ে যাওয়ার মত জরুরী খবরটা জহরের কানে

তুলতে ভুল হয়ে না যায় জয়ন্তীর, আমরাই তো 'ছি ছি' করতাম—তাকে।

কিন্তু সে ঘটনা কাল রাত্রের।

এটা সকাল। গরম কালের সকাল। ছটা বাজবার আগেই চড়া রোদে পৃথিবী ভরে গেছে। এখন ঝি এসে পৌঁছয় নি বলে বাড়িটা শ্রীহীন কুদৃশ্য। গতরাত্রের উচ্ছিষ্ট বাসনগুলো নিয়ে এক পাল কাক দালানে উঠে মাতামাতি সুরু করেছে। কাছাকাছি বস্তি থেকে সকাল বেলাই একটা তুমুল কলহের আওয়াজ উঠেছে; রাস্তার বহুবিধ শব্দ ছাপিয়ে ভাঙা কাঁসির মত কার একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর টিনের চাল ভেদ করে আকাশে উঠতে চাইছে।

এখন এসময় রাত্রের স্মৃতিটা লজ্জাকর, পরনের জরিপাড় শাড়িখানা দৃষ্টিকটু। এখন উনুনে আঁচ ধরাবার মত প্রখর প্রয়োজনের কাছে ধূপ-জ্বালার বিলাসিতা ধৃষ্টতা মনে হচ্ছে।

জুঁইয়ের মালার মদির সৌরভে সুরভিত শাড়ির আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজতে থাকে জয়ন্তী রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, দালান, সিঁড়ির তলা; যেখানে যত তাক, শেল্ফ, কুলুঙ্গি, ঘুলঘুলি আছে। যদি হঠাৎ মিলে যায় বাঞ্ছিত বস্তুর দর্শন! অন্তত ভাঙাচোরা আধখানা কাঠি সমেতও, অবহেলায় ফেলে দেওয়া একটি দেশলাই!

কিন্তু না—কোথাও মেলে না। দুটো তিনটে খালি খোল পাওয়া যায়, নিছক খালি! কে জানে—এত গোছালো কবে হলো জয়ন্তী, যে তার সংসারে ফেলে-দেওয়া দেশলাইয়ের বাক্সে একটা-আধটা কাঠি থেকে যায় না?

দেখা জায়গা আবার দেখতে থাকে, পরীক্ষিত বাক্সগুলো আবার পরীক্ষা করে মরে, মনে হয় হঠাৎ যেন মন্ত্রবলে কে জয়ন্তীর সংসার থেকে অগ্নিদেবতাকে হরণ করে নিয়েছে।

মৃত শ্বশুরের আমলের বাড়ির দেওয়ালে টাঙানো, শ্বশুরের আমলের ঘড়িটা, হঠাৎ এক সময় শ্বশুরের মতই মৃদু গম্ভীর স্বরে অবহিত করে দেয় সাতটা বেজে গেল!

সাড়ে আটটায় ভাত খেতে বসবার কথা জহরের।

এখন কি করে বেচারী?

রাত্রের ছেলেমানুষির খেসারত দিতে ঘুম ভেঙেছে বেলায়, তারপরে এই ঘটনা!

কী করবে জয়ন্তী? জহরকে জাগাবে?

যদিও তাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলা একটা মজুরের কাজ! তাছাড়া—

আজ তো তার দাবী বেশী। রাত্রের ঘুমের অভাবটা পুষিয়ে নেবার দাবী। কোন্ লজ্জায় ওকে ঠেলা মেরে ঘুম ভাঙিয়ে দোকানে ছোটাবে জয়ন্তী তুচ্ছ একটা দেশলাইয়ের জন্যে!

আকাশ থেকে একটা কাঠি পড়ে না?

বারুদের টুপি পরা ছোট্ট একটি কাঠি?···আচ্ছা, দুটো খালি বাক্স ঘষলে হঠাৎ জলে উঠতে পারে না? ঝিলিক মেরে উঠতে পারে না একটি স্ফুলিঙ্গ? ···অকৃপণ হাতে ঢেলে দেওয়া কেরোসিনের ওপর সেইটুকুতেই তো কাজ হতে পারে

অনেকক্ষণ পাগলামি করে নিরুপায় হয়েই শেষ পর্যন্ত বরকে ডেকে তুলতে যাচ্ছিল জয়ন্তী, সত্যি আর কতই ঘুমোবে? দাড়ি কামাবে না?—চা খাবে না? বাজারে যাবে না?

দিন অদিনে একদিন ঘুম থেকে উঠেই চটিটা পায়ে গলিয়ে দোকানে যেতে হয় না কাউকে? ক্ষয়ে যায় তাতে মানুষ? জয়ন্তী যদি অতি আধুনিক মেয়েদের পদ্ধতিতে চলতে জানতো, এতক্ষণ কি এত কষ্ট পেত?—নিজেই তো সে চটিটা পায়ে দিয়ে ঘুরে আসত মোড়ের দোকান থেকে।

সে অভ্যাস নেই।

নিরুপায় চিত্তেই ডাকতে যাচ্ছে বরকে, বাইরের দরজায় সজোর ধাক্কা জানিয়ে দিল ঝি সারদাসুন্দরীর আগমন-সংবাদ! আচ্ছা, ওকে বললে হয় না? পাঁচখানা বাড়িতে কাজ করে সে, তার সময়ের মূল্য আছে। তাকে দোকানে পাঠানোর কল্পনাটাই অসমসাহসিক, তবু মরীয়া হয়ে প্রস্তাবটা করে বসল জয়ন্তী।

নিজের স্মৃতিশক্তিকে যথেষ্ট ধিক্কার দিয়ে, তুচ্ছ একটা দেশলাইয়ের জন্যে সকাল থেকে কত খেটে মরেছে সে কথা জানিয়ে করুণ মিনতিপূর্ণ ভাষায় আবেদন করলে—চট করে একটা দেশলাই এনে দেবে সারদা?

কিন্তু সারদা কচি খুকী নয়, মিনতিতে গলে যাবে এমন হৃদয়বৃত্তি বজায় রাখতে হলে পাঁচখানা বাড়ির কাজ বজায় রাখা চলে না, এ জ্ঞান নিয়েই সে কর্মক্ষেত্রে নেমেছে। তাই সে সংক্ষেপে জানায় তার সময় মূল্যবান, আর দোকান-বাজার করা তার কর্তব্যের অন্তর্গত নয়।

যে আগুনের অভাবে সকাল থেকে অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছে জয়ন্তী, হঠাৎ যেন মাথার মধ্যে জলে ওঠে সেই আগুন!

'মাইনে করা লোকের এত আস্পর্দা কিসের, মনিবের হুকুম মানতে কেন

বাধ্য নয়', এই প্রশ্নই করে বসল সে প্রয়োজনাতিরিক্ত চড়া গলায়।

গলা চড়াবার বিদ্যাটা একা জয়ন্তীরই আয়ত্ত নয়। বাইশ বছর ধরে ঝি-গিরি করছে সারদা!

বলা বাহুল্য এরপর দু পক্ষের যা বাক্যালাপ সুরু হল সেটা রসালাপ নয়।

শেষ পর্যন্ত যখন হাত থেকে ঝাঁটা বালতি আছড়ে ফেলে চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে সারদা, তখন জহরের ঘুম ভাঙল।

উঠে এসে বিরক্ত স্বরে প্রশ্ন করলো—'সকাল বেলা এত গোলমাল কিসের?'

মেজাজকে কখন কোন্ পর্দায় চড়াতে নামাতে হয় সে কৌশল সারদাসুন্দরীর আয়ত্ত। মুহূর্তে আকৃতি এবং প্রকৃতি দুইয়েরই পরিবর্তন ঘটে যায় তার, ছলছল চোখ এবং অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে সে নিবেদন জানায়—'চাকরি না জোটে বরং পথে পথে ভিক্ষে করে খাব বাবু 'মুখ' সইতে পারব না।…'মুখ' সয়ে কাজ করা আমার দ্বারা হবে না, মাইনেটা মিটিয়ে দিন আমার।'

ঘটনাটা সঠিক জানা না থাকলেও—দু-একটা স্তুতিবাক্যের সাহায্যে হয়তো ঘটনার মোড় ফেরাতে পারতো জহর; ফিরে এসে আবার পরিত্যক্ত হাতিয়ার দুটো তুলে নিয়ে কাজে লেগে যেত সারদা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তী ভদ্রশ্রেণী-বিগর্হিত বিশ্রী একটা মুখভঙ্গী করে কটুগলায় বলে উঠল—আহা—হা, এতক্ষণ রণচণ্ডী মূর্তি নিয়ে মারতে আসছিলেন, এখন বাবুকে দেখে নোনা পানি উথলে উঠল একেবারে! "মাইনে মিটিয়ে দেবে"—আদর ধরছে না!

এর পরেও সারদা টিঁকে থাকবে এমন কথা যদি ভাবা হয় বড় মর্মান্তিক অবিচার করা হয় তার ওপর।—

—'বেশ, না দেবেন না দেবেন—আপনারা ভদ্দরলোক যা বলবেন সাজবে। গরীবের দু টাকা মেরে রাজা হতে চান ভালো—' বলে নিজেই রাজকীয় ভঙ্গিতে গট্ গট্ করে বেরিয়ে যায় সারদা সামনের খোলা দরজা দিয়ে। গেল গেলই।

এইখানেই যদি ইতি হত, হয়তো কিছুই হত না।

জয়ন্তী কোমর বেঁধে নেমে পড়ত উঠোনে, আর জহর দেশলাই কিনে এনে রান্নাঘরে ঢুকে আগুন ধরাবার চেষ্টায় নাজেহাল হত। কিন্তু জয়ন্তী ইতি করতে দিল না। শানানো গলায় বলে উঠল—'যা বেরো হারামজাদী মাগী, ভাত ছড়ালে আবার কাগের অভাব!'

চমকে তাকাল জহর, আর আকাশী রঙের জরিদার শাড়ি-পরা জয়ন্তীর পান খাওয়া বাসী মুখখানার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হল তার, কী—কুৎসিত! মনে

হল—কী অশ্লীল!

—চমৎকার!···বোধকরি জয়ন্তীর মুখের সঙ্গে মানান করেই কুৎসিত ভঙ্গিতে বলে উঠল জহর—ভাত তোমার যত সস্তা, কাগ তত নয় বুঝলে? বস্তিতে ঢুকে ঝি খুঁজে আনার ভারটা নিজেই নিও এবার।

—কি বললে? জয়ন্তী যেন স্তম্ভিত হয়ে যায়—এত বড়ো কথা বললে তুমি আমাকে?

—বলব না কেন? রুচি প্রকৃতিটা তো তাদের চাইতে কিছু উঁচুদরের নয় তোমার। বস্তির ঝিকে কোঁদলে হারাতে পার, আর এটুকু পারবে না?

অবশ্য এর পরে আর জয়ন্তীর কাছে সত্যিই নম্রতা কোমলতা আশা করা যায় না।

আশা করা যায় না—জহরের মেজাজের ওজন ঠিক থাকবে।

সকালের বাতাস বিদীর্ণ করে খোলাখুলি যে ভাষায় আলাপ চলতে থাকে তাদের, আর যাই হোক—গত রজনীর মধুরালাপের সঙ্গে তার মিল নেই! হয়তো কোন রাত্রি, কোন সন্ধ্যা, সকালের সঙ্গেই নয়!

সত্যিই তো—আর কবে, কখন জহর এমন স্পষ্ট ভাষায় জয়ন্তীকে ইতর বলে সম্বোধন করেছে? কবে বলেছে—'বেহুঁস', 'অকর্মা', 'অগোছালো'? কবে বলেছে—'সংসার করতে আসা ঝকমারি হয়েছিল তার'?

আর জয়ন্তই বা কবে এমন জলন্ত ভাষায় ধিক্কার দিয়েছে জহরের অক্ষমতাকে? কবে এমন তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করেছে জহরকে, 'বৌকে যে এতটুকু আয়েসে রাখতে পারবে না তার আবার বিয়ে করার শখ হয়েছিল কেন? কবে বলেছে—বৌ যার উদয়াস্ত দাসী-বাঁদীর মত খাটে, একটা চাকর রাখবার যার মুরোদ নেই, সে আবার কোন্ লজ্জায় বেলা আটটা অবধি পড়ে পড়ে ঘুমোয়?'

সবটাই আকস্মিক।

একটা দেশলাই কাঠির অভাবকে কেন্দ্র করে যে আগুন জলে উঠল কে জানে তার আসল বারুদটা কোথায় সঞ্চিত ছিল।—কথার স্থষ্টিকর্তা কি শুধুই রসনা? কথাকে কি জঠর যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না? মুহূর্তেই জন্মায় সে?

এরপর অস্নাত অভুক্ত জহর বেরিয়ে গেল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে, আর গুম্ হয়ে বসে থাকল জয়ন্তী সমস্ত কাজ ছড়িয়ে রেখে। কোলে ছেলে থাকলে এমন করে রাগ প্রকাশ চলে না, কিন্তু জয়ন্তীর সেদিকটাও শূন্য। বছর দুই আগে একটা মেয়ে হয়ে আঁতুড়েই মারা গিয়েছিল, আর হয় নি।

বসে থাকতে থাকতে মনে হল—সেই অকালমৃত সন্তানের জন্যে তেমন করে কোন দিন শোক করে নি জয়ন্তী। কিন্তু কেন করে নি? করাই তো উচিত। তা সে ত্রুটি এখন পূরণ করতেই বা দোষ কি?…পুরনো শোক স্মরণ করেও তো কাঁদে মানুষ!

কাঁদে বটে, কিন্তু কতক্ষণ পারে!

ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসল জয়ন্তী, কলে জল পড়ার শব্দে। সাড়ে তিনটে বেজে গেছে।

কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছিল তাহলে সে?

চারিদিক তাকিয়ে মনটা ছি ছি করে উঠল। কী তুচ্ছ কারণ নিয়ে কী কুৎসিত অভিনয় হয়ে গেল! এখন হঠাৎ যদি কেউ বেড়াতে আসে দেখলে বলবে কি? দালানে গতরাত্রের বাসী বাসনগুলো ছড়ানো, উঠানে সারদার হাতের পরিত্যক্ত ঝাঁটা বালতি গড়াগড়ি খাচ্ছে। জঘন্য অরুচিকর দৃশ্য!

চৈতন্য হল—সারদা আসবে না!

হয়তো তখন সারদার প্রস্থানজনিত আতঙ্কটাই অত এলোমেলো করে দিয়েছিল জয়ন্তীকে, অন্ধকার ভবিষ্যতের ছবিটা অলক্ষিতে মুখ বাড়িয়ে শাসাচ্ছিল বলেই ধৈর্যের সমতা রক্ষা হয় নি। কারণটা যাই হোক—আপাতত এখন কোমর বেঁধে কাজে লাগতে হবে।—জহর ফিরবার আগেই সংসারটা ফিটফাট করে ফেলে প্রস্তুত হয়ে নিতে হবে।…একটা মান-অভিমানের পালা তো তোলাই আছে।

সত্যি কী কাণ্ডই হল সকাল বেলা!

বেচারা জহর এক পেয়ালা চা পর্যন্ত খেয়ে যায় নি।…সারাদিন আফিসের খাটুনিটা তো খাটতে হচ্ছে তাকে, জয়ন্তী তো দিব্যি ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিল সময়টা।

সত্যি কম ঘুম ঘুমিয়েছে!

গতরাত্রের অনিদ্রার জের তো আছেই, তাছাড়া স্নানাহারের অভাবে কেমন একটা অপরিসীম ক্লান্তি এসে গিয়েছিল।

জহরের ফেরবার আগে সব সেরে নেবার তাড়ায় চটপট কাজে হাত লাগাল জয়ন্তী। বাসনপত্র মেজে ঘষে, দালান উঠোন ধুয়ে মুছে একেবারে গা ধুয়ে ঘরে ঢুকলো, কাপড় ছাড়তে ঢুকতেই বাসী জুঁইয়ের গন্ধটা যেন একটা ধাক্কা মারল! বিছানায় পড়ে রয়েছে মালা দুটো, কী লজ্জা, মাগো! ভাগ্যিস কেউ আসে নি!

কিন্তু ঘরে এত ধুলো কেন? এত কি ছড়ান চারিদিকে?

ওঃ, সকালবেলা যে তাড়াতাড়িতে ঘরটা পরিষ্কার না করেই চলে গিয়েছিল উনুন ধরাতে।···এ ধুলো সেই গতরাত্রের এক প্যাকেট ধূপের ভস্মাবশেষ, এ জঞ্জাল সেই 'মুখপোড়া' দেশলাই কাঠিগুলো।

ঘর পরিষ্কার করে জঞ্জাল ফেলতে গিয়ে হঠাৎ চোখটা ঠিকরে উঠল জয়ন্তীর। এ কী? সব কাঠিগুলো তো মুখপোড়া নয়, অনেকের মধ্যে একটা এখনও বারুদের টুপি মাথায় লাগিয়ে হাসি-মুখে তাকিয়ে আছে।

হ্যাঁ, ঠিক তাকিয়েই রয়েছে যেন?—কৌতুকের হাসি হেসে তাকিয়ে রয়েছে।

সকালবেলা ঘরটা সাফ করলেই দেখতে পাওয়া যেত ওকে। তিনশো চৌষট্টি দিন ঘুম থেকে উঠেই ঘর সাফ করে জয়ন্তী, শুধু আজই করে নি!

তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিস্ফারিত চোখে আরও বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। শুধু মনে নয়, সারা দেহেও যেন অদ্ভুত আপসোসের ছটফটানি এখন জয়ন্তী কী করতে পারে? সকালটাকে ফিরিয়ে আনতে পারে মাথা খুঁড়ে? ফিরিয়ে আনতে পারে অস্নাত অভুক্ত জহরকে সকালের পরিতৃপ্ত ঘুমের চেহারায়? ফিরিয়ে নিতে পারে নিজের উচ্চারিত কদর্য কটুক্তিগুলো?

কিছুই পারে না। মানে ও-সব কিছু পারে না।

বরং পারে এই কাঠিটিকে অবলম্বন করে রান্নাঘরে সমারোহের স্রোত বহাতে। এবেলার অরুচিকর 'রুটি তরকারির' প্রোগ্রাম বাতিল করে দিয়ে রাঁধতে পারে জহরের প্রিয় খাদ্য ভাত-ডাল, পোস্তর বড়া, মাছের অভাব মেটাতে ধোঁকা দিয়ে রাঁধতে পারে ধোঁকার ডালনা। জহর এসে দাঁড়াতেই সামনে ধরে দিতে পারে ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা। কী না পারা যায়? আরও কত কী! কিন্তু জহরকে খুশি করাই যায় শুধু? জব্দ করা যায় না?

সাত রাজার ধন একটি মানিক কাঠিটিকে নিয়ে রান্নাঘরে চলে এল জয়ন্তী। উনুনের সামনে পড়ে আছে ঘুঁটে-কয়লার চুপড়ি, কেরোসিনের বোতল। সেই খালি দেশলাইয়ের খোলটা। খানিকটা তেল ঢেলে দিয়ে কাঠিটা একবার ঘষে ফেলে দেওয়ার ওয়াস্তা!

আবার আজকের রাত মুখর হয়ে উঠতে পারে মেঘমুক্ত প্রেমের আবেগ-বিহ্বল কলগুঞ্জনে। গোড়ে-মালা না থাক, স্বামী মালা তো আছেই কোমল মাধুর্যে কণ্ঠকে বেষ্টন করতে। ধূপ না জ্বলুক, রূপকেও তো জ্বালানো যায় নূতনতর প্রসাধনের চতুর কারুকার্যে!

কলহান্তরিতার লীলাচাপল্যের প্রবল স্রোতে তলিয়ে যাবে বেচারা জহর!

কিন্তু ও কি? ও কি? অত কথা ভাবার পরও তুমি কি করছ জয়ন্তী? কেরোসিনের বোতলটা উনুনে না ঢেলে নিজের গায়ে উপুড় করছ কেন? সন্থ-পরা ধবধবে কাপড়-জামাগুলোর ওপর?—ভুলে ভুলে? এ আবার কি অনাসৃষ্টি ভুল তোমার?

সংসারের অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তু ফুরিয়ে যাওয়ার মত দামী খবরটা জহরকে যথা সময়ে বলতে ভুলে যাওয়ার খেসারত দিতে এমন অযথা সময় এত দামী জিনিসটা ফুরিয়ে ফেলতে হয়?

জহর এসে কি করবে তবে?

কী করলো?

ভুল সংশোধনের জন্য এমন অদ্ভুত ব্যবস্থা করবে জয়ন্তী, এ কথা সে কল্পনাও করে নি। আফিস থেকে ফেরবার সময় একেবারে ডজন দুই দেশলাই কিনে নিয়ে জয়ন্তীকে উপহার দিয়ে সকালের ব্যাপারটাকে লঘু পরিহাসের কোঠায় এনে ফেলবার তাড়ায় যে সে হাত চালিয়ে কাজ করেছে সারাদিন। এনেছিলও তো তাই।

জয়ন্তী, তোমার এই অদ্ভুত বোকামির কাহিনীটা যদি কারুর কাছে গল্প করতে যাই বিশ্বাস করবে সে? বিজ্ঞ হাসি হেসে বলবে না কি—"তা আর নয়? একটা দেশলাই কাঠি থেকে হঠাৎ এত বড় অগ্নিকাণ্ড? ভেতরে ভেতরে বারুদ মজুদ ছিল হে—"

কিন্তু আমি তো দেখলাম—সবটাই দেখলাম আমি, আমি জানি অবিশ্বাস করার কিছু নেই। জানি তুচ্ছ ওই কাঠিটা থেকেই সব। সকালে যদি ওটাকে কুড়িয়ে পেতে তুমি অথবা বিকেলে কুড়িয়ে না পেতে, আমার আর এ কাহিনী শোনাতে বসাবার দরকার হত না।

হয়তো—জীবনে আরও বহু ধূপ জ্বলত তোমাকে ঘিরে, বহু মালা উঠত তোমার গলায়, মালা আর ধূপের ধাপ পার হয়ে মর্যাদাময়ী গৃহিণী হয়ে উঠতে তুমি। তোমার ভারিক্কী মুখের দিকে তাকিয়ে কেউ তোমাদের দাম্পত্য-জীবনের মধ্য থেকে বারুদের গন্ধ আবিষ্কার করতে বসার কল্পনাও করত না।

গেরুয়াধারী, তবে জটাজুটধারী নয়।

আধুনিক সন্ন্যাসীরা যেমন হয়ে থাকেন তেমনি আর কি! চোখে চশমা, হাতে ঘড়ি, পায়ে হরিণের চামড়ার শৌখিন চটি। গেরুয়ার ঔজ্জ্বল্যে ধরা পড়ছে জমিটা রেশমী। বেনারসগামী ট্রেনের একখানি ফার্স্ট ক্লাস কামরায় একটা জানলার ধারে বসেছিলেন স্বামীজী।

সঙ্গে একটি দামী চামড়ার স্যুটকেস, খান-দুই ইংরেজী ম্যাগাজিন, একটি পাতলা কম্বলে জড়ানো পাতলা ধরনের দুটি মাথার বালিশ। ···কৃচ্ছ্রসাধনের কাল এঁদের পার হয়ে গেছে। বিলাসিতা আর কৃচ্ছ্রসাধনের ভেদ লুপ্ত হয়েছে। জ্ঞানী সন্ন্যাসী।

স্বামীজী বেনারসে চলেছেন একটি ধর্মীয় সম্মেলনে যোগ দিতে। তিনদিন ব্যাপী সেই সম্মেলনে নানা সম্প্রদায়ের সাধু সন্ত মিলিত হয়ে কিভাবে অধঃপতিত হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার সম্ভব সেই আলোচনা করবেন। হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেন এখনও ছাড়ে নি, তবে ছাড়ে ছাড়ে। চার বার্থের এই কামরাটার একটা বার্থ তাঁর দখলে, বাকী তিনজন দখলদার এখনও এল না দেখে একটু বিস্মিত হচ্ছিলেন স্বামীজী। যদিও সন্ন্যাসীর বিস্ময় বা কৌতূহল নিষেধ, তবু গাড়িটা প্রায় নড়ে উঠতে দেখে স্বামীজী উঠে দাঁড়িয়ে দরজার পাশে ঝোলানো রিজার্ভেশন স্লিপটা আর একবার দেখে নিলেন। হ্যাঁ স্লিপটা এখনও ঝুলছে। আঁকা-বাঁকা অক্ষরে লেখা রয়েছে মিসেস মুখার্জি, মিসেস ব্যানার্জি, এণ্ড্ মাস্টার চ্যাটার্জি। তিনটি সহযাত্রীর মধ্যে দুটি মহিলা আর একটি বালক দেখে বিশেষ খুশী হন নি স্বামীজী। কেবলমাত্র পুরুষ হলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, অবাঙালী হলেই আরও ভাল। কিন্তু এল কই এরা?

যথারীতি ঘণ্টা পড়া শেষ হয়ে গাড়িটা একবার ধাক্কা খেয়ে দুলে উঠতেই স্বামীজীর বুকটা নিতান্ত স্বার্থপর সংসারী জীবের মতই একটা স্বস্তির নিশ্বাসে দুলে উঠল। কোন কারণে এরা তাহলে এল না!

মন্দ কি! ভালই তো!

কিন্তু স্বস্তির নিশ্বাস শেষ হতে না হতেই···দুরন্ত ঝড়! গাড়ি নড়ে ওঠার পর হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল তিনটি প্রাণী, অপর একজন দাঁড়িয়ে থাকল প্লাটফর্মে। "ভাল করে বোস চাঁদু, উঃ খুব আসা গেছে!" বলল নিচে দাঁড়িয়ে থাকা যুবকটি।

বালকটি রুমাল নাড়বার জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। দরজায় দাঁড়িয়ে রুমাল নেড়ে চীৎকার করল, "গুড বাই অনিলদা!"··· ফর্সা মোটা-সোটা ছেলে,

সন্দেহ নেই ভাগ্যবানের ঘরের। হাফ প্যান্টের নিচে গোল গোল নিটোল পা দুখানি দেখলেই বোঝা যাচ্ছে শুধু আদরেই মানুষ। স্বামীজী তাকিয়ে না দেখলেও এক নজরে দেখে নিলেন। ভাবলেন তিনজনের মধ্যে কি সম্বন্ধ? যুবকটি বা কে হওয়া সম্ভব? পরক্ষণেই একখানা ম্যাগাজিন তুলে সামনে ধরলেন।

হ্যাঁ, একটু আশ্চর্য তিনি হয়েছেন।

তিনজন সহযাত্রীর একটি বৃদ্ধা, একটি তরুণী এবং একটি বালক, এ দেখে আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না, আশ্চর্য হলেন এই দেখে তরুণীটি গেরুয়াধারিণী। অথচ সঙ্গের দুজন এবং লটবহরের চেহারায় এটা বেমানান। অবশ্য তার গেরুয়া-বসনের মধ্যেও বেশ ছিমছাম ভাব। গায়ে সুন্দর ফিট করা পরিষ্কার একটি গেরুয়া ব্লাউজ, সিল্কের গেরুয়া থান পিঠে আঁচল ফেলে পরা। পায়ে গেরুয়ায় ছোপানো রবাবের চটি। রুক্ষ চুলেও কিছুটা পারিপাট্য। মোমে মাজা হাত দুখানি সম্পূর্ণ নিরাভরণ বটে তবে গলায় একটি উজ্জ্বল লাল প্রবালের মালা। চোখে সোনার ফ্রেমের চৌকো চশমা। চেহারা দেখলেই বোঝা যায় সম্ভ্রান্ত ঘরের।

'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব?'

না, বিদ্যুৎশিখা?

সবলে আবার মনকে ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠায় নিবিষ্ট করতে চেষ্টা করেন স্বামীজী। আশ্চর্য, এবকম অযথা কৌতূহল, অথবা এমন অশোভন তুলনার সাধ তাঁর তো কখনও হয় না। প্রতি নিয়ত হাজারে হাজারে মেয়ে দেখছেন, তাঁদের আশ্রমেই অহরহ আসছে কত সুন্দরী নারী, কত তরুণী কুমারী! তবে?···মনকে প্রশ্ন করে উত্তর জোটান স্বামীজী। এর কারণ বোধ হয় তরুণীর গৈরিকবাস। তাই হয়তো একটা সমগোত্র ভাব মনে জাগছে। গৈরিকবসনা সন্ন্যাসিনী? সে আলাদা! কিন্তু এমন একটি রঙে রসে উজ্জ্বল ঘরোয়া মেয়ের গৈরিক বাস, আশ্চর্য বৈকি!

ফ্যাশন নয় তো?

তা ই সম্ভব। কত রকম ফ্যাশনই তো আজকাল করছে মেয়েরা।

গাড়ি চলার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেটি যা দাপাদাপি সুরু করল সেটা দেখবার মত। জিনিসপত্রগুলো যথাস্থানে রাখবার ছুতোয় বেপরোয়া টানাটানি করে, দু-চারবার লাফিয়ে আপার বার্থে উঠে আর নেমে, এবং আবোল-তাবোল কথার স্রোতে গাড়ির মধ্যে বর্গীর হাঙ্গামা জুড়ে দিল সে।

গেরুয়া রং দেখে অভ্যস্ত বলেই কি তার এই দৃক্‌পাতহীন দুরন্তপনা? নইলে

স্বামীজীকে দেখলে—দেখেছেন তো তিনি নিতান্ত অবোধ শিশুও একটু স্থির হয়ে বসে থাকে।

তার কথার স্রোতের মধ্যে থেকে এদের কিছু কিছু তথ্য জেনে ফেলা যায়। স্বামীজী অনুমান করেন, এরাও চলেছেন 'নিখিল ভারত সনাতন ধর্ম সম্মেলনে'। এবং এও অনুমান করা যায় খেয়ালটা তরুণীরই। বৃদ্ধা তার পিতামহী, বালকটি ভাই।

স্বামীজী ভাবেন কুমারী না বিধবা? বালকটি যদি সহোদর হয় তাহলে বিবাহিতা অর্থাৎ বিধবা। কারণ পদবী আলাদা! অন্যরকম ভাই হলে অন্য কথা। আবার বৃথা কৌতূহল! মনকে চোখ রাঙান স্বামীজী।

বৃদ্ধা মহিলাটি নাতিকে নিবৃত্ত করবার অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু সে চেষ্টা বালির বাঁধ। তরুণীটি কিন্তু একেবারে স্তব্ধ নীরব। বোধ করি গাড়িতে স্বামীজীর উপস্থিতিই তার নীরবতার কারণ।

কিন্তু ভাইয়ের অদ্ভুত দুরন্তপনায় রীতিমত বিরক্ত যে হচ্ছিল তা বোঝা যাচ্ছিল ভুরুর কুঞ্চনে, ঠোঁটের আকুঞ্চনে। অবশেষে বোধ করি ধৈর্য রক্ষা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

"চাঁদু!"···তীক্ষ্ণ অথচ মৃদু একটি ডাক!

চাঁদু এক মুহূর্ত থামে।

"কাশী যাবার কথায় কি বলেছিলে?"

চাঁদু নীরব।

"বল কি বলেছিলে?"

চাঁদু গম্ভীর ভাবে বলে, "বলেছিলাম নিয়ে গেলে দুষ্টুমি করব না।"

"এটা তাহলে কি হচ্ছে?"

চাঁদু আরও গম্ভীর ভাবে বলে, "কি আবার হচ্ছে, খিদে পেয়েছে তাই! মানুষের যেন খিদে পায় না!"

মুখ ফিরিয়ে হাস্য গোপন করতে গিয়ে সদরেই হেসে ফেলতে হয়। সন্ন্যাসীর নিয়ম লঙ্ঘন করে স্বামীজীও হেসে ফেলেছেন। সৌম্য শান্ত মুখে হাসিটি কী উজ্জ্বল কী পবিত্র!

"ঠিক বলেছ খোকা! এঁরা ভুলে যাচ্ছেন যে মানুষের প্রধান ধর্মই হল খিদে পাওয়া।"

খোকা অর্থাৎ চাঁদু অভিযোগের সুরে বলে, "দেখুন তো, আপনি সাধু-সন্নিসী মানুষ, আপনিও যা বোঝেন এরা তা বুঝবে না।"

স্বামীজী তেমনি সৌম্যহাস্তে বলেন, "এরাও তো সাধু সন্নিসী!"...এই পরিহাসটুকুর লোভ সংবরণ করতে পারলেন না কেন কে জানে!

"ছাই সন্নিসী! জামাইবাবুকে খুঁজবে বলে তাই—"

"চাঁদু!"

এবারের স্বর আরও মৃদু আর আরও তীক্ষ্ণ।

"আচ্ছা বাবা আচ্ছা, খেতেও চাই না কথা কইতেও চাই না আমি শুচ্ছি।" বলেই অপ্রতিভ চাঁদু বোধ করি লজ্জা ঢাকবার জন্যেই ঝুপ করে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে, বলা বাহুল্য গাড়ির দেয়ালের দিকে মুখ করে। জামাইবাবুর প্রসঙ্গ যে অ-বক্তব্য এ তো চাঁদুর অজানা নয়, তবু কেনই যে ছাই বলে ফেলে। ...দিদির বিয়ের এক মাস আগে জন্মেছে সে, তবু এমন ভাবে জামাইবাবুর কথা বলে বসে, মনে হয় যেন কতই দেখেছে তাকে।...অবশ্য দোষও নেই বেচারার, ক্রমাগত ঠাকুমার কাছে খেদ আর আক্ষেপোক্তি শুনতে শুনতে এ বিষয়ে পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছে সে।...কেউ চাঁদুর দিকে তাকাচ্ছে না, কেউ চাঁদুর কথা ভাবছে না। দিদি একখানা বই নিয়ে পড়তে সুরু করে দিয়েছে।

চাঁদুর আর সহ্য হয় না। মুখ ফিরিয়ে থাকতে থাকতেই হঠাৎ বলে ওঠে, "বকবার কথা মনে থাকে, আর রেলগাড়ি চড়লেই যে আমার খিদে পায় তা কারুর মনে থাকে না।"

"ক ঘণ্টা আগে খেয়ে বেরিয়েছিস চাঁদু?"

"জানি না!"

"কিন্তু এখন খাবার কোথায় পাই বল?"

"অ্যাঁ!" চাঁদু চমকে উঠে বলে, "কিচ্ছু খাবার আনো নি?"

"না তো!"

'তাহলে সারাদিন কি এত গোছালে কচুপোড়া"?

তরুণী এতক্ষণ নীরব ছিল তো ছিল, এখন আবার বুঝি কথার খেলায় মাততে চায়। তাই গম্ভীর মুখ করে বলে, "গোছালাম আমার নিজের জিনিসপত্র। তোর খাবারের কথা আমার মনেই ছিল না।"

"মনেই ছিল না? বাঃ! বেশ!"

এতক্ষণ ঠাকুমা সকৌতুকে তাকিয়ে বসেছিলেন, এবার বলেন, "কি হচ্ছে রাণী! কেন ক্ষ্যাপাকে আরও ক্ষ্যাপাচ্ছিস? ...ভালও লাগে। ...না রে চাঁদু অনেক খাবার এনেছি। খিদে তো পাবেই—তখন স্ফূর্তির চোটে কিছু খেয়েছে

নাকি!...বলেই ঠাকুমা সঙ্গে আনীত একটি বোতল থেকে গঙ্গাজল ঢেলে হাত ধুয়ে একটি বড় পিতলের কৌটো টেনে বার করে হঠাৎ স্বামীজীকে উদ্দেশ করে বলে ওঠেন, "বাবা, অপরাধ না নেন তো একটা কথা বলি—"

স্বামীজী সচকিতে বলেন, "আমায় বলছেন?"

"...হ্যাঁ বাবা, বলছি কি সঙ্গে ভাল সন্দেশ আছে, বাবার সেবা চলবে?"

তরুণীটির কণ্ঠে অস্ফুট একটা প্রতিবাদ।

ঠাকুমার প্রগলভতায় তার অস্বস্তি না হয়ে পারে না। সাধু মানুষের সঙ্গেও ওঁর আত্মীয়তা পাতানো চাই। মুস্কিল বাবা।

স্বামীজী হাতের বই মুড়ে স্মিত মুখে বলেন, 'আজ্ঞে না।'

"খুব ভাল করে আনা বাবা—"

"মায়ের হাতের সব জিনিসই ভাল মা, কিন্তু অসময়ে খাওয়ার অভ্যাস নেই।"

বৃদ্ধা দুঃখিত স্বরে বলেন, "সামান্য কিছু খেলেও—"

"আঃ ঠাকুমা, তুমি মানুষকে অত বিরক্ত কর কেন বল তো?"

স্বামীজী মুহূর্তের জন্য তরুণীর বিব্রত বিরক্ত মুখের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিয়ে বলেন, "বিরক্ত কিসের? মায়ের জাত—সন্তানকে খাইয়েই খুশি। বিধাতা-প্রদত্ত প্রকৃতি।"

"আপনি জানেন না—আমার ঠাকুমাটিকে বিধাতা ও প্রকৃতিটি ভুলে ভুলে চারবার দিয়ে ফেলেছেন।"

সামান্য কৌতুকের হাসি হাসেন স্বামীজী।

চাঁতুর খাওয়া-পর্ব চলতে থাকে।

ঠাকুমা গল্প জুড়ে দেবার চেষ্টা করেন।

"বাবা বোধ হয়ে বেলুড় মঠের?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"বাবার কি কাশী পর্যন্তই যাওয়া হবে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ!"

"ওখানেই থাকা হয়?"

"আজ্ঞে না। দিন চারেকের জন্যে যাচ্ছি।"

"কোথায় ওঠা হবে?"

"যে কাজে যাচ্ছি, সেখানে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।"

"কোন প্রচারে যাচ্ছেন বুঝি?"

রাণীর মুখে আবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে বিরক্তির ছাপ। স্বামীজী কিন্তু সমান প্রসন্ন।

"প্রচার? তাও বলতে পারেন। নিজের দলের মত প্রচার!"

"ওই হিন্দু ধর্ম সম্মেলনে না কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ!"

রাণীর মুখে আনন্দ আর বিস্ময়! যা অনুমান করছিল ঠিক তাই!

ঠাকুমা মহোৎসাহে বলেন, "আমরাও তো ওইখানেই যাচ্ছি। আমার এই নাতনীর বাতিক। আর বাতিকই বা বলবো কি, দুঃখের বরাত। যেখানে শুনবে সাধু-সন্ন্যাসীর মেলা সেখানে ছুটবে—"

"ঠাকুমা, বৃথা ওঁর শান্তির ব্যাঘাত করছ কেন"?

ঠাকুমা নাতনীকে ভয় করেই থাকেন, কিন্তু আজ সহসা যেন বুকের বল বেড়ে গেছে তাঁর, ধমকের সুরে বলেন, "তুই থাম দিকি! শুধু ছুটে ছুটে দেশে-বিদেশে ধাওয়া করলেই হবে?…খোঁজ-পত্তর না করলে?…শুনুন বাবা, আমার এই নাতনীটির আজ আট বছর হল বিয়ে হয়েছে, বিয়ের পরই জামাই নিরুদ্দেশ! কেউ বলে হিমালয়ে তপস্যা করতে গেছে, কেউ বলে 'নিলয়ানন্দ' না কি যেন নাম নিয়ে বেলুড় মঠের শিষ্য হয়েছে—"

স্বামীজী অস্ফুট একটা বিস্ময়ের শব্দ করে বলেন "খোঁজ নেন নি ভালো করে?"

"করেছি বৈ কি বাবা, তবে তেমন করে আর কে করবে? বাপ নেই, শ্বশুর নেই!"

"ঠাকুমা—" রাণীর কণ্ঠে হতাশ স্বর—"আমি শুচ্ছি!"

টক করে আপার বার্থে উঠে পড়ে একেবারে চাদর চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ে রাণী।

"দেখুন—" স্বামীজী মৃদু শান্ত কণ্ঠে বলেন, "উনি বোধ হয় এসব আলোচনায় ক্লেশ পাচ্ছেন।"

"পাক। ক্লেশ দুঃখ তো ওর সঙ্গের সাথী। আপনাকে যখন পেয়েছি তখন একটু অনুসন্ধান না করে ছাড়ব না। আপনি তো—মানে আপনার—মনে কিছু করবেন না বাবা, নাম?"

"জ্ঞানানন্দ!"

"মা বাপের ঘর শূন্য করেই যে সব চলে আস বাবা?"

"ব্রহ্মাণ্ড জুড়েই তো আমাদের পিতামাতা মা!"

"জানি বাবা—" বৃদ্ধা নিশ্বাস ফেলে বলেন—"ওসব বড় বড় কথা শুনেছি তো

ঢের, মন মানে কই ? ...সে যাক বলছিলাম কি—আপনাদের খাতাপত্তর দেখে যদি একবার খোঁজ করেন ওই নামে কেউ আছে কি না।"

"কি নাম বললেন ?"

"নিলয়ানন্দ !"

"নিলয়ানন্দ !" স্বামীজী মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলেন, "আমাদের এলাহাবাদ ব্রাঞ্চে "নিরয়ানন্দ" নামে একজন আছেন, বয়েস কম, শুনেছিলাম বিবাহিত বলে মহারাজ প্রথমে কিছুতেই গেরুয়া দিতে রাজী হন নি অবশেষে মিনতিতে পড়ে—"

না দেখলেও বুঝি অনুভব করেন স্বামীজী চাদর ঢাকার অন্তরালে একটি হৃদয় স্পন্দিত হয়ে ওঠে !

ঠাকুমা ব্যগ্রভাবে বলেন, "তাহলে হয়তো ওই নামই হবে। আপনি একটু খোঁজ করবেন বাবা ?"

"করতে পারি।" স্বামীজী ঈষৎ ইতস্তত করে বলেন, "কিন্তু তিনি যখন স্বেচ্ছায় এ রকম স্ত্রী সংসার ইত্যাদি ত্যাগ করে বৈরাগ্যের পথে গিয়েছেন, তখন তাঁর খোঁজ করে লাভ কি ? তাছাড়া—আমাদের হল জনসেবার ব্রত। ছোট ছোট সংসারের গণ্ডির বাইরে বড় সংসার করছি। আমরাও তো একরকম সংসারী।...আক্ষেপ কিসের ?"

"সে কথা তো আমিও বলি। কিন্তু ও হতভাগীকে কে বোঝাবে বাবা ! ও বলে একবার দেখা করে জিজ্ঞেস করতে চাই কেন এরকম করলে ?"

স্বামীজী রীতিমত অস্বস্তি অনুভব করেন, এ যেন আড়ালে আড়ি পেতে কারও গোপন কথা শোনা। অথচ এই প্রগলভা বৃদ্ধাকে থামাবেনই বা কি করে। অতএব মৃদু হাস্যে বলেন, "এ কী একটা প্রশ্ন হল মা ? ভগবান বুদ্ধ কেন করেছিলেন ? শ্রীচৈতন্য কেন করেছিলেন ?"

"সেই তো কথা ! কিন্তু আমারও যে মস্ত জ্বালা। কোনদিকে কোন অভিভাবক নেই, আমি মরলেই সব ফর্সা ! নাতনীকে তো দেখলেন, যৌবনে যোগিনী। ও বলে, যদি কখন তাঁর দেখা পাই, যেন তাঁর সামনে দাঁড়াবার যোগ্য হতে পারি। ঘৃণায় না মুখ ফিরিয়ে চলে যান।...তাই এই বেশ ! সেই দুদিনের দেখা স্বামী যেন ধ্যান জ্ঞান।...তার ফটো নিয়ে পুজো করছে, ধুপ জ্বালছে।"

স্বামীজী এ প্রসঙ্গের শেষ করতেই বোধ করি তাড়াতাড়ি বলেন, "আচ্ছা আমি খোঁজ করব। কিন্তু এই একাগ্রতা, এই নিষ্ঠা একজন মানুষের প্রতি আরোপ

না করা, আত্মানুসন্ধানে ব্যাপৃত হতে পারলে যে উনি নিজেই—"

ঠাকুমা বাধা দিয়ে আক্ষেপের সুরে বলেন, "হায় কপাল! সেই বয়েস কি ওর? না সত্যিই সেই মন? এ শুধু বৈরাগ্যের ছল! আপনার মনকে আপনি ভোলানো!"

"রাত হয়েছে মা শুয়ে পড়ুন, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি সন্ধান করব।"

বলে একটা আলো নিভিয়ে দিয়ে নরম নরম দুটো বালিশে মাথা ডুবিয়ে কম্বলখানা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েন স্বামীজী।

বরাবরের মত নিশ্চিন্ত শান্তির ঘুম আসে না।

বৃদ্ধার শেষ কথাটা বারবার মনের মধ্যে উচ্চারিত হতে থাকে।…"এ শুধু বৈরাগ্যের ছল! আপনার মনকে আপনি ভোলানো!"

জগৎ জুড়ে তো শুধু এই মন-ভোলানোই চলছে!

অপরের চোখেও তাহলে ধরা পড়ে?

স্বামীজীর জন্য অভ্যর্থনার আয়োজন আছে। অদূরে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষমাণ পরিচিত ছেলে দুটিকে হাতের ইশারায় আর একটু অপেক্ষা করতে বলে স্বামীজী বৃদ্ধাকে প্রশ্ন করেন—"মায়ের এখানে থাকার ভাল ব্যবস্থা আছে তো?"

"তা আছে। এখানে বাড়ি আছে আমাদের। কর্তার বাতিক ছিল, সকল বড় বড় তীর্থস্থানে বাড়ি করে রেখে গেছেন। ভোগ করবারই কেউ নেই। শুধু বলছিলাম কি— রাণীই বলছিল, রাণী তুই নিজেই বল না?"

ঠাকুমার গতরাত্রির আলোচনার বহরে রাণীর মুখ তোলাই দায় হচ্ছিল, তবু সে যেন কিছু শোনে নি, সে যেন ঘুমোচ্ছিল, এই মনোভাব এনে সপ্রতিভ ভাবে বলে, "শুনছি নাকি দশ বারো হাজার প্রতিনিধির সমাগম হবে?"

"বেশিই হবে—" স্বামীজী হাসেন—"আমাদের দেশে সম্প্রদায়ের তো সংখ্যা নেই?"

"বড় বড় স্বামীজী মহারাজদের সঙ্গে ছোট-খাটরাও আসবেন তো?"

"মানুষের মধ্যে বড়-ছোটর কি আছে? আসবেন অনেকেই"।

"এসব জায়গায় আমাদের মত বাজে লোকের তো প্রবেশ-অধিকার নেই—"

"অধিকার অবশ্যই আছে, তবে স্থান-সঙ্কুলানের প্রশ্নই প্রধান।"

রাণী আরও সপ্রতিভ ভাবে বলে, "সেই জন্যই তো আপনাকে বিরক্ত করা। ঠাকুমার কবলে পড়ে তো কাল অনেক বিব্রত হয়েছেন, আজ আবার আমার—"

বলেই থেমে যায় রাণী, মুখের রঙ রাঙা হয়ে ওঠে।

স্বামীজী সামনের ছেলে দুটির একটিকে ইশারায় ডাকেন, কি দুএকটি কথা বলেন, এদের ঠিকানা জেনে নিয়ে মনে রাখতে অনুরোধ করেন তাকে, তারপর এঁদের জানান এই ছেলেটিই গিয়ে তাঁদের নিয়ে আসবে এবং যতটা সম্ভব সুব্যবস্থা করে দেবে।

নমস্কার প্রতি-নমস্কারের পালা চুকে যাবার পরও বৃদ্ধা একটু এগিয়ে এসে বলেন, "নাতনী লজ্জায় বলতে পারে নি বাবা, বলছিল এলাহাবাদ থেকে যে দল আসবেন, তাঁদের একবার দেখতে পাওয়া সম্ভব কি না।"

"চেষ্টা করব মা, খুব চেষ্টা করব।"

তিন দিন ব্যাপী সম্মেলন।

সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায় তিন বারে।

বারে বারেই দেখা হয়ে যায়, ব্যস্ত যাতায়াতের পথে, প্যাণ্ডেলে ঢোকবার গেটে ···হয়তো দুটি একটি কথা, হয়তো শুধু একটি সস্নেহ আর একটি সশ্রদ্ধ দৃষ্টির বিনিময়। হয়তো দ্রুত ভাষায় এলাহাবাদের দলের সন্ধান নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দান।

স্টেশনে ভিড়, পথে ভিড়···কেউ বলছে বিশ হাজার লোক জড়ো হয়েছিল, কেউ বলে পঞ্চাশ হাজার। অনুমানের মা-বাপ নেই। জোয়ারের জলের মত যে ভিড় এসেছিল, ভাঁটার টানের মত সরেও গেল সে ভিড়। কাশীর পথ আবার কিছু সহজ হয়েছে। স্বামীজী নিজের প্রযোজনে দুএকদিন থেকে গেলেন।

জ্যোৎস্নায় একতলার ছাদে বসে আছেন ঠাকুমা আর নাতনী। চাঁদু গেছে বাইরে খেলতে। নতুন বন্ধু জুটেছে বুঝি। বাইরে দাসী ছিল বসে, তার সঙ্গে স্বামীজী এলেন। "এসেছেন"? ভূলুণ্ঠিতা দুটি নারীর কাছ থেকে তাড়াতাড়ি সরে স্বামীজী বলেন, "কি করছেন? সন্ন্যাসীর প্রণাম গ্রহণ নিষেধ। শুনুন স্বামী 'নিরয়ানন্দকে' নিয়ে এসেছি, বাইরে গাড়িতে অপেক্ষা করছেন।"

বৃদ্ধা আবেগ-বিগলিত স্বরে বলেন, "নিয়ে এসেছ? অ্যাঁ! পরিচয় কিছু পেয়েছ বাবা?"

"পেয়েছি। তিনি পরিচয় স্বীকার করেছেন। তিনিই আপনাদের—"

"বাবা! বাবা! তুমি কি স্বয়ং দেবতা? তুমি—"

"শুনুন!···অত অধীর হবেন না। এঁদের একবার দেখা সাক্ষাৎ করতে দিন। তিনি কথাচ্ছলে আমার কাছে তাঁর ভিতরের ইচ্ছে ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন

সন্ন্যাস-জীবনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। এঁকে—তিনি সম্মেলনে দেখেছেন চিনতেও পেরেছেন। হয়তো অনুরোধ করলে তিনি আবার সংসার-আশ্রমে ফিরে যেতে পারেন।"

"বাবা! কি কথা শোনালে!"

কৃতজ্ঞ বৃদ্ধার মুখে এর বেশি আর কথা যোগায় না! ব্যস্ত হয়ে ছুটে যেতে চান তিনি নিচের তলায়। কিন্তু তাঁর আঁচল টেনে আটকে রাণী স্থিরস্বরে বলে "কিন্তু তেমন অন্যায় অনুরোধ আমরা করব কেন?"

"আহা সে তো নিজেই—"

"থামো ঠাকুমা। আপনি শুনুন—তাঁকে বলবেন তাঁকে উচ্চ মার্গ থেকে নামিয়ে আনবার স্পৃহা আমার নেই।"

"বেশ তো আপনি নিজেই বলবেন সে কথা।"

"আমি দেখা করবো না।"

"দেখা করবি না?"

"না"!

"দেখা করবেন না?"

"না!"

"কিন্তু—"

"এর মধ্যে আর কিন্তু নেই। নিজের মন স্থির করে ফেলেছি আমি। আমি সন্ন্যাস-মন্ত্রে দীক্ষা নেব।"

"কিন্তু সে তো শুধু আপনার মনকে আপনি ভোলানো।"

সহসা দুটি কালো চোখে বিদ্যুতের অগ্নিশিখা জ্বলে ওঠে।

"সে তো সবাই ভোলাচ্ছে।"

"ওরে হতভাগী", ডুকরে ওঠেন ঠাকুমা—"একবার দেখা কর্?"

"না!"

সাদা রিবনের আলগা ফাঁসে জড়ানো ফাঁপানো চুল উড়িয়ে, আর পাঁচ থাকের ফ্রিল দেওয়া সাদা অর্গ্যাণ্ডির ফ্রক উড়িয়ে ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরল মিষ্টি। স্কুল-ফেরৎ ঘাম ঘাম মুখে সকালের রোদের ঔজ্জ্বল্য।

—মা মা, আমাদের স্কুলে আজ কি হল জান ?

মন্দিরা মেয়ের কবল মুক্ত হতে হতে হেসে ফেলে বলে—জানব আর কি করে, জানবার আগেই তো 'লৌহভীম চূর্ণ' হয়ে যাচ্ছে।

মন্দিবার পরিচ্ছদেও সাদার একাধিপত্য। তুলির আঁচড়ের মত সরু একটু কালো বর্ডারও রাখে নি মন্দিরা পরিধেয় বস্ত্রেব প্রান্তসীমায়। নির্মম হস্তে নির্মূল করে ফেলেছে সবটুকু। মেয়ের মতই বকের পালকের মত সাদা আবরণে মণ্ডিত সে। কিন্তু মুখের হাসিতে নেই সে শুভ্রতা, সে ঔজ্জ্বল্য।

আনন্দের হাসি, তবু মলিন।

বিষাদ-ম্লান একটি ছায়া যেন ঠোঁটের গঠনভঙ্গির উপর একটি স্থায়ী রেখাপাত করে রেখেছে। সমস্ত হাসি আর কথার ওপর সেই বিষণ্ণ বিধুর ছায়া। এ ছায়া দেখা অভ্যাস হয়ে গেছে মিষ্টির। সে মাকে ছেড়ে দিয়ে একটা টুলের উপর বসে পড়ে পা দোলাতে দোলাতে বলে—এক নম্বর হচ্ছে মুটকী দিদিমনি—আজ একেবারে—হি হি হি—পা পিছলে আলুব দম! হি হি হি!

ওর বলার ধরনে মন্দিরারও যে হাসি পাচ্ছিল না তা নয়, তবু গম্ভীর মুখে বলে—মিষ্টি, ফের ? ফের তুমি দিদিমনিদের বিষয় এ ভাবে—

মিষ্টি 'বেচারী বেচারী' গলায় বলে—বাঃ আমি কি করব ? উনি শুধু শুধু জুতো স্লিপ করে পড়ে গেলেন কেন বড়দিদিমনির জলের কুঁজোর ওপর ? মেয়েরা আড়ালে ওঁকে মুটকী দিদিমনি বলে ডাকে বলে লাগিয়ে দিতে গিয়েছিলেন কেন বড়দিদিমনিকে ? ঠিক হয়েছে—আচ্ছা হয়েছে!

বাঁধ-ভাঙা হাসিতে নিজেই ভেঙে পড়ে মিষ্টি।

এই নিয়ে এত হাসি! এই ওর ঘোরালো করে বলার মত কাণ্ড! কিন্তু এত চাপল্য তো ভাল নয়!

এত ছেলেমানুষি কেন এখনও ?

কথাটা ভাবতে চেষ্টা করে মন্দিরা, সব সময় করে। কিন্তু উড়ন্ত প্রজাপতির মত হালকা এই মেয়েটাকে শাসন করার কথা ভাবাই যায় না, এটা ভাল নয়, ওটা ভাল দেখায় না, এ বোধের বালাই মাত্র যার নাই, তাকে কিই বা বলবে ? অথচ বাড়ন্ত গড়নের গুণে বয়সের চাইতে বড় বৈ ছোট দেখায় না মিষ্টিকে।

মেয়ের হাসিতে যোগ না দিয়ে গম্ভীর মুখে বসে থাকবার চেষ্টা করে মন্দিরা সেইটুকুই শাসন। অতএব একটু প্রকৃতিস্থ হতেই হয় অপরাধিনীকে।

মন্দিরা এবারে বলে—এটা তো এক নম্বর! দু নম্বরটা কি?

মিষ্টি এবারে অবহিত হয়ে বলে—ওঃ হো হো! হ্যাঁ—হয়েছে কি মা, একট লোক কি জন্যে যেন কেরাণীবাবুর কাছে এসে বসেছিল, আর আমরা তখন মাইনে দিতে গেছি। ওমা, লোকটা বোকার মত খালি আমার দিকেই তাকিয়ে আছে! আছে তো আছেই। আমার এত হাসি পাচ্ছে, কিন্তু হাসতে তো আর পারি না। খালি অন্য দিকে তাকাচ্ছি, আবার একটু একটু দেখছি চোখ পিটপিটিয়ে আরে, ঠিক তেমনি করে তাকিয়ে আছে!

মন্দিরা এই অপ্রত্যাশিত সংবাদ-পরিবেশনের বাহারে একবার চম্‌কেই স্তব্ধ হয়ে তাকিয়েছিল মেয়ের মুখের দিকে। কি এ? সারল্য? না ছলনা?

নাঃ, একেবারে নির্মল সুন্দর ভোরের আলো।

এই মেয়েকে সে বড় হওয়ার অপরাধে শাসন করতে চায়? মেয়ে থামতে নিতান্ত সহজ ভঙ্গিতে বলে—ওমা! কেন? কিরকম লোক?

সহজ ভঙ্গিটা অবশ্য খুব সহজ নয়, চেষ্টাকৃত।

—লোক আবার কি রকম? মিষ্টি অগ্রাহ্য ভরে বলে—লোকের মতন, আবার কি? সাদা পাঞ্জাবি পরা সাদা ধুতি পরা।

ধুতি পাঞ্জাবি! তাহলে বুড়ো হওয়াই সম্ভব।

মন্দিরা ঈষৎ আশ্বস্ত স্বরে বলে—মানে কত বড় তাই বলছি। বুড়ো?

—ওমা বুড়ো কেন হবে? মিষ্টি আবার হাসিতে ভেঙে পড়ে—বুড়ো হতে যাবে কি দুঃখে? আহাঁ! কি সুন্দর কালো কুচকুচে চুল! কেমন ফরসা। খুব ভাল দেখতে।

বুকটা ধড়াস করে ওঠে মন্দিরার। তাড়াতাড়ি বলে—ওঃ তাই বুঝি যাকগে এখন মুখ-টুখ ধো! খাবার দেরি হয়ে যাবে।

—যাক গে আমার খিদেই পায় নি। এত টিফিন দাও, উঃ! পেট ভরেই থাকে! আসল কথাই শুনলে না। সব মেয়ে চলে গেলে লোকটা আমাকে ডাকল—

মন্দিরা এবার ঈষৎ কঠিন স্বরে বলে—সব মেয়েরা চলে গেলেও তুমি রইলে কেন?

—বাঃ আমি যে ঠেলাঠেলি করতে পারি না।

—পারা উচিত! ঠেলাঠেলি করে নিজের কাজ না পারলেই শেষ পড়ে থাকতে হয়।

—হোক গে বাবা! মিষ্টি আর একবার 'রিবনের বো' দুলিয়ে বলে—কি হল তাই শোনই না। আমাকে ডেকে বলল—তোমার নাম কি! আমি বলে দিলাম মিষ্টি রায়, তখন ও আস্তে আস্তে বলল কি মিষ্টি! মিষ্টি! বৃষ্টি মিষ্টি!··· আমার তো হাসিতে পেট ফেটে যাচ্ছে। কবিতা যেন। তারপর আমার বাবার নাম জিজ্ঞাসা করল। যখন আমি বললাম স্বর্গত শ্রী—

মন্দিরা বাধা দিয়ে বলে—আচ্ছা তুমি কি বললে তা জানি। সে কী বলল শুনি?

—সে? সে চমকে উঠে বলল, এ্যাঁ! মারা গেছেন? তারপর আমাদের বাড়ির ঠিকানা জানতে চাইল।

—বললি?

—বলব না? বাঃ!

—বলেছিস বেশ করেছিস! এখন স্কুলের পোশাক-টোশাক ছাড়। এ প্রসঙ্গের উপর যবনিকা পাত করে দেয় মন্দিরা।

বেশী কৌতূহলই অপরের সন্দেহের জনক। কিন্তু মনে মনে এক অদ্ভুত অস্বস্তি। কে লোকটা? সমরেশকে চিনত বোঝা যাচ্ছে। মিষ্টির দিকে হাঁ করে তাকিয়েছিল কেন? বাপের চেহারার তো লেশমাত্র মিল নেই মেয়ের, বরং সকলেই বলে সে নাকি অবিকল মায়ের প্রতিমূর্তি। তবে কি মন্দিরারই চেনা? কে তাহলে? মিষ্টি বৃষ্টি! অকারণ এ দুটো শব্দ একত্রে উচ্চারণ করেছে কেন? একি শুধুই ছন্দের খেয়াল? না—'বৃষ্টি' নামধারিণী এক কিশোরীকে যে চিনত সে?···না, 'বৃষ্টি' নামের মেয়ে নয়, তার নিজেরই দেওয়া নাম! সেই এক এলোমেলো বৃষ্টির দিনে—যে মেয়েটা—

দূর তাই কখনও হয়? সে এখানে কোথা থেকে? অসম্ভব!

ভাবব না মরুক গে! বলে উড়িয়ে দিতে চাইলেও, ভাবনাকে কিছুতেই আয়ত্তে আনতে পারে না মন্দিরা, সে নিজের পদ্ধতিতে বেড়েই চলে।

আর—আর বোধ করি লোকটা কে, জানবার ইচ্ছায় মন্দিরার ইচ্ছাশক্তির জোরেই লোকটা পরদিন বিকেলে মন্দিরার বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ায়!

আবার তেমনি করে চুল উড়িয়ে ছুটে আসে মিষ্টি—মা, মা, কালকের সেই লোকটা!

—অদ্ভুত সাদৃশ্য !

মন্দিরা কৃশমুখে ঈষৎ হেসে বলে—হ্যাঁ সবাই বলে বটে, ও ঠিক আমার মত দেখতে হয়েছে।

—সবাই বলে ? সুকান্ত ওর রোগা ফরসা মুখটার দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টি ফেলে বলে—কারা বলে ?

—কেন, যে দেখে ওকে আর আমাকে !

—যারা তোমায় শুধু এখন দেখছে, যারা তোমায় তখন দেখে নি তারাও ?

—তা জানি না। হেসে ফেলে বলে—কে কখন থেকে দেখা সুরু করেছে, তার সাল তারিখ তো লিখে রাখি না ?

—আমার কিন্তু লেখা আছে। সাল তারিখ ঘণ্টা মিনিট !

—ভাল ! পরীক্ষায় ফুল মার্ক পাবে।

মুখের সেই চিরস্থায়ী বিষণ্ণ বিধুর ছায়াটা কি ফিকে হয়ে গেছে মন্দিরার ? মেঘমুক্ত সূর্যের মত হাসিটা উজ্জ্বল দেখাচ্ছে কেন ?

—ওকে দেখেই আমি তোমাকে আবিষ্কার করতে পারলাম !

—খুঁজে বেড়াচ্ছিলে নাকি ?

—অতটা বললে সত্যের অপলাপ হবে, তবে আবিষ্কার করে বড ভাল লাগল বৃষ্টি !

বৃষ্টি !

মন্দিরা ভীরু নয়, তবু বুকটা ওর একটু কেঁপে উঠল বৈ কি। আর মনে হল, মেয়েটা কী অদ্ভুত ছটপটে, কোথায় যে উধাও হয়ে গেল।

আবার আগের মত নির্নিমেষ নেত্রে তাকিয়ে থাকে সুকান্ত মন্দিরার আনত মুখের উপরে আঁকা সরু সিঁথির অস্বাভাবিক শুভ্রতার দিকে। যেন ও গবেষণা করছে কুমারীর সিঁথির চাইতে বিধবার সিঁথি কি বেশী সাদা ? তা নইলে এমন প্রখর হয়ে চোখে ঠেকে কেন !

—আমার মেয়ের ভাষায় বলি—মন্দিরা মৃদু হেসে বলে—বোকার মত কী দেখছ হাঁ করে ?

বিহ্বলভাব সরে যায়, আত্মস্থ হয়ে ওঠে সুকান্ত। তাই সেও মৃদু হেসে বলে—ভাবছি কি হতচ্ছাড়া দেশেই জন্মেছ। অন্য দেশে তোমার মত এমন একটি সুন্দরী, ধনী বিধবা কত লোভনীয়।

—আচ্ছা থাক যথেষ্ট হয়েছে ! বাচনভঙ্গিটি ঠিক তেমনি আছে দেখছি।—

—না থাকবে কেন ? সবাই তো তোমার মত বদলায় না !

—তা মানুষ তো আর স্টিল ফটো নয় ?

—তা বটে !

—যাক, অনেক বাজে কথা হয়েছে—এবার পারিবারিক খবরাখবর শুনি ?

—আমার কাছে ওইগুলোই বাজে।

মন্দিরা হেসে ফেলে কি একটা বলতে যাচ্ছিল, এই সময় আবার মিষ্টি ছুটে এল উদ্দাম ভঙ্গিতে। এসেই মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে দুজনকে, যাকে বলে অবলোকন, তাই করেই বলে ওঠে—মা একটা কুকুরছানা কিনবে ?

—কুকুরছানা !

—হ্যাঁ হ্যাঁ কুকুরছানা ! সুন্দর দেখতে, কী লোম ! পুতুলের মত চোখ !

—কোথায় সে ?

—ওই তো বাইরে ! চল না মা কিনবে !

মন্দিরা সুকান্তর দিকে ফিরে বলে—দেখছ ?

সুকান্ত জবাব দেয়—শুধু দেখছি না, দেখে অবাক হচ্ছি। মনে হচ্ছে তোমার ছেলেবেলাটাই ফের দেখছি।

মিষ্টি ঈষৎ সন্দিগ্ধ ভাবে বলে—কি বলছেন ?

—কিছু না। কিন্তু কুকুরছানার বিক্রেতা কে ?

—ওই ওখানের লালবাড়িটার চাকর ! ওদের কুকুরের বাচ্চা হয়েছে—চল না মা !

—মিষ্টি ! কী ছেলেমানুষি হচ্ছে !

সুকান্ত বলে—ছেলেমানুষ কি বুড়োমানুষি করবে ? চল তো দেখি, কেমন কুকুরছানা তোমার ?

ব্যস ! খানিক পরেই সগৌরবে সগুক্রীত মালটি সজোরে বুকে চেপে মিষ্টির আবির্ভাব—মা, সুকান্তমামা তোমার চাইতে হাজার হাজার গুণ ভাল। বুঝলে ? চিরকালের মত ভাব হয়ে গেছে আমার সঙ্গে।

—সুকান্তমামা ! এটা আবার কখন হল ?

—একটু আগেই ! না ডাকলে কথা কইব কি করে ? সুকান্তমামা, আপনি রোজ আসবেন !

সস্নেহ দৃষ্টিতে ওর উদ্ভাসিত মুখের দিকে তাকিয়ে আছে সুকান্ত,···সেইদিকে তাকিয়ে দেখে মন্দিরা। হঠাৎ কেমন বিরক্তি ধরে ওর। মনে হয় ওর ওই দৃষ্টি

দিয়ে যেন বড্ড বেশী গদগদ ভাব ঝরে পড়ছে। মনে হয় মিষ্টির খুকীপনা যেন মাত্রা ছাড়াচ্ছে।

মনের এই বিরক্তি ঝঙ্কার হয়ে বেজে ওঠে—হ্যাঁ! ওঁর তো কোন কাজ নেই, রোজ আসবেন তোমায় কুকুরছানা কিনে দিতে।

কিন্তু ওর এই বিরক্তির ক্ষীণমেঘ হাসির ঝড়ে উড়িয়ে দেয় সুকান্ত—ও হো তো! তোমার বুঝি এখনও সেই কুকুরে ভয় আছে? এইখানে দেখছি মেয়ের সঙ্গে তোমার বদল আছে! বুঝলে মিষ্টি তোমার এই মা'টির ছেলেবেলায় কী ভয়ই ছিল!···একদিন—আচ্ছা আর একদিন সে গল্প হবে, আজ উঠি।···চললাম বৃষ্টি!

একটুখানি স্মিত হাসি! একটু বঙ্কগভীর দৃষ্টি!···ভুলে একবার পুরনো নামে ডেকে ফেলা! বৃষ্টি!

মিষ্টি থমকে তাকায়—মাকে আপনি 'বৃষ্টি' বললেন?

সুকান্ত বোধ করি এক সেকেণ্ডের জন্য থতমত খায়, তারপর হেসে বলে—তবে আবার কি? মিষ্টির মা বৃষ্টি হবে না তো কি পুঁটুরাণী হবে?

মিষ্টিরই জয়!

সত্যই প্রায় প্রতিদিন আসতে সুরু করেছে সুকান্ত! এ যেন এক নতুন নেশায় পেয়েছে ওকে! ছেলেবেলায় মন্দিরার সঙ্গে সত্যই যে ভয়ানক একটা কিছু প্রেমে পড়াপড়ি হয়েছিল তা নয়, কৈশোরের চাপল্য, আর অভিভাবকদের অনবধনতার যোগাযোগে একটু মেশামেশি। একটু মাখামাখি, তারপর কে কোনদিকে ছিটকে গেল। সেই ছিটকে যাওয়ার জন্যে বিরহে জীর্ণও হল না দুজনের কেউ! সুকান্ত যে আজও অবিবাহিত, সে শুধু সুবিধের অভাবে, আর কিছু না। তথাপি এতদিন পরে সেই বাল্যবান্ধবীকে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে আর বেওয়ারিশ অবস্থায় আবিষ্কার করে, সুকান্ত যেন স্থান কাল ভুলতে বসেছে। এক নিরভিভাবক বিধবার গৃহে প্রতিদিন হাজরে দেওয়ার মধ্যে যে একটা শোভন অশোভনতার প্রশ্ন আছে। তাও কি মনে পড়ে না সুকান্তর?

হয়তো পড়ে।

তাই অশোভন ব্যাপারকে শোভন করতে, মিষ্টিকে নিয়েই তার মাতামাতি। উপঢৌকনে মিষ্টির ঘর-সংসার ভরে গেল!

মন্দিরার সমস্ত আপত্তি নস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু মিষ্টি বড় দুর্দান্ত মেয়ে! শুধু খেলনা পুতুল হলেই চলবে না, আস্ত

মানুষটাকেই ওর চাই। দুমিনিট বসে গল্প করতে দিতে রাজী নয়। "সুকান্তমামা কুকুরকে বগলস পরিয়ে দিন,...সুকান্তমামা লাটাইয়ে কষে সুতো জড়িয়ে দিন, সুকান্তমামা আসুন ট্রেড খেলি! দেখবেন কি রকম হারিয়ে দেব।"

সুকান্ত মনে মনে বিপন্ন বোধ করলেও, ভালও লাগে তার এই অবোধ সারল্য! কিন্তু একসময় তো উঠতে হয়? একসময় তো যেতে হয়? তখন মনটা হায় হায় করে ওঠে। কী এক অতৃপ্ত বাসনায় পেয়ে বসে। কত কথা বলতে ইচ্ছে থাকে, কত গল্প অসমাপ্ত থেকে যায়, সমস্ত কিছুর উপর যবনিকা পাত করে বলতে হয়—আচ্ছা যাই তাহলে? চললাম মিষ্টিবাবু!

অবিশ্যি বাসনা কি আর প্রেম-নিবেদনের? না আলাপ-আলোচনাই মারাত্মক কিছু? কিছুই না, হয়তো পুরনো কালেব রোমন্থন! হয়তো শুধুই সাময়িক কথা। তবু টানটা নেশার মত।

যদি মন্দিরার সৌভাগ্যের দিনে, সমারোহের দিনে, এই জীবনে অপ্রতিষ্ঠিত ছন্নছাড়া লোকটা এসে এ সংসারে দেখা দিত হয়তো তার ভাগ্যে জুটত অবজ্ঞা অবহেলা! কিন্তু এখন তার জন্য থাকে প্রত্যাশা, থাকে অভ্যর্থনা। এখন মন্দিরার সৌভাগ্যের সূর্য অস্ত গেছে, শেষ হয়ে গেছে সমস্ত সম্ভাবনা, এখন তার নিঃসঙ্গ জীবনের অগাধ অবসর-ক্ষণের জন্য বরং এমনি একটা সঙ্গীই ভাল, যার নিজের বলতে গর্ব করবার কিছু নেই। যে ব্যক্তি বলবে না "তোমার কথা রাখ, আমার কথা শোন।"

ঘুম ভাঙায় সকাল থেকেই মনটা যে প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে থাকে। ঐ কি নিজের কাছে নিজেরই ধরা পড়ে না মন্দিবার? পড়ে বৈ কি। তবু মনকে প্রবোধ দেয় সে থাকলইবা! ছেলে বেলার বন্ধু তো! ধরো যদি তার নিঃসঙ্গতার দুঃখ লাঘব করতে ছেলেবেলার কোন বান্ধবীই আসত তাহলে কি আগ্রহে উন্মুখ হয়ে থাকত না মন্দিরা? নিশ্চয়ই থাকত। শুধু অসহনীয় অবসর কালকে একটু সহনীয় করে তোলা এই তো। এতে কি এত অপরাধ?

কিন্তু সেই গল্প করার সুখটুকু থেকে বঞ্চিত করতে চায় মিষ্টি? কেন এত প্রতিবন্ধকতা করে?

ওর ওই অর্থহীন আবদার আর আদুরেপনার বাড়াবাড়ি দেখে এক এক সময় চোখ জলে ওঠে মন্দিরার, দুরন্ত এক সন্দেহ যেন ভূতের মত ঘাড়ে চেপে বসে। ও যেন প্রত্যক্ষ দেখতে পায় মিষ্টি তার একান্ত অনুগত লোকটার উপর ষোলো আনা আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। যেন হিংস্র একটা ক্ষুধায় মার কাছ থেকে

কেড়ে রাখতে চায় লোকটাকে!

যখন ভাবে তখন মাথার রক্তে আগুন ধরে ওঠে। মনে আনতে চেষ্টা করে নিজের বারো বছর বয়সের কথা!

বারো বছর বয়েসটা কি নিতান্তই তুচ্ছ করবার মত?

তার যখন 'বৃষ্টি' নামকরণ হয়েছিল, সেই এক ঝড়-বৃষ্টির সন্ধ্যায়—তখন কত বয়েস ছিল মন্দিরার? তখনও সে ফ্রক পরে বেড়াত না? সন্দেহের বিষ-সর্প থেকে ছোবল হানে। কিন্তু রাত্রে যখন বিছানার এক পাশে অকাতরে ঘুমিয়ে থাকে মিষ্টি, একটি ছোট্ট শিশুর মত, চুলগুলো ঝুমঝুমিয়ে ছড়িয়ে থাকে কপালে গালে বালিশে, তখন এক ঘরে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে মন্দিরা। নিজের উপর নিজের ধিক্কার আসে।

কিন্তু সময় কালে আবার মন বদলে যায়।

আবার মেয়ের উপর বিরক্তিতে তিক্ত হয়ে ওঠে সে! তখন সুকান্তকে পর্যন্ত বিষ লাগে।

কিন্তু কেন?

শুধুই কি মেয়ের চাপল্যে বিরক্তি? না আশাভঙ্গের জ্বালা?

যথারীতি আজও নিচের তলায়, মিষ্টির পড়ার ঘরে হৈ চৈ উঠল!

অর্থাৎ আবির্ভাব হয়েছে সুকান্তমামার।

নিশ্চয় কোন নতুন খেলনা এসে আসর জমকেছে। তাই স্ফূর্তির ঘোষণা এমন উদ্দাম হয়ে উঠেছে! "এই আসে এই আসে" করে অধীর হয়ে উঠল মন্দিরা।

নিজে থেকে নেমে গিয়ে দেখতেও লজ্জা করে, অথচ প্রতীক্ষা অসহনীয়। এমনি মনের অবস্থায় সহসা চাবুকের ঘায়ের মত মাথার মধ্যে চড়াৎ করে ওঠে নতুন এক সন্দেহ।

শুধু কি মিষ্টি?

আর সুকান্ত?

এতদিন শুধু কুটিল সন্দেহে বারো বছর বয়েসটার দিকেই ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে দেখছিল সে, কিন্তু বত্রিশ বছর বয়েসটাকেই বা অগ্রাহ্য করেছে কোন্ বুদ্ধিতে? কেন তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করে নি এ বাড়িতে সুকান্তর আকর্ষণ-রজ্জু কে?

তার বদলে কি না নিজেকে? ছি ছি ছি! লজ্জায় ঘৃণায় সারা দেহ মন শুধু ছি ছি করতে থাকে!

কেন নয়?

অবিবাহিত, সংসারানভিজ্ঞ অপরিণত-মন লোকটা আজও তো মন্দিরার সেই কিশোরী মূর্তির ধ্যান করছিল বসে বসে। সে মূর্তি যদি তার আত্মজার মধ্যেই আবিষ্কার করে থাকে, কেন নয় তবে? প্রথম দিনের ঘটনা থেকে একে একে সমস্ত দিনগুলোর ঘটনা মনে আনতে চেষ্টা করে মন্দিরা, আর দৃঢ় প্রত্যয়ের তীব্র জ্বালায় জ্বলতে থাকে।

কিছু পরেই বীরবিক্রমে উপরে উঠে আসে মিষ্টি, প্রত্যেক সিঁড়ির ধাপে ধাপে সশব্দ পদক্ষেপ ফেলে। আর এসেই মন্দিরার গায়ে সড়াৎ করে বিরাটকায় একটা সাপ ছেড়ে দিয়ে হি হি করে হেসে ওঠে।

চমকে উঠেই গম্ভীর হয়ে যায় মন্দিরা। একটি কথা বলে না।

সুকান্ত সেই রবারের গোখরোটাকে কুড়িয়ে নিয়ে দোলাতে দোলাতে সহাস্যে বলে—কি রকম? দেখে বুঝতে পারছ আসল কি নকল?

—না। পারছি না! আসল নকল বোঝবার মত সূক্ষ্ম বুদ্ধি ভগবান আমাকে দেন নি। বলে ঘরের মধ্যে চলে যায় মন্দিরা। গিয়েই শুয়ে পড়ে খাটের উপর। বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে থাকে সুকান্ত, আর মিষ্টি কাছে এসে মার খাটের একপ্রান্তে বসে করুণ বচনে বলে—মা তোমার মাথা ধরেছে? কপালে অডিকলোন দিয়ে দেব?

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সুকান্তও ঘরে এসে হাজির। কি হয়েছে মন্দিরা? মাথা ধরেছে? সারিডন খাবে? নয়তো এনাসিন ট্যাবলেট? মিষ্টি তোমাদের বাড়িতে হাত-পাখা নেই?

মিষ্টি নিথর বসে থেকে নীরবে ঘাড় নাড়ে।

—আহা খুঁজেই দেখ না? রান্নাঘরে-টরে?

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে যায় মিষ্টি, আর মিনিট খানেক পরেই এসে স্বচ্ছন্দে বলে—কোথ্থাও নেই।

সেই মাত্র অসমসাহসিকতায় সুকান্ত মন্দিরার কপালের উপর একটা হাত রেখে পরীক্ষা করতে উদ্যত হয়েছিল—শুধু মাথাধরা, না জ্বর! আর সেই মুহূর্তে সে হাত ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছিল মন্দিরা।

সুকান্ত উঠে যাবার পর মা মেয়েকে নিয়ে পড়লেন।

—সুকান্তমামার সঙ্গে অত হৈ হৈ কর কেন? কঠিন স্বর মন্দিরার।

—সুকান্তমামা যে ক্ষ্যাপান।

—ক্ষ্যাপালেই তুমি ক্ষেপবে? তুমি এখন বড় হচ্ছ, ওরকম করতে হয় না। বুঝলে? এখন তুমি খুব ছোট নেই মনে রাখবে একথা!

মিষ্টি ম্লানভাবে মাথা কাৎ করে।

ছলকে ওঠে মাতৃস্নেহ।

একটু নরম গলায় বলে মন্দিরা—সুকান্তমামাও এমন কিছু ভাল লোক নয়।

কেন বলে? মেয়ের মন ফিরিয়ে আনতে চায়?

মিষ্টি বিস্ফারিত নেত্রে বলে—ভাল লোক নয়?

—না! মন্দিরা নির্লিপ্ত কঠিন গলায় বলে—ছেলেবেলায় ওর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা উঠেছিল, বাজে মার্কা ছেলে বলে আমার বাবা দেন নি বিয়ে।

হ্যাঁ মোক্ষম দাওয়াই!

নিজের বুদ্ধিতে নিজেই পুলকিত হয়ে ওঠে মন্দিরা। মায়ের সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল শুনলে, মন আপনিই বিতৃষ্ণায় গুটিয়ে আসবে। অবশ্য অবোধ মিষ্টির মুখের চেহারায় নিজের বুদ্ধিকৌশলের প্রতিক্রিয়া দেখতে পায় না মন্দিরা। অবোধ মুখে 'ফ্যালফেলে' চাহনি মেলে মিষ্টি বলে—তবে তুমি অত গল্প কর কেন?

আরক্তিম মুখকে সহজ করবার ভান করতে করতে মন্দিরা বলে—ওমা! যতই হোক ভদ্রতা বলে একটা জিনিস আছে তো? বাড়িতে আসে তাড়িয়ে দিতে তো পারি না?

মাতা-কন্যার কথায় ছেঁদ পড়ে।

আবার ফিরে এসেছে সুকান্ত। এ বাড়িতে ওর অবারিত দ্বার হয়ে গেছে এখন! চাকর-বাকর ফিরেও দেখে না।

—এনাসিন ট্যাবলেট দুটো এনেই রাখলাম, বুঝলে? কি জানি রাত্রে যদি আবার—মিষ্টি, নিচে তোমায় কে ডাকছে।

—আমায়? আমায় আবাব কে ডাকবে?

—আহা ওই যে তোমার সেই বান্ধবীর বাড়ির চাকর না ঠাকুর। যে বই আনে কেবল।

অগত্যাই উঠে যেতে হয় মিষ্টিকে।

অনিচ্ছা-মন্থর গতিতে।

রোগশয্যা!

এ জিনিসটা তো মন্দ নয়। সামাজিক রীতি-নীতি কিছুটা লঙ্ঘন করা চলে এতে। যে লোকটার সঙ্গে কেবলমাত্র ড্রইংরুমের গল্প ছাড়া আর কিছু সম্ভব হয় না, এখানে তাকে বলা যায়,—"বোস না বিছানার কাছে ওই চেয়ারটায়।"

এটুকুতে চোখ দেবে, এমন গার্জেন কেউ নেই মন্দিরার!

তাছাড়া এই তো সুবিধে, সন্দেহজনক ব্যক্তিটিকে লক্ষ্য করবার। ও ভিতরে ভিতরে ছটফট করে কি না, উঠে চলে গিয়ে খেলায় মাততে চায় কি না, অদৃশ্য কোন রজ্জুতে আর কেউ ওকে আকর্ষিত করছে কি না, এখানে থেকে দেখা সহজ!

হ্যাঁ, রোগশয্যায় শুয়ে অনেক সুবিধে হয়েছে মন্দিরার!

জ্বর জ্বালা না হোক, মাথার অসুখই কি কম অসুখ? সুবিধে হয়েছে, এতে মিষ্টির খুকীপনাও একটু কমেছে। সুকান্তমামাকে ডাক হাঁক করা দূরে থাক, তার দিকে তাকায় না পর্যন্ত।

মন্দিরা বোঝে সেদিনের উপদেশে কাজ হয়েছে।

রোগশয্যা ভাল। কিন্তু হায় এ জগতে নিরবচ্ছিন্ন ভাল কি আছে? সমস্ত ভালর গায়ে লাগল কালির অবলেপন! মন্দিরার সমস্ত ক্রূর সন্দেহ দেখা দিল নিশ্চিন্ত সত্যের নিষ্ঠুর মূর্তি নিয়ে!

রোগশয্যা আরামের, কিন্তু রোগশয্যায় শুয়ে পাহারা দেওয়া যায় না কোথায় কি ঘটছে! তাই—বুঝি সেই অক্ষমতার সুযোগে আপন কাঠামো প্রকাশ করে ফেলেছে সুকান্ত। আরক্ত মুখ নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে মায়ের বিছানায় আছড়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে মিষ্টি, কিছুতেই মুখ তুলবে না।

দুবার চারবার ভাল কথায় প্রশ্ন করেই কেমন একটা আতঙ্কে বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে। উঠে বসে জোর করে মেয়ের মাথাটা তুলে ধরে তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করে মন্দিরা—কী হয়েছে কি?

অনেক কষ্টে উত্তর দেয় মিষ্টি—সুকান্ত মামা!

—সুকান্তমামা? সুকান্তমামা মানে? রুদ্ধশ্বাস বক্ষের প্রশ্ন।

—জানি না। সুকান্তমামা ছাই বিচ্ছিরী অসভ্য।

মেয়ের মাথাটা সজোরে নাড়া দিয়ে বাঘিনীর মত বলে মন্দিরা—মানে কি এ কথার? কী করেছে সুকান্তমামা?

কিন্তু আর একটি কথাও বার করা যায় না বারো বছরের মেয়েটির মুখ দিয়ে।—ও শুধু কাঁদতে থাকে।

যেন অনেক দিনের জমানো অশ্রুর সাগর উথলে উঠেছে।

আর শখের রোগশয্যা ছেড়ে উঠে পিঞ্জরের বাঘিনীর মত ঘরময় পায়চারি করে বেড়ায় মন্দিরা। হয়তো বা হাতড়ে বেড়ায় ভাষার রাজ্যে কত কটুকাটব্য আছে।

যাক এ বাড়ির বরাত উঠলো সুকান্তর।

রূঢ় ভাষায় তাকে দূর করে দিয়েছে মন্দিরা। স্পষ্ট করে বলেছে, তার নিজেরই আগে বোঝা উচিত ছিল, যে জাত নাই দিলে মাথায় উঠে সুকান্ত সেই জাতের জীব। বলেছিল যথেষ্ট কটু কথা।

প্রথমটা বজ্রাহতের মত অবাক হয়ে গিয়েছিল সুকান্ত, তারপর ধীরে ধীরে বিদায় নিয়েছিল আত্মপক্ষ-সমর্থনের চেষ্টা মাত্র না করে! না, সে মুখের দিকে তাকিয়ে দেখবারও প্রবৃত্তি হয় নি মন্দিরার। এ অসহনীয়, এ ক্ষমার অযোগ্য। সুকান্ত যদি মন্দিরাকে অপমান করত, তাতেও বরং কখনও ক্ষমার প্রশ্ন উঠতে পারত। এ অসম্ভব।

আচ্ছন্নের মত দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছিল মা আর মেয়ে! বামুনঠাকুর বারবার ডাকার পর 'জবাব' পেয়ে চলে গেছে বিরক্ত হয়ে। অভুক্ত দুটি প্রাণী ঘুমোচ্ছিল যেন নেশার মত।...উঠে বসে হাত বাড়িয়ে বেডসুইচটা জ্বালল মন্দিরা। দেখল ঘুমন্ত পাউডার-মাখা দুই গালে চোখের জলের দাগ।

আহা ও বেচারীই কি কম কষ্ট পেয়েছে!

ছেলেমানুষ! না জানি কী ভয়াবহ নালিশ ছিল তার, যে কথা মুখে উচ্চারণ করতে পারে নি।

ধীরে ধীরে মেয়ের মাথার উপর একটু স্নেহস্পর্শ রাখে মন্দিরা, আর সঙ্গে সঙ্গেই মায়ের কোলে মুখ গুঁজে উথলে কেঁদে ওঠে মিষ্টি। আশ্চর্য! ওকি তাহলে জেগেছিল? না কি ঘুম-লোকের বিস্মৃতির মধ্যেও স্পষ্ট হয়েছিল তার গ্লানির স্মৃতি?

—মা, আমায় মার!

—মারব? তোকে মারব?

—হ্যাঁ। হ্যাঁ। মেরে মেরে শেষ করে ফেল আমাকে।—একেবারে মরে যাই আমি!

—ছি মিষ্টি ! ওকথা বলতে নেই। তোর কি দোষ ?

—আমারই তো সব দোষ ! সুকান্তমামা কিছু করেন নি। সুকান্তমামা খুব ভাল খু-ব ভাল ! ঠাকুরের মতন ভাল। আমি মিছিমিছি করে তোমার কাছে—

সর্পদষ্টের মত কাঠ হয়ে তাকিয়ে থাকে মন্দিরা, যেন ধীরে ধীরে বুঝতে চেষ্টা করে, কী বলছে মিষ্টি।

—মিছি মিছি করে !···

—হ্যাঁ ! সব মিছে কথা ! আমায় মার মা।

ছায়াছবির মত—চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যাচ্ছে বজ্রাহতের মত এক-খানি মুখ !···কী ছিল সে মুখে ? বিস্ময় ? আতঙ্ক ? না ঘৃণা ? আর্তনাদ করে ওঠার মত বলে ওঠে মন্দিরা—কেন এমন করলি ?

—ও কেন—মার কোলের উপর মুখ ঘষতে থাকে মিষ্টি—ও কেন, তোমার দিকে অমন বিচ্ছিরি করে তাকায় ? ও কেন তোমাকে 'বৃষ্টি' বলে ডাকে ?—ও কেন—?

নিঃসম্বল

নিরুপিসী আবার ডেকে পাঠিয়েছেন।

বাজার থেকে বাড়ি এসে দাঁড়াতেই মা খবরটা দিলেন, মুখ টিপে হেসে হেসে। আমি থলিটা হাত থেকে নামিয়েই সেই হাত মাথায় দিয়ে বলি, "সেরেছে ! আবার! এক্ষুনি আবার কি হল ? এই তো সেদিন"—

মা বলেন, "তা কি জানি ! ঝি-টা বলে গেল খাওয়া-দাওয়া হলেই যেন বেশী খানিকটা সময় হাতে নিয়ে যায় দাদাবাবু। জরুরী দরকার। বল তো এখনই ভাত দিই ?" মার মুখে দুষ্টুমির হাসি।

আমি রেগে উঠে বলি, "তোমার আর কি ! দিব্যি মজা দেখছ আর হাসছ ! আমার দুর্দশার কথাটা ভেবেছ!? উঃ ! রবিবারের দুপুরটা স্রেফ মাটি।"

"তা আমার কি দোষ ?" মা আরও মজা-দেখা হাসি হাসেন আর বলেন, "এ তো আর মাসী নয় বাপু যে আমায় খোঁটা দিবি ? ও হল গিয়ে তোর সাক্ষাৎ পিসী, তার প্রতি একটা কর্তব্য নেই ?"

কথাটা পরিহাসের। নিরুপিসীর সঙ্গে আমাদের যা সম্পর্ক তার হিসেব কষতে হলে কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসার দরকার, মুখে মুখে হিসেব হবে না। দৈবক্রমে একই পাড়ায় থাকার সুবাদে সম্পর্কের 'এলো' সুতোয় পড়েছে আত্মীয়তার বন্ধনগ্রন্থি।

নিরুপিসী নিঃসন্তান!

নিরুপিসীর অনেক টাকা। অবশ্য লাখ দুলাখ নয়! বাঙালী ঘরের পিতৃ-গৃহ-বাসিনী বিধবার পক্ষে অনেক, এই আর কি! শুনতে পাই নিরুপিসে গত হবার পর, তরুণী নিরুপিসী শ্বশুরের ভিটার নিজ অংশ ভাসুরপোর কাছে বিক্রি করে, হাজার বারো টাকা হাতে নিয়ে ভাইয়েদের বাড়িতে এসে উঠেছিলেন! বলা বাহুল্য বিশেষ অনাদরও তখন পান নি। বড় দুই ভাই ছিলেন বেঁচে, ভাজেরাও লোক খারাপ ছিলেন না। তাছাড়া—ওই টাকার সম্বলটি। ওর সাহায্যে ঘাড়েপড়া নিঃসম্বল বিধবা বোনের চাইতে যে বেশী সমাদর পাবেন, এ তো পড়েই আছে কথা।

অবিশ্যি—এসব কথা তামাদি কথা।

আমরা জ্ঞানাবধি দেখে আসছি নিরুপিসীর পরনে একখানা আটহাত খেঁটে কেটে ধুতি, কদমছাট করে ছাঁটা কাঁচা পাকা চুল, মাংসহীন খটখটে দেহ, আর রসহীন কটকটে বাক্যি।

তবে কেন জানি না নিরুপিসী আমার প্রতি বরাবরই স্নেহশীলা। তাঁর সত্যিকারের ভাইপোদের চেয়েও আমাকে বিশ্বাসও করেন বেশি। নেমকহারামি না করলে বলতেই হয়, ছেলেবেলায় আর সবাইকে লুকিয়ে আচারটা, আমসত্তটা, কলাটা, বাতাসাটা ঢের খাইয়েছেন আমায়।

হায়! তখন কে জানত, সেই চোরাই ঘুষের এত খেসারৎ দিতে হবে!

নিরুপিসীর সেই টাকাই এখন আমার 'কাল' হয়েছে!

স্বামীপুত্রহীনা বিধবা বুড়ীর বিশ্বাসভাজন হওয়া যে কি বিপদ, সে কথা যে হয়েছে সে-ই জানে। ভুক্তভোগী ব্যতীত বুঝবে না কেউ। আমার সেই বারো বছর বয়েস থেকে টাকা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে আমিই নিরুপিসীর ডান হাত। মানে আর কি আমাকেই ডান হাত হতে হয়েছে। কারণ নিরুপিসীর মতে তাঁর নিজের ভাইপোরা নাকি 'চোরের রাজা!'

গোপালের নৈবেদ্য বাবদ এক পোয়া বাতাসা আনতে দিয়েও তিনি ওদের বিশ্বাস করতেন না। আমাকে মিনতি করে বলতেন, "বিণ্টু বাবা আমার! তুই একবার সদ্য-চান-করা মাথায় আসিস দিকি! বাতাসা দু'খানা তোকে দিয়েই

আনিয়ে নেব। রাখলে পাঁচদিন হবে।"

'পাঁচদিন'টা নিরুপিসীর বিনয়োক্তি! একপোয়া বাতাসায় পাঁচ দুগুণে দশদিন চালাবার ক্ষমতা তাঁর আছে। গোপাল তো আর মানুষের ছেলের মত 'আবদেরে বদমাইস' নয় যে, দুখানা বাতাসা পেয়ে আরও দুখানার জন্যে আবেদন করবে! যাই হোক দশদিন অন্তরও আমাকে এক একবার সদ্য-চান-করা মাথায় ওবাড়ি যেতে হত—গঙ্গাজলে হাত ধুয়ে বাতাসা এনে দিতে।

পিসীর আসল ভ্রাতুষ্পুত্রবর্গ যে একদিক থেকেই চোরের রাজা, তা তো নয়। দুদিক থেকেই অবিশ্বাসী। কে জানে চান না করেই তারা নিজেকে সদ্যস্নাত বলে ঘোষণা করবে কি না, কে জানে গঙ্গাজলে হাত ধোয়ার পর আর কোন অস্পৃশ্য বস্তুকে স্পর্শ করে বসবে কি না, কে জানে খালি পায়ে না গিয়ে লুকিয়ে জুতো পরে যাবে কি না। এছাড়া আছে অপর এবং প্রধান দিনটা। পুরো পয়সা দিয়ে পুরো জিনিস আনবে কি না কে বলতে পারে! 'ছোঁড়াগুলোর কি ধর্মাধর্ম জ্ঞান আছে?'

বাতাসা আসামাত্র সেগুলোকে থালায় ঢেলে গুণতে বসা কি কম কাজ একটা? একপোয়া বাতাসায় কগণ্ডা হয় নিরুপিসীর তো অজানা নয়? এত সব ঝঞ্ঝাটের হাত এড়াতে নিরুপিসী আমাকেই বেছে নিয়েছিলেন। 'বেছে নিলে আমারেই, দুরূহ সৌভাগ্য সেই বহি প্রাণপণে।' প্রাণপণে এবং হাস্যবদনেই সে কাজ করে এসেছি বরাবর, কিন্তু এখন হয়েছে মহা ঝামেলা।

এখন আর বাতাসা পাটালির ব্যাপার নয়। সে সব আর নিজে কেনেন না নিরুপিসী, গেবস্ত থেকে ঠাকুর-সেবা বাবদ বরাদ্দ করে দিয়েছে, দিন দুটো করে কলা আব মাসে আড়াই পোয়া বাতাসা। কারণ নিজে কেনবার পয়সা আর এখন নিরুপিসীর হাতে থাকে না। কেন থাকে না, সেই হচ্ছে কথা, আর সেই কথা নিয়েই আমার ঝামেলা।

বারো হাজার টাকা হাতে নিয়ে যেদিন এ বাড়ি এসে উঠেছিলেন নিরুপিসী ওঁর তখন আটাশ বছর বয়স! আর এখন আটষট্টি। এই দীর্ঘ চল্লিশটি বছর একখানেই কাটল মানুষটার। একে একে মারা গেছেন দুই ভাই, দুই ভাজ। বড় ভাইপো বৌটাও গেল সেদিন। নিরুপিসী কিন্তু আছেন ভালই। এই 'ভাল' থাকার জন্যে মাঝে মাঝে হাসি-টিটকিরিও সহ্য করতে হয় বৈকি, খেতে হয় মুখনাড়া! পুরনো ঝি টা পর্যন্ত ডাকলে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। ছোট ভাইপো-বৌয়ের বুঝি আঁতুড়ে একটা মেয়ে মারা গেল, পুরনো ঝি বিন্দু সাতকথা শুনিয়ে গেল নিরুপিসীকে। "আর কেন পিসীমা, এবার যমের বাড়ির রাস্তাটা খোঁজ না

একটু! একে একে কি সব্বাইকে খেয়ে যাবে?"

চিবমুখরা নিরুপিসী, এ ধরণের আক্রমণে কেমন যেন হয়ে যান। মুখোমুখী উত্তর দিতে পারেন না, বোকার মত তাকিয়ে থাকেন। এ দুর্বলতা ওরা জানে বলেই হয়তো এই পথেই আক্রমণ চালাতে আসে। আগে এ সংসার নিরুপিসীরই মুঠোর মধ্যে ছিল, কোন ফাঁকে সে মুঠো আলগা হয়ে গেছে। এখনকার সংসার যেন মেছোহাট। চব্বিশঘণ্টাই হৈ-হল্লা চেঁচামেচি। এখনকার সংসারে কতগুলো জিভ কতগুলো পেট সে হিসেবটাই চট করে দিয়ে উঠতে পারেন না নিরুপিসী। রান্নাঘর ভাঁড়ার ঘর খাবার ঘর সমস্ত জায়গা থেকে ঠেলতে ঠেলতে যেন নিরু-পিসীকে এরা পূজোর ঘরে নির্বাসন দিয়েছে।

সবাই বলে, যাও না দু দণ্ড মালা জপ করোগে না? তোমার অত দেখবার দরকার কি? তোমার সব খোঁজে দরকার কি? নিরুপিসী অবাক হয়ে যান। স্মৃতির ভাণ্ডার হাতড়ে হাতড়ে বুঝতে চেষ্টা করেন—সব দেখবার, সব খোঁজ রাখবার দরকারটা হঠাৎ কোন মন্ত্রবলে কখন শূন্যে মিলিয়ে গেল। ভাবতে ভাবতে ভারি রাগ এসে যায়, তখন খোঁজ করতে বসেন নিজের টাকার। অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেন ভাইপোদের। আর বলেন, "দে লক্ষ্মীছাড়ারা, আমার পাই পয়সাটি পর্যন্ত মিটিয়ে দে! তোদের সংসারের মুখে নুড়ো জ্বেলে দিয়ে আমি তীর্থবাস করিগে।"

গালমন্দে বিরক্ত হয়ে বৌরা বলে, "দিয়ে দাও না ওর টাকা! যেখানে খুশি বিদেয় হোন। এ অশান্তি তো আর সহ্য হয় না।"

কিন্তু ভাইপোরা পুরুষ মানুষ! আর পাগলও নয় তারা।

আসল কথা সে টাকা আর নেই!

বহুদিন আগেই সে টাকা শেষ করে দিয়েছিলেন নিরুপিসীর দাদারা, মেয়ের বিয়ে দিয়ে আর বসতবাড়ির তেতলায় ঘর তুলে। খবরটা অনুমান সাপেক্ষে পাড়াপড়শী আত্মীয় কুটুম্ব সবাই জানে, জানেন না শুধু নিরুপিসী। তাই সুদে আসলে টাকাটা এখন কতয় দাঁড়িয়েছে তার নিখুঁত হিসেব কষে দিতে হয় আমাকে রবিবারের দুপুর মাটি করে।

শুধু হিসেব কষে দিলেই হয় না, উইলও তৈরি করতে হয়। মাস দুমাস অন্তর উইল বদলান কি না নিরুপিসী। যখন যার ওপর রাগের মাত্রা চড়ে, তখনই তাকে বঞ্চিত করে নতুন উইল লেখান। হয়তো ভাইপোর ছেলেদের ফেলে দেওয়া খাতার এক-পিঠ-লেখা পাতায় লেখা হয় সে উইল। প্রথম প্রথম খুব মজা লাগত।

কিন্তু ক্রমাগত এ ছেলেখেলা আর ভাল লাগে না।

অথচ কি জানি কেন, ডাকলে না গিয়েও পারি না। সবাই যাকে অবহেলা করছে, তাকে, তার চিরদিনের আস্থাভাজন আমি, অবহেলা করতে পেরে উঠি না। কোথায় যেন বাধে।

অগত্যাই খেয়ে উঠে জামাটা মাথায়, আর চটিটা পায়ে গলাতে গলাতে বেরিয়ে পড়ি। প্রসন্ন মনে নয়, অপ্রসন্ন মনেই। জানি ও বাড়ির চৌকাঠ ডিঙোনোর সঙ্গে সঙ্গেই ভাগ্যে জুটবে কিছু বাঁকা কথা, কিছু ব্যঙ্গহাসি।

জ্ঞাতি ভাইয়েরা বলে, "এটর্নী সাহেব!" বৌদিরা বলেন, "মুহুরী!"

আজও তাই হল। রবিবারের দুপুরে বাড়ি আছে সকলেই, আমাকে দেখেই জিতেনদা বঙ্কিমহাস্যে বলে উঠল, "কি খবর, এটর্নী সাহেব যে! উইল বদলাতে বুঝি, আবার কার কপাল পুড়ল?"

ব্যঙ্গোক্তিতে বিরক্তি প্রকাশ করা চলে না। সেটা ছেলেমানুষি। তাই আমিও হাসিকে বাঁকা করবার চেষ্টা করে বলি, "কপাল যাদের আছে তাদেরই পোড়ে। না থাকলে আর পুড়বে কি?"

"ভাল ভাল! বলি এত বেগার খাটতে ভালও লাগে তোর?" এবারে আমার হিতৈষীর ভূমিকা অভিনয় করেন জিতেনদা। আমিও অমায়িক বিনয়ে বলি, "ক্ষেপেছ জিতুদা, বিনা স্বার্থে কেউ বেগার খাটে? ভুলিয়ে ভালিয়ে নিজের নামে কিছু লিখিয়ে নেবার তালে আছি।"

"হুঁ! আবার ইয়ার্কি!" বলে রাগ করে চলে যান জিতুদা।

গলার সাড়া পেয়েই নিরুপিসী ভাঙা ভাঙা গলায় হাঁক পাড়েন, "কে বিন্টু এলি নাকি? আয় ইদিকে আয়।"

এগিয়ে গিয়ে আলগোছে একটা প্রণাম গোছের করে বলি, "কি হল পিসী, আবার কি পাগলামিতে পেল?"

"পাগলামি?" নিরুপিসী উত্তেজিত ভাবে বলে ওঠেন, "পাবে না? এদের সংসারে যে বাস করবে সে-ই পাগল হয়ে উঠবে! বুঝলি বিন্টু, এ বাড়ির ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ সব কটা পাজী! এক একজন এক একটি বিচ্ছুর অবতার! গুরুলঘু জ্ঞান নেই? অ্যাঁ! এত অপমান সয়ে মানুষে থাকতে পারে? আর কেনই বা থাকব? আমি কি নিঃসম্বল ভিখিরী? তাই তোদের হাত তোলায় পড়ে থাকব চিরকাল? দে আমার টাকা ফেলে দে, আমি চলে যাই।"

আশেপাশে চারিদিকে ক্রুদ্ধ এবং ব্যঙ্গদৃষ্টি কল্পনা করে লজ্জায় আমারই

মাথাটা কাটা যেতে চায়। তবু শান্তভাবে বলি, "আহা তা অত রাগ করছ কেন? দেবে বৈ কি! 'দেবে না'—একথা বলেছে কি?"

নিরুপিসী সজোরে বলেন, "দেবে না বলবে? এত আস্পদ্দা হবে? একি ভিক্ষের টাকা? এ হল আমার হক্‌কের টাকা! এই দেখ না আজ সব ব্যাটাদের ঘাড় ধরে সই করিয়ে নেব। দেখি কেমন সুড়সুড় করে টাকাটি ফেলে না দেয়।"

"সই! কাকে দিয়ে কিসে সই করিয়ে নেবে?" আমি বিস্মিত প্রশ্ন করি।

নিরুপিসী সগর্বে বলেন, "কেন, হ্যাণ্ডনোটে! এবারে আর কাঁচা কাজ করছি না, একেবারে পাকা কাজ! কেমন বুদ্ধিটি খাটিয়েছি? নে তুই আগে পাওনার হিসেবটা কষে দে।"

হতাশভাবে বলি, "এই তো কিছুদিন আগে সব হিসেব কষে লিখে-টিখে দিয়েছিলাম পিসীমা। সে কাগজ কোথা গেল?"

নিরুপিসী সহসা ফোকলা দাঁতের ফাঁকে একটু হেসে ফেলে বলেন, "সে লজ্জার কথা আর শুধোসনে বাছা! তোর লেখা সেই হিসেবের কাগজ আর উইলখানা পাছে নষ্ট হয় বলে একেবারে প্যাঁটরার ভেতরে তলার দিকে রেখে দিয়েছিলাম, আচারের তেল পড়ে সব গোল্লায় গেছে। শুধু কি কাগজ? আমার তসর থান, মটকার চাদর, ছিষ্টির দফা গয়া।"

"প্যাঁটরার মধ্যে আচারের তেল? আচারের বোতল কাপড়-চোপড়ের ট্রাঙ্কে রাখ নাকি পিসীমা?"

নিরুপিসী তিক্তস্বরে বলেন, "তাছাড়া আর কোন চুলোয় রাখব? রাক্ষসদের জ্বালায় কিছু বাইরে রাখবার জো আছে? মেজবৌমার ছেলে দুটো আর সেজ-বৌমার মেয়েটা একেবারে চোরের রাজা বুঝলি?"

নিরুপিসীর চির অভ্যস্ত অভিযোগের ভাষাটা শুনে আমার হাসিই পাচ্ছিল, কিন্তু অভিযুক্ত আসামীদের জননী-যুগলের হাসি পেতে পারে না, হঠাৎ সেজবৌদির শানানো গলা বেজে ওঠে ওদিক থেকে, "এমন দুঃখের দশা পড়ে নি কারুর ছেলেমেয়ের, যে ওনার জিনিসে নজর দিতে যাবে।"

"না যাবে না!" পিসী গলার শির ফুলিয়ে বলে ওঠেন, "ছেলেমেয়েগুলিকে তো চেন না! মিটমিটে শয়তান। হবে না কেন? আমড়াগাছে কি আর ল্যাঙড়া ফলবে?"

বলাবাহুল্য নিরুপিসীর এ দুঃসাহসের সমর্থন করা যায় না। গম্ভীরভাবে গলা খাটো করে বলি, "দেখো পিসীমা, তোমার রাগটাগগুলো একটু কমাও। এই

জন্যেই তোমার সঙ্গে ওদের বনে না।"

নিরুপিসী কিছুমাত্র দমেন না। বীরাঙ্গনার ভঙ্গিতে বলেন, "না বনল তো বয়েই গেল! আমি ওদের খাই না পরি? দিক না আমার টাকা কটা ফেলে, একখুনি চলে যাচ্ছি। নিজেদের সমস্ত নবাবি হচ্ছে, খালি আমার টাকা কটা দেবার বেলাতেই দৈন্যদশা!"

আমার সামনে সবদিক থেকে এত অপমান বোধকরি সহ্য হয় না জিতুদার। তাই এদিকে তেড়ে এসে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে, "দেখো পিসীমা, গুরুজন বলে এতদিন ঢের সয়েছি, কিন্তু আর সহ্য করব না! বলি টাকা তুমি আমাদের কাছে দাবী কর কি হিসেবে? আমরা তোমার কাছে ধার নিয়েছি টাকা? না, রেখেছিলে আমাদের কাছে?

নিরুপিসী একবার থতমত খান, তাব পরই পূর্ব-বিক্রমে বলে ওঠেন— "তোদের কাছে না রাখি, তোদের বাপ কাকার কাছে রেখেছিলাম। সে টাকা তো আর তারা যাবার সময় নিয়ে যায় নি?"

জিতুদা বিদ্রূপ-কুঞ্চিত হাস্যে বলে—"গেছে কি না সে হিসেব 'সেখানে' গিয়েই কোর? কতকাল আর এখানের মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে?"

জিতুদাব হৃদয়হীনতায় মর্মাহত না হয়ে পারি না। মনে হয় নিরুপিসীর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে কান্নার স্রোত প্রবাহিত হবে বোধ হয় এবার। কিন্তু সে ধারণা ভুল। নিরুপিসী সতেজেই উত্তর দেন, "থাকব না কেন? যতকাল ভগবান অন্নজল মেপেছে ততকালই থাকব। তোরা যে মনে করছিস বুড়ী মরুক, টাকাটা আর বার করতে হবে না, সে আশা ছাড়। কড়ায় গণ্ডায় সব বুঝে নিয়ে সমস্ত দান ধ্যান করে যাব। এক পয়সা দেব না তোদের।—জানিস বিণ্টু, হতভাগারা এমন চোখের চামড়াখোর যে সুদের টাকা ক-টা পর্যন্ত মেরে দেয়, এক পয়সা দেয় না আমায়!"

জিতুদা গম্ভীর ভাবে বলে—"আমরা তোমার টাকা ধার করেছি—তাই সুদ দেব!"

নিরুপিসী হৈ হৈ করে ওঠেন, "শুনলি বিণ্টু, শুনলি আক্কেলখেকোর কথা? তোরা দিতে যাবি কেন? ব্যাঙ্ক থেকেই তো দেবে। এক বস্তা টাকা জমা আছে কোম্পানীর ঘরে অমনি নাকি? দাদা ছোড়দা যতদিন ছিলেন, সমান—মাসে কুড়ি টাকা করে দেন নি? তোরা এমন চশমখোর, টাকা কটা একটু চেষ্টা করে ব্যাঙ্ক থেকে এনে দিতে পারিস না!"

জিতুদার মুখে একটু হাসির আভাস ফুটে ওঠে। আরও ব্যঙ্গস্বরে বলেন—

"সে ব্যাঙ্কের ঠিকানাটা তোমার দাদারা আমাদের জানিয়ে রেখে যেতে ভুলে গেছেন কিনা?"

"নাঃ! ঠিকানা জান না তোমরা! খোকা! গ্রাহ্য নেই তাই বল।"

"আচ্ছা বেশ তাও বলি তোমার দাদারা না হয় বড়লোক ছিলেন, তোমার সুদের টাকা তোমাকে হাত খরচ করতে দিতেন, আমরা কোথা থেকে দেব? খাচ্ছ, পচ্ছ, ঠাকুরের নৈবিদ্যি সাজাচ্ছ, মাসে কুড়িটা টাকা খরচ হয় না তোমার জন্যে?"

এই সব বিশ্রী কথার সাক্ষী হয়ে বসে থাকার মত বিড়ম্বনা অল্পই আছে। উঠে দাঁড়িয়ে বলি, "আজ যাচ্ছি পিসীমা. তোমার কাজ আজকে আর হবার কোন আশা নেই।"

নিরুপিসী ছুঁৎমার্গ ভুলে সবলে আমাকে ধরে বসিয়ে দিয়ে বলেন—"হবে না মানে? আজ একটা হেস্তনেস্ত করে তবে ছাডব। আক্কেলখেকোর কথা শুনলি? বলি—আমাকে খরচের খোঁটা দিতে লজ্জা করল না? বিধবা ঠাকুমা পিসীমাকে কে না ভাত দেয়? আজন্মকাল তোদের সংসারের 'কম্ম' করে এলাম, ভাত দিবি না?"

"সবাইয়ের ভাত আমাদের মত সস্তা নয়!" বলে গম গম করে চলে যান জিতুদা।

আমি শান্ত অথচ বিরক্তভাবে বলি—"কেন অমন অবুঝের মত কথাগুলো বল পিসীমা? এতে তোমার মান্য থাকে?"

পিসীমা পরম নিশ্চিন্ততায় বলেন—"নাঃ থাকবে না! ওই হতভাগার কথায় আমাব মান্য অমনি প্পালিয়ে গেল! ওটা হল চিরকেলে রগচটা। শাস্তরেই বলেছে—"কটা মেজাজ চটা। নে তুই তোর কাজ কর। হিসেবটা আগে লিখে ফেল—ছোড়দা যাবার পর থেকে সুদ তোলে নি এক পয়সা, আসলের সঙ্গে সে-গুলো যোগ দে! দিয়ে একটা হ্যাণ্ডনোট লেখ।"

একখানা পুরনো ক্যালেণ্ডারের উল্টো পিটটা মেলে ধরেন নিরুপিসী। "হায় কপাল! শেষে আমিই হ্যাণ্ডনোট কাটব তোমার কাছে?"

পিসীমা আর একবার নির্দন্ত হাসি হেসে বলেন—"আহা! তুই কাটবি কেন? লিখে দিবি—লেখ,—আমাদের পিসীমা শ্রীমতী নীরজাবালা দেবীর নগদ বারো হাজার মায় সুদে এত টাকার জন্য আমরা দায়ীক আছি। উক্ত টাকা আগামী মাসের পয়লা তারিখের মধ্যে পরিশোধ করিয়া দিতে না পারিলে পিসীমাতা দেবীর কাছে আমাদের ভিটামাটি বন্ধক পড়িবে—কই লিখছিস না যে?"

হেসে ফেলে বলি—"আমি লিখে কি হবে? যারা পরিশোধ করবে তারা লিখুক?"

"লিখবে মুখপোড়ারা? কখনও না! বৌগুলি যে ভেতরে ভেতরে কলকাঠি নাড়ছে। তুই লিখে দে, আমি ওদের ঘাড় ধরে সই করিয়ে নেব।"

সেই পুরনো ক্যালেণ্ডারের উল্টো পিঠে জিতুদাদের ভিটেমাটি-চাটির বার্তা লিখে দিই—হাসি গোপন করতে করতে।

নিরুপিসী হৃষ্টচিত্তে সেটি নিয়ে বলেন—"সাধে কি আর তোর গুণ গাই। তোর মা সার্থক ছেলে গর্ভে ধরেছিল! নে এইবার উইলটা লিখে ফেল। ওদের একটি পয়সা দেব না। শুধু সেজ বৌয়ের সেজ ছেলেটা একটু 'ঠাকুমা' 'ঠাকুমা' করে, তার পৈতের খরচ বলে পাঁচশ টাকা দিয়ে যাব ব্যাস।"

"অত টাকা তাহলে করবে কি?"

"শোন ক্ষ্যাপার কথা! টাকায় আবার কি করে মানুষ? পরকালের কাজ করব। লেখ তুই—'যথা আমি শ্রীমতী নীরজাবালা দেবী সজ্ঞানে ও সুস্থ মস্তিষ্কে এই উইল করিতেছি—আমার নগদ বারো হাজার টাকা ও উক্ত টাকার সাড়ে পাঁচ বছরের সুদ চক্রবৃদ্ধি হারে যাহা হইয়াছে, তুই মিলাইয়া সর্বসমেত টাকা নিম্নলিখিত হিসাবে বাঁটোয়ারা হইবেক। যথা'—"

জানি অতঃপর নিরুপিসী সেই রাশীকৃত টাকা নির্ভুল অঙ্কে অসংখ্য খণ্ডে ভাগ করে ফেলে, গড় গড় করে বলে চলবেন গ্রহীতাদের নাম। সে তালিকায় দেব দ্বিজ, গুরু পুরুত, কুলদেবতা, গ্রামদেবতা, কাশীর অন্নপূর্ণা, তারকেশ্বরের 'বাবা', হাসপাতাল, কুষ্ঠাশ্রম, মেয়ে ইস্কুল ইত্যাদি থেকে বাড়ির পুরনো গয়লানী, 'বাবার আমলের ধোপা' পর্যন্ত কারুর নাম বাদ যাবে না। থাকবে না খালি বাড়ির কয়েকটি লোকের নাম। কারণ তারা "মহাপাজী!" তাদের বঞ্চিত করবার জন্যেই নতুন উইলের সৃষ্টি!

আশ্চর্য হিসাব!

এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডগুলিকে অবশেষে 'যোগে'র বন্ধনে আবদ্ধ করলেই দেখা যাবে, নিজস্ব অখণ্ডরূপটি ধারণ করেছে! নিরক্ষর মানুষ মুখে মুখে এমন নির্ভুল হিসাব করেন কি করে এই আশ্চর্য! হয়তো মনে মনে সহস্রবার করেছেন। তা নইলে—

এক টানা বলে চলেন নিরুপিসী। বলতে বলতে 'ইতি'র কাছে এসে পৌঁছল ক্রমশঃ, "ইহা ছাড়া বক্রী টাকা আমার মৃত্যুর পর আমার পারলৌকিক কার্যাদির

জন্য ব্যয় করা হইবেক”—

লিখতে লিখতে ক্রমশঃ যেন ক্লান্ত হয়ে যাই। হতাশ ভাবে বলি, “আচ্ছা পিসী, তুমি তো হইবেক করিবেক লিখে চলেছ এক মনে, তোমার কি বিশ্বাস জিতুদারা করবে এসব ?”

“করবে না—মানে ? ওদের ঘাড় করবে। আমি তো আর অমনি বলছি না ? দস্তুর মত টাকার গাদা ধরে দিয়ে বলছি ?”

এই বৃথা আস্ফালন দেখে হাসিও পায় দুঃখও হয়।

হঠাৎ মনে হয় মানুষটা মিথ্যা আশার জাল বুনে আর কতকাল স্বপ্ন দেখবে। তার চাইতে আজ ওর চৈতন্য সম্পাদন করিয়ে দিই। তাই গলা নামিয়ে বলি, “তুমি তো তাই ভেবে নিশ্চিন্ত আছ। কিন্তু সে টাকা কি আর আছে ? সে হয় তো ওরা কোনকালে শেষ করে বসে আছে।”

আমার মুখে হঠাৎ এই হতাশার বাণী শুনে নিরুপিসী কেমন যেন হকচকিয়ে যান মনে হয়, কে যেন ওঁকে একটা ধাক্কা মারল। তবু মুখে হারতে রাজী হন না। ফ্যালফেলে দৃষ্টি মেলে বলেন—“ক্ষ্যাপাব কথা বলছিস কেন বিণ্টু ? শেষ অমনি করলেই হল ? কার টাকা কে শেষ করে ? এ কি মগের মুল্লুক ? দুটো নয় পাঁচটা নয় এক মোট টাকা—জন্মে একবার বৈ দুবার দেখলাম না, কোম্পানীর ঘরে তুলে দিলাম। সে অমনি কর্পূরের মতন উবে যাবে ?”

ফ্যালফেলে চাউনির মধ্যে বাসা করে আছে যেন এক বিরাট শূন্যতা। মনে হয় টাকাগুলো যে এখনও কোথাও আছে এ বিশ্বাস, পিসীমারও আর নেই। তবু সে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন না। কে জানে সন্দেহ-প্রকাশের সেই সূক্ষ্ম ছিদ্র-পথে নির্লজ্জ প্রখর সত্য উঁকি দেবে কি না।

সে সত্য প্রকাশ হয়ে পড়লে যে একেবারে নিঃসম্বল হয়ে যাবেন নিরুপিসী, একেবারে ওদের মুখাপেক্ষী। তার চাইতে এও ভাল। সেই অলক্ষিত অর্থের দাপটে যখন তখন তাদেরই বঞ্চিত করবার ভয় দেখানো যায়, যারা নিষ্করুণ ভাবে বঞ্চনা করেছে নিরুপিসীকেই।

নোটের গোছাটা হাতে নিয়ে গুণতে গুণতে আরাধনা ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করেন—কম যে ?

বীরেশ্বর আকাশ থেকে পড়েন—কম ? কম না কি ? কত কম ?

—কুড়ি টাকা !

বীরেশ্বর যেন অথই জলে—কুড়ি টাকা কম ? বল কি ? তাই তো—কি করল বুঝতে পারছি না তো। কি একটা কথা উঠেছিল বটে, প্রভিডেণ্ড ফণ্ডের টাকা নাকি আরও বেশী হারে কাটবে, সে কি এই মাস থেকেই—

আরাধনা বিরক্তভাবে বলেন—ন্যাকা-বোকার মত কথা বলছ কেন ? আপিসের ফণ্ডে টাকা বেশি কেটে নিল কি না, তা জানতে পার নি ?

—আহা ! অতটা কান দিয়ে শুনি নি আর কি ! কাল খোঁজ নেব !

আরাধনা মুখে যতটা বিরক্তি ফোটানো সম্ভব, তা ফুটিয়ে বলেন—খোঁজ নিয়ে তো আমার মাথা কিনবে। কুড়ি-কুড়িটা টাকা কমে গেলে, আমি চালাব কি করে ?

বীরেশ্বর পরম সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বলেন—হয়ে যাবে এক রকম করে। তোমার বাজেটে কুড়িটা আইটেম কি আর নেই ? সব থেকে একটা করে টাকা বাঁচালেই—

একেই কুড়ি টাকা ঘাটতির বিরক্তি, তার উপর এই হাড়জ্বালানো সান্ত্বনা ! আরাধনা রেগে বলেন—বাঁচানোর ভারটা তুমিই নিও তাহলে ! ঠাকুরের মাইনে থেকে এক টাকা, ঝিয়ের মাইনে থেকে এক টাকা, বাড়ি-ভাড়া, ইলেকট্রিক বিল, কাবুলের কলেজের আর উমা উষার স্কুলের মাইনে, তোমার পিসীর মাসোহারা, সব থেকে কাটো এক টাকা করে, জমে যাবে !

বীরেশ্বর অপ্রতিভভাবে বলেন—আহা ওসব থেকে কি আর সম্ভব ? ধর তোমাদের গিয়ে শাড়ি, জুতো, জামা, স্নো, সাবান, পাউডার এই সব থেকে—

—শাড়ি জুতো জামা প্রত্যেক মাসে কিনছি ?

আরাধনার স্বরে ভীষণতা।

—আহা তাই কি আর বলছি ?

—বলছই তো ! বলতে আর বাকি রাখছ কোথা ? স্নো সাবান থেকে বাঁচিয়ে কুড়ি টাকা বেরোবে ? মাসে কত টাকার কেনা হয় ওসব ?

উঃ ! উকিল কেন হও নি তাই ভাবি ! বলে সরে পড়েন বীরেশ্বর।

এ কথাটা বীরেশ্বরবাবুর মুদ্রাদোষের সামিল।

স্ত্রীর জেরার মুখে দাঁড়তে না পারলেই, ওই কথাটি বলে রণে ভঙ্গ দেন।

কিন্তু আরাধনা এমন প্রখর না হবেন বা কেন? স্বামীকে অধঃপাতের পাতাল হতে টেনে তুলে, এখন যে দশের একজন করে দাঁড় করিয়েছেন সে কিসের জোরে? ঘরে বসে শুধু ওই জেরার জোরে আর কথার জোরেই তো!

নইলে কি যে হত!

কম বয়সে তো রীতিমত পান-দোষ ছিল বীরেশ্বরের। বেপরোয়াই ছিলেন। লজ্জা-সরমের ধার বড় ধারতেন না বীরেশ্বর। স্বচ্ছন্দে বলতেন—মদ খাওয়ায় দোষটা যে কি, তা তো বুঝি না। খাবার জন্যেই তো জিনিসটা সৃষ্টি হয়েছে? না কি? সারা পৃথিবীতে বছরে কত কোটি টাকার মদ বিক্রি হয় তা জান? লোকে খাচ্ছে বলেই তো? মদ আছে তাই দুনিয়া টিঁকে আছে, বুঝলে?

আরাধনা কেঁদে-কেটে এক করলে হতাশ হয়ে বলতেন—বেশ! তাহলে আর খাব না! একটা জিনিস একটু খেতে ভালবাসি, সেইটাতেই তোমার যত নজর। আচ্ছা এই যে তুমি ইলিশ মাছ খেতে ভালবাস, কই আমি তো বাগড়া দিতে যাই না?

—ইলিশ মাছ আর মদ এক হল?

রান্না ভুলে ছিটকে উঠতেন আরাধনা।

—কেন নয়? বীরেশ্বরের যুক্তি জোরালো—মদ পয়সা দিয়ে কিনতে হয়, ইলিশ মাছও রাস্তায় বিলোয় না! মদের আফটার এফেক্ট খারাপ, ইলিশ মাছেরও তাই। মাতালের মদের বোতল দেখলে রসনার যে অবস্থা হয়, মহিলাদেরও গঙ্গার ইলিশটি দেখলে রসনার সেই অবস্থাই ঘটে! বল সত্যি কি না? এই যে তুমি আমাকে মদ থেকে নিবৃত্ত করবার জন্যে এত লাঠালাঠি করছ, কারণ কি? পাছে লিভার পেকে মরে যাই, কেমন? কিন্তু সমাপ্তির পর উপসংহারটা কি? আমি আমি মলে তোমার ইলিশ মাছটি বন্ধ হবে এই তো?

এই সব যুক্তি তর্ক ছিল বীরেশ্বরের।

তা সে যত জোরাল যুক্তিই থাক, শেষ পর্যন্ত আরাধনারই জয় ঘটেছে। মদ ছেড়েছেন বীরেশ্বর, সুন্দরী মহিলা দেখলে চাঞ্চল্যপ্রকাশ, সেটাও ছেড়েছেন। অবিশ্যি উল্লেখযোগ্য স্বভাবদোষ তাঁর ছিল না, কিন্তু পথে-ঘাটে, ঘরে-সংসারে, সুন্দরী তরুণী দেখলেই চোখ ট্যারা হয়ে যেত বীরেশ্বরের। আর আরাধনার শত ধিক্কারে এবং গালাগালেও অবিচলিত চিত্তে বলতেন—ভাল জিনিস চোখে পড়লে তাকিয়ে দেখব না? মানুষের তৈরী যান্ত্রিক শিল্প নয়, স্বয়ং বিধাতা পুরুষের হাতের

শিল্পকলার নমুনা! এও যদি হাঁ করে না দেখব তো দেখব কি? ফুল দেখে মোহিত হও না তোমরা? পাখি পক্ষি নদী পাহাড় দেখ না বিভোর হয়ে?

আরাধনা চটে লাল হতেন, রেগে মাথার চুল ছিঁড়তেন, বলতেন—দেখি! হাঁ ভগবানের হাতের কারুকার্য দেখি! তোমার মতন চোখ দিয়ে গিলি না।

—তার মানে হচ্ছে আমার রসবোধ তোমাদের চেয়ে বেশি! আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখি। কথায় হেরে অবশেষে আরাধনা অনশন ধর্মঘট সুরু করতেন।

যাক ও-সব তো অনেক দিনের কথা!

সুশীল সুবোধ বীরেশ্বর আরাধনাতে সমর্পিত প্রাণ হয়ে বসে আছেন সেও অনেকদিন হয়ে গেছে। এখন তো বড় ছেলে কাবুল থার্ড ইয়ারে পড়ছে, দুই মেয়ের প্রবেশিকা দেব-দেবর বয়স। তারা বরং বাবার উপর মায়ের শাসনের বাড়াবাড়িতেই দুঃখিত।

কিন্তু আরাধনার শাসকমনোবৃত্তিটা রয়েই গেল কেন? তাঁর অন্তরের অন্তঃস্তলে নিশ্চিন্ততা নেই কেন? এতদিনের অনভ্যাসেও সন্দেহ করার অভ্যাসটা ভিতরে টিকে আছে কেন? তাই না আজ সামান্য এই কুড়িটা টাকার ঘাটতি, সেই সন্দেহকে এতটা উস্কে জাগিয়ে তোলে। শান্তি পান না আরাধনা, রেহাই পান না সন্দেহের হাত থেকে।

কেবলই তাঁর মনের মধ্যে একটি প্রশ্ন আনাগোনা করতে থাকে, আবার মতিচ্ছন্ন ধরল না তো? কে জানে বুড়ো বয়সে আবার পুরনো কোন বন্ধুরূপী শয়তানের পাল্লায় পড়লেন কি না। কে জানে বা নতুন কোন ক্লাব-টাবের আওতায় গিয়ে পড়েছেন কি না!

সন্দেহই সন্দেহের পৃষ্ঠপোষক।

ভাবতে ভাবতে মনে হয় আরাধনার, কদিন থেকেই যেন লক্ষ্য করছেন, আপিস থেকে এসে কোথায় বেরিয়ে যাচ্ছেন বীরেশ্বর। রাত করে ফিরছেন। নিজে তিনি সন্ধ্যাবেলাটা পূজার্চনায় কাটান বলেই, কদিন খেয়াল করেন নি।

কিছুদিন হল গুরুমন্ত্র হয়েছে আরাধনার!

কিন্তু গুরুমন্ত্র হয়েছে, আর নতুন পূজাহ্নিকের নেশায় মেতেছেন বলেই তো আর স্বামীকে পুরনো উচ্ছন্নের পথে যেতে দিতে পারেন না। ভাবলেন দু-দিন পূজো সংক্ষিপ্ত করে বীরেশ্বরের গতিবিধি ধরতে হবে!

ঠিক! ঠিক! যা ভেবেছেন তাই! বীরেশ্বর চলেছেন গুটি গুটি!

তাড়াতাড়ি পুজো সেরে তিনতলার ঠাকুর ঘর থেকে নেমে এসেই খপ করে স্বামীকে ধরলেন আরাধনা।

—যাচ্ছ কোথায়?

বীরেশ্বর এইমাত্র ঠাকুরঘরে সন্ধ্যারতির ঘণ্টাধ্বনি শুনেছেন, চিত্ত নিঃশঙ্ক! তাই এই অতর্কিত আক্রমণে চমকে উঠলেন। আমতা আমতা করে বললেন—যাব আবার কোথায়? এমনি!

—এমনি মানে? এমনিটা কি? লক্ষ্য একটা কিছু আছে তো?

বীরেশ্বর পরিহাসের পথ ধরেন—লক্ষ্য তো কিছু নেই। এ যাত্রা মোর লক্ষ্য-হীন নিরুদ্দেশের পথে—!

আরাধনা এ পরিহাসে গললেন না, মুখ ঘুরিয়ে বললেন—বুঝেছি, কোন নিরুদ্দেশের পথ! বুড়ো বয়সে আবার মতিচ্ছন্ন ধরেছে!

বীরেশ্বর মৃদু হেসে বলেন—পাগল হয়েছ? যে মতি তোমাতে অর্পিত হয়েছে সে কি আর উচ্ছন্নে যেতে পারে?

—চিরদিনই মুখে জগৎ মারলে! আচ্ছা দেখব দুদিন তোমার মতি গতি!

তথাপি বীরেশ্বর বেরিয়ে গেলেন গুটি গুটি এবং ফিরলেন রাত দশটায়।

আরাধনা গুম্ হয়ে রইলেন!

ভেবেছিলেন পরদিন বোধ হয় আর বেরোতে সাহস করবেন না বীরেশ্বর, কিন্তু নাঃ! যথা কল্য তথা অদ্য! পুজো প্রায় না করেই ছুটে নেমে এসেছেন আরাধনা; এসেই দেখেন বীরেশ্বর চুলে চিরুণী চালাচ্ছেন।

দেখে আপাদমস্তক জ্বলে যাবে না—এ হতে পারে না।

—আবার? আবার আজ ছুটছো?

—কি মুস্কিল! বীরেশ্বর বিব্রতভাবে বলেন—তুমি যে সি. আই. ডি হয়ে উঠলে! বাড়ি থেকে বেরোব না?

—কই এতদিন কি বেরোচ্ছিলে?

—এতদিন বেরোচ্ছিলাম না বলে কোনদিন বেরোব না, এটা যুক্তি নয়।

—আজ তুমি বেরোবে না! ব্যস!

—আমার যে না বেরোলেই নয় গো!

—নয় তাত দেখতেই পাচ্ছি—দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করেন আরাধনা—

কিন্তু আমি এই দিব্যি দিচ্ছি যদি যাবে!

—আঃ কি বিপদ! কেন দিব্যি-দিলেশা দিচ্ছ! বলছি—তুমি মিথ্যে সন্দেহ পুষে কষ্ট পেও না। আমি ভাল জায়গাতেই যাচ্ছি।

—মাতালের ভাল জায়গা শুঁড়িখানা! বুড়ো বয়সে আবার তুমি এই কেলেঙ্কারি ধরলে? কাবুল টের পেলে মুখখানা কোথায় থাকবে তোমার?

বীরেশ্বর এবার চটে ওঠেন। বিরক্ত স্বরে বলেন,—মাতালদের মুখ যেখানে থাকে। জগতে কি মাতাল নেই? না তাদের ছেলেমেয়ে নেই? আবার যদি আমি মদ ধরি, আটকাতে পারবে তুমি?

পারব বৈ কি! পারতেই হবে! জোয়ান বয়সের নেশা ছাড়িয়েছি, আর বুড়ো বয়সের পারব না?

—তুমি ছাড়িয়েছ? হঠাৎ হা হা করে হেসে ওঠেন বীরেশ্বর! হাসতে হাসতে বলেন—সেই আত্মপ্রসাদেই বুঝি এত অহঙ্কার? ছেড়েছে বীরেশ্বর সেন নিজে! বুঝলে? খেয়াল হল, দিলাম ছেড়ে। ভাবলাম জলজ্যান্ত আস্ত একটা মানুষ যখন তোমার পছন্দ নয়, তখন নাও একটা হাবাগোবা ভালমানুষ! তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাক! নইলে বীরেশ্বর সেনকে মদ ছাড়ানো তোমার সাধ্যি?

আরাধনা পূজোর তসর পরেই খাটের উপর বসে পড়ে বলেন—তাহলে নিজে মুখে স্বীকার করছ?

—অস্বীকার করলেও যখন তুমি বিশ্বাস করবে না, তখন স্বীকার করায় ক্ষতি কি?

এ বয়সে আর চোখে জল ঝরে না, ঝরে আগুন! আরাধনা রাগে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন—তুমি যদি আজ যাও তো, এসে দেখবে যে আমি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছি!

বীরেশ্বর আর একবার হেসে ওঠেন। হেসে হেসে বলেন—পাগল হয়েছ? সকালে বড়ি দেবে বলে ডাল ভিজিয়ে রেখেছ না?

—বটে? তুমি ভেবেছ তুচ্ছ বস্তুতে এমনই আসক্তি আমার যে মরতে পারি না?

—আহা হা, তাই কি বলছি? আসক্তিটা আরও উচ্চ বস্তুতে রক্ষিত আছে, তাই কি আমি জানি না? আমি শুধু বলছি—বড়িবিহীন মাছের ঝোল যে আমার মুখে রোচে না, সে কথা বিস্মৃত হয়ে তুমি কি—?

—আচ্ছা! তোমার দৌড় আমি দেখছি। মরব কেন? মরলে তো

তোমার সুবিধেই। বেঁচে থেকেই তোমার জীবন অতিষ্ঠ করছি, রোস।

—জীবন অতিষ্ঠ? বীরেশ্বরের ওষ্ঠপ্রান্তে একটু বঙ্কিম হাসি দেখা দেয়। সেই বঙ্কিম রেখার খাঁজ থেকেই উচ্চারিত হয়—তার অবকাশ এখনও আছে নাকি?

—কি? কি বললে? আমি তোমার জীবন অতিষ্ঠ করেছি!

—কই? বললাম না কি ওকথা? না-বলা কথাও বুঝে ফেল? আশ্চর্য তো!

কথার মাঝখানেই খাটের তলা থেকে চটিজোড়াটা বার করে তাতে পা গলিয়ে নেন বীরেশ্বর।

—তবু যাচ্ছ?

—কী মুস্কিল! যাচ্ছিই তো!

—কিছুতেই যেতে পাবে না তুমি আজ!

—এই দেখ ছেলেমানুষের মত বায়না ধরছ কেন? বলছি যে—না গেলেই নয়!

বেরিয়ে যান বীরেশ্বর!

বিছে কামড়ানোর মত ছটফট করতে থাকেন আরাধনা, ভেবে পান না কি করবেন। এক একবার মনে হয় সত্যিই একগাছা দড়ি নিয়ে কড়িকাঠ থেকে ঝুলে পড়েন। মোক্ষম রকম জব্দ হয়ে যাক লোকটা। কিন্তু সত্যিই তো আর সেটা সম্ভব নয়!

খানিক পরে বামুন ঠাকুর এসে ডাকে—মা, দাদাবাবু খেতে বসেছেন।

অগত্যাই উঠতে হয় আরাধনাকে।

অন্যমনস্কের মত একটুক্ষণ বসে থেকে বলেন—হ্যাঁরে কাবুল, তোর বাবা রোজ সন্ধ্যাবেলা কোথায় যায় রে?

কাবুল বিস্ময়ে মুখ তুলে বলে—জানি না তো? রোজ যান নাকি?

—তাই তো যাচ্ছে দেখছি!

মার তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক স্বরে কাবুল কিছুটা চমকিত হয়। মুহূর্তে একটা সন্দেহের বিদ্যুৎ খেলে যায় তারও মনের মধ্যে। ছেলেবেলার স্মৃতি লুপ্ত হয় নি তার, অনেক অশান্তি, অনেক অশ্রুজল দেখেছে সে।

ছেলের গুম্ হয়ে যাওয়া মুখের দিকে একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে আরাধনা বলেন—আর দু একটা দিন দেখি, তারপর—এই তোকে ভার দিচ্ছি,—কোথায় যায় সন্ধান নিয়ে আমাকে একদিন নিয়ে যাবি সেখানে।

—তোমাকে?

—হ্যাঁ আমাকে! চমকাচ্ছিস কেন? আমি বেঁচে থাকতে, বুড়ো বয়সে ওকে লোক হাসাতে দেব না!

দু একদিন কেন, পর পর চারদিন দেখেন আরাধনা!

হতাশের আশায় ভাবতে চেষ্টা করেন—হয়তো তাঁর নিজের ভুল! হয়তো সত্যিই সেরকম কোন কাজ পড়েছিল বীরেশ্বরের!

কিন্তু না!

আরাধনার ভাগ্যদেবতা বড় নির্দয়। পর পর চারদিন কোন ব্যতিক্রম নেই, যথানিয়মে পুজো করে নামেন তিনি, যথানিয়মে দেখেন স্বামী বেরবার জন্য তোড়-জোড় করেছেন।

আর নিষেধ করেন না আরাধনা, শুধু গুম্ হয়ে থাকেন!

বার বার চারবার।

পঞ্চম দিনে কর্তা বেরোতে না বেরোতে ছেলেকে কাছে ডাকেন আরাধনা। ভারী মুখে বলেন—চট্ করে একটা রিক্‌স ডাক দিকিন। ঝটপট! কোথায় যায় ও, ধরবই আমি আজ!

কাবুল আড়ষ্ট হযে বলে—রিক্‌স করে?

—এখন তো তাই বেরোই! পায়ে হেঁটে গেছে, ধরতে অবিশ্যিই পারা যাবে। বাসে চড়ে, বাসে চড়ব! ট্যাক্সী নেয়, ট্যাক্সী নেব!

কাবুল ভয়ে ভয়ে বলে—গিয়ে কি করবে?

—কি করব? কি করব সে কথা এখন এখানে বসে গল্প করবার সময় নেই। এখনও গলির ভেতর আছে, বড় রাস্তায় পড়লে আর ধরতে পারা যাবে না।

কাবুল কাতরভাবে বলে—তার চাইতে আজকে আমিই যাই না মা!

—দাঁড়িয়ে তর্ক করবার সময় আমার নেই কাবুল! বেশ—তুমি নিয়ে যেতে না পার, আমি একাই যাচ্ছি।···পথে বেরিয়ে পড়েন আরাধনা!

অগত্যাই কাবুলকে যেতে হয় পিছন পিছন!

না, চোখ ছাড়া হয়ে যান নি বীরেশ্বর!

অনেকটা পথ একটানা চলেছেন হাঁটতে হাঁটতে! রিক্‌স নিয়ে অনুসরণ করবার আদায় আছে। রিক্‌সর সামনের কদর্য কুশ্রী চটের পর্দাটা মুখের সামনে ঝুলিয়ে দেন আরাধনা, কাবুলের আর নিজের পা দু জোড়া পর্যন্ত কাপড় টেনে

টেনে দিয়ে ঢাকা দেন। কোণের দিকে ইঞ্চিখানেক ফাঁক, সেইখানে একটি চক্ষু স্থাপিত।

চোখ না আগুনের ফুলকি!

ম্রিয়মান কাবুল কোণে মাথা হেলিয়ে বসে থাকে নিরুপায়ের ভঙ্গীতে।

রিক্‌সওয়ালা আরোহিণীর নির্দেশ অনুসারে গজ কয়েক তফাৎ থেকে 'বাবুকে ফলো' করে।

গলি রাস্তা থেকে বড় রাস্তায়···বড় রাস্তা থেকে আবার গলি! আঁকাবাঁকা কুৎসিত পথ। কোথাও পথেই স্তুপীকৃত জঞ্জাল, কোথাও মরচে-পড়া ডাষ্টবীনটা উপছে উঠেছে! কোথাও পাশের দোতলার খোলা নর্দমা দিয়ে জল পড়ছে ছরছর করে।

আরাধনা মরীয়া। বাড়ি গিয়ে স্নান করবেন নিশ্চিত, অতএব হেস্তনেস্ত দেখতেই হবে। শরীর মন ক্রমশঃই যেন অবশ হয়ে আসছে! এই আস্তাকুঁড়ে প্রত্যহ গতায়াত বীরেশ্বরেব!

তাহলে শুধু মদই নয়, দ্বিতীয় 'ম' কারও! হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

রাগেও নয় দুঃখেও নয় অপমানে চোখ ফেটে জল আসে আরাধনার।

হায় গুরুদেব!

আরাধনার স্বামী এমনি নরকের কীট! ইতর হতে হলে কি এমনি ইতরই হতে হয়!

হঠাৎ কাবুল বলে—মা ফিরে যাই!

সঙ্গে সঙ্গে রিক্‌সওয়ালাটাও বলে—হাঁ হাঁ, গাড়ি আর যাবে না!

আরাধনার নিজের মনেই দ্বিধা এসেছিল—ভাবছিলেন এগোই কি ফিরে যাই, কিন্তু চিরস্বভাব অনুযায়ী দুজনের বিরুদ্ধ মতে তাঁর জিদ চাপে। বলেন—আচ্ছা দাঁড়া তোরা এখানে! বলে নেমে পড়েন।

কাবুল ব্যাকুলভাবে হাতটা ধরে ফেলে বলে—ওই পচা গলির মধ্যে তোমার আর গিয়ে কাজ নেই মা!

আরাধনা হাত ছাড়িয়ে নেন, বিদ্বেষ-কুটিলমুখে বলেন—কেন তোদের বাপ রোজ আসতে পারে—আমিই গেলেই দোষ?

এ রণচণ্ডী মূর্তির সামনে কাবুল শিশুমাত্র! গুটি গুটি অগ্রসর হয় মায়ের পিছন পিছন।···বীরেশ্বর ততক্ষণে চোখছাড়া হয়ে গেছেন। তা হোক, আরাধনার হাত ছাড়াতে পারবেন না!

ছেঁড়া মাদুর, কাচভাঙা লণ্ঠন, নড়বড়ে জলচৌকি! স্কুলের আসবাব এই। বিদ্যার্থীদের চেহারাও তথৈবচ! কালো, রোগা, খালি পা, খালি গা। লজ্জা নিবারণার্থে মাত্র একটা করে হ্যাফপ্যাণ্ট! কিন্তু পরিবেশ যাই হোক উৎসাহের অভাব নেই।

বীরেশ্বরকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সেই গুটি কুড়ি-বাইশ মানবশিশু সমস্বরে কলরোল তোলে—লেট্! লেট্! মাষ্টার মশাই আজকেও লেট্!

নড়বড়ে জলচৌকিটির উপর আসন পরিগ্রহ করে বীরেশ্বর ফুল্লমুখে বলেন—হুঁ! মাষ্টারমশাই একেবারে লেট্ লতিফ!

হাসির আর ঠেলাঠেলির ধুম পড়ে যায় ছাত্রদের মধ্যে।

বাতাসে কম্পিত ভাঙা লণ্ঠনের নিষ্প্রভ আলোটুকুতেও তাদের ছায়াগুলো অনেক বড় হয়ে হয়ে কাঁপতে থাকে পিছনের বিবর্ণ প্রাচীরটার গায়ে।...কাঁপতে থাকে পৃথিবী, লজ্জায় কাঁপতে থাকে অদূরবর্তিনীর পা দুখানা।

ছেলে রয়েছে সঙ্গে। আরাধনার নীচতার সাক্ষী হয়ে গেল—চিরদিনের মত!

প্রয়োজন ছিল না, তবু এবারেও কদর্য কুশ্রী সেই চটের পর্দাটা সামনে ঝুলিয়ে দিয়েছেন আরাধনা। একলাই চলেছেন। কারণ চটটা ঝোলাবার সঙ্গে সঙ্গেই—"তুমি ওঠ, আমি হেঁটে যাচ্ছি—" বলে কাবুল লাফিয়ে নেমে পড়েছে রিক্স থেকে!

চলতে চলতে আকস্মিক সেই লজ্জাবোধটাও চলে গেছে আরাধনার, জেগেছে শুধু বিস্ময়! হ্যাঁ, অবাক হয়ে ভাবছেন আরাধনা—যে ব্যক্তি মদ খাওয়ার মত গর্হিত কাজ করতে কখনও এতটুকু লজ্জিত হয় নি, লুকোচুরির ধার দিয়ে যায় নি, সে একটা সৎকাজ করতে বসে এত লজ্জিত কেন, যে এমন করে লুকোচুরির দরকার হয়?

ছায়াচ্ছন্ন মনোলোক! সেখানে কখন কোন ঘটনা ঘটছে, আর কেন ঘটছে, এ তথ্য এখনও আবিষ্কৃত হয় নি।

সমুদ্রতীরে বাড়ি শুনতেই লোভনীয়, একেবারে কিনারা ঘেঁষে যদি নতুন একখানি বাড়ি ওঠে, ছবির মত দেখতে লাগে, পথ চলতে দাঁড়িয়ে পড়ে বলতে হয় বাঃ! কিন্তু সে সৌন্দর্য আর কদিনই বা থাকে? বালির ঝড়, আর লোনা হাওয়ার অবিরাম আঘাতে আঘাতে রং যায় ঝরে, বেরিয়ে পড়ে দেওয়াল আর জানলা-দরজাগুলোর বিবর্ণ কাঠামো। বাড়ির শুধু লোহা-লক্কড়েই নয়, ইট পাথরের গা গুলোয় পর্যন্ত যেন মরচে ধরে। হঠাৎ দেখলে পরিত্যক্ত বাড়ির মত লাগে।

নতুন বাড়িরই এই হাল হয়, আর—অভীক আর চিত্রা যে বাড়িটার সামনে এসে গাড়ি থেকে নামল সেটার তো কালের আক্রমণেই ঝরে পড়বার সময় হয়েছে।

চিত্রা গাড়ি থেকে নেমেই দাঁড়িয়ে পড়ে বলল—এই তোমার মাসীমার আস্তানা? এ বাড়িতে মানুষ থাকে?

—তা থাকেন!

—উঃ! দেখে মনে হচ্ছে দশ বছরের পোড়ো বাড়ি। থাকেন যখন, সারান না কেন?

—কে সারাচ্ছে? আত্মীয়-বান্ধব সঙ্গত্যাগী সন্ন্যাসিনী।

চিত্রা উৎসুক ভাবে বলে—আচ্ছা উনি কতদিন সন্ন্যাসিনী হয়েছেন?

—ঠিক বলতে পারব না, তবে আমার জন্মাবার আগে থেকে তো বটেই।

—গেরুয়া পরেন?

—গেরুয়া? না তো!

চিত্রা ঈষৎ হতাশভাবে বলে—গেরুয়া পরেন না? আমি ভেবেছিলাম—মানে সকলে বলছিল কিনা সন্ন্যাসিনী—

—তা গেরুয়া না পরলে কি আর সন্ন্যাসিনী হওয়া যায় না?

নব-বিবাহিতা—চিত্রা এসব দার্শনিক মন্তব্যের ধার ধারে না, সে গম্ভীর ভাবে বলে—যাই বলো বাপু, তোমার মেসোমশাইয়ের জন্য দুঃখ হয়। দেখলাম তো ভদ্রলোককে, এত বয়েস হয়েছে, তবু কেমন চমৎকার রয়েছেন। চেহারাও—

—চেহারা? চেহারার কথা যদি বল মাসীমার সঙ্গে তুলনাই হয় না। মাসীমাকে হঠাৎ দেখলে শ্বেতপাথরের প্রতিমা বলে মনে হয়।

চিত্রা মুচকে হেসে বলে—তোমার দেখছি সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি। অন্ততঃ রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে তো বটেই।

অভীকও হাসে। বলে—তোমাকে যেটা বলা হয়, সেটা হচ্ছে মনোরঞ্জক চাটুভাষণ, মাসী পিসীর ক্ষেত্রে সেটা অপ্রয়োজনীয়।…রূপের জোরেই উনি গরীবের ঘর থেকে রাজার ঘরে পড়েছিলেন।

এই সময় একটা ঝি গোছের স্ত্রীলোক দরজা খুলে বেরিয়ে এল। তারও বয়েস হয়েছে, চোখ কুঁচকে রোদ্দের দিকে হাত আড়াল করে বলে—কে বাছা তোমরা?

—আমরা? তাই তো—অভীক দুষ্ট হাসি হেসে গলা খাটো করে বলে—আমরা 'কে', সেটা তো বলা বড় মুস্কিল দেখছি।—শোন—উনি বাড়ি আছেন?

—কে? সন্দিগ্ধ প্রশ্ন করে স্ত্রীলোকটা।

—মহাশ্বেতা দেবী—মানে তোমার গিন্নীমা! বাড়ি আছেন?

ঝি-টা বিরক্তস্বরে বলে—বাড়ি থাকবে না তো কোথায় যাবে? তেনার কি ওঠবার ক্ষ্যামতা আছে?

—কেন, অসুখ নাকি? ব্যগ্র প্রশ্ন করে অভীক।

—অসুখ নয়? বলে আজ ছমাস ভুগতেছে!

—ওঃ! আমাদের একটু—ইয়ে—ভেতরে নিয়ে চল না।

—তোমরা কে, তা তো কই বললে না বাছা?

—আমরা? মানে—আমি তাঁর বোনের ছেলে, আর এ হচ্ছে—মানে নতুন বিয়ে হয়েছে বলে আমরা মাসীমাকে প্রণাম জানাতে এসেছি।

চিত্রা মনে মনে হাসে।

প্রকৃতপক্ষে এটা ওদের মধুচন্দ্র।

নতুন বৌ নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়বার এ একটা ছুতো আবিষ্কার করেছে অভীক। জানে এতে অন্ততঃ মায়ের সমর্থন পাবেই।··কিন্তু এখানে আবার অসুখ-বিসুখ কেন রে বাবা! একবার দেখা করেই কেটে পড়ত তারা "হোটেল ডি, মুন্‌লাইটে"র উদ্দেশে, এখন আবার কি না জানি ফেরে পড়তে হয়।

ঝি-টা অপ্রসন্নমুখে ওদের পথ-নির্দেশিকার কাজ করে। আর শয্যাগতার শয্যাপার্শ্বে এসে দাঁড়িয়ে চিত্রার মনে হয় রূপবর্ণনার ব্যাপারে অন্ততঃ এক্ষেত্রে অভীকের উক্তিটা অত্যুক্তি নয়।

এত বয়েস, এত অসুখ, তবু এখনও মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়, রং দেখলে অবাক লাগে।

রোগিনীর পক্ষে যতটা ব্যস্ত হয়ে উঠে বসা সম্ভব, ততটা ব্যস্ত হয়েই উঠে বসেন মহাশ্বেতা। ঝি-টা আগেই জানান দিয়ে দিয়েছে, তাই অবহিত হয়েই শান্তস্বরে বলেন—বিছানার বেশী কাছে আসিস নে বাবা, রোগীর বিছানা। ওই টুলটা টেনে এনে বৌমাকে বসতে দে, আর তুই—স্নিগ্ধ একটু হাসেন মহাশ্বেতা—তুই খাড়া দাঁড়িয়ে থাক। দুটো আসন তো দিতে পারব না।

—আমরা যে আপনাকে প্রণাম করতে এলাম মাসীমা। পায়ের ধূলো নিতে দেবেন না?

মহাশ্বেতা হেসে বলেন—কলকাতা থেকে এত ধূলো খেতে খেতে এত দূরে এলি, সেই তো অজস্র প্রণাম অভীক, পায়ের ধূলোটা বাহুল্য।

—আপনার এত অসুখ, কাউকে তো জানতে দেন নি মাসীমা?

—কাউকে? মহাশ্বেতা আবার হেসে উঠেন—যাঁর জানবার তিনি তো জানছেনই, আর কাকে জানাব?

কথাগুলো চিত্রার কানে ছেঁদো কথার মত লাগে, কিন্তু অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকে ও প্রায় ষাটের কাছাকাছি বয়সের এই মহিলাটির হাস্যোদ্ভাসিত মুখটার দিকে। মুখের কাট কি নিখুঁত!

অভীক বিরসভাব দেখিয়ে বলে—তা 'তিনি' তো আর চিকিৎসা করতে আসবেন না?

—আসেন রে আসেন। চুপি চুপি খবর পাঠিয়েছেন, এইবার চরম চিকিৎসার সময় এসেছে, শেষ ওষুধ নিয়ে যাচ্ছি।

অভীক একটু চুপ করে থেকে বলে—এমন অবস্থা জানলে, মাকে নিয়ে আসতাম।

—ভাগ্যিস জানিস নি। তোরা ছুটিতে এসেছিস সংসার থেকে পালিয়ে, সে বুড়ী এসে আবার কি অস্বস্তিটা বাড়াতো বল তো?

অভীক হেসে ফেলে।

আর চিত্রা মনে মনে ভাবে···বাবা এদিকে তো চির-সন্ন্যাসিনী, অথচ ঠাট্টা-তামাসাটির বেলায় তো বেশ!

এটা ওটা সেটা। টুকটাক কথা।

একটু পরে মহাশ্বেতা বলেন—কোথায় উঠেছিস?

—ওদিকের একটা হোটেলে।

—এইবার তোরা তাহলে যা বাবা। রোগীর ঘরে বেশীক্ষণ থাকার দরকার

নেই।···আর শোন—একটু থামেন মহাশ্বেতা।

—শুয়ে পড়ুন মাসীমা, কষ্ট হচ্ছে আপনার।

—শুচ্ছি। শোন—নতুন বৌ নিয়ে এলি, একটু মুখ দেখানি দিই, ওই ট্রাঙ্কটা খোল তো।

—আঃ ওসব আবার কেন মাসীমা? আপনার আবার অত সামাজিকতা কি?

—সামাজিকতা নয় রে অভীক, আশীর্বাদ। সোনা মুক্তো তো নয় একটি মূল্যহীন মূল্যবান জিনিস, এই পর্যন্ত বয়ে মরছি, তোর বৌয়ের হাতেই দিই। খোল ট্রাঙ্কটা।

অভীক বিমূঢ়ভাবে বসে—চাবি?

—চাবি? চাবির পাট নেই রে বাছা। বললাম তো—সোনা মুক্তো নয়, ছোট্ট একটি চন্দন কাঠের কৌটোর মধ্যে সূক্ষ্ম কাজের একটি হাতীর দাঁতের মালা কে জানে কিসের স্মৃতি বিজড়িত আছে এতে, যার জন্যে সংসারত্যাগিনী সন্ন্যাসিনীও সুদীর্ঘকাল ধরে সযত্নে তুলে রেখেছেন কোন স্নেহপাত্রের হাতে তুলে দেবার জন্যে।

জিনিসটা চিত্রার হাতে তুলে দিয়ে, মহাশ্বেতা অভীকের দিকে তাকিয়ে বলেন—তোকে দেবার আর একটা জিনিস আছে, সেটা আজ থাকে। কদিন আছিস? কাল আর একবার আসতে পারবি?

—নিশ্চয়! তিন-চার দিন আছি আরও। কিন্তু মাসীমা, রাগ করতে পাবেন না—আমি একজন ডাক্তার যোগাড় করে আনব—

—পাগল ছেলে! মহাশ্বেতা শুয়ে পড়ে হাত নেড়ে বারণ করেন—ও সব করতে যাস নে, শুধু সময় নিয়ে একবার আসিস।

—এই হচ্ছে মাসীমার সেই উপহার—হোটেলের বারান্দায় পাতা ডেক চেয়ারটায় বসে পড়ে অভীক বলে—মনে হচ্ছে মাসীমার এবার শেষ হয়ে এসেছে। জীবনে কখনও কাউকে চিঠি দেন নি, যাঁকে দেবার জন্যে একটা চিঠি দিলেন। মুখ বন্ধ একটা খাম দেখায় অভীক, আবার বলে—আর আমাকে এই খাতা—আশ্চর্য! বললেন কি জান? "তুই আর কখনও আমার কাছে আসিস নি। এখন নয়, যদি বেঁচে থাকি ভবিষ্যতেও নয়।"

চিত্রা ঝোড়ো হাওয়ায় চুল সামলাতে বলে—সন্ন্যাসী মানুষদের কিছুতেই নিন্দে নেই, যা ইচ্ছে বলা চলে। সংসারী লোক বলুক দিকি এমন কথা?

—কিন্তু যাই বল আমার উপর ওঁর বরাবর একটি বিশেষ স্নেহ আছে। এসেছিলাম আরও দুবার—

চিত্রা উৎসুক স্বরে বলে—খাতাটা কিসের ? আত্মজীবনী-টীবনী নাকি ?

—নাঃ। অভীক হাসে—মানুষের দুর্বলতা। বলছিলেন মাঝে একবার নাকি সাহিত্যচর্চার শখ হয়েছিল, তাই গল্প লিখছিলেন কয়েকটা।

—ও বাবা! তাই নাকি ? দেখি দেখি! হাতের লেখাটি তো বেশ।

—হ্যাঁ মানুষটির মতই ছিমছাম পরিষ্কার। দাঁড়াও আমি আগে দেখি তারপর তুমি—

—ইস তাই বৈকি ? আমি আগে—

—আমি আগে—

—আমার নিজের মাসী—

—আমার বরের মাসী, ডবল দাবী!

কাড়াকাড়িতে অবশ্য চিত্রাই জেতে এবং লাইন কয়েক পড়েই বলে—ভাষাটা তো মন্দ নয়, বেশ পাকা হাতের লেখার মত। পড়ে দেখ।

হাতে নিয়ে পড়তে সুরু করে অভীক।

"রিপুর মধ্যে অন্ত্যজ রিপু রাগ, তাই রাগের সংজ্ঞা চণ্ডাল! কে জানে চণ্ডাল মাত্রেই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য কিনা। তবে রাগটা তাই বটে। সে যখন যার উপর ভর করে তাকে ধংস করে বসে।

অর্থবানের রাগ, সে আবার আরও সর্বনেশে।

অর্থের দম্ভ তো তাদের হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করেই রেখেছে, এটা তার ওপর বাড়তি। রাগলে এদের সমস্ত 'বোধে'র দরজা লুপ্ত হয়ে যায়। জমিদারের ছেলে জমিদার, বাপ মরে নতুন গদি লাভ হয়েছে, কাজেই সোনায় লেগেছে সোহাগা। তাই যেদিন চান করতে গিয়ে হীরের আংটি হারালেন চন্দ্রনারায়ণ, সেদিন তাঁর পূর্বতন পুরুষদের রক্ত শিরায় শিরায় টগবগিয়ে উঠল।

এ তো হারানো নয়, খোয়া যাওয়া! যার আসল মানে চুরি! তেল মাখিয়েছে চাকরে ডলে ডলে ঘষে ঘষে এবং নির্ঘাৎ বাবুর আরাম-নিমীলিত নেত্রের অবসরে খুলে নিয়েছে তিন হাজার টাকার মালটি।

সদ্য-জমিদার চন্দ্রনারায়ণের কথা বলছি—।

দর্পনারায়ণের পৌত্র, প্রভুনারায়ণের ব্যাটা! দর্প উদ্ধত হয়ে আছে ওর

প্রত্যেকটি রক্ত-কণিকায়, প্রত্যেকটি শিরা-উপশিরায় প্রভুত্বের সচেতন অহমিকা। বললেন—"হারামজাদকো বোলাও! লাগাও জুতি।"

বেহারী চাকর নয়, রোগা পটকা একটা বাঙালী ছোকরা, মাস আষ্টেক হল বাবুর তেল মাখানোর কাজটা ধরেছে, হিন্দী বুলি শুনেই বেচারার আত্মাপুরুষ খাঁচার দরজা খুলে বসেছে।

বাবু সামনে দাঁড়িয়ে তদারকি করছেন, গুর্খা দারোয়ানের ওপর জুতো মারার ভার।

বাবু মাঝে মাঝে হাঁক দিচ্ছেন—বার কর হারামজাদা আংটি! নইলে তোকে আজ জ্যান্ত গোর দেব!

ছোকরা চাকরটার ক্ষীণকণ্ঠ চাপা পড়ে যাচ্ছে এই বীর কণ্ঠের নিচে। ভগবানও কালা হয়ে থাকেন। বাতাসের পাখায় ভর করে আকাশে পৌঁছে যাবে ওর আবেদন, এমন আশা করা চলে না। সে বলতে চায় হীরের আংটি সে নেয় নি, ছোট ওই জিনিসটার যে এত দাম হওয়া সম্ভব সে কথা বেচারা জানেই না! কিন্তু নাই বা জানল, না জানিয়ে ছাড়া হবে তাকে? মারের চোটে জানিয়ে দেওয়া হবে।

গুর্খা দরওয়ানটার ক্লান্তির অবসরে—"তবু কবুল করবি নে ব্যাটা?" বলে ছুটে গিয়ে একটা লাথি মারলেন চন্দ্রনারায়ণ ছোঁড়াটার হাঁপরের মত হাঁফ-ধরা পেটটার ওপর।···আর আশ্চর্য, ভোজপুরীর হাতে মার খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছোঁড়াটা কিনা এই একটা লাথিতেই গড়িয়ে পড়ল? পড়ল পড়ল, একেবারে মরেই পড়ল?

পাপ নয়, পাতক নয়—লজ্জা!

লজ্জায় সারা হলেন চন্দ্রনারায়ণ! এ কী অপযশ! শেষে কিনা ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ? যে হতভাগা এই লজ্জার নিমিত্ত হল, সে বোধ করি আপন ধৃষ্টতার অপরাধেই মুখ থুবড়ে থাকল, আর মুখ কালো করে হুকুম দিলেন চন্দ্রনারায়ণ, "কেয়াড়ি বন্ধ কর দেও।"

কিন্তু একটা সদর বন্ধ করে কী-ই বা হবে, খিড়কির দরজা যে অগুণতি। দাসী চাকরে ছত্রিশ জন, 'ঠ্যাঙানি' দেখবার দুর্লভ আনন্দে কাজকর্ম ফেলে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়েছিল উঠোনে, ঘুষ দিয়ে ক-জনের মুখ বন্ধ করা যাবে? মরে 'বাবু'কে জব্দ করে যাওয়া! হতভাগা ব্যাটার জ্ঞাতি একটা দাদা নাকি ছিল ওই দলে, ঘুষে

মুখ বন্ধ করা গেল না তার। ঘুঁষিয়ে বন্ধ করে দেবার কৌশলটা প্রয়োগ করবার সুযোগের আগেই সে খবর দিয়ে বসল থানায়।

দর্পনারায়ণ হলে হয়তো এ অবস্থায় উল্লাস সহকারে বলতেন—"যা, ব্যাটার লাসটাকে নিয়ে চন্দন কাঠে দাহ করে আয়, আমার হাতে মরে স্বর্গে গেল।"

কিন্তু আরও দুপুরুষ নেমেছে, ছোটলোকরা আর এখন বড়লোকের হাতে মরে স্বর্গে যাচ্ছে না, তাই চন্দ্রনারায়ণ ঘরে এসে বসে পড়ে অপ্রতিভ ভাবে বললেন —দেখলে হারামজাদার আক্কেল? নেপালীর জুতো খেতে খেতে সাতবার ঝেড়ে উঠল, আর আমার খালি পায়ের এক ধাক্কাতেই খতম? এ যেন আমাকে খুনের পাতকে ফেলবার জন্যে ষড়যন্ত্র!

কিন্তু যার উদ্দেশে কথাটা উচ্চারিত হল, সে কি তখন এ-জগতে ছিল?··· এইমাত্র যে লোকটা একটা খুন করে এল তার মুখের দিকে বিস্ময়-বিস্ফারিত অপলক দৃষ্টি মেলে যে দাঁড়িয়েছিল সে কি একটা জ্যান্ত মানুষ? না পাথরের পুতুল!

চন্দ্রনারায়ণ কি এই কাঁচের বলের মতন নিথর অক্ষিগোলক দুটো দেখে ভয় পেলেন? বোধ হয়! ধর্মাধর্ম পাপপুণ্য কোন কিছুতেই ভয় না থাক সুন্দরী প্রিয়ার কোপ অভিমানে ভয় আছে চন্দ্রনারায়ণের। তাই আর একটু অপ্রতিভের ভাবে বললেন—সত্যি কাজটা ভারি বিশ্রী হয়ে গেল! হতভাগা একেবারে মরে যাবে তা কে জানত বল তো? বাবার হাতের আংটিটা—চুরি যাওয়ায় রাগটা কেমন সামলাতে পারলাম না। কথাতেই তো আছে রাগ না চণ্ডাল! যাবে—কতকগুলো টাকা দণ্ড যাবে আর কি!

নির্বাক প্রতিমা তবু নির্বাক?

—ব্যাস তুমি যে একেবারে কথাই কইছ না? ব্যাটার ভেতরে কিছু ছিল না বুঝলে? ফাঁপা বাঁশ একখানা। ওই জন্যেই তেল মেখে সুখ হচ্ছিল না। ক-দিন ধরেই ভাবছিলাম হাত বদলাতে হবে। তা—

বাকী কথাটা অসমাপ্তই থাকল, চন্দ্রনারায়ণের বোন এসে রুদ্ধকণ্ঠে বলল—দাদা, সর্বনাশ হয়েছে, পুলিশে বাড়ি ঘেরাও করেছে।

উদ্বেগ চেপে কণ্ঠস্বরে তাচ্ছিল্য ফুটিয়ে চন্দ্রনারায়ণ বললেন—ঘেরাও তো একবার করবেই! আবার খুলবার মন্তর ঝাড়লেই ঠিক খুলে দিয়ে যাবে। সর্বনাশের আতঙ্কে চোখ যে তোদের গোল হয়ে গেল রে!

স্ত্রী আর বোন উভয়কেই ধিক্কার দিয়ে আর নিশ্চিন্ত করে নিচে নেমে গেলেন

চন্দ্রনারায়ণ। যাবার সময় লোহার সিন্দুক খুলে নিয়ে গেলেন পুলিশের মুখ বন্ধ করবার মন্ত্র!...কিন্তু?...

আশ্চর্য! তবু সে মুখ বন্ধ হল না!

কোন ফাঁকে, কোন খানে যে এক-আধটা নির্বোধ লোক ঢুকে পড়ে, যাদের জন্যে মাঝে মাঝে বুদ্ধিমান মানুষদের অসুবিধের অন্ত থাকে না! একটা দারোগা-কুল-কুলঙ্ক চন্দ্রনারায়ণের নামে খুনের ওপর ডবল চার্জ আনল উৎকোচ দিতে আসার।

বেপোটে পড়ে গেলেন চন্দ্রনারায়ণ।

তারপর সুরু হল যুদ্ধ।

সত্যে আর অর্থে।

তা চন্দ্রনারায়ণের বোধ হয় তখন কু-গ্রহের দশা চলছিল, তাই তাঁর ভাগ্যে চিরন্তন ব্যবস্থা গেল উল্টে, অর্থ আর সত্যের লড়াইয়ে কেমন্ করে যেন জয়ী হয়ে বসল সত্য!

'ইচ্ছাকৃত নরহত্যা'র দায়ে পড়লেন চন্দ্রনারায়ণ! ন্যায়বিচারে যার শাস্তি ফাঁসি!

তবে যদি—

চন্দ্রনারায়ণের বোন ভাজকে টেনে এনে ঘরে খিল লাগিয়ে প্রজাপতির পাখার শন্‌শনানির স্বরে বলল—দাদাকে বাঁচাবার জন্যে এই বছরাবধি তো ঢের লড়লে বৌ, একটা রাজার রাজত্ব উড়ে গেল, স্ত্রী-ধন গহনাগুলো পর্যন্ত দুহাতে বিলিয়ে সর্বস্বান্ত হলে, কিন্তু তবুও তো রক্ষে হয় না।

বৌরাণী শুধু চেয়ে রইলেন।

বোন বলল—তোমার ননদাই বলছে—এখন একমাত্র শেষ উপায় আছে, তোমারই হাতে।

বৌরাণী নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—কি?

বোন আরও গলা নামিয়ে, প্রায় কানে কানে বলল—ও বলছিল—তুমি যদি—

ঠোকা লাগল চকমকির্ পাথরে পাথরে...ফিন্‌কি দিয়ে ঠিকরে উঠল এক ঝিলিক আগুন।

—কী ?

—চমকে উঠবে, তা জানি বৌরাণী···বোন ম্রিয়মান গলায় বলে—কিন্তু তোমার ননদাই বলছে এ ছাড়া আর অন্য উপায় নেই ! আইনে নাকি এই এক ব্যাপারেই খুনের অপরাধের মার্জনা আছে। এই পরামর্শই হচ্ছিল এতক্ষণ উকিল-ব্যারিস্টারের সঙ্গে।

অনেকক্ষণ পরে পড়ল আর একটা নিঃশ্বাস—আগুনে ঝলসানো···পৃথিবীর মাটি পুড়িয়ে দেওয়া জলন্ত নিঃশ্বাস !

—আর তোমার দাদা ?

—দাদা ? দাদা না কি প্রথমটা খুব 'না না' করেছিল, শেষে অনেক বোঝানো-সোঝানোয় রাজী হয়েছে। সহজে কি আর এসব কেলেঙ্কার কথায় রাজী হতে ইচ্ছে করে ? তবে না কি 'প্রাণের দায়' বলে কথা !···বোন নিঃশ্বাস ফেলে।

বৌরাণী স্থিরস্বরে বলেন—আমাকে সাক্ষী দিতে হবে তো ?

—তোমাকেই তো দিতে হবে ! তুমিই হলে আসল। তোমার একটা কথার ওপর এখন দাদার প্রাণটা ঝুলছে।···অবিশ্যি এজলাশ বাড়িতেই বসবে !

—দরকার কি ? সাধারণ আদালতেই যাব আমি। শুধু তার আগে একবার তোমার দাদার সঙ্গে দেখা করে জেনে নিতে চাই, এ শুধুই উকিল-ব্যারিস্টারের কৌশল কি না !

বোন আক্ষেপের সুরে বলে—কৌশল তো তাদেরই বটে, দাদা আর এত সব আইন-কানুন জানবে কোথা থেকে ? কিন্তু দোহাই বৌরাণী, অনেক বুঝিয়ে রাজী করা হয়েছে তাকে, তুমি যেন 'ইয়ে' ভাব দেখিও না।—তোমায় তো বেশী কিছু বলতে হবে না, তুমি শুধু বলবে, লোকটা আমাকে আক্রমণ করতে আসে, আমি ভয়ে চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়ি, তারপর কি হয়েছিল জানি না।··· জ্ঞান হয়ে দেখলাম বাড়িতে লোকে লোকারণ্য আর শয়তানটা মরে উঠোনে পড়ে রয়েছে।" ব্যস, বাকী যা বলবার উকিল-ব্যারিস্টারে বলবে।

চন্দ্রনারায়ণ বললেন—খোলা আদালতে সাক্ষ্য দিতে চাও কেন ? এখনও ঠাকুরবাড়িটা আছে, বাঁধা দিয়ে বাড়িতে কোর্ট বসাবার খরচ তুলব। দেবত্র সম্পত্তি ধার নেওয়া চলে।

বৌরাণী শান্তস্বরে বললেন—দরকার কি ?

—দরকার নেই ? তুমি কোন বাড়ির বৌ, ভুলে যাচ্ছ সে কথা ?

—সব সময় সব কথা মনে রাখা সম্ভব হয় না।

চন্দ্রনারায়ণ ক্ষুব্ধস্বরে বললেন—তা সত্যি! মাথার ঠিক থাকে না সব সময়! বুঝছি বলতে তোমার খুব লজ্জা করবে, কিন্তু রাণী এও জানি তুমি সাধ্বী স্ত্রী! স্বামীর প্রাণরক্ষার জন্য তুমি সে লজ্জা কাটিয়ে ফেলতে পারবে। মনে রেখ উকিলের সঙ্গে যেন কথার নড়চড় হয় না! বলবে চীৎকার করেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম,……

বৌরাণী বাধা দিলেন—জ্ঞান হয়ে কি দেখলাম, সে কথা থাক!

—আচ্ছা থাক! ওরাই বলে দেবে।…এক্ষুনি উঠছ? এখনও তো সময় আছে!

—নাঃ সময় আর নেই—বলে উঠে দাঁড়ালেন বৌরাণী।

চন্দ্রনারায়ণ ব্যগ্রভাবে বললেন—খোলা আদালতের খেয়াল ছাড়, শেষ কপর্দক শেষ করেও মুখুয্যে-বাড়ির বৌয়ের সম্ভ্রম রক্ষা করা চাই।

সে কথা বোধকরি শুনতে পেলেন না বৌরাণী।

প্রহরীর হাতের চাবির তাড়া বেজে উঠল ঝন্ ঝন্ ঝন্।

না ঠাকুরবাড়ি বন্ধক দিতে রাজী হলেন না বৌরাণী, খোলা আদালতেই দাঁড়াবেন তিনি। ননদাইয়ের অনুরোধে মৃদু হেসে বললেন—স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে, এটুকু আব বেশি কি ঠাকুর জামাই?

আদালতের অনেক কচকচি শেষ হয়ে সাক্ষী ডাকা হল বৌরাণীকে। ও পক্ষের কৌঁসুলী বললেন—এতক্ষণ ব্যারিস্টার সাহেব যা বললেন সে কথা সত্য?

বৌরাণী অকম্পিত স্বরে বললেন—সম্পূর্ণ সত্য নয়!

সম্পূর্ণ সত্য নয়!

বজ্রাঘাত হল আদালতে।

চমকে উঠেছে বোন আর ভাই, চমকে উঠেছেন এ পক্ষের আইনজ্ঞ দল। পাখি-পড়া করে শিখিয়ে আনলেন যে তাঁরা। এখন এ আবার কি বলে বসল?

যিনি প্রধান কি যেন বলতে চেষ্টা করেন তিনি, কিন্তু থামিয়ে দেন জজসাহেব। অভয়ের স্বরে বলেন—প্রকৃত সত্য ঘটনা নির্ভয়ে বলুন আপনি।

—যে লোক নিহত হয়েছে, সে আমাকে অক্রমণ করতে এসেছিল, এটা ঠিক নয়, আমিই তার প্রতি আসক্ত ছিলাম! ঈর্ষাপরবশ হয়ে আমার স্বামী—

ছি ছি ছি!…সমস্ত আদালত-কক্ষে একটা 'ছি ছি'-কারের ঢেউ বয়ে যায়!…

সম্ভ্রান্ত ঘরের কুলবধূর এ কী কদর্য স্বীকারোক্তি!

পাথর হয়ে গেছে সবাই!

সহসা আসামী চীৎকার করে ওঠে—মিথ্যে কথা! মিথ্যে কথা! এ শুধু রাগের কথা!...কিন্তু আসামী চেঁচালেও আদালতের কাজ ব্যাহত হয় না।

লজ্জায় ঘৃণায় অবনতমস্তক এপক্ষের আইনজ্ঞ পুরুষরা তবু লড়তে সুরু করলেন? আইন-পুস্তকের সহস্র 'ধারা'র জটিল আবর্তে ঘুরপাক দিয়ে দিয়ে মণি মুক্তা হাতড়ে তোলেন তাঁরা।

ঈর্ষা?

হ্যাঁ, এতেও পুরুষের রক্ত টগবগিয়ে উঠতে পারে। এ ক্ষেত্রে খুনের অপরাধ মার্জনীয়! আইনে তাই বলে।

অতএব বেকসুর খালাস পেলেন চন্দ্রনারায়ণ!

রক্ত ফেটে পড়া টসটসে মুখ নিয়ে গাড়ি চড়ে বাড়ি ফিরে এলেন।

লজ্জা, অপমান, বিস্ময় অনেকগুলো ভাবের সংমিশ্রণে লাল মুখ ক্রমশঃ কালো হয়ে উঠতে চাইছে।

বাড়ি এসে—

অতঃপর ধিক্কার! এ কী বলে বসলেন বৌরাণী? কী কুৎসিত! কী কদর্য! আর কেনই বা?......পাগল হয়ে গেছলেন না কি তিনি? ধিক্কারের বিষে মানুষ মরে না তাই রক্ষা। না হলে হয়তো...বিষে নীল হয়ে মরেই যেত মানুষটা। বৌরাণী কিন্তু নির্বিকার।

—কি বললাম আর কি না বললাম, তাতে কি এসে যাচ্ছে? প্রাণ বাঁচা নিয়ে কথা, সেটা তো বেঁচেছে? ঈর্ষায় পড়ে খুন করলে ফাঁসি হয় না, এইটা শোনা ছিল আমার।

ওঃ! তাই! তাই নাকি? এটা তো ভাবে নি তারা!

অতএব চুপ করে সবাই।

সাধ্বী নারী স্বামীর প্রাণরক্ষার্থে আপন মান-মর্যাদার প্রশ্ন ভুলে আরও জোরালো ঔষধ প্রয়োগ করেছে।...তবে ধিক্কার থাক! দাও অভিনন্দন!

সত্যিই তো এতক্ষণ কী ভুলই করছিল তারা।

নিরালায় এসে চন্দ্রনারায়ণ বললেন—তুমি যা করেছ, তা সাবিত্রীর সঙ্গে তুলনীয়। সাবিত্রী স্বামীকে যমের হাত থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন, তুমিও তাই?

…আহা কত কষ্টই পেলে, আমার একটা বোকামির জন্তে।…এস, কাছে এস পুরস্কার নাও।

হাত ছাড়িয়ে নেন বৌরাণী, কাঠের মত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

—এস কাছে।

—না।

—না?

—আমাকে এবার মুখুয্যে-বাড়ির বৌ-গিরি থেকে ছুটি দাও।

—ছুটি দেব তোমাকে?

চন্দ্রনারায়ণ বিমূঢ় ভাবে বলেন—তবে এত কাণ্ড করে বাঁচলাম কার জন্তে?

বৌরাণী একটু হাসলেন।

পাগলামি ছাড়ো? বুঝছি অভিমান হয়েছে, কিন্তু কি করব রাণী? দেখলে তো কী বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিলাম? তোমার এটুকু সহায়তা না পেলে ফাঁসি-কাঠে ঝুলতে হত এতক্ষণ?

—হয় নি, তার জন্তে তোমার ভগবানকে ধন্তবাদ দাও। আমার ছুটি চাই।

—কিন্তু ছুটিটা কিসের? কি করবে ছুটি নিয়ে? উদভ্রান্তের মত বলেন চন্দ্রনারায়ণ।

প্রায়শ্চিত্ত।

—প্রায়শ্চিত্ত?

—একটা ইতরের সংস্পর্শে দেহে আর মনে যে অশুচি, তা অপবিত্রতা সঞ্চিত হয়েছে, দেখি তা থেকে মুক্ত হওয়া যায় কি না?

চন্দ্রনারায়ণ ব্যাকুল ভাবে বলেন—নানা অঘটনে পড়ে তুমি কি পাগল হয়ে গেলে রাণী? ও সমস্তই তো বানানো কথা? ও সব উকিল-ব্যারিস্টারের শেখানো কথা। মাথা বেঠিক হয়ে তুমিও আবার এক বলতে আর বলে এলে? কিন্তু এখন তো সে সবের শেষ হয়েছে? সকলেই জানে তুমি কত পবিত্র, কত নিষ্কলঙ্ক?

—সকলে যা জানে, সেটাই তো সব সময় সত্যি হয় না? আশঙ্কা অমূলক নয়? মাথাটাই বেঠিক মত হয়ে গেছে।

চন্দ্রনারায়ণ আরও ব্যাকুল ভাবে বলেন—কিন্তু আমি তো জানি রাণী, তুমি কত শুচি—

হঠাৎ হেসে ওঠেন বৌরাণী। বলেন—তোমার পক্ষে সেটা জানাই স্বাভাবিক? কিন্তু আমি যে জেনেছি আমার দেহ মন আত্মা সমস্তই কলুষিত।…প্রায়শ্চিত্ত না

কল্পে মরতে চাইলে চলবে কেন ?"

চিত্রা ঝুঁকে পড়ে বলে—এক নিঃশ্বাসে শেষ করছো যে ? খুব ইণ্টারেস্টিং বুঝি ?

—হ্যাঁ !

—কই, এবার আমায় দাও না ?

—থাক !

মেরুদণ্ড

তাক থেকে খলনুড়িটা পাড়তে দেখেই সারদাশঙ্কর খিঁচিয়ে উঠলেন—কি, আবার একখুনি ওষুধ গেলাতে এসেছ ? পতিসেবার পরাকাষ্ঠা দেখাতে হবে কেমন ? দূর করে দাও গে ওষুধ ! টান মেরে ফেলে দাওগে।

ঠিক যে বয়সের বুদ্ধিভ্রংশ তা নয়। বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে রোগে। খিঁচিয়ে ভিন্ন কথা যেন সারদাশঙ্কর বলতেই পারেন না আজকাল। রোগের লক্ষণই এই রাগ। আর কমদিন তো পড়েন নি বিছানায়, খিটখিটে হয়ে যাবেন এ আর বিচিত্র কি ? অন্নপূর্ণা কি জানেন না এ কথা ? তবু অভ্যাস হয়ে যায় না, তবু ধমক খেলেই চোখের কোণে কোলে জল উপচে পড়তে চায়।

এ সময় সহজে কথা কন না অন্নপূর্ণা, নিজেকে সামলে না নিয়ে কথা বলতে গেলে বয়সের মর্যাদা বজায় রাখা শক্ত হবে যে ! নিঃশব্দে তাই খলের উপর আস্তে আস্তে নুড়ি ঘষে ঘষে মাড়তে লাগলেন মধু আর স্বর্ণসিন্দূর।

—নাও খেয়ে ফেল।

খেয়ে ফেল !···সেই চিরপরিচিত শান্তসুরের অনুরোধ ! যেন এইমাত্র ওষুধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন নি সারদাশঙ্কর, যেন সারদাশঙ্করের রাগটা কিছু নয়। নেহাৎ ছেলেমানুষের গালফুলিয়ে রাগ করার মত। সকৌতুকে উড়িয়ে দেওয়া যায় সে রাগকে !

কোটরগত দুই চোখে যেন আগুন জ্বলে ওঠে সারদাশঙ্করের। হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসেন। হাত বাড়িয়ে বল্লেন—দাও ! আর অন্নপূর্ণা দেবার আগেই,

হাত থেকে প্রায় কেড়ে নিয়ে সত্যিই খলনুড়ি সুদ্ধ ওষুধটা টান মেরে ফেলে দেন, দরজা পার করে দালানে। অনেককালের জিনিসটা, একটা আর্তনাদ করে ছড়িয়ে পড়ে কয়েক টুকরোয়।

এ কী! এতটা—এমন তো কোনদিন কই দেখা যায় না। মরণের দিনই ঘনিয়ে এসেছে বোঝা যাচ্ছে। বিহ্বলভাবে কয়েক সেকেণ্ড ওষুধ-মাখা ভাঙা টুকরোগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে অন্নপূর্ণা ম্লানভাবে বলেন—তুমি কি সত্যি পাগল হয়ে গেলে? এই রোগে অসুখে ভুগে জেরবার হয়ে যাচ্ছ, আর পাথরটা ভাঙলে?

সারদাশঙ্কর ফের শুয়ে পড়েছিলেন দেয়ালমুখো হয়ে। সেইভাবেই তীব্রকণ্ঠে বলে ওঠেন—বেশ করেছি ভেঙেছি! ভেঙে আমার কি ঘোড়ার ডিম হবে?··· মরব তাই ভয় দেখাচ্ছ?···মরলেই তো বাঁচি! কবে মৃত্যু আসবে বলে দিন গুনছি, বুঝলে? তোমাদের বোঝা হালকা করে দিয়ে বিদেয় হবার জন্যে দিন গুনছি।···

অন্নপূর্ণা ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বলেন—এই কথাগুলো বলে কি সুখ পাও?

—সুখ আবার কি? এ হচ্ছে ফ্যাক্ট, সত্যি!···হ্যাঁ তবে—একটা অসুবিধে তোমার আছে বটে, মাছ খাওয়াটা ঘুচবে!

অন্নপূর্ণা কি স্বামীর এই নির্মম ভাষণে শিউরে উঠলেন? নাকি কেঁদে আছড়ে পড়লেন?···তার কিছুই করলেন না, শুধু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ধীরে ধীরে। অবিরতই তো শুনছেন, এইরকম নিষ্ঠুর বাক্য। বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে কথা শোনা সহ্য হয়ে এসেছে, সহ্য হয় নি শুধু ধমক! ওতেই যেন কোথায় কি হয়ে যায়!

তবে সারদাশঙ্করের মেজাজের 'পারা' সবসময় শেষ ডিগ্রিতে চড়ে বসে থাকে কেন, সে কথা অন্নপূর্ণার অজানা? আটত্রিশ বছর ধরে যে মানুষটাকে নিয়ে ঘর করলেন, যার প্রতিটি নিশ্বাস-প্রশ্বাসও বোধ হয় পরিচিত, তার এই উত্তাপের কারণ আর ধরতে পারবেন না? এ তো শুধু রোগের খিটখিটেমি নয়!

কিন্তু অন্নপূর্ণা এর প্রতিকার করবেন কি করে? সারদাশঙ্করেরই না হয় বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে, তাঁর তো হয় নি? সারদাশঙ্কর চান অন্নপূর্ণা সর্বদা তাঁর কাছে থাকুন! বিদায়ের বাজনা শুনতে পাচ্ছেন, দূরে নয়, অদূরেই। সেই অপ্রতিরোধ্য বিরহের আশঙ্কা আর শেষ ক্ষণটুকুকে শীর্ণ দুই হাতে আঁকড়ে ধরে রাখতে চান। অন্নপূর্ণা যে নিজেকে সংসারের সহস্রপাকে বেঁধে রাখবেন, আর ধর্মের সাক্ষী একবার করে এসে ওষুধ আর পথ্যি দিয়ে যাবেন, এ সারদাশঙ্করের অসহ্য। এমন

হতশ্রদ্ধায় সেবা তিনি চান না।

যে মানুষটার রোজ জ্বর হয়, যার শরীরটা জ্বরের জ্বালায় জরজর, তার কি ইচ্ছে করতে পারে না, এই উত্তপ্ত দেহে কেউ একটু স্নেহকোমল হাতের স্পর্শ বুলিয়ে দিক?···কিন্তু সে হাত কোথায়? সেই স্নিগ্ধ হাতখানি, যা নাকি একটা মৃত্যুপথযাত্রীর আকাঙ্ক্ষিত বস্তু, যে হাত অষ্টপ্রহর নিয়োজিত আছে, কুটনো-কোটা আর মাছ-কোটায়, রান্নায়. আর ভাঁড়ার ঝাড়ামোছায়! অন্নপূর্ণা নাতিকে তেল মাখিয়ে দিচ্ছেন ডলে ডলে ঘষে, নাতনীকে ভাত খাইয়ে দিচ্ছেন গল্প বলে বলে, তাতে সময়ের অকুলান হয় না, হয় শুধু এইখানে!

ভেবে অবাক হয়ে যান সারদাশঙ্কর, স্বামী যার মরতে বসেছে সে মেয়েমানুষ সংসার নিয়ে উন্মত্ত থাকে কোন প্রাণে! এখন অভিমান উঠেছে তিক্ত হয়ে, অন্নপূর্ণার সঙ্গলাভেব বাসনাটা প্রতিহত হয়ে, অন্নপূর্ণাকেই আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে ফেলতে চায়।

এ সবই বোঝেন অন্নপূর্ণা!

তবু স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী চলবার উপায় কোথা? প্রধান তো চক্ষুলজ্জা! চক্ষুলজ্জার কাছে সব তুচ্ছ। এই হচ্ছে সংসার-শিক্ষা!···চক্ষুলজ্জাব দায়ে কোলের শিশুটার প্রতিও যে কত সময় ঔদাসীন্য দেখাতে হয় মেয়েমানুষকে।

যে লোকটার হাত পা চোখ কান সবই রয়েছে, জ্ঞান রয়েছে টনটনে, সে লোকটা যদি ইচ্ছে করে অবুঝ হয়; কে তার দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে চাইবে!··· অন্নপূর্ণার মত এমন একটা গিন্নীবান্নী মানুষ, কি করে সেই অবুঝপনার তালে তাল মিলোবেন? লোকটা কেবলমাত্র ভুগে ভুগে কঙ্কালসার হয়ে গিয়েছে এই অজুহাতে? বৌ ঝি হাসবে না? এমনিতেই তো সারদাশঙ্করের মনোবাসনা ধরে ফেলে তারা হাসে—দুই জা! অন্নপূর্ণার দুই ছেলের বৌ। এর উপর যদি অন্নপূর্ণাও গা ভাসিযে দেন, তাহলে আর মুখ দেখানো যাবে?

যাক, এও তো তবু ভিতরের ব্যাপার, বাইরেই বা সুবিধা কোথা?

পরিবারটি তো ছোটখাট নয়, বৃহৎ। আর সবটাই অন্নপূর্ণার স্বকৃত। দায়িত্বের ভাগ কাকে দেবেন? একদা একটি একটি করে যখন পাঁচটি ছেলে আর চারটি মেয়ে হয়েছিল তখন কি খেয়াল ছিল, তারা বড় হয়ে গেলে কেমন দেখতে হয়ে যাবে সংসারটা?···তখন কি ভেবেছিলেন যে সংসার নিয়ে হাঁফ ফেলবার অবসর পাবেন না? নিজের যে সংসারটি আবর্তিত হত সারদাশঙ্করকে কেন্দ্র করে, যেখানে সারদাশঙ্করের সুখসুবিধের দাবীটাই ছিল ষোল আনা, সে সংসার কোথায়

হারিয়ে গিয়েছে, কত রূপে রূপান্তর ঘটেছে। তার সারদাশঙ্কর তলিয়ে গেছেন। কিন্তু অন্নপূর্ণার দায়িত্ব তো কমে নি।

আগে আইবুড়ো মেয়েরা ছিল কাজের ডানহাত, এখন বিয়ে হয়ে গেছে তিন জনের, যে মেয়েটা আছে, সে কলেজে পড়ে, তার জন্যেই ব্যস্ত হতে হয়। বৌরা দুজনেই কচিছেলের মা! তাছাড়া—তারা এদিক ঘেঁষেই না! সংসারে দৈনিক কত করে চাল লাগে, আর কতটা তেলমশলা, এ ওরা জানেও না। ওরা জানেই না কেমন করে বালির রুটি করতে হয়, আর কেমন করে 'পোরে'র ভাত।

হঠাৎ রান্নার লোকটা কামাই করে বসলে, কি চাকরটার অসুখ করে বসলে, দিশেহারা হয়ে পড়া ছাড়া আর কিছুই তো করতে পারে না ওরা। নিশ্চিন্ত হবেন কার ভরসায়?

বিবাহিত মেয়েরা অবশ্য থাকেই কেউ না কেউ। বিশেষ করে সারদাশঙ্করের অসুখ হয়ে অবধি। বাপের অসুখ, বাপের বাড়িতে আসার পাশপোর্ট। কিন্তু সদাবিরক্ত খিট্‌খিটে বাবার দিক ঘেঁষতে তাদের আতঙ্ক হয়।...একসময় যে পরিবারের বিশিষ্ট একটা অংশ ছিল তারা, সে পরিবারের নাড়ীর বন্ধন আর মনের মধ্যে নেই।...দায়িত্বের দায়ও তাই নেই। এখন তারা সংসারের বিশৃঙ্খলা দেখলে, আড়ালে বৌদের সমালোচনা করে, আর সামনে নিজেরা নিজেদের শ্বশুরবাড়িতে কী মহিমা বিকীর্ণ করে, তার ব্যাখ্যানায় তৎপর হয়। আবার নিজের নিজের ছেলেমেয়েদের আদর যত্নের ত্রুটি দেখলে মুখ ভার করে।

এর মাঝখানে সারদাশঙ্করের আবদারটা যেন হাস্যকর পাগলামি।

সারদাশঙ্করের মরবার সময় হয়ে এসেছে সত্যি, কিন্তু অন্নপূর্ণার যে মরবারও সময় নেই।

খলনুড়ি ভাঙার শব্দে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে এসেছে অনেকেই, সেজ ছেলে, বড় বৌ, মেয়েরা, কচিরা।

—এটা কী হল?...তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করল সেজ ছেলে।

ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির সামনে পর্যন্ত গিয়েছিলেন অন্নপূর্ণা, একটু দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেন—হল আর কি, রাগ!

—তা জানি! বাড়িতে যা হচ্ছে আজকাল!—বলে সরে যায় সে।

বড়ো বৌ বলে—ওষুধ তো সবই নর্দমায় যায়, অসুখ আর সারবে কি?

মেয়েরা বলাবলি করতে থাকে—বাবার এত তিরিক্ষি মেজাজ হল কি করে? যে বাবা ছিলেন সদাহাস্যময়, ফুর্তিবাজ, স্নেহশীল। উঁচু কথা কইতেই জানতেন

না কাউকে। সেই তিনি?···অবশ্য উঁচু কথা তিনি এখনও কন না, আর কাউকে কন না। শুধু অন্নপূর্ণার ওপরই যেন যত আক্রোশ!

হাতে কাজ না থাকলেই মুখের কাজ বাড়ে। চাপা গলার ফিসফিসিনি কখন উদ্দাম হয়ে উঠেছে টেরও পায় না ওরা, অনেকক্ষণ পরে একসময় সচকিত হয় সারদাশঙ্করের কাসির শব্দে। সে কাসি যেন থামতে রাজী নয়। যতক্ষণ না অন্নপূর্ণা হাতের কাজ ফেলে ছুটে আসবেন, থামবেও না!

খেটে খেটে কড়াপড়া, জলে জলে ঠাণ্ডা স্যাঁৎসেঁতে; তবু হাতটা কপালে ঠেকতেই যেন সারা শরীর জুড়িয়ে যায়। ইচ্ছে হয় কপালটার উপর চেপে ধরে রাখতে। কিন্তু না, অন্নপূর্ণা শুধু জ্বরের উত্তাপ পরীক্ষা করেই হাত নামিয়ে নিয়েছেন। দাঁড়াবার সময় তো এটা নয়, এখন শুধু জানতে এসেছেন, কতটুকু ক্ষিধে আছে সারদাশঙ্করের। শুধু দুধবার্লি খাবেন, না তার সঙ্গে একটা আলুসিদ্ধ!

—ছাই খাবো! উনুনের পাঁশ খাবো! তীব্র এই ঘোষণার পরই ব্যঙ্গের সুরে ভেঙ্‌চে ওঠেন সারদাশঙ্কর—'একটা আলুসেদ্ধ খাবে গো' কর্তব্যপরায়ণা কর্তব্য করতে এলেন!

একটুখানি চুপ করে থেকে অন্নপূর্ণা নিরুপায় স্বরে বলেন—কি করি বল? একবার যদি ওখান থেকে সরে আসি, গিয়ে দেখি সব একেবারে বানচাল হয়ে বসে আছে! আমাকেই তো আবার সে সব—

—করোগে না, তাই করো গে। কে পায়ে ধরে সেধেছে ঠক করে একবার কপালে হাত ঠুকে জ্বর দেখতে আসতে?···আশ্চর্য! একটা লোক মরতে বসেছে কেউ একবার এ মুখো হয় না! সংসারে অনুষ্ঠানের তো ত্রুটি নেই কোথাও!

অন্নপূর্ণা বিষণ্ণস্বরে বলেন—কে আসবে বল? মেয়েরা এলে তুমি কথা কওনা, বৌরা গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে এলে দরকার নেই বলে উঠিয়ে দাও, ছেলেরা জিজ্ঞেসা করতে এলে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকো। ওরা কি এসব বুঝতে পারে না?

—পারুক না। পারাতেই তো চাই আমি। উত্তেজনায় সারদাশঙ্কর যেন হাঁফাতে থাকেন—কারুর আসবার দরকার নেই। অমন ব্যাগারঠেলার সেবায় আমি—! হুঁ!···মন রয়েছে নিজেদের আমোদ-ফুর্তিতে, দায় করতে এলেন সব—'বাবা আপনার পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দেবো?'—ঘেন্না ধরে গেছে!—

—তুমি খিটখিটে হয়ে গেছ বলেই ওরা আসতে ভয় পায়।

—নাঃ খিটখিটে হব কেন?···সারদাশঙ্করের পুঞ্জীভূত বেদনার ভার প্রকাশ

পায় জ্বালার মূর্তিতে—যে মানুষটার আজ ছ'মাস পেটে ভাত পড়ে নি, মাথায় তেলজল পড়ে নি, সে মানুষ সুখের সাগরে ভাসবে!

অর্থাৎ বোঝা যায় নিজের ব্যবহারে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত নয় সারদাশঙ্কর, এই অসহিষ্ণুতা, অবুঝপনা, খিটখিটেমী করবার 'রাইট' আছে তাঁর, এই তাঁর ধারণা।

অন্নপূর্ণা হয়তো সান্ত্বনাসূচক আর কোন কথা খুঁজছিলেন, হঠাৎ একটা পোড়াগন্ধ, আর খানিকটা কলরব তাঁর ঘ্রাণেন্দ্রিয় আর শ্রবণেন্দ্রিয় দুটোকেই সচেতন করে তোলে। ওই যাঃ! সর্বনাশ করেছে! বড়চিংড়ি দিয়ে নতুন ফুলকপির ডালনা চড়িয়েছিলেন। মেজছেলের শখে। অবিশ্যি মুখফুটে অনুরোধ করে নি মাকে, শুধু বড় বড় মাছগুলো এনে বলেছিল—এমন ফাইন মাছগুলো, আর দু'টাকা জোড়া কপি, কেনই বা আনা! 'উৎকল' যা রাঁধছেন আজকাল, ইচ্ছে হয় লোটা-কম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। একটু দেখিয়ে টেখিয়ে দিলেও বা—

বৌদের কথা ভাবেও নি সে, পরোক্ষে মায়ের প্রতিই এ অনুযোগ, বা মায়ের কাছেই প্রত্যাশা করেছিল!···মেজ ছেলেটি বরাবরই একটু ভোজন-বিলাসী, ওর এ কথায় অন্নপূর্ণার মনটা বিচলিত হয়েছিল! তাঁর সময় নেই, মন নেই, সত্যি। কিন্তু সারদাশঙ্কর যদি অনির্দিষ্টকাল ভুগতে থাকেন, ওরা খাবে না পরবে না?

দুদিক রক্ষা করতে হয় যে তাঁকে। বৌ-মেয়েরা সিনেমা গেলে, খবরটা চেপে ফেলেন অন্নপূর্ণা। কেউ একখানা বাহারি শাড়ি পরলে পারতপক্ষে তাকে সেদিন কোন দরকারে সারদাশঙ্করের ঘরে পাঠান না।

কিন্তু সে সব যাক, মাছের ডালনাটা গেল!

লজ্জায় মাথাকাটা গেলেও, বোধ হয় সে লজ্জা ঢাকতেই, অন্নপূর্ণা ঠাকুরের উপর তম্বি করেন—জিনিসটা পুড়ে যাচ্ছে খেয়াল কর নি ঠাকুর? চোখকান ছিল কোথায়?

আর ঠাকুর উত্তর দেবার আগেই মেজবৌ বলে ওঠে—ওরই বা দোষ কি মা, ওকে তো আপনি বলে যান নি। আপনি চড়িয়ে গেছেন আপনি নামাবেন, তাই ও জানে। নইলে—শুধু ঠাকুর কেন আমিও তো রয়েছি এদিকে, নামালে নামাতে পারতাম না কি?

অন্নপূর্ণা গম্ভীর ভাবে বলেন—তাই কেন নামালে না মেজবৌমা! তাতে কিছু আর তোমায় ফাঁসি দিতাম না আমি।

—কি দিতেন না দিতেন জানি না মা, কখন কিছুতে হাত দিতে দেন না, তাই

দিতে যাইও না।···বলে মেজবৌ খরখর করে চলে যায়। ফুলকপি গলদাচিংড়ির শোকটা তার বড্ডই লেগেছে!···

'কখনও কিছুতে হাত দিতে দেন না—'অন্নপূর্ণা অবাক হয়ে যান!

অবলীলাক্রমে বলেও তো গেল কথাটা!

পুড়ে আঙার কড়াটার তত্ত্বাবধান করতে করতে মুহূর্তের জন্য একবার মনে হয় অন্নপূর্ণার···দূর হোক ছাই, কেন আর ছুটোছুটি করে মরি, ওদের সংসার ওরা করুক, আমি রোগা মানুষটাকে নিয়েই থাকি। শেষ যে হয়ে আসছে, সে কি তিনিই বুঝছেন না!···কিন্তু তলিয়ে ভাববার সময় কোথা? আসল জিনিসটা তো ধ্বংস হয়ে গেল, এখন কে কি দিয়ে খাবে ভাবতে হবে তো? ঠাকুরটাকেই আবার খোসামোদ করতে হয়—হাতটা ধুয়ে ছুটে একবার বাজারে যাও দিকি ঠাকুর, গোটাকতক হাঁসের ডিম নিয়ে এস! আমি ততক্ষণ আলু কুটে দিচ্ছি।···আর শোন—চার আনার দই এন তো অমনি। তোমাদের বড়দিদিমণি তো আবার ডিম খায় না।·· রোস, টাকা দিই।

'ওদের সংসারে ওদের হাতে ছেড়ে দেবার' সাধু সংকল্প ধোপে টেঁকে না, পরদিন সকালে আরও ভোরে ভোরে ওঠেন, নিঃশব্দে বেরিয়ে আসেন ঘর থেকে। ···কপালে একবার হাত রেখে উত্তাপটা দেখবার সাহসও হয় না, কি জানি যদি জেগে ওঠেন সারদাশঙ্কর। যদি দুটো কথা বলেন, তালেই তো দেরি হয়ে যাবে। ···হয়তো সময়ে উনুনে আগুন দেবে না ঝি, হয়তো চাকর মুখপোড়া আবার পাশ ফিরে শোবে। তাহলেই তো সমস্ত দিনের মত সংসার বানচাল!···এইবেলা চাকরটাকে 'খাটালে' না পাঠালেই গয়লা পাঁচ গরুর দুধ এক করে বসে থাকবে। বড়ছেলের ছোট খোকাটা পেট রোগা, তার একটু এদিক ওদিক সয় না। এক গরুর দুধ, তাতে আধাআধি জল মিশিয়ে তবে—। সে দুধ অন্নপূর্ণা নিজে হাতে করে জ্বাল না দিলেই চিত্তির, ঠাকুর জ্বাল দিলে হয়তো বা—মা গঙ্গাকেই দুধের বাটির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে রেখে দিল, নয় তো ফুটিয়ে ফুটিয়ে ঘন করে বসে থাকল।···তার পরেই কাজ পড়ে যেন হুড়মুড় করে। চা জলখাবারের পত্তন মিটতে না মিটতে কুটনো চাই, কুটনো শেষ না হতেই এসে পড়ে মাছ,···পড়ে কুচোদের স্কুলের তাড়া, নিজের ছেলেদের অফিসের তাড়া।

একটু অবসরে একবার খানিকটা জল গরম করে পাঠিয়ে দেন সারদাশঙ্করকে মুখ খোওয়ার জন্যে। একটা নাতি-নাতনীকে দিয়ে পাঠান আদা ছোলা আর নুন।

একটু পরে এক ফাঁকে নিজে গিয়ে প্রশ্ন করবেন—হ্যাঁ গো কি খাবে? ভুটো পানিফল চিবোতে ইচ্ছে করে?

হয়তো এমনিই আরও দীর্ঘদিন চলতো। হয়তো ক্রমশঃ যত অশক্ত হয়ে পড়তেন সারদাশঙ্কর, ততই অন্নপূর্ণাও ক্রমশঃ সংসার থেকে সরে আসতেন—ধীরে ধীরে তিল তিল করে। সে অনুপস্থিতি চট করে কারও চোখে পডত না। কিন্তু সব এলোমেলো হয়ে গেল তুচ্ছ একটা ঘটনায়।

মাংসটা খেতে বড় ভালবাসতেন সারদাশঙ্কর, তাই তিনি অসুখে পড়া পর্যন্ত বাড়িতে ও জিনিসটা রাঁধতে দিতে তেমন গা করেন নি অন্নপূর্ণা। কিন্তু এদিন দিতে হল পাকেচক্রে।···বড় ছেলের শালা মাদ্রাজে না কোথায় চাকরী পেয়ে চলে যাচ্ছে, যাবার আগে তাকে একবার নেমন্তন্ন করবার ইচ্ছে তার বোনের। ইচ্ছেটাও ন্যায্য। তবু সে খুব কুণ্ঠিত হয়েই বলেছিল।

অন্নপূর্ণা বললেন—বেশ তো বৌমা, বল না!···

সারদাশঙ্করের আজ কদিন থেকে জ্বরটা যেন বেশী মাত্রায় হচ্ছে, থার্মোমিটার তো আজকাল গায়ে ঠেকাতে দেন না, আন্দাজেই যা বোঝা যায়! কিন্তু করা যাবে কি? সংসার তো বসে থাকবে না।

বাজার বেলায় অন্নপূর্ণা বললেন—তোমার ভাই কি কি মাছ তরকারি ভালবাসে বৌমা? বল আনতে দিই।

বৌমা হাসিমুখে জবাব দিল—ছোড়দা? তরকারি তো ও ছোঁয়ও না, মাছেরও নানান বাছবিচার, সন্তুষ্ট খালি মাংসয়। ওইটি হলে আর কিছু চায় না।

এব পর আর সে জিনিস রাঁধতে না দেওয়ার কথা ওঠে না অবশ্যই!

ভুধবার্লির বাটিটা টেবিলে নামিয়ে রাখতেই সারদাশঙ্কর জ্বরতপ্ত চোখভুটো খুলে ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন—মাংস সেদ্ধর গন্ধ বেরোচ্ছে কাদের বাড়ি?

অন্নপূর্ণা কণ্ঠস্বর খাটো করে বললেন—কাদের বাড়ি আবার, আমাদেরই বাড়ি!

—ওঃ! ভোজের আয়োজন চলছে!

এতক্ষণ নিজেরই 'মনটা করকর' করছিল অন্নপূর্ণার, সাতবার মনে পড়ছিল রবিবার হলেই কি রকম মাংস খাওয়ার ধুম লাগিয়ে দিতেন সারদাশঙ্কর। কতকাল খান নি, হয়তো জীবনেও আর খেতে পাবেন না। রোগ তো লিভারেরই।···মন কেমনই করছিল—কিন্তু সারদাশঙ্করের এই শ্লেষাত্মক সুরে

হঠাৎ কেমন রাগ এসে গেল। চামচ দিয়ে বার্লির চিনিটা গুলতে গুলতে বললেন —তা চলবে নাই বা কেন?...তোমার খাবার উপায় নেই বলে কি, বাড়িসুদ্ধ সবাই বঞ্চিত হয়ে থাকবে? এ তো আচ্ছা হিংসে তোমার?

কথাটা সত্য, কিন্তু বড় রূঢ় সত্য। বলে ফেলেই অপ্রতিভ হয়ে গেলেন অন্নপূর্ণা, কিন্তু—কথায় বলে হাতের ঢিল, আর মুখের কথা—

সারদাশঙ্কর প্রথমটা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারেন নি। তারপর রক্তচক্ষু মেলে বললেন—ওঃ! তোমার মনেও এই বিষ পোষা? বুঝতে পারি নি। —যাও! যাও! যাও! চলে যাও! যা—ও!

—যাচ্ছি, এটুকু খেয়ে নাও।

—খাবো? ওই বার্লিটা খাবো? বেরিয়ে যাও! আমার সুমুখ থেকে দূর করে দাও ওটাকে! আর কিছু খাব না! একেবারে ছেলেদের হাতের আগুন খাব—বলে চোখের উপর হাত চাপা দিয়ে ঘুমের ভান করেন সারদাশঙ্কর।

নাঃ, এক্ষেত্রে আর খাওয়ানো যাবে-না। ভেবেছিলেন একখানা আলুর লোভ দেখিয়ে বার্লিটুকু খাইয়ে নেবেন, কিন্তু ঠিক সে ভাব রইল না। তাছাড়া 'আড়ি'কে ভাব করবার সময় বা এখন কোথা? বড় বৌয়ের ভাই এসেছে, চলে যাবে অনেক দিনের মত, সে আজ আর নিচে নামে নি। শুধু বড় বৌয়ের ভাইয়ের নেমন্তন্ন হয়েছে বলে মেজর মুখ থম্‌থমে, অথচ থই থই করছে সংসার, কাকে কি বুঝিয়ে পড়িয়ে আসবেন? ভাবলেন ঠাকুরকে কতকটা সামলে দিয়ে আসবেন—চুপি চুপি একখানা মাংসর আলু নিয়ে। ছেলেরা দেখলে বকবে। ওই ভয়েই আরও কিছু দিতে পারেন না। বুড়ো মানুষ দিন ফুরিয়ে এসেছে, এ জীবনে যে আর খাবেন না, সাবধানে থাকলেও যে আর সেরে উঠবেন না— একথা ওরা বোঝে না।

যা থাকে কপালে, আজ চুপি চুপি একটু ঝোল আর আলু দেবেনই। এই এই সঙ্কল্প করে গরম ঝোল জুড়োতে দেবার জন্যে একটা বাটি খুঁজছিলেন অন্নপূর্ণা, হঠাৎ বছর ছয়েকের নাতিটা হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলল—দিদা, দাদু রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে—

—ও কী কথার ছিরি রে?...বলতে বলতে হাত ধুয়ে উঠে দাঁড়ান অন্নপূর্ণা। ছেলেটা বলতে থাকে—হ্যাঁ গো দিদা, বাক্স থেকে কোট বার করে পরেছে—ফর্সা কাপড় পরেছে—

সবটা শোনার অবসর হয় না, অন্নপূর্ণা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ন...আর দেখেন

সত্যিই তেমনি এক অবিশ্বাস্য ঘটনার মতই প্রস্তুত হয়েছেন সারদাশঙ্কর।…যে মানুষ না ধরলে খাট থেকে নামতে পারেন না, তিনি চলে এসেছেন দালান পার হয়ে সিঁড়ির কাছে। ফর্সা ধুতি কোঁচা-লুটিয়ে অবিন্যস্ত ভাবে পরা, বহুদিনের অব্যবহৃত একটা কোট গায়ে, হাতে ছড়ি। সেইটার ওপর ভর দিয়ে টলমল করে টলছেন।

—কী সর্বনেশে কাণ্ড! এ কি?…পিঠটা ধরতে যান অন্নপূর্ণা।

কিন্তু ধরতে দেবেন কেন সারদাশঙ্কর! অন্নপূর্ণার হাতটা আছড়ে সরিয়ে দিয়ে ভাঙা-ভাঙা কাঁপা-কাঁপা গলায় চীৎকার করে বলেন—তোমাদের সুখের পথ পরিষ্কার করে দিয়ে যাচ্ছি…আমার জন্যে আর কাউকে বঞ্চিত হয়ে থাকতে হবে না।…মরে গেলে বিধবা হবে, খাওয়া ঘুচবে—নিরুদ্দেশ হলে তো আর—

—ও খোকা, তোর বাবাকে ডাক—বলে চীৎকার করে ওঠেন অন্নপূর্ণা, কিন্তু সাহায্যের প্রয়োজন তখন ফুরিয়েছে।…হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেছেন সারদাশঙ্কর! যতই রোগজীর্ণ দেহ হোক, বিকারগ্রস্তের অমিত বল রুখতে পারা অন্নপূর্ণার সাধ্যে কুলোয় নি। অসাধ্য চেষ্টা করতে গিয়ে পড়ে গেছেন তিনিও!

বাড়িসুদ্ধ সকলে হৈ চৈ করতে এসে পড়ে একজনকে টেনে তুলল, আর একজনকে টেনে সোজা করে শুইয়ে দিল।

উপরোক্ত ঘটনাটুকুই যা নাটকীয়, পরবর্তী ঘটনা একেবারে সাধারণ। ছককাটা ঘরের ছকপূরণ মাত্র! চৌষট্টি বছরের গৃহকর্তার মৃত্যুতে যতটুকু শোক হওয়া উচিত, ততটুকু হয়েছে! কৃতী ছেলেদের বাপ হিসেবে শ্রাদ্ধে যেটুকু সমারোহ করা উচিত তদুপযুক্ত আযোজন হচ্ছে। এ উপলক্ষে যে সব আত্মীয়-কুটুম্বকে আমন্ত্রণ করে আনা উচিত তাও আনা হয়েছে। অনুষ্ঠানের ত্রুটি হয় নি কোথাও। রান্নাঘরের পিছনের এবড়ো-খেবড়ো উঠোনটায় চালা তুলে ভিয়েন বসেছে, গত কাল মিষ্টি তৈরি হয়ে গেছে, আজ ভোজের রান্না।

নিজের ঘরে বসে এ সবই টের পাচ্ছেন অন্নপূর্ণা।

কিন্তু আশ্চর্য, কিছুই যেন মনকে স্পর্শ করছে না! কোনও কিছুই অনুভূতির জগতে ঘা দিচ্ছে না, শুধু ভেসে চলে যাচ্ছে।…এই ঘর বাড়ি…এ কার? এ সংসারের ভার কার উপর?…এত বড় একটা কাজ হচ্ছে, এত অভ্যাগত জড়ো হয়েছে, এদের আদর-আপ্যায়নের দায়িত্ব নিয়েছে কে?…এদের জন্যে কত চাল লাগবে, আর ঘি-ময়দা, এসব হিসেব কে করছে?…অন্নপূর্ণাকে তো কেউ কিছু

জিজ্ঞেস করছে না। অথচ হয়েও তো যাচ্ছে সব।···কি করে হচ্ছে? কখন শিখল ওরা?···শিখে ফেলেই অন্নপূর্ণাকে বাদ দিয়ে চালিয়ে নিচ্ছে?···অন্নপূর্ণা কি এ সংসারে কখনও ছিলেন?

ছিলেন যদি, তো এত বড় একটা কাজ, অন্নপূর্ণার উপস্থিতি ব্যতিরেকে হচ্ছে কি করে? কোথাও কিছু তো বানচাল হয়ে যাচ্ছে না?···ওই যে বিরাট কর্মচক্র আবর্তিত হচ্ছে, যা দেখতে পাচ্ছেন না অন্নপূর্ণা, শুধু তার ঝনৎকারটা কানে এসে পৌছচ্ছে, ওই কর্মচক্রের একমাত্র চালক ছিলেন তো অন্নপূর্ণাই। ···কখন কোন্ ফাঁকে রঙ্গমঞ্চ থেকে নেমে এসে দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করলেন তিনি?···কই, কিছু অস্বস্তিও তো হচ্ছে না। আসছে না একবিন্দু চক্ষুলজ্জা। কোথায় গেল সে চক্ষুলজ্জা?

সেই তো একই ঘর, শুধু খাটের উপরটা এমন খাঁ খাঁ করত না, কিন্তু তখন একসঙ্গে আধঘণ্টা নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে পারতেন না, নানা কাজের ফিরিস্তি মনে পড়ে প্রাণ ছটফট করত। অথচ এখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছেন, 'কাজ' বলে কোন বস্তু জগতে আছে, মনেই পড়ছে না!

যে সংসারের জন্য সারদাশঙ্করকেই গৌণ করে এসেছিলেন, সেই সংসারটাই হঠাৎ এমন গৌণ হয়ে গেল কি করে?

কে হঠাৎ এমন মুক্ত করে দিল অন্নপূর্ণাকে? কে দিয়ে গেল কাজ থেকে অব্যাহতি?···না, বাইরে থেকে কেউ মুক্তি দিয়ে যায়নি তাঁকে, কিন্তু···কিন্তু কোথায় ছিল এ মুক্তি? কই একবারও তো এর দেখা পান নি আগে? যদি পেতেন —তাহলে হয়তো—এত তাড়াতাড়ি —!

অন্নপূর্ণার উপর অভিমানের জ্বালায় কী কষ্টই পেয়ে গেছেন সারদাশঙ্কর! প্রাণটাই খোয়ালেন তাইতে!

কেন এমন অর্থহীন বোকামি করে এসেছেন অন্নপূর্ণা? কেন?

কর্ত্রীর মর্যাদা, আর কর্ত্রীর দায়িত্ব? বিনা চেষ্টায় আপনিই তো ছেড়ে গেল, অথচ সারদাশঙ্কর থাকতে, কিছুতেই কেন সেটা ত্যাগ করতে পারেন নি?

পাশের দালানে মহিলামহল বসেছে, সেখানে সারদাশঙ্করের কথাই আলোচিত হচ্ছে। ইদানীং কী অদ্ভুত অবুঝ আর জেদী হয়ে উঠেছিলেন তিনি কী ভাবে ইচ্ছে করে রোগ বাড়িয়েছেন, আর কী গোঁয়ার্তুমি করতে গিয়ে মরলেন, তারই ইতিবৃত্ত। অনেকবার এ আলোচনা শুনেছেন অন্নপূর্ণা, সেই দিন থেকেই শুনছেন। যে নতুন আসছে, তাকেই নতুন করে শোনানো হচ্ছে।

যখনই কানে আসছে রাগে আর অপমানে সারা শরীর যেন ঝাঁ ঝাঁ করে উঠছে, ইচ্ছে হচ্ছে তীব্র তিরস্কারে এ প্রসঙ্গকে নির্বাক করে দেন, কিন্তু পারছেন না! কোথাও যেন কোনও জোর খুঁজে পাচ্ছেন না। না ভিতরে, না বাইরে।

আত্মসর্বস্ব

মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন বসু দম্পতি।

ফিরিয়ে নিয়ে এলেন তার কুমারী-জীবনের স্নিগ্ধ পরিবেশে। সেই তার ছোট্ট ঘরখানি, সেই তার একটি দেয়াল ঘেঁষে সরু একহারা খাট আর ধবধবে বিছানা, সেই ও-দেয়ালে আলনা আর বইয়ের র‍্যাক, এ-দেয়ালে নিচু টেবিল আর ছোট চেয়ারখানা, বরাবর যাতে বসে পড়ে এসেছে শর্বরী।

আর বেশি কিছু ধরে না এ ঘরে, তবু ভারি সুন্দর লাগে।

ছিম্‌ছাম পরিষ্কার পবিত্র!

মেয়ের বিয়ের পর ঘরের চেহারাটা পাল্টে ফেলেছিলেন সুজাতা, সংসারের অবান্তর জিনিসগুলো ভরে ফেলেছিলেন এ ঘরে। শ্বশুরবাড়ি থেকে যা দু-চার বার এসেছে শর্বরী, শুয়েছে মার কাছেই। অস্থায়ী সেই আসায় স্থায়ী জায়গা পাবার প্রশ্ন ওঠেও নি।

কিন্তু এবারে তো দু-চার দিনের জন্য বেড়াতে আসা নয়, চিরদিনের মত ফিরে আসা! আবার নতুন করে প্রতিষ্ঠার বেদী রচনা না করে রাখলে, ও বুঝবে কি করে যে, বরাবরের মত এসে আশ্রয় নিতে হলেও সমাদরের ত্রুটি থাকবে না তার।

কি করে টের পাবে স্নেহাতুর মাতৃহৃদয়ের আকুলতার পরিচয়?

মা বাপ দুজনে গিয়ে নিয়ে এসেছেন। গাড়ি থেকে নেমে একেবারে সোজা এখানে তুললেন। বললেন—এই তোমার ঘর, আবার এ ঘর ফিরে পেলে তুমি। মনে কর যেমন ছিলে তেমনিই আছ। মাঝখানের কটা দিন কিছু নয়, স্বপ্ন, ছায়া।

বলতে বলতে স্বর বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এল অনাদিপ্রসাদের।

শর্বরী কথা বলছে না, কাঁদছেও না, শুধু বসে আছে মুখ নিচু করে। কেশের ঘন অরণ্যের মাঝখানে পায়ে-চলা-পথের মত যে সরু রেখাটি শুভ্রতায় প্রখর হয়ে

উঠেছে, উজ্জ্বল বিদ্যুত-আলোকে আরও প্রখর দেখাচ্ছে সেটা। মুখ নিচু করায় রেখাটা বড় বেশি করে চোখে পড়ছে। সেই দিকে তাকিয়ে সুজাতা সহসা হাহাকার করে উঠলেন—আবার তোর বিয়ে দেব আমি। এ বেশ আমি দেখতে পারব না।

শর্বরী সামান্যতম নড়ে চড়ে বসল। প্রকৃত পক্ষে বেশভূষার খুব-কিছু পরিবর্তন ঘটে নি। কুমারী মেয়ের মতই দেখাচ্ছে তাকে। তবু অবুঝ মাতৃহৃদয়! অনাদিপ্রসাদেব দিকে তাকিয়ে আবার বললেন সুজাতা—হিন্দুব মেয়ে হয়ে একথা মুখে আনছি বলে রাগ কোর না গো! ও তো আমার যেমন আইবুড়ো মেয়ে ছিল, তেমনি আইবুড়োটিই আছে।

—রাগ! অনাদিপ্রসাদ একটু বিষাদের হাসি হাসলেন। তারপর বললেন—যাক এখন ওকে শুতে দাও। কি একটু খাবে-টাবে—

এইবার কথা বলল শর্বরী, শান্তভাবে বলল—খিদে কিছু পায় নি বাবা!

—তা হোক। সামান্য কিছু যা হোক খেতে হবে বৈকি। বলে দাঁড়িয়ে উঠলেন অনাদিপ্রসাদ। ট্রেনেব গবমে এসেছেন, স্নান কবতে ইচ্ছে করছে।

সুজাতা মেয়ের হাত ধরে দৃঢস্ববে বললেন—খিদে নেই বলে পাশ কাটালে চলবে না, চল খাবি যা পাবিস। আমাদের সঙ্গে বসে খেতে হবে।

আমাদের সঙ্গে বসে খেতে হবে!

এ কিসের ইঙ্গিত? সকলেব সঙ্গে বসে খাবার অনুবোধেব মধ্যে সুজাতার কাতর মাতৃহৃদয়ের আর একটু অবুঝপনা প্রকাশ হল কি?

মুহূর্তের জন্য কেঁপে ওঠে শর্ববী! তাবপর শান্তভাবে বলে—আজ থাক মা!

—আচ্ছা! আজ যদি নিতান্ত না পারিস, থাক। কাল থেকে কিন্তু তোর কোন ওজব আপত্তি শুনব না আমি, তা—বলে রাখছি। এখন রেলেব কাপড়-চোপডগুলো ছেড়ে ফেল। একটু চা কি জল খা।

শর্বরী অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলে—এমনিই শুয়ে পড়ি না মা! আজ আর কিছুই ইচ্ছে কবছে না, বড্ড মাথা ধরেছে।

—একটু চাও খাবি না?

—এত বাতে?

—রাত আর কি, নটাই তো বেজেছে মোটে। আমিও তো ভাবছি—আগেই একটু চা—দেখি, উনি কি করেন। সতীশটা এই দুর্দিনে যে কি করে রেখেছে সে-ই জানে।

ঈষৎ চঞ্চল হয়ে উঠে পড়েন সুজাতা। কাল ভোর থেকে সংসারে অনুপস্থিত রয়েছেন, ইতিমধ্যে কি কি অঘটন ঘটেছে কে জানে।

শর্বরী বিছানায় শুয়ে পড়ে বলে—আচ্ছা একটু চা দিও।—আলোটা নিভিয়ে দেবে মা?

সুজাতা দাঁড়িয়ে পড়ে বলেন, আলো নিভোলে ঘুমিয়ে পড়বি না তো? চা আনছি।

—তুমি আনবে? তুমি আবার আনবে কেন? সতীশ নেই?

—আছে। তা হোক আজ আমিই হাতে করে—

শেষ কথাটা কান্নায় বুজে যায়, আলো নিভিয়ে ধীরে ধীরে চলে যান সুজাতা।

অন্ধকার ঘরে একা চুপচাপ পড়ে থাকে শর্বরী।

ঘুম? না, ঘুমিয়ে পড়বার মত চোখ এখন নেই। শুকনো খটখটে পরিষ্কার। একটু যেন বেশিই শুকনো। সদ্য বিধবার পক্ষে এত শুকনো চোখ, এত স্থির ভাব একটু আশ্চর্য বৈ কি! কাঁদুক না কাঁদুক, মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাসটাও তো ফেলবে?

একা শুয়েও নিশ্বাস ফেলল না শর্বরী, শুধু একটু যেন অবাক হয়ে ভাবতে লাগল—মা বাপ তার জন্যে এত আকুল হয়ে উঠেছেন, এত ব্যস্ত হচ্ছেন তার একটু স্বস্তির জন্য, কিন্তু সে স্নেহ-স্পর্শ শর্বরীর মন পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে না কেন? ও যেন শার্সি-বন্ধ ঘরের মধ্যে থেকে ওগুলো শুধু দেখতে পাচ্ছে।

তবে কি খুব শোক হয়েছে শর্বরীর? তাই এমন হচ্ছে?

শোক!

খুব তলিয়ে ভাবতে চেষ্টা করে শর্বরী।

শোক কাকে বলে? প্রিয়জনকে হারিয়ে যে হাহাকার ওঠে অন্তরের অন্তস্থলে, তার নামই না শোক? কিন্তু কই? সে হাহাকার কোথায় শর্বরীর?

শুধু খানিকটা অস্বস্তি!

শুধু সাদা দেওয়ালের মত খানিকটা ফাঁকা ফাঁকা শূন্যতা।

প্রিয়জন?

কে সে?

কদিন আগে যার মৃত্যু-সংবাদ এসেছিল? শর্বরীর সঙ্গে তার হৃদয়ের যোগ ঘটল কবে? বরং যে কদিন সেই লোকটাকে উপলক্ষ করে শর্বরীকে নিয়ে

শোকের সমারোহ চলছিল—রীতিমত বিরক্তিই বোধ করছিল শর্বরী। বাপ মা গিয়ে পড়ে সে বিরক্তি থেকে উদ্ধার করেছেন। হ্যাঁ, এর জন্যে মা বাপের উপর কৃতজ্ঞ সে।

শর্বরীর ভাগ্যে ঘটেছিল এক পৌরাণিক যুগের কাহিনী। মুক্তিকামী পুত্র পালিয়ে গিয়েছিল সংসার ছেড়ে, মা বাপ গিয়ে কেঁদে কেটে মঠ থেকে ফিরিয়ে আনলেন ছেলেকে, এবং একটি বন্ধন-রজ্জু সংগ্রহ করে বাঁধতে চাইলেন তাকে।

কিন্তু সে চেষ্টা হল সমুদ্রে বালির বাঁধ!

ফুলশয্যায় হাতের সুতো খোলার মতই বৈরাগী-কুমার অনায়াসে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে গেল সেই বন্ধন-রজ্জু, ফুলশয্যারই রাতে।

ব্যাপারটা অতীব শোচনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু একেবারে পচা পুরনো প্লট।

তবু বিয়ের পর এই দেড়টা বছর শ্বশুরবাড়িতেই ছিল শর্বরী। ছেলেকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে চেষ্টার কসুর করেন নি তাঁরা। কিন্তু শর্বরীর ভাগ্যে নেই। পালিয়ে-যাওয়া-লোকটা, এমন জায়গায় পালাল যে ধরে আনবার আশা-টুকুও গেল।

মঠের কর্মাধ্যক্ষের হাতে লেখা দু লাইনের একখানি পোস্টকার্ড!

সেই দু লাইনের মধ্যেই লেখা হয়ে গেছে শর্বরীর ভবিষ্যৎ জীবনের ভাগ্যলিপি।

অন্ধকারে বাইরের দৃষ্টি ব্যাহত হয় বলেই কি, ভিতরের দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে ওঠে?

নিজেকে সম্পূর্ণ তফাতে রেখে সেই স্বচ্ছ দৃষ্টি মেলে ভাবতে চেষ্টা করে শর্বরী। ভাগ্যলিপি কি শিলালিপির মতই খোদাই করা? পুরনো লেখা মুছে ফেলে আর একবার নতুন করে লেখা যায় না? যে লেখা লেখবার জন্যে সুজাতা কলম ধরতে চাইছেন!

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ নিজেকে সচেতন করে তোলে শর্বরী।

নাঃ, ভেঙে পড়লে চলবে না, নিজেকে অপরের করুণার পাত্রী হতে দিতে রাজী নয় সে।

খুট্ করে একটু শব্দ, পরক্ষণে আলোর জোয়ার।

—চা টুকু খেয়ে ফেল মা! সুইচটা নামিয়ে দিয়ে কাতর কণ্ঠে অনুরোধ জানাচ্ছেন সুজাতা।

শর্বরী উঠে বসে সহজ গলায় বলে—দাও! আর শোন, কি আছে তোমার?

হঠাৎ দেখছি বেশ খিদে পেয়ে গেছে।

ও ঘরে গিয়ে সুজাতা নিচু গলায় বলেন—যতটা মুষড়ে পড়েছে ভেবেছিলাম, তেমন মনে হচ্ছে না। সামলে নিয়েছে!

অনাদিপ্রসাদ বোধ করি উত্তরের অভাবেই চুপ করে থাকেন।

সুজাতা জেদের সুরে বলেন—এখন তো সব রকম আইনই হয়েছে, তবে কেন আমরা ওর আবার বিয়ে দেব না, বল তো তুমি?

—বিধবা বিয়ের আইন আজকে হয় নি সুজাতা, ও-আইনের বয়েস অনেক।

—ওকে বিধবা বোল না গো! সুজাতা কেঁদে ফেলেন—ভাবলে প্রাণটা ফেটে যায়! একদিনের জন্যেও জানল না স্বামী কি বস্তু।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন সুজাতা। আর ব্যস্ত অনাদিপ্রসাদ তাঁর মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

দুজনের একই শোক।

পরস্পরের সান্নিধ্যই সান্ত্বনা।

কিন্তু মেয়ে মা-বাপকে তাজ্জব বানিয়ে দিচ্ছে।

ঠিক এ রকমটা আশা করেন নি তাঁরা!

সুজাতা চোখের জলে ভেসে মেয়েকে অনুরোধ করতে গেলেন তাঁদের সঙ্গে 'একসঙ্গে' খেতে, অর্থাৎ একই খাদ্য গ্রহণ করতে, যদিও মনে নিশ্চিত ছিলেন খাবে না সে। খাবে না বটে তবে শোকাবহ একটি করুণ দৃশ্যের অবতারণা অবশ্যই হবে। কিন্তু শর্বরী কি না মায়ের প্রস্তাবের উত্তরে দিব্যি ঝর-ঝর করে হেসে উঠে বলল—রক্ষে কর মা, আবার ওসব ঝামেলা কেন? বিধাতা দয়া করে যখন নিষ্কণ্টক করে দিয়েছেন তখন আর তোমার ওই ইলিশ মাছের কাঁটার ফেরে পড়তে চাই না। কষে ঘি-দুধ খাওয়াও না, খেদ মিটে যাবে।

পরার বেলাতেও দেখা যায় শুধু সাদা শাড়িগুলোই পরে। না কুলোলে অম্লান বদনে বাবার ধুতিগুলো টেনে জড়ায়।

হাতে অনেকগুলো চুড়ি বালা নাকি ওর ভয়ানক অসুবিধাকর, কানের গহনা নাকি ভীষণ ফোটে। আর গলার হার? সে তো গলায় ঠেকলেই ঘামাচি অনিবার্য। হেসে হেসে গা পাতলা করে এই সব বলবে শর্বরী। তবে কোন্ অবকাশে কাঁদবেন সুজাতা?

অথচ এত বড় একটা শোকাবহ ঘটনা ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও কাঁদতে না পেয়ে হার্টের অসুখ ধরে যাচ্ছে তাঁর। সান্ত্বনা দিতে বাড়িতে যারা আসে তাদের কাছেও সেই কথাই বলেন সুজাতা—কাঁদতে না পেয়ে পেয়ে বুকের ব্যামো জন্মে গেল ভাই। ভয়ে কাঠ হয়ে আছি, ও-হতভাগীও হঠাৎ একটা শক্ত রোগ না বাধিয়ে বসে। এত চেপে চেপে থাকলে—

আগন্তুক আগন্তুকা হয় তো সসঙ্কোচে বলেন—অবিশ্যি ভাব-ভালবাসা ত জন্মায় নি তার সঙ্গে, মনে ততটা—

সুজাতা ক্ষোভের হাসি হেসে বলেছেন—সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু ওর জীবনটা যে ছারখারে গেল, তা কি বুঝছে না ও? নিজের ভবিষ্যৎ যে শূন্য হয়ে গেল তা কি ভাবছে না তলে তলে? খুব চাপা মেয়ে তাই!

বলাবাহুল্য অপর ব্যক্তি সঙ্কোচে নত-বদন হন।

একটু বিশেষ অন্তরঙ্গ কেউ এলে চুপি চুপি তার কাছে গোপন ইচ্ছা ব্যক্ত করেন সুজাতা। বলেন—ওর এই যোগিনীমূর্তি আমি আর দেখতে পারছি না ভাই। আবার যদি আমি ওকে সংসারী করতে চাই তোমরা কি আমায় সমাজে ঠেলবে?

'ঠেলব' একথা অবশ্য বলে না কেউ। অতঃপর তাদের কাছেই আবেদন জানান সুজাতা একটি হৃদয়বান উদারচিত্ত পাত্রের সন্ধান দিতে।

হিতৈষী আত্মীয়েরা কাগজে বিজ্ঞাপন দেবার, অথবা 'পাত্র-পাত্রী'র কলম খুলে দেখবার পরামর্শ দেন।

শেষেরটা হয় মাঝে মাঝে, কিন্তু অনাদিপ্রসাদের অজ্ঞতার ফলে প্রথমটা আর হয়ে ওঠে না। তিনি জানেন না খবরের কাগজের অফিস কোনমুখো, আর তার কোন দরজা দিয়ে ঢুকতে হয় বিজ্ঞাপন দিতে।

আর দরকারটাও যেন ফিকে মেরে আসছে ক্রমশঃ। শর্বরীর জীবনের শূন্যতাটা ধরাই পড়ে না। হেসেই আছে মেয়ে।

এদিকে আবার মেয়ের দুর্ভাগ্যের চিন্তায় কেঁদে কেঁদে আর কাঁদতে না পেয়ে পেয়ে সুজাতার হার্টে যে দুর্বলতার সৃষ্টি হয়েছিল, তার প্রকোপ বেড়েই চলে। কাজেই শর্বরীর শূন্য দিন-রাত্রির অনেকখানিটা পূর্ণ হয় মাতৃসেবায়।

দিন কাটতে থাকে।

আছে মায়ের সেবা, আছে সংসারের কাজ, চাকর পালায়, ঝি ছাড়ে। সেই

অদৃশ্য শূন্যস্থানগুলো, এক অমোঘ অলিখিত আইনের বলে ক্রমশঃ পূর্ণ হয়ে যায় শর্বরীকে দিয়ে।

মাঝে মাঝে মেয়ের কৃশ মুখের পানে চেয়ে পুরনো শোক উথলে ওঠে সুজাতার। মেয়ের হাত ধরে বলেন—তুই আমার যে সেবা করছিস মা, আমি আশীর্বাদ করছি তোর ভাল হবে।

পাত্রের খোঁজ আর করেন না, বরং কেউ সে ইশারা দিলে নিশ্বাস ফেলে বলেন—আমার কপাল, আর ওর কপাল। যখন ব্যস্ত হলাম, তখন জুটল না, এখন আর সে খোঁজে লাভ? এখন ওকে নইলে আমার যে এক দণ্ড চলে না!

তা সত্যিই চলে না।

মা-বাপ চক্ষেহারা হন। তাঁদের অবিরত জপমন্ত্র 'শবু শবু শবু'! 'শবু কোথায় গেল?' 'শবু কি করছে?'

ভোরবেলা ছোট ভাই দুটোর মুখ ধোওয়াবে 'শবু', জলখাবার দেবে আর জামা-জুতো পরাবে শবু, বাপের জন্যে ডিমের পোচ আর কফি বানাবে শবু, কুটনো কুটবে ভাঁড়ার বার করবে, আর রান্নার ডিরেকশন দেবে শবু, জলখাবার তৈরি করবে শবু, মায়ের বাক্স, আলমারি, বিছানাপত্র, কাপড়-চোপড় সব কিছু রক্ষা করবে আর সুসজ্জিত রাখবে শবু, এ ছাড়া উদয়াস্ত মায়ের 'হাতে হাতে মুখে মুখে' শবু।

স্ত্রীর স্বাস্থ্যহীনতায় অনাদিপ্রসাদের মেজাজ খিটখিটে হয়ে গেছে, ত্রুটি দেখলে রাগ চাপতে পারেন না, তাই প্রায়শঃই তার বহিপ্রকাশ ঘটে। যখন তখনই সরবে চীৎকার করেন—এটুকুও হয়ে ওঠে নি? সারাদিন কি রাজকার্য হচ্ছে বাড়িতে? চব্বিশ ঘণ্টা নাটক নভেল নিয়ে পড়ে না থেকে, সংসারের এদিক-ওদিক একটু দেখলে ভাল হয়।

বই ফেলে তড়বড় করে উঠে পড়ে শবু।

ভাইরা নালিশ করে—'দিদি খাতায় রুল টেনে দিচ্ছে না', 'দিদি প্যান্টে বোতাম লাগিয়ে দিচ্ছে না—', 'দিদি শুধু শুধু বকছে।'

সুজাতা কপালে করাঘাত করে বলেন—"আমারও যেমন অদৃষ্ট! বয়েস থাকতে অথর্ব হয়ে রইলাম, নইলে সংসারের এই অবস্থা হয়, না তোমাদের এত দুর্গতি হয়? খাচ্ছি দাচ্ছি মোটা হচ্ছি, 'রোগ' বললে লোকে হাসবে, অথচ হাতে পায়ে একবিন্দু বল নেই। ওদের হল মন-মর্জির কাজ, ইচ্ছে হল করল, ইচ্ছে হল না করল না। কি বলব বল?"

'দের'টা অবশ্য গৌরবে বহুবচন।

ছোট্ট সুন্দর ছিমছাম সেই ঘরখানি অপেক্ষা করে করে হতাশ হয়। জানলা দিয়ে আসে ভোরের রোদ, আসে দুপুরের উদাসী ঝোড়ো হাওয়া, আসে পড়ন্ত বেলার সোনালী আলো। তারপরও আসে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ বাতাস। অন্ধকার ঘরের শূন্য পরিমণ্ডলে সে বাতাস দীর্ঘশ্বাসের মত সঞ্চরণ করে বেড়ায়!

শর্বরী শুতে আসে প্রায় মধ্য রাত্রির কাছ ঘেঁষে।

তখন বাতাস নিথর হয়ে যায়, সমস্ত দিনের প্রতীক্ষারত ঘরখানা যেন অভিমানে মূক হয়ে বসে থাকে। সাড়া দেয় না, আহ্বান জানায় না। কর্মক্লান্ত শীর্ণ দেহখানি নিয়ে ছোট্ট হয়ে শুয়ে পড়ে শর্বরী। কোন দিন পড়ে আর ঘুমোয়, কোন কোন দিন কী একটা অস্বস্তিকর গন্ধে ঘুম আসতে চায় না। কিসের গন্ধ অনুসন্ধান করতে বসে মনে পড়ে যায় বিছানাটা প্রায় মাসখানেক হল ফর্সা করা হয় নি। ভোরের অন্ধকার থাকতে উঠে যায়, দুপুররাতের অন্ধকারে শুতে আসে, ময়লা হয়েছে চোখেই পড়ে না।

বালিশের ওয়াড়টা টান মেরে ফেলে দিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করতে থাকে।

ইতিমধ্যে একদিন সতীশ এসে আবেদন জানাল এক মাসের ছুটি চাই। দেশে যাবে ছেলের বিয়ে দিতে। প্রথমটায় অবশ্য আবেদন করেছিল দিদিমণির কাছেই, কারণ হাতের কাছেই তাকে পাওয়া যায়। দিদিমণি উঠল ঝঙ্কার দিয়ে —এক মাস! একমাস ধরে ছেলের বিয়ে দেবে তুমি? অত আহ্লাদে কাজ নেই!

—একমাস ধরে কি আর বিয়ে দেব দিদিমণি? মেয়ে খুঁজতে হবে তো?

—ও বাবা—শর্বরী চোখ কপালে তুলে বলে—এখনও পাত্রীই খোঁজা হয় নি? তবেই হয়েছে! রেখে দাও ওসব কথা। তোমার ছেলে নিজে বৌ খুঁজে যোগাড় করে রাখুক, তুমি গিয়ে বিয়ে দিও।

সতীশ গম্ভীর ভাবে বলল—আমাদের ওখেনে ওসব শহুরে চাল চলে না দিদিমণি, মাসখানেক ছুটি আমাকে দিতেই হবে।

—হবে তো রাঁধবে কে? আমি এই এত কাজের মধ্যে সময় পাব কখন?

—কষ্ট-মষ্ট করে চালিয়ে নেবেন।

—হবে না আমার বাবা! যাবে তো একেবারেই যাও। মনের সুখে দেশে বসে বৌমার হাতের রান্না খাওগে। আর আসতে হবে না। অন্য লোক রাখা হবে।

অতঃপর সতীশ গিয়ে প্রকৃত মনিব-মনিবানীর কাছে কেঁদে পড়ল—দিদিমণি তাকে জবাব দিয়েছে।

সুজাতা তখন নিজের ঘরে পা ছড়িয়ে বসে পান সাজছিলেন, আর স্বামীর কাছে খেদ করছিলেন ঘরে অত বড় মেয়ে থাকতে দুটো সাজা-পান পাবার পিত্যেশও তাঁর নেই। সেই মুখে এই বার্তা।

—দিদিমণি! অনাদিপ্রসাদ গম্ভীর ভাবে বলেন—দিদিমণি জবাব দেবার মালিক নয় সতীশ!

সতীশ গামছার কোণে চোখ মুছল, কথা কইল না!

সুজাতা বললেন—কেন কি অপরাধ হল হঠাৎ?

সতীশ কিছু রেখে-ঢেকে ইতিহাসটা ব্যক্ত করল, এবং শেষ মন্তব্য করল আপনাদেব বড়লোকের বাড়ি তাই, আমাদের দেশে-ঘরে অমন ভারী বয়েসের বেধবা মেয়ে সংসারের জুতোসেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সমস্ত করে বাবু! এ বয়সে বসে খেলে কি আর রক্ষে আছে?

কথাটা শেষ হতে না হতেই শর্বরী ঢুকল ঘরে, মায়ের দুধের বাটি হাতে। সতীশের কথা শেষ হতেই তীক্ষ্ণ গম্ভীর স্বরে বলল—তোমার জামাকাপড় কি আছে নিয়ে বেরিয়ে যাও সতীশ! বেরিয়ে যাও বলছি—এক মিনিট দেরি নয়। ওঠ!

থতমত সতীশকে থো করে অনাদিপ্রসাদ বলেন—যাও বললেই কি আর যাওয়া হয়?

—হয় বৈ কি বাবা! সতীশ আর এক মিনিট নয়। শর্বরী বলে।

সুজাতা ভারী মুখে বলেন—তেজ দেখালেই তো হয় না। তোমার তো ওই গতর। লোক এখন যোগাড় করে কে?

শর্বরী আশ্চর্য রকম শান্তভাবে বলে—যোগাড় করতে আর হবে না মা! ও কাজটা আমিই চালিয়ে নেব ভাবছি। সত্যি বসে খেয়ে খেয়ে একসারসাইজের অভাবে স্বাস্থ্যটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সতীশ তুমি ওঠ! তুমি না গেলে আমাকেই যেতে হবে কোথাও।

সতীশ উঠল, শর্বরীও বিদায় হল ঘর থেকে।

সুজাতা স্বামীর মুখের দিকে হতাশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, দেখলে মেয়ের মেজাজ?

—দেখলাম বৈ কি!

—আমার যেমন অদৃষ্ট তাই মুখ বুজে এই মেজাজ সহ্য করছি। ও যা তেজী মেয়ে, সতীশকে আর ঢুকতে দেবে বলে মনে হয় না।

—না দেয় তো আর কি করা যাবে। সতীশও তো বলেছে মিথ্যে নয়! গেরস্থ ঘরে কে কজন বিধবা মেয়েকে বসিয়ে খাওয়াতে পারে? নিষ্কর্মা হয়ে শুধু নাটক নভেল পড়ে লাভই বা কি? আমিও তো খরচ-পত্রে ডুবতে বসেছি।

অতঃপর ডোবার হাত থেকে কিছুটা পরিত্রাণ পান অনাদিপ্রসাদ, আব শর্বরীরও ব্যায়ামের ফলে স্বাস্থ্য ভাল হতে থাকে।

সাধে কি আর বলে—ভগবান যা কবেন ভালর জন্যে!

দেহ-যন্ত্রের একটায় কোন কসুর দেখা দিলে অপর কোন যন্ত্র না কি বেশী কার্যকরী হয়। কথাটা বোধ কবি সত্য। সুজাতার হাতে-পায়ের বল গেছে, কিন্তু অনুমান-শক্তিটা ক্রমশঃই জোরালো হচ্ছে। দোতলাব ঘরে শুয়ে বসে থেকেও তিনি আবিষ্কার করতে সক্ষম হচ্ছেন বিকেলেব দিকে প্রায়ই নিচের তলায় রান্নাঘবে আর ভাঁড়াব ঘরে নিতান্ত নির্বান্ধব অবস্থায় কাটছে না শর্বরীর। কেবলই যেন হাসি-গল্প-কথার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

ছেলে-দুটোও কি তেমনি পাজী! ঠিক একসঙ্গে দুজনের বেড়াতে যাওয়া চাই। অনাদিপ্রসাদেরও ফিরতে প্রায় রাত্তির। সুজাতাকে যে ডাক্তাব ওপর-নিচে করতে বারণ করেছেন—সে কথা কি ভুলেই গেছেন অনাদিপ্রসাদ? ভুলে গেছেন ঘরে বিধবা মেয়ে!

—নিচে কে এসেছিল? জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না, তবু একদিন না কবে পারেন না সুজাতা—বিরস স্বরে বলেন—খুব হাসি-গল্পের সাড়া পাচ্ছিলাম? আজ বলে নয়, রোজই পাই।

শর্বরী নিজস্ব সুস্থির গলায় বলে—হ্যাঁ প্রায়ই তো আসে। এসেছিল নন্তুদা।

—নন্তুদা?

—হ্যাঁ গো। ছোট পিসীর ভাসুরপো। ভুলে গেলে? আগে তো কত আসত। গল্প ধরলে তো আর রক্ষে নেই!

—আসে তো—এসে নিচে থেকেই আড্ডা দিয়ে চলে যায়? সুজাতার কণ্ঠ হতে যে রস ঝরে, সেটা আর যাই হোক—মধুর সমগোত্র নয়।

শর্বরী মুচকে হেসে বলে—বলি তো! বলে—ওরও নাকি হার্টের অসুখ, নিচে

থেকে ওপরে উঠতে ইচ্ছে করে না।

—তা রোজ আসবার দরকারই বা কি? তোমার সঙ্গে এত কিসের কথা?

শর্বরী নিজস্ব ভঙ্গীতে ঝর ঝর করে হেসে ওঠে। শীর্ণ মুখে হাসিটা আর তেমন সুন্দর দেখায় না, তবে হাসির সুরটা এখনও বাজনার মত বাজে। হেসে হেসে বলে—ওর কথার কি আর মাথামুণ্ডু আছে? চিরকেলে পাগল। বল্লে, 'তোমারও বর নেই, আমারও এযাবৎ বৌ জুটলো না, জোড়াতালি দিয়ে একটা সংসার গেঁথে ফেললে কেমন হয়?'

সুজাতা হার্টের অসুখ ভুলে দাঁড়িয়ে উঠে বলেন—কী বললি? এই কথা বলেছে ও?

—শুধু আজ কেন, রোজই বলছে তো!

—সেই অপমান হজম করে তুই হেসে হেসে বলছিস সেই কথা?

—অপমান আবার কি! শর্বরী মাকে ধরে আবার খাটে বসিয়ে দিয়ে বলে—উত্তেজিত হচ্ছ কেন শুধু শুধু। অসুখ বাড়বে যে! এতে অপমানের কি আছে? আমার হাতের রান্নার সুগন্ধে নাকি ওর মন অস্থির হয়ে ওঠে। তাই—

—ওঃ! ভেতরে ভেতরে তোমার এই? ওপরে ভিজে বেড়ালের মত হাত শুধু করে থান পরে বেড়াচ্ছ! লজ্জা করল না! লজ্জা করল না সেই হতচ্ছাড়া বজ্জাতের ইয়াকির কথাটা মুখে আনতে! হা ভগবান! এই তোমার মনের ভাব! আর তোমাকে আমি বিশ্বাস করে নিশ্চিন্দি হয়ে বসে আছি?

—কী মুস্কিল! শর্বরী বসে পড়ে বলে—ও তো আর আমাকে নিয়ে পালাতে চায় নি! ভদ্রলোকের মত বিয়ের প্রস্তাব করেছে। আমিও ভেবে দেখলাম রাজী হতে দোষ কি? তোমরাও তো খুঁজেছিলে এমনি একটি উদারচিত্ত হৃদয়বান পাত্র! এতদিনে যখন জুটেই যাচ্ছে—

সুজাতা ধপাস করে বিছানায় শুয়ে পড়ে বলেন—মেয়ে-সন্তান এমনি অকৃতজ্ঞই বটে! আত্মসর্বস্ব, স্বার্থপর!

শর্বরী অমায়িক হাস্যে বলে—সে কথা ঠিক মা! শুধু মেয়ে-সন্তান কেন, মেয়ে-জাতটাই!

হাসপাতালের ঘরে একটা চাপা গুঞ্জন উঠল, বিস্ময়ের আর ধিক্কারের! ধিক্কারের সেই অস্ফুট তরঙ্গ যেন ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ছড়িয়ে পড়ল কৃষ্ণার সঙ্গের আত্মীয়-বর্গদের থেকে ডাক্তার আর নার্স, পুলিশ আর তার সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে।

সব্বাই শক খেয়েছে। কেউ আশা করে নি এটা!

এই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে কৃষ্ণার রসনা থেকে যে এই নির্লজ্জ নিরাবরণ প্রশ্নটা উচ্চারিত হবে, এটা আশা করার কথাও নয়।

ডাক্তার মুখার্জি সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় পৃথিবীকে অনেক দেখেছেন, তবু কৃষ্ণার এই শ্রীহীন প্রশ্নটায় নতুন করে একটু বৈরাগ্যের হাসি হেসে ভাবলেন, 'এই পৃথিবী'!

নার্স দুজন মনে মনে মুচকে হেসে ভাবল, 'হুঁ, এঁরাই সাধ্বী। এঁরাই স্বামীর মৃত্যুর পর বৈরাগ্যের খোলস এঁটে নির্লিপ্ত মুখে ঘুরে বেড়াবেন জগতে।'

কৃষ্ণার দাদা ভাবলেন, 'ছি ছি ছি! কৃষ্ণা এই! অথচ দেখলে মনে হত—'

নীলাব্জর ছোট ভাই ভাবল 'জানতাম—বৌদি এই রকমই! শুধু দেখলে মনে হত—'

কিন্তু কৃষ্ণা?

কথাটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সে কি নিজে বুঝতে পেরেছে একটা অনুচ্চারিত ধিক্কারের তরঙ্গ বয়ে গেল ঘরখানা ভরে, বয়ে গেল ঘর থেকে বাইরে। ঈথার-তরঙ্গে মিশে গিয়ে সেই ধিক্কার ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিগন্তরে।...ব্যাপ্ত করে ফেলল পৃথিবী, আচ্ছন্ন করে দিল আকাশ।

হয়তো বুঝতে পারল।

অথচ এক মুহূর্ত আগেও কি ভেবেছিল কৃষ্ণা, এই চরম দুঃসময়ে, এই ভয়ঙ্কর পরিবেশের মাঝখানে এই তুচ্ছ কথাটা ছাড়া জিজ্ঞেস করবার মত আর কোন কথা খুঁজে পাবে না সে!

কিন্তু আগে থেকে কী-ই বা বলা যায়?

দুপুর বেলা নিত্য-নিয়মে লেটার বক্সটা খুলতে গিয়ে কৃষ্ণা যখন চাবির রিংটা হাতে নিয়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, তখন কি ভেবেছিল এই তুচ্ছ বিস্ময়টাই তার জীবনে চরম বিস্ময় হয়ে থাকবে? ভেবেছিল কি এই সামান্য ব্যাপারটাই তার সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন করে দেবে?

রিঙের প্রত্যেকটি চাবি পাঁচ-সাতবার করে দেখেছিল কৃষ্ণা। কিছুতেই বিশ্বাস

হচ্ছিল না বলে, একটি একটি করে গুনে দেখেছিল চাবিগুলো, তারপর নিঃসন্দেহ হয়েছিল।

নাঃ, লেটার বক্সের চাবিটা রিঙে নেই।

রিঙ্ থেকে 'খোয়া' গেছে সেটা।

অথচ কি করে গেল!

কেউ খুলে না নিলে, নিজে নিজে খুলে পড়তে পারে না নিশ্চয়ই।

কিন্তু কে নেবে?

লেটার-বক্স সম্বন্ধে কৌতূহলী হবে, এমন কে আছে এ-বাড়িতে?

চিরকালের চাকর নন্দলাল, আর চিরদিনের বামুন ঠাকুর হরিনন্দন, এদের কথা উঠতেই পারে না। নতুনের মধ্যে বাসন-মাজা ঝি-টা। কিন্তু সদ্য-দেহাত-থেকে-আবির্ভূতা, অষ্টাঙ্গে-উল্কি-আঁকা বুড়ী 'সুভদ্রা'কে এ প্রসঙ্গে সন্দেহ করতে গিয়ে হেসে ওঠা ছাড়া আর কি করা চলে?

আর তো বাড়িতে থাকার মধ্যে আছে তিন বছরের ছেলে খোকন এবং শেষ পর্যন্ত নীলাব্জ! তা তার প্রতি সন্দেহটাও হাসির ঘরে জমা দেওয়া ছাড়া তো আর কিছুই করা যায় না!…

কী মনে করা যায়? বিশেষ কোন প্রয়োজনে তাড়াতাড়ি নিয়ে গেছে—কৃষ্ণাকে বলার অবসর হয় নি, এমন কথা ভাবা যায় না! নীলাব্জর জীবনে এমন কি প্রয়োজন আছে, যা কৃষ্ণার অজ্ঞাত?

তবু কৌতূহলের একটা সীমা থাকা উচিত। থাকা উচিত অসহিষ্ণুতার মাত্রা।

"লেটার বক্সের চাবিটা কি হল" এই কথাটুকু জিজ্ঞেস করতে কেউ ভরদুপুরে স্বামীর কর্মস্থলে ফোন করতে বসার ঝঞ্ঝাট পোহায়? গহনার বাক্সের কি লোহার সিন্দুকের চাবি হলেও বা কথা ছিল। এ চাবিটাব জন্যে কৃষ্ণার কোন কাজ আটকাচ্ছে এমনও নয়। জরুরী কোন চিঠির প্রতীক্ষা করছে কৃষ্ণা তাও নয়।

হয়তো বাক্সের ডালাটা খুললে দেখা যাবে, চিঠিই আসেনি একটাও।

তবু কৃষ্ণা সে-ঝঞ্ঝাট পোহাল।

অফিস ঠিক নয়, নীলাব্জর দোকান। বিরাট এক স্টেশনারি শপ্। নীলাব্জর বাপের আমলের ব্যবসা। কাজে-অকাজে কারণে অকারণে দোকানে ফোন যে করে না কৃষ্ণা তা নয়, তবু আজকের মত অকারণে এত ব্যস্ত বোধহয় হয় না। কণ্ঠস্বর শুনে দোকানের চাকর সাধন বরং একটু আশ্চর্যই হল। দ্রুত কম্পিত কণ্ঠে

বলে,—হ্যালো হ্যালো, কে—সাধন?…ও হ্যাঁ আমি কথা বলছি। বাবুকে একবার ধরতে বল তো।…বাবু দোকানে নেই? যান নি আজকে?…কি বললে? একবারটি গিয়েই তাড়াতাড়ি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছেন?…কখন ফিরবেন কিছু বলে গেছেন?…বলে যান নি?…আচ্ছা সাধন, বিশেষ কোন কাজে পড়ে কোথাও গেছেন কি না জান কিছু?…জান না?…আচ্ছা ফিরলে একবার বাড়িতে ডাকতে বোল।

তবু সে-ডাকের অপেক্ষা করে ধৈর্য ধরে বসে থাকে নি কৃষ্ণা। কে জানে কোন্ দুরন্ত খেয়ালের বশে ডাকাডাকি করে জাগিয়ে তুলল ঘুমন্ত দুটো লোককে দিবানিদ্রার সুখশয্যা থেকে।

'চিঠির বাক্সর চাবি কোথায় জানিস নন্দ?'

নিদ্রাতুর নন্দ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলে, 'চিঠির বাক্স? কোন চিঠির বাক্স? কার চাবি?'

'ভূতের মত কথা বলছিস কেন? লেটার বক্সে চাবি দেওয়া থাকে, জানিস না তুই?'

'জানি তো।'

'সে-চাবিটা কই?'

'সে-চাবি—সে-চাবি, আপনার কাপড়ের কোণে!' বলেই ফের ধপাস করে শুয়ে পড়ে নন্দ।

'ঘুমই হচ্ছে মুখপোড়ার যম। এত ঘুমোতেও পারে—!' বলে নন্দলালের প্রতি বিরক্তচিত্ত কৃষ্ণা হরিনন্দনকে ডাকে চেঁচিয়ে, ঠাকুর, 'ও ঠাকুর! · বলি দিনের-বেলা তোমাদের এত ঘুম কিসের বাপু! একটা কাজে পাবার জো নেই!'

হরিনন্দন উঠে পড়ে নম্রভাবে দাঁড়ায়। অতএব কৃষ্ণাকেও একটু নম্র হতে হয়। নরমভাবে বলে, 'আচ্ছা ঠাকুর, চিঠির বাক্সর চাবিটা কোথায় জান?'

'না বৌমা।'

'কোন্ চাবির কথা বলছি বুঝতে পারছ তো? আমারই এই রিঙে থাকে, হঠাৎ দেখতে পাচ্ছি না বাপু।'

লোহার সিন্দুকের চাবি নয় যে, পুরনো লোক মনিবানীর এ প্রশ্নে অপমানিত বা আহত হবে, তাই ভেবে-চিন্তে বলে, 'খোকাবাবু ফেলে দিয়েছে সম্ভব।'

'দুর! খোকাবাবু খুলবে কি করে!'

বলে চলে যায় কৃষ্ণা। পুরোপুরি রিংটাই যদি নিরুদ্দেশ হত, তাহলে খোকাকেই

আসামী করা হত সন্দেহ নেই, কিন্তু এতে হয় না।

দোতলায় উঠে গিয়ে আর একবার রিসিভারটা হাতে তুলে নিল কৃষ্ণা, তুলে নিয়েই কী ভেবে কে জানে রেখে দিল।...থাক গে! আর হৈ চৈ করে কাজ নেই, আসুক নীলাজ।

কিন্তু কিছুতেই কোন স্বস্তি আসে না!

ছোট্ট পাতলা একটা পিতলের চাবির চিন্তা কৃষ্ণার দিবানিদ্রার সুখ হরণ করে নিল কেন! শুয়ে পড়েছিল, আবার ধড়মড় করে উঠে পড়ল।...তাই তো, এটা তো এতক্ষণ মনে পড়ে নি। যাক, মনে যখন পড়েছে তখন চেষ্টায় ক্ষতি কি!

অতএব বাড়িতে যেখানে যত চাবি ছিল সবগুলো নিয়ে নিচে নেমে যায় কৃষ্ণা। দেখে প্রত্যেকটি ঢুকিয়ে। কিন্তু নাঃ, ছোট্ট পাতলা একটি পিতলের চাবির অভাব কেউ পূরণ করতে পারে না।

গোটা কয়েক স্ক্রু খুলে ফেললেই খুলে ফেলা যায় বাক্সের ডালাটা, নন্দকে বললে নন্দই পারে খুলে দিতে। কিন্তু বলবে কোন্ মুখে।

অকারণে একদিন একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছে বলেই তো সত্যি পাগল হয়ে যায় নি কৃষ্ণা! নন্দকে যা-তা বলে বোঝানো যেতে পারে। কিন্তু নীলাজকে?

ও যখন বাড়ি এসে কৃষ্ণার এই অসহিষ্ণুতার পরিচয় পেয়ে অবাক হয়ে যাবে বিস্মিত প্রশ্নে বলবে, 'সে কি, ঘণ্টা চার-পাঁচ সবুর সইল না তোমার, বাক্সটা ভাঙলে?' তখন কি উত্তর দেবে কৃষ্ণা?

আর কিছু করার নেই।

মনকে বোঝাতে চেষ্টা করে কৃষ্ণা, হয়তো দোকানের কোন ড্রয়ার কি বাক্সের চাবি-টাবি হারিয়ে গেছে, হয়তো ছোট্ট পাতলা পিতলের এই চাবিটা তাতে লাগতে পারে এই আশায় ওটা খুলে নিয়ে গেছে নীলাজ। হয়তো তাড়াতাড়িতে আর বলে যাবার সময় পায় নি। হয়তো এই ভেবেছে, এক বেলা লেটার-বক্সটা খুলতে না পারলেই বা কি এমন রাজ্য রসাতলে যাবে?

তবু কিছুতেই কেন কে জানে স্বস্তি আসে না। কেবলই যেন মনটা হারিয়ে যায়।

দিনটাও কি তেমনি!

মেঘলা-মেঘলা, ছায়া-ছায়া...। হাওয়া বইছে। প্রায় শীত করে করে, এমনি শিরশিরে উদাস-উদাস!

এমন দিনে যেন মনটা অকারণে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে; ইচ্ছে করে বাড়ি ছেড়ে কোথাও বেরিয়ে পড়তে, ইচ্ছে করে জানলার মধ্যে থেকে আকাশের টুকরোটুকুর দিকে তাকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অলসভাবে শুয়ে শুয়ে মনগড়া দুঃখের কথা ভাবতে।

যে-দুঃখ জীবনে নেই, যে দুঃখ জীবনে আসবার কোন সম্ভাবনা নেই, সেই দুঃখ। তেমনি এক দুঃখের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে কৃষ্ণা, আজকের মেঘ-ভারাক্রান্ত আকাশের মতই।

এমনও তো হতে পারে কৃষ্ণাকে হঠাৎ সন্দেহ করতে সুরু করেছে নীলাব্জ! তাই হয়তো লেটার বাক্সের চাবি নিজের হাতের মুঠোয় রাখতে চায় সে। দেখতে চায় কখন কোথা থেকে কি চিঠি আসে।—না, এ কল্পনায় বিবক্তি আছে, বিলাস নেই।...সত্যকার দুঃখ না থাকলেই বোধ করি, দৈবাৎ এমনি এক মেঘমেদুর দিনে দুঃখের বিলাসে সাধ যায়।...সেই সাধেই ভাবতে বসে কৃষ্ণা, চিরদিন নীলাব্জ ফাঁকি দিয়ে এসেছে তাকে। ভালবাসার ভান করে অপমান কবে এসেছে চিরদিন। নীলাব্জর মর্মে যার আসন পাতা, সে কৃষ্ণা নয়, আর কেউ।...

ভাবতে থাকে, হয়তো দীর্ঘকালের ব্যবধানে এতদিনে আবার হঠাৎ কোথাও নীলাব্জর দেখা হয়ে গিয়েছে তার সঙ্গে, হয়তো সে দিয়েছে চিঠি দেবার প্রতিশ্রুতি। তাই নীলাব্জর এই সতর্কতা।

হয়তো দুজনে হাসাহাসি করেছে কৃষ্ণাকে নিয়ে। বলাবলি কবেছে, কৃষ্ণা কি নির্বোধ।...কাচে আর কাঞ্চনে প্রভেদ বুঝতে পারে না সে। সমাদর আর সদ্ব্যবহার এই পেয়েই সে ধন্য। কে জানে, হয়তো দোকান পালিয়ে তার সঙ্গেই দেখা-সাক্ষাৎ কবতে গেছে নীলাব্জ। হয়তো এমন প্রায়ই যায়, নিঃশঙ্ক কৃষ্ণা জানতেই পাবে না। কোথায় সে-জায়গা? কোনখানে? শহরের মধ্যে? শহবতলিতে? শহব ছাড়িয়ে অনেক দূরে? কৃষ্ণা তত দূরে পৌঁছতে পারে না?

নীলাব্জ এমন!

নীলাব্জ এত মিথ্যাবাদী! এই নীলাব্জকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে কৃষ্ণা! উঃ, এই দণ্ডে যদি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তে পারত কৃষ্ণা, নিজে গাড়ি চালিয়ে হানা দিয়ে বেড়াত এখানে-সেখানে, শহরে আর শহরতলির আশেপাশে, হাতে হাতে ধরতে পারত নীলাব্জকে!

তীব্র তিরস্কারে বলতে পারত তাকে, 'তুমি না একটি বিশ্বস্তহৃদয় স্ত্রীর স্বামী, তুমি না সন্তানের পিতা!'

কিছুই হয় না, কিছুই হবে না, শুধু হঠাৎ এক সময় সংবিৎ ফিরে পেয়ে দেখতে পায় কৃষ্ণা, চোখের জল ঝরে ঝরে বালিশ ভিজে গেছে তার।

কী কাণ্ড, এ কী!

যে-দুঃখ নেই সে-দুঃখকে মনে গড়ে অহেতুক এতটা চোখের জল খরচ করেছে কৃষ্ণা!

চোখ মুছে হাসবার চেষ্টা করে উঠে বসে, কিন্তু চোখকে মুছে মুছে কিছুতেই শুকিয়ে তুলতে পারে না। ব্যাধিগ্রস্ত চোখের মত শুধু জল পড়তেই থাকে অবিরত।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল, আর বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যায় পর্যবসিত হয়। কৃষ্ণা ওঠে নি, চুল বাঁধে নি, কাপড় ছাড়ে নি।

ইচ্ছে করেই করে নি এসব।

আজ সে অভিমানিনীর রূপ নিয়ে বিপর্যস্ত করে দেবে নীলাব্জকে। স্বীকারোক্তি করিয়ে নেবে নীলাব্জকে দিয়ে, তার বিগত জীবনের দুর্বলতার। অনেক ভেঙেছে, অনেক গড়েছে, অনেক প্রশ্ন ভেঁজেছে।

কিন্তু আজকেই কি নীলাব্জর যত দেরি?

হবে বৈকি। বাল্যবান্ধবী ছাড়েন নি বোধ হয় এখনও!···

'বৌমা!' বামুন ঠাকুর এসে ডাক দেয়, 'কী রান্না হবে বলে দিলেন না, তরকারি কোটা হল না, উনুন জ্বলে যাচ্ছে।'

'আমি জানি না। যা পার করগে না ঠাকুর। একদিন নিজে বুদ্ধি করে চালিয়ে নিতে পার না?'

হরিনন্দন নিঃশব্দে সরে যায়। চালিয়ে নিতে পারে না সে? কৃষ্ণার আসার আগে পর্যন্ত চালিয়েছে কে? মা-মরা ছেলেকে চালিয়ে নিয়ে বিয়ের যুগ্যি করে তুলেছিল কে?

হরিনন্দনের কোন দাম নেই?

ও নিঃশব্দে চলে যেতেই কৃষ্ণা একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ে। 'না বললেই হত এমন করে। যাই দেখে আসি।'

উঠি উঠি করতে করতে আরও কতক্ষণ গেছে কে জানে, হঠাৎ চমক ভাঙল নন্দলালের ডাকে।

'বৌমা, বৈঠকখানা-ঘরে মামাবাবু আর কাকাবাবু এসে বসে আছেন। চা

দিলাম, ফেরত দিলেন !'

মামাবাবু আর কাকাবাবু ! একসঙ্গে !

এ আবার কি মণিকাঞ্চনযোগ !

ধড়মড় করে উঠে বসে কৃষ্ণা। 'এসেছেন তো ডাকিস নি কেন আমাকে ?'

'বলেছিলাম, বারণ করলেন !'

'বারণ করলেন ! সে আবার কি ? কতক্ষণ এসেছেন ?'

'এই একটুক্ষণ !'

'দেখি যাই ! করছেন কি দু'জনে ?'

'কি জানি বৌমা, কি যে গুজগাজ করছে দুজনে ! আমাদের বাবুই বা এখনও এল না কেন ?'

দ্রুত ভাষণে কৃষ্ণা প্রশ্ন করেছিল, 'কি গো ঠাকুরপো, কতক্ষণ ?...দাদা, আমায় ডাকনি যে ?'

কিন্তু কৃষ্ণার দাদা উত্তর দিয়েছে শান্ত আর মৃদু।

'হ্যাঁ, এইবার ভাবছিলাম ডাকা যাক। যেতে হবে এক জায়গায়।'

'যেতে হবে ? কাকে দাদা, আমাকে ?'

'হ্যাঁ—একবার মেডিকেল কলেজে যাওয়ার দরকার। নীলাজ গাড়ি নিয়ে সোনারপুর না ওই দিকে কোথায় গিয়েছিল, হঠাৎ একটা য়্যাকসিডেণ্ট হয়ে—ইয়ে মেডিকেল কলেজে এনে তুলেছে...চলো আমার সঙ্গে।'

নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন দাদা।

কৃষ্ণা শুধু অনেক কষ্টে উচ্চারণ করল, 'সোনারপুর !'

'হ্যাঁ, তাই তো বললে ! পকেটে কাগজপত্র ছিল, তাতেই ঠিকানা পেয়ে স্থানীয় লোকেরা দোকানে খবর দেয়, দোকানের লোক ট্যাক্সি নিয়ে গিয়ে—'

তারপর থেকে আর একটিও কথা কয় নি কৃষ্ণা।

নিঃশব্দে ওদের সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে উঠেছে। গাড়ি থেমে নেমে অনেকখানি দালান আর অনেকগুলো সিঁড়ি পার হয়ে চলে এসেছে ওদের পিছন পিছন তেমনি নিঃশব্দে।

ঘরের দরজায় ঢোকবার মুখে নীলাজর ভাই একবার থমকে দাঁড়াল, ইস্পাতের মত মাজা আর ঠাণ্ডা স্বরে বলল, 'একটু শক্ত হবেন বৌদি। অধৈর্য হয়ে লাভ নেই।'

লাভ ! ও কি তাহলে বুঝতে পেরেছে সারা রাস্তা কৃষ্ণা শুধু লাভ লোকসানেরই হিসাব কষতে কষতে এসেছে ?

শূণ্য দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখলে কৃষ্ণা। কৃষ্ণার দাদা ওর পিঠের উপর আস্তে একটু হাত রাখলেন। থাক এইটুকু স্নেহস্পর্শ, বেদনাবিধুর সহানুভূতিতে কোমল। আবার এ একপ্রকার প্রস্তুতিও বটে, হাহাকাব করে যদি আছড়ে পড়তে চায় কৃষ্ণা স্বামীর মৃতদেহের উপর, তখন আগলে রাখতে হবে এই হাত দিয়ে, স্বামীর আশ্রয়হারা নাবীকে বাল্যের আশ্রয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার আশ্বাস থাকে যে-হাতের স্পর্শে।

কিন্তু কৃষ্ণা কি সে-প্রস্তুতিকে কাজে লাগতে দিয়েছিল ? আছড়ে পড়েছিল স্বামীর বুকেব উপর ? বুকফাটা বিলাপে বিদীর্ণ করতে চেয়েছিল মৃত্যুর স্তব্ধতাকে ?

কই, কিছুই তো করেনি সে।

শুধু ঘরে ঢুকেই চাদর-ঢাকা মূর্তিটার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে ডাক্তার-বাবুর দিকে তাকিয়ে একটি প্রশ্ন করেছিল। অপ্রত্যাশিত আর নিরাবরণ প্রশ্ন !···

যে-প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ের আর ধিক্কারের একটা চাপা গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ঘরে, ঘর থেকে বাইবে !

প্রশ্নের স্বরের মধ্যে ব্যগ্রতাটুকুও ঢাকতে পারে নি কৃষ্ণা। বিনা ভূমিকায় বলে বসেছিল, 'ওঁকে যখন প্রথম পেয়েছিলেন, ওঁর পকেটে একটা চাবি দেখেছিলেন ? ছোট্ট পাতলা পিতলের চাবি একটা ?'

দেখা হওয়াটা অপ্রত্যাশিত।

ঘূর্ণমান পৃথিবীর বিশেষ কোন চক্রান্তে যে—হঠাৎ একদিন দুজনে এ রকম মুখোমুখি হয়ে যাবে এ কথা কি কোনদিন ভেবেছিল রাজ্যশ্রী? না, ঘুমন্ত মনের অস্বীকৃত চেতনাতেও চেয়েছিল কোনদিন?

পাগল! শনিগ্রহকে কে ছুবার চায়?

তবু দেখা হয়ে গেল।......পরিবেশটা নূতন নয়, আশঙ্কার লেশমাত্রও অবকাশ ছিল না......নিত্যকার মতই স্কুলের গেট থেকে বেরিয়ে সুরকি-ফেলা লাল রাস্তাটি ধরে বাসায় ফিরছিল রাজ্যশ্রী, 'বাবলু' পিছলে ছুটে গিয়েছে অনেকটা এগিয়ে—মোড়ের বাঁক ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে চোখ-ছাড়া হয়ে যেতেই রাজ্যশ্রী চেঁচিয়ে ডাক দিলে—এই দুষ্টু শয়তান, দাঁড়া ওইখানে—

ঠিক সেই সময় মোটর বাইকখানা স্বাভাবিক কুশ্রী গর্জন করতে করতে পিছন থেকে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রাজ্যশ্রীর পাশেই।......রাজ্যশ্রী গ্রাহ্য না করেই এগিয়ে যাচ্ছিল, কে একটা লোক হঠাৎ চলতে চলতে থেমে গেল কেন, টায়ার ফাটল কি চেন ছিঁড়ল তার সম্বন্ধে কিসেব বা কৌতূহল রাজ্যশ্রীর? ছেলেটাকে সামলে নিয়ে বাসায় ফিবতে পারলেই বাঁচে সে।

ছোট্ট ছেলে, একরত্তি ছেলে, মেয়ে-স্কুলেই যে এখনও দুবছর পড়তে পারে তাকে নিয়ে রাজ্যশ্রী একেবারে নাজেহাল। স্কুল থেকে বাসা—এই পথটুকু যেতে আসতে দুটি বেলা জব্দ করে ছাড়ে ওকে দুরন্ত ছেলে।

ইনফ্যাণ্ট ক্লাসের ছাত্র তিনটে বাজতেই ছুটি হয়ে যায়, স্কুলের চাকরের সঙ্গে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া শক্ত নয়, তবু রাজ্যশ্রী প্রাণ ধরে ছাড়তে পারে না। নিজে সে উঁচু ক্লাসে পড়ায়, সাড়ে চারটের আগে ছুটি হয় না—এই সময়টুকু স্কুলের গণ্ডিতে আটকে রাখবার জন্যে দারোয়ানের সঙ্গে আছে বন্দোবস্ত।......শুধু দুরন্ত বলেই বা কি? বাসায় কে আছে রাজ্যশ্রীর? ও নিজে গিয়ে চাবি খুলবে তবে তো? মা আর ছেলে—এই তো সংসার।

লাল সুরকির রাস্তাটা রেখায়িত হয়ে মিলিয়ে গেছে দূর সীমান্তে......চোখের দৃষ্টি খানিকদূর গিয়ে থেমে যায়......ওদিকটা 'নাবাল', অনেকটা উঁচু থেকে হঠাৎ ঢালু হয়ে গড়িয়ে গেছে।......চাষার মেয়েরা যখন বড় বড় চ্যাপ্‌টা গড়নের বেতের ডালার উপর শাক-সব্জি আনাজ-পাতি চাপিয়ে ওদিক থেকে এদিকে আসে বেচতে, তাদের মাথার ওই ডালাটাই চোখে পড়ে সকলের আগে।......

স্পষ্ট হতে থাকে মুখ বুক সব শরীর, নিটোল চিকণ বাহুর দোলানি, আর ফাটাচটা পায়ের কুশ্রীতা।

এদিকটা আধা-শহর স্কুল পোষ্টাফিস হাসপাতাল বাজার দোকান ইত্যাদির মফস্বলি সমারোহ। ওদিকটা গ্রামের পথ। ওই পথ চলতে বাঁ-হাতি পড়ে রাজ্যশ্রীর নিজের—একান্ত স্বাধীনতার ছোট্ট বাসাটুকু। অনেক ঝড়-ঝাপ্‌টা সয়ে অনেক বন্দরে ঠোকর খেয়ে এইখানে এসে পেয়েছে একটু নিশ্চিন্ত আশ্রয়, পেয়েছে একটা শক্তখুঁটি, স্রোতে ভাসা নৌকোটা বাঁধতে।... ...

বাংলার বাইরে প্রায় অখ্যাত এই ছোট্ট শহরে সুজিতের যে কখনও কোন কাজ পড়তে পারে, দরকার পড়তে পারে—উদ্দাম বেগে মোটর বাইক হাঁকিয়ে আসবার—সেইটাই শুধু আশঙ্কা করে নি কোনদিন।

তবু—কোন অঘটনই অসম্ভব নয় পৃথিবীতে, সেই হিসেবেই ধরে নিতে হবে ওদের এই অপ্রত্যাশিত দেখা হওয়াটা।

রাজ্যশ্রী নিজের উদ্বেগে এগিয়ে যাচ্ছিল, চমকে উঠল সুজিতের কণ্ঠস্বরে। রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম আর ধুলো মুছতে মুছতে সুজিত প্রায় ওর পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে পড়ে বিস্মিত প্রশ্ন করছে—তুমি? তুমি এখানে?

রাজ্যশ্রী মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে ঈষৎ কঠিন স্বরে হাসির আভাস মিশিয়ে বললে, আশ্চর্য হবার কি আছে? বেঁচে যখন আছি—পৃথিবীর কোন একটা জায়গায় তো থাকতেই হবে!

—তবু আশ্চর্য হচ্ছি শ্রী, এমন করে হঠাৎ যে তোমায় দেখতে পাব এ ভাবি নি।

—অনেক অভাবনীয় ব্যাপারই তো সংসারে ঘটে—এ তারই একটা। কিন্তু সর—আমার দাঁড়াবার অবসর নেই।

—এক মিনিটও আর তোমার অবসর নেই শ্রী? পথ থেকে তাড়িয়ে দেবে?

—তাড়ানোর কথা হচ্ছে না—রাজ্যশ্রী উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি যতদূর চলে প্রসারিত করে চঞ্চলভাবে বলে—'বাবলু' একলা এগিয়ে গেছে—দুরন্ত ছেলে—সর আমি যাই।

সুজিত একটু সরে দাঁড়িয়ে ম্লানভাবে বলে—সরে তো যাবোই শ্রী, তোমার পথ রোধ করি এ ক্ষমতা নেই, কিন্তু কি নাম বললে—'বাবলু?' কে সে?

—সে? সে হচ্ছে দিদির ছেলে।

—দিদির? পূরশ্রীর ছেলে? তোমার কাছে?

—না না আমার মামাত দিদির, তাকে চেন না তুমি—দ্রুত পায়ে প্রায় ছুটে চলে রাজ্যশ্রী।...

কিন্তু কোথায় সেই দুরন্ত শিশু? কোনখানে তাকে দেখতে পাচ্ছে না রাজ্যশ্রী। এতটুকু সময়ের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেল! সুজিতের উপস্থিতি ভুলে রাজ্যশ্রী চীৎকার করে ডাকে···ছেলের নাম ধরে। জনবিরল পথে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসে তার ডাক। কী কুক্ষণেই আজ স্কুল থেকে বেরিয়েছিল সে···কী কুক্ষণে দেখা হল সুজিতের সঙ্গে! তার জীবনে কি বার বার শুধু শনি হয়েই দেখা দেবে সুজিত?

আশে-পাশে কয়েকটা বাড়ি জনশূন্য। স্বাস্থ্যকর স্থান বলে কলকাতার বড়-লোক সম্প্রদায় যেখানে সেখানে একটা একটা বাড়ি খাড়া করে, রেখেছে তালা ঝুলিয়ে। কোথাও বা আর একটু সুব্যবস্থায় আছে—মালি। এমন একটা বাড়ির গেটের কাছে এসে রাজ্যশ্রী উৎসুক ডাক দেয়—দেওদাস! দেওদাস!

কাছেই কোথাও ছিল মালিটা, এসে আভূমি সেলাম করে দাঁড়াল।

—খোকাবাবু আয়া হ্যায় দেওদাস?

—নোহ্ মাইজী!

বাগানের ফুলের মধ্যস্থতায় দেওদাসেব সঙ্গে 'বাবলু বাবু'র কিছু হৃদ্যতা আছে।

রাজ্যশ্রী কাতরভাবে অনুরোধ জানায় তাকে বাগানে একটু অনুসন্ধান করতে, দুষ্টু ছেলে যদি অলক্ষে ঢুকে পড়ে থাকে।···কিন্তু কই?···নেই নেই, কোথাও নেই ···একবার চোখের বাইরে চলে গেলেই বুঝি মনে হয় কোনখানেই আর নেই, একেবারে হারিয়ে গেছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে পৃথিবী থেকে।·· মার প্রাণের কেন এই ব্যাকুলতা? কেন এমন অন্যায় অমঙ্গল আশঙ্কা?

নিজের বাড়ি ছাড়িয়ে অনেকটা দূর চলে যায় রাজশ্রী, আবার ফিবে আসে। বার বার করে আনাগোনা।···দূরে গিয়ে মনে হয় বাড়ি গিয়ে হাজির হয়েছে হয়তো—বাড়ির কাছে এসে প্রাণ হা হা করে ওঠে।···কিন্তু চাবি তো রাজ্যশ্রীর নিজের কাছেই ছিল, কিসের আশায় সে বার বার শোবার ঘর রান্নাঘর উঠোন আর কুয়োতলায় ঘুরে দেখছে?···সুজিত যে তার সঙ্গে এসেছে···বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে আছে সে খেয়ালও নেই রাজ্যশ্রীর·· দেখা জায়গাই আবার দেখছে আর নিজের কণ্ঠের ভাঙা ভাঙা কাতর ডাকে নিজেই শিউরে উঠছে।···হঠাৎ একটা সম্ভাবনায় সমস্ত শরীর অবশ হিম হয়ে আসে রাজ্যশ্রীর। নিশ্চয়ই তাই! গোলাপ গাছ-ওয়ালা সেই বড় লাল বাড়িটার বাইরের উঠোনে যে প্রকাণ্ড ইঁদারাটা আছে নিশ্চয়ই তার কানায় উঠে উঁকি মারতে গিয়েছিল সে। ব্যস্ তারপর—উঃ সেই

নিশ্চিত পরিণতির কথা ভাবতেও পারে না রাজ্যশ্রী, শুধু পাগলের মত ছুটে আবার পথে বেরিয়ে আসে।

সুজিত এতক্ষণ আর কোন কথাই বলে নি, শুধু হতভম্বের মত রাজ্যশ্রীর অনুসরণ করছিল মাত্র। ওর আসার সঙ্গে সঙ্গেই যে এ রকম একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটবে এমন আশা করে নি। কিন্তু পরের ছেলের জন্যে রাজ্যশ্রীর কী অস্বাভাবিক ব্যাকুলতা! আবার তাকে ও-রকম এলো-মেলো হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে সুজিত আর স্থির থাকতে পারে না, কাছে গিয়ে দৃঢ়স্বরে বলে—তুমি একটু শান্ত হয়ে বোস শ্রী, আমাকে একটু খুঁজে দেখতে দাও।

—তুমি? তুমি কি করে খুঁজবে? তুমি তো তাকে চেন না?

হতাশায় ভেঙে পড়ে রাজ্যশ্রী।

—চিনে নেব। নিজের ছেলেকে চিনে নেওয়া হয়তো শক্ত হবে না।

—কী? কী বললে তুমি? আচমকা আগুনের মত ঝলসে ওঠে রাজ্যশ্রী—তুমি যাও, উপকারের ছলে আর আমার সর্বনাশ ডেকে এনো না। কেন তুমি এসে আমার সামনে দাঁড়ালে? কেন দেরি করিয়ে দিলে? তাই তো হারিয়ে গেল সে, চোখের বাইরে চলে গেল। চিরদিনই কি তুমি আমার সঙ্গে শত্রুতা করবে?

—আমার ভাগ্যলিপি! কিন্তু যাক, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে শুধু পাগলেব মত ছুটোছুটি করে আর রাস্তার বাজে লোককে জিজ্ঞেস করে কোন লাভ হবে না।··· বাইকটা নিয়ে আমি দেখছি—কি নাম বললে—বাবলু! আচ্ছা বয়স কত?

—পাঁচ বছর। প্রায় অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করে রাজ্যশ্রী।

—পাঁচ! পাঁচ বছর—

নিজের মনে কি যেন একটা হিসাব মিলিয়ে নিয়ে আধ মিনিট পরে বললে সুজিত—কি জামা পরা আছে?

—খাকি সুট। কাবলি জুতো—কালো কোঁকড়ানো চুল, ফর্সা—খুব ফর্সা রং—দেখলেই চিনতে পারা যাবে—সোনার পুতুলের মত ছেলে!

সুজিত যেন কল্পনায় একবার দেখে নেয় সেই স্বর্ণকান্তি শিশুটীকে···অন্যমনস্কের মত একবার নিজের ধবধবে ফর্সা নিটোল বাহুর দিকে তাকিয়ে দেখে···তারপর ফিরে চলে নিজের মোটরবাইক খানার কাছে—পথের মাঝখানে পথচারীদের কৌতুহল আকর্ষণ করে এতক্ষণ পড়েছিল যেটা।

কিন্তু এক মিনিট যে এক যুগ রাজ্যশ্রীর কাছে…কতক্ষণ আর অপেক্ষা করবে সে, সন্ধ্যার অন্ধকার যে ঘনিয়ে এল।…সুজিতকে বিশ্বাস কি? তাকে মিথ্যা স্তোক দিয়ে ভুলিয়ে নিজের কাজে চলে গেল কি না কে জানে? সুজিতের ভরসায় কেনই বা বসে থাকবে রাজ্যশ্রী?…এতক্ষণ স্কুলের দারোয়ান চাকর আর মালিদের বললে তারা চারদিকে বেরিয়ে খুঁজে আনতে পারত। কিম্বা—কিম্বা ইঁদারায় নেমে তার পরের কথাটা আর স্পষ্ট করে ভাবতে পারে না রাজ্যশ্রী, শুধু চোখের সামনে ভেসে ওঠে ওর বাবলুর অচৈতন্য দেহ…জুতো জামা সমস্ত ভিজে ভারী হয়ে গেছে…কিন্তু অতটুকু ছেলে দু-ঘণ্টা জলে পড়ে থাকলে বাঁচে? কই সুজিতকে তো সে বললে না এই সর্বনাশা সন্দেহের কথা? হয়তো তখনও তুললে বাঁচানো যেত। অবশেষে আর কোন কিছুই ভাবতে পারে না রাজ্যশ্রী নিজেই অচৈতন্যের মত বাইরের রোয়াকেই শুয়ে পড়ে…

কিন্তু কতক্ষণ-ই বা…রাজ্যশ্রীর কাছে সহস্রযুগ মনে হলেও ঘড়ির হিসেবে বেশী নয়, আধঘণ্টা পরেই সুজিতের মোটর-বাইকখানার গর্জন শোনা গেল…উত্তরোত্তর কাছে আসছে…কিন্তু না, রাজ্যশ্রী চোখ খুলবে না, প্রশ্রয় দেবে না সুজিতকে।… সুযোগ দেবে না তাকে গদগদ স্নেহের ভানে শোকে সান্ত্বনা দেবার। গর্জনটা থেমে গেল…শুধু একটু ফোঁস-ফোঁসানি…পরক্ষণেই মিহি বাঁশীর মত বেজে উঠল বাবলুর অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর—না কক্ষনও যাব না আমি মার কাছে—কক্ষনও না। ছেড়ে দাও আমাকে—ছটফট করে নেমে পড়ছে সুজিতের কোল থেকে।

ধড়ফড় করে উঠে বসে রাজ্যশ্রী। স্বপ্ন দেখছে না কি? না সত্যিই যে অক্ষত সুন্দর সোনার পুতুলের মত ছেলে সুজিতের কোল থেকে নেমে পড়বার জন্যে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে। সুজিতের মুখে বিপন্ন হাসি।

রাজ্যশ্রী ছুটে এসে প্রায় যেন ছিনিয়ে নেয় ওর কোল থেকে…যেন সুজিতই কেড়ে নিয়েছিল তার ছেলেকে।

এর পরের ব্যাপারটা চমৎকার!

বাব্‌লু হঠাৎ প্রবল বিক্রমে মাকে দু'হাতে মারতে সুরু করেছে। অভিযোগেরও অভাব নেই—কেন তুমি আমাকে খুঁজে পেলে না? কেন তুমি আমাকে খুঁজে পেলে না? আমি তো শুধু একটু লুকিয়ে ছিলাম—তুমি কেন দরজা খুলে আনলে না? আমি যে কিছুতেই খুলতে পারছিলাম না। আমায় খালি মশা কামড়াচ্ছিল—

একরত্তি ছেলের জোরের কাছে রীতিমত পর্যস্ত হয়ে পড়ে রাজ্যশ্রী।

নাঃ, আর দাঁড়িয়ে দেখা চলে না—সুজিত ওকে টেনে নিয়ে ধরে ফেলে আড়কোলা করে তুলে নিয়ে বলে—ছিঃ ছিঃ তুমি মাসীকে মারো? এমন দুষ্টু ছেলে তুমি? চল আবার তোমায় সেই ভাঙ্গা ঘরে বন্ধ করে দিয়ে আসি—সাংঘাতিক ছেলে, উঃ।

কিন্তু বাবলুর তখন একটা খটকা লেগেছে—রাগ ভুলে আশ্চর্য হয়ে বলে—কই মাসীকে মেরেছি? মাসী তো ইস্কুলে—

স্কুলের অপর কোন দিদিমনির কথা স্মরণ করেই বোধ করি কথাটা বলে।

সুজিত সামান্য হাসির সঙ্গে বলে—ওই তো তোমার মাসী, জিগ্যেস করো ওকে।

—ইস্ মাসী বইকি? মাকে বলছে মাসী, জানে না কিছু না, বোকা।

এতক্ষণে একটু ধাতস্থ হয়ে সুজিতের দিকে চেয়ে দেখে। এ রকম বুদ্ধিহীন লোককে আর ভয় করবার কি আছে? মোটর-বাইকের অধিকারী হিসেবে যেটুকু শ্রদ্ধা সম্মান দেওয়ার কথা উঠত, অনায়াসেই সেটা তুলে নেওয়া যায়।

রাজ্যশ্রী যতক্ষণ ছেলে হারিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটোছুটি করছিল ততক্ষণ বরং সহজ হয়েছিল সুজিতের সঙ্গে কথা কওয়া, এখন সুস্থ সহজ ছেলেকে অনায়াসে পেয়ে গিয়ে লজ্জা এসে আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরে। দীর্ঘদিন অসাক্ষাতের লজ্জা, ছেলের নামে মিথ্যা পরিচয় দেবার লজ্জা।

কিন্তু না, লজ্জায় জড় পদার্থের মত বসে থাকলে চলবে না—ছেলের হাতে বিপর্যস্ত কেশ-বেশ সামলে নিয়ে গম্ভীরভাবে বলে—কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ? শয়তান ছেলে!

মার মুখে তুমি সম্বোধনটা বাবলুর কাছে প্রায় তিরস্কারের সামিল—হঠাৎ সমস্ত বীরত্বে জলাঞ্জলি দিয়ে ভ্যাঁক্ করে কেঁদে ফেলে বেচারা। সত্যি, এই ঘণ্টা তিনেক ধরে সেও কম সহ্য করে নি···শারীরিক যন্ত্রণা, মানসিক কষ্ট, যথেষ্টই তো ভোগ করতে হয়েছে তাকে।

—এই দেখ—বীরপুরুষ, হঠাৎ কাঁদবার মানে? চল চল তোমায় গাড়ি চড়িয়ে ঘুরিয়ে আনি। হ্যাঁ হ্যাঁ একটা কোদাল কুড়ুল কিছু থাকে তো দাও দিকিন রাজ্যশ্রী, সেই হতচ্ছাড়া দরজাটা ভেঙে দিয়ে আসি। হয়েছিল কি জান? ওই যে মাঠের মাঝখানে লাল রঙের ভাঙা বাড়িটা পড়ে আছে—ইনি বোধ করি লুকোচুরি খেলতে ঢুকে পড়েছেন তার মধ্যে আর উঠোনের দরজাটি বন্ধ করায়

সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে নিচের দিকের ছিটকিনিটা গিয়েছে পড়ে। কিছুক্ষণ বোধ করি মজা উপভোগ করছিলেন, তারপর মশা কামড়েছে—সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, ভাল লাগে নি—দরজায় ধাক্কা সুরু করে দিয়েছেন কিন্তু রাস্তা থেকে এত দূর—সে শব্দ কানেই আসে নি আমাদের। আশ্চর্য যে একটু কাঁদে নি—আমি উঠোনের দিকের ভাঙা পাঁচিল টপকে গিয়ে যখন উদ্ধার করলাম তখন দেখি মুখ-চোখ লাল করে দরজায় ধাক্কা দিয়েই চলেছে। দোরটা ভারী শয়তান, না বাবলু বাবু?

—তোমার সঙ্গে যে বড় আসতে চাইলে?

—আমার সঙ্গে?

সুজিত একবার স্পষ্ট করে সোজাসুজি তাকাল রাজ্যশ্রীর মুখের দিকে···

অন্ধকার কেটে গিয়ে পরিষ্কার জ্যোৎস্না উঠেছে···নির্জন হয়ে গেছে সামনের রাস্তা, ছোট্ট বাসার ছোট্ট রোয়াকে বসে থাকা জ্যোৎস্নামাখা রাজ্যশ্রীকে দেখাচ্ছিল যেন আঁকা ছবির মত। ওর চোখের কোলে তখনও জলের রেখা, মুখে মৃদু হাসির আভাস। আগের চাইতে আরও বেশী সুন্দর হয়েছে নাকি রাজ্যশ্রী? আরও বেশী মোহময়?

মুহূর্তের জন্য আত্মবিস্মৃত হয়ে কি একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল সুজিত, সহজ ভাবেই উত্তর দিলে—আসতে কি সহজে চায়? যখন বললাম—তোমার নাম বাবলু আমি তোমায় চিনি, তোমার মার কাছে নিয়ে যাব—এই বদমাইস দরজাটাকে ভেঙে দেব, তবে রাজী হল। যাক—পেয়েছ তো তোমার ছেলে?

—খালি খালি ও কথা বলে লাভ আছে কিছু? ··রাজ্যশ্রী হঠাৎ যেন ফেটে পড়ে—আমি বলছি ও আমার দিদির ছেলে, ছেলেবেলা থেকে মা বলে আমায়। তুমি কি ভেবেছ তোমার দেওয়া লজ্জা অপমানের বোঝা মাথায় করে বয়ে বেড়াচ্ছি আমি? নষ্ট করে ফেলেছি···সেই পাপের অঙ্কুর, ধ্বংস করে ফেলেছি সেই কলঙ্কের বীজ। টুকরো টুকরো করে ফেলে দিয়েছি তোমার চিহ্ন···পাপের আর লজ্জার, লজ্জার আর ঘৃণার সমস্ত চিহ্ন। ও আমার পালিত সন্তান, এ ছাড়া আর কিছু প্রমাণ করতে পার না তুমি। যাও যাও, আমার এইটুকু শান্তি আর নষ্ট কোর না তুমি, অনেক ক্ষতি করেছ আমার।

—কিন্তু ক্ষতি কি আমার কিছুই হয় নি শ্রী? শুধু তোমারই হয়েছে? তোমরা —মেয়েরা, বড় বেশি স্বার্থপর তাই নিজেদের লাভ ক্ষতি ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না তোমাদের। আমার দিকটাই কি কোনদিন ভেবে দেখেছ? আজ ছবছর ধরে আমার জীবনেই কি শান্তি আছে? শৃঙ্খলা আছে? ঘর আছে?

—এ তোমার ইচ্ছাকৃত বিলাস। ঘর বাঁধবার কোন বাধাই তো তোমার পক্ষে নেই।

—সামাজিক বাধা হয়তো নেই, কিন্তু মনের—বিবেকের কোন বাধাই কি থাকতে পারে না? তবে যদি বল পুরুষের হৃদয় বলে কিছু থাকে না।

—আমি কিছুই বলতে চাই না, শুধু বলছি তুমি যাও। অনেক উপকার করলে আমার, তার জন্যে ধন্যবাদ, কিন্তু আর না, বাবলু অবাক হয়ে শুনছে আমাদেব কথাবার্তা। চল বাবলু, খিদে পায় নি তোর?

বলে সমস্ত আলাপ-আলোচনার উপর যবনিকা টেনে দেবার ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ায় রাজ্যশ্রী।

সুজিত এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল···তারপর নেমে গেল রাস্তায়। কিন্তু বাবলু? সে তার দাবী ছাডবে কেন? মার হাত ছাড়িয়ে ছুটে চলে আসে রাস্তায় —বা রে তুমি যে বললে গাডি চড়িয়ে নিয়ে যাবে? দরজাটা ভেঙে দেবে? এখন যে পালাচ্ছ?

সুজিত একবার ওর হাতটা নিবিড়ভাবে ধরেই ছেড়ে দিয়ে বলে—দরজা ভাঙতে আব পাবলাম কই বাবা? তাই তো পালিয়ে যাচ্ছি।

—না তুমি যাবে না।

বাইকের চাকায় হাত লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে।

অগত্যা রাজ্যশ্রীকেই নেমে আসতে হয় পথে—ছেলেকে বকে ধমকে ফিরিয়ে নিতে হয়।

সুজিত চলে যায়। হয়তো একটু ধীরে। আর ওর গাড়ির কুশ্রী গর্জন ছাপিয়ে একটা মিহি গলার বাঁশীর মত আওয়াজ পথের শূন্যতাকে খণ্ড খণ্ড করে দেয়—গাডিওলাবাবু, কাল এস আবাব—ও গাড়িওলাবাবু—

ছেলের পরিচর্যায় কতটুকুই বা সময় খরচ হয়? দুর্দান্ত ছেলে খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পডে কাদার মত। তারপর? আর তো কোন কাজ নেই রাজ্যশ্রীর।

নিজের আহারের দরকারও যেন আজ মিটে গেছে।

জানলা খুলে বাইরের দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকাই বা মন্দ কি? বদ্ধঘরে বিছানায় শুয়ে থাকার চেয়ে ভাল, ঘুম যখন আসবেই না!···চাঁদ ডুবে গেছে···বাইরেটা নিঝুম অন্ধকার হঠাৎ ভাবী অবাক লাগে রাজ্যশ্রীর, কোন

সাহসে সে এই লোকসঙ্গহীন প্রায় প্রান্তরে একলা বাসা বেঁধেছে? এই তো—বিপদ যে-কোন সময় আসতে পারে! সে কি সেই রাজ্যশ্রী? কলকাতায় তাদের বাড়িতে সকলের মাঝখানে পাঁচজনের একজন, আদরের আদরিণী যে রাজ্যশ্রী সব সময় প্রজাপতির মত রঙিন ডানা মেলে ঘুরে বেড়াত, তার সঙ্গে কি কোন সংস্রব আছে তার নিজের?

প্রতিষ্ঠাপন্ন ঘরের মেয়ে, রূপের প্রতিষ্ঠা নিজেরও কম নয়, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, সহস্র সম্ভাবনা ছিল তার সামনে, কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। কত লাঞ্ছনা অপমান! অনেক ধাক্কা খেয়ে এসে উঠেছে এইখানে, অখ্যাত এক মফস্বলি শহরে মাষ্টারী করে কায়ক্লেশে নিজের দিন চালান—শুধু এইটুকু! বাকী সমস্তই নিরর্থক হয়ে গেছে তার জীবনে?

ঘুমের ঘোরে উসখুস করে উঠল বাবলু।

রাজ্যশ্রী চমকে চাইল···না না সবটাই নিরর্থক নয় তার। তার বাবলু আছে। বাবলু: বাবলু: সমাজ সংসারের অস্বীকৃত এই সন্তানকে সে দুর্বহ বোঝা বলে মনে করতে পারে কই? বাবলুকে মানুষ করে তোলাই তার একাগ্র সাধনা। হঠাৎ মনে হল সুজিতের কাছে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে লাভ কি হল তার? কেনই বা সে ভয় পাবে? সুজিত কেড়ে নেবে? জগতের কোন আইনের সাধ্য আছে তাকে কেড়ে নেবার? ভয় নয়, লজ্জা।

অদ্ভুত একটা লজ্জা।

বাবলু যেন সুজিতের কাছে তার পরাজয়ের দলিল।

সুজিতকে সে ঘৃণা করে···তার জাগ্রত চৈতন্যে ঐ একমাত্র শব্দ আছে, আছে একমাত্র অনুভূতি...ঘৃণা ছাড়া আর কিছু নয়, কিছু হতে পারে না।

আচ্ছা সুজিত এখানে কোথায় এসেছিল? কি কাজ তার থাকতে পারে এখানে?···কতদূর থেকে এসেছিল কে জানে? হয়তো পরিশ্রান্ত ছিল, ক্ষুধার্ত ছিল···মুখের দিকে কি তাকিয়ে দেখেছে রাজ্যশ্রী?···ক্ষিদে বরদাস্ত করতে মোটে পারত না সুজিত···কতদিন ওর মুখ দেখে ধরে ফেলত সে।

পথ থেকে এভাবে তাড়িয়ে দেওয়াটা কি বেশী নিষ্ঠুরতা হল না? সুজিত ওর ছেলেকে খুঁজে এনে দিলে—ধর অপরিচিত কেউ যদি এই উপকারটুকু করত? সামান্য একটু ভদ্রতার আমন্ত্রণ, কিছু খেয়ে যাবার অনুরোধ...এ না করে উপায় থাকত না নিশ্চয়? তবে?

সুজিতকে সেটুকু করলেই বা ক্ষতি ছিল কি?

বরং বোঝানো যেত রাজ্যশ্রীর জীবনে এক কানাকড়িও দাম নেই তোমার, নিতান্ত পথের লোকের মতই সাধারণ ভদ্রতার সম্বন্ধ। কেন যে অমন উত্তেজিত অধৈর্য হয়ে উঠল রাজ্যশ্রী! ছি! ছি!

দুষ্টু ছেলেটাই আনলে সমস্ত বিপত্তি ডেকে।

সমস্ত ঘটনাকে ফিরিয়ে এনে নিজের ইচ্ছামত ছাঁচে ঢালাই করে ভাবতে কি সুখ! সুজিতের কথাগুলো গড়ে নিলেই সহজ হয়ে আসে নিজের উত্তর। ধারালো চাঁচা-ছোলা সেই উত্তর...নিজের গৌরব যাতে নষ্ট না হয়।

কিন্তু সুজিত কি আর আসবে? রাজ্যশ্রী তো তাড়িয়ে দিয়েছে—দিয়েছে ভবিষ্যতের সমস্ত সম্ভাবনা নষ্ট করে।

ভদ্রতার খাতিরে—মানে বাবলুর আমন্ত্রণ রক্ষা করতে আর একবার কি আসা উচিত নয় ওর? রাজ্যশ্রী অবশ্য চায় না—শুধু আজকের বড় বেশী রূঢ় ব্যবহারটাকে একটু মোলায়েম করা যেত।

অনেকরাত্রে ঘুমিয়ে, উঠতে একটু বেলা হয়ে গিয়েছিল...ঘুম ভাঙল—বাবলুর দুরন্ত টানাটানিতে—মা ওমা, গাড়িওলাবাবু এসেছে—গাড়ি চড়ে ভোঁ ভোঁ করে বেড়াতে যাচ্ছি আমি।

রাজ্যশ্রী উঠে বসে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ছেলের মুখের দিকে। যেন বোধগম্য হয় নি কথাটা।

কিন্তু বাবলুর কাছে হৃদয়-বিলাসের সময় নেই, মার মুখটা ধরে জানলার দিকে জোর করে ঘুরিয়ে দিয়ে বলে—দেখতে পাচ্ছ না? ওই তো গাড়ি, ওই তো গাড়িওলাবাবু...ও গাড়িওলাবাবু দাঁড়াও যাচ্ছি আমি, জুতোটা পরে নিই।

দেখা গেল বাবলু মাথায় খাটো হলেও বুদ্ধিতে খাটো নয়। চেয়ার টেনে নিয়ে গিয়ে দরজার খিল খুলেছে—আলনা থেকে পেড়ে নিয়েছে নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ। শুধু শার্টটা উল্টে পরার দরুণ পকেট টকেট খুঁজে পাচ্ছে না বলে ব্যস্ত হয়ে বার বার অনুসন্ধান করছে নির্দিষ্ট স্থানে...হায় হায় অমন সুন্দর বুশ-সার্টটা তার সমস্ত শোভা-সম্পদ হারিয়ে এমন দরিদ্র হয়ে গেল কি করে? পকেট নেই, বোতাম নেই, কাঁধের ফিতেপত্র কিছুই যে নেই ছাই!.. ছুটে পথে বেরিয়ে গিয়ে ধরল সুজিতের হাত—দাঁড়াও পালিয়ে যেও না তুমি—আমার পকেট টকেট কিছু খুঁজে পাচ্ছি না, পয়সা আছে—পেন্সিল আছে, তোমায় দেব। মার কাছে খুঁজে নিয়ে আসি—

সুজিত মুখটিপে হেসে বললে—পকেট খুঁজে পাচ্ছ না? তাই তো, এই ভোরবেলা কোথায় বেড়াতে গেল সে? না কি চুরিই করল কেউ পকেটটাকে?

—জানি না তো।

ভারি বিপন্ন লাগে বাবলুর মুখটা।

নিষ্পলক দৃষ্টিতে দেখছে সুজিত ওর কোঁকড়ান-চুলে-ঘেরা উজ্জ্বল চঞ্চল মুখ। হাতের কাছে একটা আয়না থাকলে কি সুবিধে হত না? সুজিতের মুখটা এই মুহূর্তে একবার দেখে নিতে।

—আমি একটা মন্তর জানি—হারানো জিনিস খুঁজে পাবার।

—কই মন্তর?

উৎসুক প্রশ্নে বাবলু দুইহাত দিয়ে ওর একখানি বলিষ্ঠ বাহু চেপে ধরে। আঃ! শুধু শিশুর স্পর্শ বলেই কি এত কোমল? এত তৃপ্তিকর?

দুহাতে প্রায় বুকের কাছে চেপে ধরে সুজিত কৌতুকহাস্যে বলে—খুলে দাও শার্টটা—চোখ বোজ, এই যে—না, এবার পর দিকিন?

তাইতো! পাওয়া গেছে হারানো জিনিস!

বাবলুকে অবাক করাব পক্ষে এটা নেহাৎ কম নয়। সব আছে—ফিতে বোতাম, পকেট, মায় পেন্সিল খড়ি, চকচকে সিকিটা পর্যন্ত।

দুজনেই হেসে ওঠে।

এবার গাড়ি চড়ার পালা।

এতক্ষণ যেন রাজ্যের লজ্জা ধরেছিল রাজ্যশ্রীকে...হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে ওঠে, লজ্জা ভেঙে যায়। নিয়ে পালিয়ে যাবে না তো সুজিত? অধিকার বোধের প্রবল দাবীতে! সুজিতকে কি ঠকানো গেছে! মাতৃহৃদয়ের সমস্ত সুধা দিয়ে মানুষ করে তুললেও মায়ের অনুরূপ করে তুলতে পেরেছে কই ছেলেকে? প্রমাণহীন তুচ্ছ একটু ঋণেব ভিত্তির উপর ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে এই সুকুমার অবয়ব। অদ্ভুত সাদৃশ্য। সমস্ত মুছে ফেলতে পারে রাজ্যশ্রী, মুছে ফেলতে পারে না এই সাদৃশ্য।

তাই না এত ভয়।

গাড়ি ছাড়বার উপক্রম করতেই রাজ্যশ্রী ছুটে আসে—কোথায় নিয়ে যাচ্ছ তুমি ওকে?

—ভয় নেই শ্রী, তোমার ছেলেকে চুরি করে পালাব না। ছেলেমানুষের

কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, বাইকখানা নিয়ে বেরোবার সময় মনটা কেমন করে উঠল, একটু ঘুরিয়ে এনে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।

—ও এখনও দুধ খায় নি—

দুর্বলভাবে শুধু একটুকু বলতে পারে রাজ্যশ্রী।

—বেশ তো—খেয়ে আসুক দুধ। বাবলু যাও তো মানিক ছেলে, দুধ খেয়ে এস ?

—ইস্। ওই বলে তুমি পালিয়ে যাবে—

মার কথা-বার্তাগুলো যে তার অনুকূল নয়, এটুকু বোধ হবার বয়স হয়েছে—বুনো ঘোড়ার মত ঘাড় ফিরিয়ে বলে—দুধ খাবোই না আজ, গাড়িওলাবাবুর সঙ্গে চা খাবো। তুমি চা তৈরি কর না মা, আমরা এক মিনিট পরে ঠিক চলে আসব—বলে সুজিতকে টেনে নিয়ে এগিয়ে যায়।

মাকে আর বেশী বিশ্বাস নেই তার।

আশ্চর্য! সত্যিই যে তৎপর হয়ে কাজে লেগে গেল রাজ্যশ্রী। বাবলুর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে সুজিত ওর আতিথ্য নেবে এই কি ভেবেছে না কি ? যার জন্যে ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রাখে নি, তার জন্যে কেন এত আন্তরিক যত্ন নিয়ে তৈরি করছে তার অতীতদিনের প্রিয় খাদ্য।

মনটা কি তাহলে কিছুই নয় ?

কেবল মাত্র ঘটনার দাস ?

তাই যদি না হবে কি করে সুজিত এসে বসল ওর ঘরে ? অনায়াস-ভঙ্গীতে বাবলুকে কাছে নিয়ে নিতান্ত অন্তরঙ্গের মত ? সামান্য ঘর, ততোধিক সামান্য গৃহসজ্জা, তবু কি চমৎকার মনোরম।

নিচু চৌকিতে ছোট বড় দুটি বালিশ দিয়ে সাজানো বিছানা, মার আর ছেলের। মাথার কাছে টুলের উপর কাচের গ্লাস চাপা দেওয়া জলের কুঁজো, সস্তা কাঠের টেবিলের উপর রাজ্যশ্রীর "রবীন্দ্ররচনাবলী" "তরুণের স্বপ্ন" "গীতার গান্ধীভাষ্য" "জওহরলালের আত্মজীবনী"র পাশে বাবলুর "নূতন শিক্ষা ধারাপাত" "ছুটির গল্প" "সরল ইংরাজী শিক্ষা" সহজ ভাবে মিশে আছে এক হয়ে। এপাশে স্ট্যাণ্ড-আলনায় রাজ্যশ্রীর শাড়ি ব্লাউস পেটিকোট...বাবলুর হাফ-প্যান্ট বুশসার্ট ক্ষুদে গেঞ্জি...আর ঘরে ঢুকে সামনেই আয়নার নিচে একখানি ফটো—বাবলুকে কোলে

নিয়ে রাজ্যশ্রী।

স্কুলে কি একটা বিশেষ অধিবেশনে ফটো তোলার আয়োজন হয়েছিল—মালতী জোর করে ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল তাদের ক্যামেরার সামনে। বলে—"দেখ দিকিন এমন একটা 'ম্যাডোনা'র ছবি র‍্যাফেলও আঁকতে পারে নি"—এক কপি সে নিয়েছে কেড়ে আর এক কপি টাঙানো আছে রাজ্যশ্রীর নিভৃত নীড়ে।

কথাবার্তা বেশীর ভাগই চলছিল বাবলুকে মধ্যস্থ করে...হঠাৎ কি খেয়াল হল সে ছুটে বাগানে গেল ফুল আনতে। উঠো'নর কয়েকটা গাঁদা ফুলের গাছ তার বাগান।

সুজিত একবার লোভীর মত ঘরের চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে অদ্ভুত একটু হেসে বলে—না'মের সঙ্গে তোমার কাজের মিল আছে শ্রী, তোমার রাজ্যের শ্রীটুকু লোভনীয়...একটু জায়গা কি এখানে দিতে পার না আমায়?

রাজ্যশ্রী মাথা হেঁট করে স্টোভে পাম্প করছিল—চায়ের জল চাপিয়ে, চমকে মুখ তুলে চা'ইলে।

পূর্ব কথারই পুনরাবৃত্তি করে সুজিত—একটু ঠাঁই দাও না তোমার আশ্রয়ে, বেঁচে যাই তা'হলে—

—পাগলের মত কথা বোল না—

রাজ্যশ্রী আবার আবদ্ধ কাজে মন দেয়।

—হয়তো পাগলের মতই হল কথাটা—তবু পাগলকেও তো লোকে ভিক্ষা দেয় শ্রী, তাই দা'ও না একবার? জীবনের প্রারম্ভেই যে প্রকাণ্ড ভুলটা করে বসে আছি, একবার সেটা শোধরাবার সুযোগ দাও না?

—বাজে কথা বলে লাভ আছে কিছু?

—লোভ হচ্ছে—আশা হচ্ছে হয়তো কিছু লাভ-ই হবে। সত্যিই তোমার কাছে হাতজোড় করে ভিক্ষা চাইছি, তোমাদের এই স্বর্গে আমায় একটু জায়গা দাও।

—তুমি কি এই অসম্ভব কথাগুলো শোনাবার মতলবেই আজ এলে?

—ও কথা মনে কোর না শ্রী—আহতস্বরে বলে ওঠে সুজিত—কোন মতলব করেই আসি নি আমি। বিশ্বাস করবে কি না জানি না—নিজেই জানতাম না সত্যিই আসব কি না—বাবলুর কালকের সেই কান্না যেন টেনে এনে ফেলল এই পথে। তবু স্বপ্নেও ভাবি নি, এত সৌভাগ্য হবে আমার, তোমার

স্নেহ-সম্ভাষণ পাব—পাব স্বর্গে প্রবেশের অধিকার। সত্যিই বিশ্বাস কর, এই ঘরে এসে এই তোমার সামনে বসে হঠাৎ মনে হচ্ছে—আমি যেন তোমাদেরই একজন। এইখানেই তৈরী আছে আমার সমস্ত প্রয়োজনের উপকরণ। তুমি—যেন বদলাও নি শ্রী, সেই আছ—আর আমিও—ধ্বংস করি নি নিজের জীবনের সমস্ত সুখ শান্তি আরাম আশ্রয়। মাঝখানের দিন ক'টা ভুলে যাওয়া যায় না শ্রী?

—না।

—শুধু একটি অক্ষর? শ্রী কত সহজ তোমার এই নির্বাচন! এক মুহূর্ত ভাবতে হ'ল না!

—এ ছাড়া আর কি আশা করতে পার তুমি?

—আশা? আশার কি সীমা আছে শ্রী? অনেক—অনেক বেশী আশা করতেই বা বাধা কি?

—না, আশা করতে আর বাধা কি।

কথার সুরে মৃদু হাসির আমেজ মিশিয়ে পরিপাটি করে দুটি পেয়ালা চায়ে ভর্তি করে রাজ্যশ্রী...ছোট আর বড়।

—পূর্ণ হবার নয় সে আশা?

—না।

—কি ক্ষতি হয় শ্রী, যদি এতদিন পরে দুজনে ঘর বাঁধি? সেইটাই তো ঠিক ছিল গোড়া থেকে? একটু অসহিষ্ণুতা একফোঁটা অসাবধানে চিরদিনের জন্যে নষ্ট হয়ে যাবে সেই ঘর?

—যাবে? সে তো অনেকদিন আগেই গেছে সুজিত। আবার কবর খুঁড়ে মৃতের সৎকার করতে চাও কেন?

—ভুল মানুষেরই হয় শ্রী, ভগবানের হয় না। এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই প্রথমটা দারুণ অস্বস্তিতে এলোমেলো হয়ে গিয়েছিলাম—চেয়েছিলাম তুমি যেন একেবারে মুছে যাও, নিশ্চিহ্ন হবে যাও পৃথিবী থেকে—আমার অসতর্কতার সমস্ত প্রমাণ নিয়ে। কিন্তু ভুল যখন বুঝতে পারলাম—প্রতিনিয়ত মার খেতে লাগলাম বিবেকের কাছে···তখন এই বিরাট জনারণ্যে হারিয়ে গেছ তুমি। কেউ দিতে পারলে না তোমার কোন সন্ধান···কি জানি ইচ্ছে করেই দিলে না হয়তো। কাল হঠাৎ দৈবের অনুগ্রহে কি নিগ্রহে তা জানি না—আশাতীত দেখা হয়ে গেল তোমার সঙ্গে।...হয়তো না হলেই ভাল ছিল।

—একশ বার। আর কখনও দেখা হয় এও চাই না আমি।

—কি আশ্চর্য নিষ্ঠুর হয়ে গেছ তুমি শ্রী!

—আশ্চর্য? তা হতে পারে। অকারণে এত বড় পরিবর্তন! কি বল?

—অজস্র কারণ থাক, তবু ক্ষমা বলে কি একটা কথা নেই অভিধানে?

—আমার অভিধানে নেই।

—কোনদিনই থাকতে পারে না?

—না।

ততক্ষণে বাবলু এসেছে সার্টের আর প্যান্টের পকেট বোঝাই করে ফুল নিয়ে—এই নাও—এই নাও—

গর্বিতভাবে মুঠো মুঠো ফুল ফেলে দেয় সুজিতের কোলে। নিজের চেষ্টায় মান্যগণ্য অতিথির সম্মান রক্ষার মত কিছু একটা সংগ্রহ করতে পেরে ভারি খুশী সে—দেখ কত্ত ফুল—আরও অনেক—অনেক আছে।

—এই ছেলে, চমৎকার এই ঐশ্বর্য পড়ে গেছে তোমার ভাগে—একেবারে ঠকে তুমি যাও নি শ্রী।

—কিছুতেই এ সন্দেহ তাড়াতে পারছ না কেন তুমি?

অসন্তুষ্ট স্বরে উত্তর করে রাজ্যশ্রী—কেন তুমি বিশ্বাস করবে না আমার কথা? আমি বলছি—তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই ওর, কেউ নয় ও তোমার। এক ফোঁটা দাবী করতে পার না তুমি।

—দাবী! পাগল হয়েছ শ্রী। দাবী করব কোনমুখে? চাইছি দয়া, চাইছি ভিক্ষে, অন্ততঃ তোমার এই পরিশ্রম লাঘব করতে—ওকে মানুষ করে তুলতে যে ভার, এখন থেকে সেইটাই না হয় বহন করতে দাও আমাকে—

—না না না। কেন তুমি বারবার অপমান করছ আমার? অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছু নেই—মানুষকে অপমান করাই যে ধর্ম তোমার।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় সুজিত। বিষন্নহাসি হেসে বলে—ঠিকই বলেছ শ্রী, হয়তো নিজের অপরাধের গুরুত্ব ফিকে হয়ে গিয়েছে বলেই তোমার কাছে এত কথা বলবার সাহস।...তবু কি প্রশ্ন মনে আসছে জান? কালের দরবারে সব জিনিসেরই ক্ষয় আছে, নেই কি শুধু ভুলের? কিন্তু বাবলুকে কিছু দেবার—কোন উপহার, সে অধিকারও বোধ হয় নেই আমার?

—না।

—যদি কোনদিন তোমার মত বদলায়—আমার ঠিকানাটা রাখবে?

না।

সুজিত ঘর ছেড়ে চলে যেতে গিয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ায়···একটু ব্যঙ্গ-হাসি হেসে বলে—একটা কথা আছে জান শ্রী 'কাঙালের বাড়া বেহায়া নেই' কথাটার সার্থক করতে চাইছি, তোমাদের মা ছেলের ওই অপূর্ব ছবিখানা—দেবে ?

—না।

সুজিত চলে গেল।

মিলিয়ে গেল তার গাড়ির ধুলো আর শব্দ।

বাবলু শুয়ে পড়ে হাত পা ছুঁড়ছে—আমি যাব—আমি যাব গাড়িওলাবাবুর সঙ্গে, চলে যাব আমি।···

ফুলগুলো পিষ্ট হচ্ছে তার পদতাডনায়।

চা-টা ঢালা হয়েছিল, খাওয়া হয় নি!

ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে পেয়ালার উপব পড়েছে একটা বিবর্ণ সর।

খাবারের পাত্রটা ঘিরে মাছিদের মহোৎসব।

এখুনি উঠে স্কুলে যাবার আয়োজন করতে হবে—এ যেন কল্পনাও করতে পারে না রাজ্যশ্রী। এইমাত্র যেন ওর জীবনের সব প্রয়োজন নিঃশেষে ফুরিয়ে গেল।···

ক্ষণজাত ?

কথাটা শুনেই নতুন কনে চমকে তাকাল। মেয়েটাকে দেখে পর্যন্তই কেন কে জানে তার কেমন গা জ্বলে যাচ্ছিল, কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরটা জ্বলে উঠল।

অথচ এমন কিছু বিষাক্ত কথা বলে নি অলকা।

কনের ছোট ননদ চামেলীকে উদ্দেশ করে হেসে বলছিল সে—বৌ দেখে বাঁচলাম বাবা চামেলীদি, মণ্টুদার প্রতিজ্ঞাটা রইল তাহলে ?

চামেলী সন্দিগ্ধভাবে বলে—কিসের প্রতিজ্ঞা ?

—ওই যে গো, বরাবর আমাকে শোনাত—'বৌ যা আনব দেখে তাক

'লেগে যাবে তোদের, তুই তার পাশে দাঁড়ালে মনে হবে যেন চাঁদের পাশে জোনাকি!'

ভালই কথা, অলকার মন্তব্যে কনেকে বাড়ানোই হয়েছে, তবু কথাটা যেন নতুন কনে সাহানার কানে বিষ-বর্ষণ করল।

আশ্চর্য! তারপর থেকে কি যে হল সাহানার, চোখ কান মন তার একাগ্র হয়ে রইল কালো রোগা নেহাৎ সাধারণ এই মেয়েটার দিকে।

মেয়েটা যে আত্মীয় বলতে কেউ নয়, এমনি পাড়ার মেয়ে, সে তথ্যও সে সংগ্রহ করে ফেলল কমবয়সী একটা ভাগ্নীর কাছ থেকে।

আশ্চর্য।

সাহানার গাত্রদাহের কারণ হতে পারে এমন কি গুণ আছে অলকার? রূপ গুণ বিদ্যে বুদ্ধি সব দিকেই তো তার নম্বর ত্রিশের নিচে।

আর সাহানা?

বলতে গেলে উপরোক্ত কোন বিষয়েই ষাট-সত্তরের নিচে নম্বর নেই তার। বি. এস. সি পরীক্ষা দিয়ে ছুটিতে বিয়ে হচ্ছে, পড়া আরও অগ্রসর হতে পারবে বর-পক্ষের সঙ্গে এই শর্ত করিয়ে নিয়ে তবে বিয়েতে মত দিয়েছে সে।

ওর পাশে রোগা ময়লা লম্বাটে অলকাকে দাঁড় করিয়ে 'চাঁদের পাশে জোনাকি' বললে কম বৈ বেশি বলা হবে না। মর্যাদাপূর্ণ ভারিক্কি সৌন্দর্য সাহানার, বয়সেও সে-ই বরং দু-এক বছরের বড় হবে।

অবিশ্যি অলকাও কচি খুকি নয়। কিন্তু এতখানি বয়স অবধি সে করেছে কি? ক্লাস এইট্ পর্যন্ত পড়ে পাঠ্যপুস্তক তুলে ফেলে স্কুলের দরজায় প্রণাম ঠুকে চলে এসেছে মায়ের কচি কাঁচা ছেলেমেয়েদের তত্ত্বাবধান করতে, আর সেই পর্যন্ত গোগ্রাসে গিলে আসছে যত সব 'অপাঠ্য কেতাব'। মাত্র একটা লাইব্রেরীতে কুলোয় না, দুটো লাইব্রেরীর মেম্বার সে।

সকাল সন্ধ্যে মায়ের রান্নাঘরের 'কন্না' করে, সারা দুপুর গল্পের বই ধ্বংস করে, আর সুযোগ পেলেই দুরন্ত ভাই বোনগুলোর একটাকে ঘাড়ে করে পাড়া বেড়াতে যায়। সেই সূত্রে পাড়া-সুদ্ধ গিন্নি মহিলারা তার 'মাসী' 'পিসী', পাড়া-সুদ্ধ তরুণ-তরুণী তার 'দাদা' 'দিদি'।

নেহাৎ যাকে একটা 'মেয়ে' মাত্র বলা যায়, অলকা হচ্ছে সেই মেয়ে।

আর সাহানা হল রীতিমত একটি ভদ্রমহিলা।

সেই সাহানার গা জ্বলে গেল অলকাকে দেখে! আশ্চর্য নয়?

গত রাত্রে ফুলশয্যা হয়ে গেছে। বলতে গেলে প্রায় শেষ রাত্রে। ভীষণ ভিড় বাড়িতে।

আজ দ্বিতীয় রাত্রে মণ্টু অর্থাৎ শুভেন্দু নতুন কনের সঙ্গে আলাপ জমাবার উপলক্ষ হিসেবে প্রশ্ন করে—আচ্ছা এ দুদিন তো এ বাড়ির সকলকে দেখলে, কাকে কি রকম লাগল বল ?

সাহানা ঈষৎ বাঁকা হাস্যে ফিরতি প্রশ্ন করে—শুধু বাড়ির ? না পাড়ারও ?

হাসির বাণে বিব্রত শুভেন্দু বোকার মত বলে—পাড়ার কেন ? পাড়ার লোকদের চিনে বেড়াতে কে বলেছে তোমাকে ?

—না চেনাই বাঞ্ছনীয় তাহলে ? কি বল ? কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার দৃষ্টিশক্তিটা এত তীক্ষ্ণ—যাকে চেনবার, বড় চট করে চিনে ফেলতে পারি।

শুভেন্দুও দৃষ্টিশক্তিকে যতটা সম্ভব তীক্ষ্ণ করে বলে—কার কথা বলছ বল তো ?

—বলি নি আমি কারুর কথাই, গায়ে লাগছে কেন তোমার ?

বৌ আর একবাব মুচকে হাসে।

অতঃপর সে রাত্রে আলাপটা আর বেশি এগোতে পারে না। ঘুরে ফিরে বিশেষ একটা সীমায় এসেই যেন ঠোক্কর খায়। বাধ্য হয়ে শুভেন্দু সাহানার স্কুল-কলেজের কথা তোলে, সহপাঠি সহপাঠিনীদের গল্প শোনবার ইচ্ছে প্রকাশ করে, প্রফেসররা কে কেমন পড়ান তার আলোচনা চলে, নিজের ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতার কথা হয়।

উত্তর অবশ্য সব কথারই দেয় সাহানা।

ছাত্রীমহলে সে নিজে যে কি রকম একটি উজ্জ্বল তারকা সে বিষয়ে অবহিত করিয়ে দিতে ছাড়ে না শুভেন্দুকে এবং এরই ফাঁকে এক অবসরে হঠাৎ বলে বসে—এত তো তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করলে, মারাত্মক কিছু একটা আবিষ্কার করতে পারলে ?

—নাঃ, তোমার মনের অবস্থা আজ স্বাভাবিক নেই—বলে ঘুমোবার চেষ্টায় বালিশ উল্টে নিয়ে পাশ ফিরে শুল শুভেন্দু, আর চোখ বুজে খুঁজে বেড়াতে লাগল 'পাড়ার লোক' কথাটার রহস্য।

কী ব্যাপার ? লক্ষ্যণীয় লোকটা কে ? কে হতে পারে ? কী কাণ্ড। তাই নাকি রে বাবা !...আরে ধ্যেৎ, এত পাগল আর এত বোকা কখনও হতে পারে সাহানা ? বি. এস. সি-পরীক্ষা-দিয়ে আসা ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্রী সাহানা রায় ! যে কন্যাকে লাভ করে ধন্য হয়ে গেছে শুভেন্দু! যাকে আহরণ করে আনতে

পারার গৌরবে বন্ধুমহলে ঈর্ষার পাত্র হয়ে উঠেছে সে।

সকালবেলা ঘর থেকে বেরোবার আগে বিদায়পর্বের বেলাতেও যেন একটু দূরত্ব বজায় রেখে দেয় সাহানা। অনুযোগ করা চলে না এমন একটু দূরত্ব, ধরা ছোঁওয়া যায় না এমন একটু কাঠিন্য।

খানিক পরে শুভেন্দুকে দেখা যায় অলকাদের রান্নাঘরের দালানে। দ্রুত হস্তচালনায় আলু ছাড়াচ্ছিল অলকা, শুভেন্দুকে দেখে কলরব করে ওঠে—ও মা দেখ নতুন মানুষ এসেছে তোমার বাড়িতে। কী মণ্টুদা, নতুন কনের আওতা ছেড়ে হঠাৎ এদিকে?

কেন কে জানে, অলকার দুগাছামাত্র চুড়িপরা গৃহকর্মনিরত রোগা রোগা হাত দুখানার সঙ্গে সাহানার কারুকার্যময় উজ্জ্বল স্বর্ণালঙ্কারমণ্ডিত নিটোল মোলায়েম সুগৌর হাত-দুখানির তুলনা মনে এসে যায় শুভেন্দুর।

মনের কথা থাক, মুখে সেও মুখর হয়ে ওঠে—এদিক ওদিক না করে উপায়? কী মারাত্মক কথা বলে এসেছিস আমার বৌকে?

—ওমা! মারাত্মক আবার কি বলব গো! তোমার বৌকে তো একেবারে 'ধন্যি ধন্যি' করে এসেছি! কেন ব্যাপার কি?

শুভেন্দু অবশ্য ওপর-চালাকিই করে—ধন্যি ধন্যি করে এসেছিস? তাহলে আমার বৌ তোর 'ছিছিক্কার' নিন্দে করল কেন?

অলকা গায়েও মাখে না কথাটা, বরং হেসে বলে—কি যে বল! আমি তোমার মহীয়সী বিদুষী ভার্যার সমালোচনারই যুগ্যি না কি? সব তোমার কবি-কল্পনা মণ্টুদা!

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসেন অলকার মা। বলেন—কি গো বাবা, বিয়েবাড়ি ছেড়ে এ বাড়িতে?

—এই দেখুন না কাকীমা, একটু বেড়াতে এসে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে মারা গেলাম বিয়েবাড়ির ভিড় আর গরমে হাঁপিয়ে যাচ্ছিলাম!

সহজেই কথাটা বিশ্বাস করেন অলকার মা।

যদিও সকালবেলা কাজের সময়, তবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সস্নেহ-ভাষণে নতুন শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে দু'চারটি তথ্য জিজ্ঞাসা করেন, কুটুম্বদের আক্কেল-বিবেচনার ভূয়সী প্রশংসা করেন, বৌয়ের রূপগুণের কথা আবার উল্লেখ করেন।

দুষ্টুহাসি হেসে অলকা বলে—এতক্ষণে বুঝেছি মণ্টুদার হঠাৎ শুভাবির্ভাব

কেন? সকালবেলা একটু 'শ্রীমতী চরিতামৃত' শোনবার আশায়!

—যা যা ফাজিল মেয়ে—বলে মা চলে যান।

মণ্টুর মনে হয় সত্যিই যেন আগের থেকে একটু বেশী ফাজিল লাগছে অলকাকে একটু বেশী বাচাল। জানে না এইটাই স্বাভাবিক। অতি গোঁড়া বাড়িতেও সচরাচর এমন দেখা যায়। নতুন বিবাহিত বরকনেকে উপলক্ষ করে তরুণী মেয়েরা বাচালতার একটা ছাড়পত্র পেয়ে যায় এবং তার সদ্ব্যবহার করতেও ছাড়ে না তারা।

তেমন ক্ষেত্রে হঠাৎ মেয়েগুলো যেন নতুন করে চোখে পড়ে। মনে হয়—এ আবার এত কথা জানে! এ আবার এ সব কথা শিখল কখন?'

আচার অনুষ্ঠানেব শেষ নেই।

কনে দুচারটে পাশ করে সংস্কারমুক্ত হয়ে থাকুক আর যাই হোক, এ বাড়ির নিয়ম কানুনগুলো আপাততঃ সবই মানতে হয়।

'সুবচনী' 'সত্যনারায়ণ' 'কালীঘাট' ইত্যাদি সব কিছুই করেন শুভেন্দুর মা। এই উপলক্ষে নিকটতম প্রতিবেশী অলকার মার ঘন ঘন ডাক পড়ে, অলকাও আসে সঙ্গে সঙ্গে।

আসবে না কেন, পাড়ার সব বাড়িই তো তার নিজের বাড়ি।

মেয়েটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে সাহানা তিক্তদৃষ্টিতে, কথা কইলে উত্তর দেয় আরও তিক্ত ভঙ্গীতে।

তবে মজা এই—অলকা গায়েও মাখে না। নাকি বুঝতেই পারে না? একেবারে পারে না, তাই বা বলা যায় কই? দিব্যি হেসে হেসে বৌয়ের কর্ণগোচরীভূত হতে পারে এমন স্বরে বলে—খোঁজ নিও তো চামেলীদি নতুনবৌদি ম্যালেরিয়ায় খুব কষে ভুগে এসেছে কি না। কুইনাইনের গুণটা যেন এখনও রয়ে গেছে ভেতরে।

চামেলী হেসে বলে—ঘুরিয়ে ভিন্ন কথা বলতে জানে না ছুঁড়ি।—বৌ যা এনেছি আমরা, বাজারের সেরা, বুঝলি?

কিন্তু বিপদ ঘটেছে শুভেন্দুর।

ও বেচারা আর কিছুতেই অলকার কাছে আগের মত সহজ হতে পারছে না। সাহানার সামনে তো নয়ই। আবার সেই সহজ হতে না পারার খেসারত দিতে, অভদ্রতাটা মেকআপ্ করে নিতে, থেকে থেকে ছুটতে হচ্ছে তাকে

অলকাদের বাড়িতে, যা হোক একটা ছুতো নিয়ে।

অলকা হাসে আর বলে, সামনাসামনিই বলে—মণ্টুদার ভাবখানা কি জান মা, লোককে দেখান—'দেখ আমি বড়লোকের জামাই হয়ে কিছু বদলাই নি। বরং আরও সামাজিক আরও সাদাসিধে হয়ে গেছি।'

মেয়েকে তাড়না দেন অলকার মা। আবার মনকে নিশ্চিন্ত রেখে চলেও যান সংসারের কাজে।

পাড়ার বড় বড় ছেলেমেয়েগুলোর বিয়ে হয়ে গেলে অপর বড় বড় ছেলেমেয়েদের মায়েরা যেন খানিকটা হাঁফ ফেলে বাঁচেন। পাহারা দেওয়ার কাজটা কমে। বিয়েটা হয়ে গেছে, আশঙ্কা-প্রুফ্ হয়ে গেছে!

হয়তো অনেকক্ষণ পরে এসে দেখেন, দিব্যি গল্প চালাচ্ছে দুজনে। ভাবেন, নতুন বৌয়ের গল্পগুলো একটা কারুর কাছে উজাড় না করে বাঁচছে না বেচারা! ভাবেন আর হাসেন।

কে জানে অলক্ষে আর কেউ হাসে কিনা!

হাসে না শুধু সাহানা। দেখে শুনে মনে হয় হাসতে বুঝি শেখে নি।

প্রথমটায় বিদুষী বৌ বলে তেমন সমীহ কেউ করতে যায় নি, দু-দশটা পাশ আজকাল আর কে না করছে? চামেলী শেফালী না করুক, ওদের ভাসুরঝি ভাগ্নীরা তো করছে! কিন্তু বৌয়ের গাম্ভীর্যের বর্মের ঠেক খেয়ে সকলেই ধীরে ধীরে সমীহ করতে শুরু করে। বর পর্যন্ত।

অথচ এত ভদ্র সভ্য মার্জিতভাব সাহানার, নিন্দে করবারও কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না।

এখনকার বড় সড় মেয়ে, অষ্টমঙ্গলায় দুদিনের জন্যে বাপের বাড়ি ঘুরে এসে আবার ঘর করছিল। মাস-দেড়েক পরে পাকাপাকি ভাবে বাপের বাড়ি ফেরার তোড়জোড় সুরু হল। কলেজের খোঁজ খবর নিতে হবে। ভর্তি হবে পোষ্টগ্র্যাজুয়েট ক্লাসে।

শুভেন্দু মুখ শুকিয়ে ঘুরঘুর করে বেড়ায়। একসময় বলে—কিছুতেই কেন তোমার কাছাকাছি পৌঁছতে পারলাম না সাহানা, তাই ভাবছি।

সাহানা সুটকেস গোছাতে গোছাতে মুখ না তুলেই বলে—তার খুব বেশী প্রয়োজনই বা কি? আচার অনুষ্ঠানের কাছি দিয়ে দুজনকে একসঙ্গে বেঁধে দিলেই যে কাছাকাছি হতে পারা যাবে, এমনই বা আশা করছ কেন?

শুভেন্দু কিছু আর বিয়ের বৌয়ের চাইতে খাটো নয়, কিন্তু কথায় হেরে যায় সব সময়।

অবিশ্যি মেয়েদের কাছে কথায় জিততে পুরুষজাতি কবে কোথায় পেরেছে ? বড় জোর জিততে পারে ধমকের দাপটে চুপ করিয়ে দিয়ে। সভ্য সমাজে সে পদ্ধতি অচল।

বৌয়ের সঙ্গে সঙ্গে শুভেন্দুও পৌঁছে দিতে যাবে, এটা বাড়ির সকলে তো বটেই, বৌ নিজেও আশা করেছিল, কিন্তু সকলের আশায় ছাই দিয়ে শুভেন্দু রয়েই গেলো বাড়িতে।

চামেলীও আগামীকাল শ্বশুর বাড়ি যাবে, মন খারাপ, তবু ফিকে হাসি হেসে বলে—ছোড়দার বুঝি বিরহের জ্বালায় হাত পা উঠলই না ? তা যাও শ্রীমন্দিরে গিয়ে শুয়ে পড় গে ? এখনও শ্রীমতীর সৌরভ ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—উঃ, কী ইয়ারই হয়েছিস তোরা আজকাল !

হাসতে হাসতে বোনের মাথায় একটা টোকা মেরে চলে যায় শুভেন্দু। মিনিট দুই পরে বলে যায়—যাই একটু ঘুরে আসি।

একটু ঘুরতে আর কোথায় বা যাবে—দুখানা বাড়ির পরেই যখন একটা চেনা বাড়ি রয়েছে ?

অলকা বলে—তোমার আজকাল কি হয়েছে গো মণ্টুদা ? খুব যে ঘন ঘন আগমন ?

শুভেন্দু গম্ভীরভাবে বলে—কেন, এলে দোষ হয় ?

—সে কি গো, দোষ কিসের ! হঠাৎ এত দয়া কেন তাই ভাবছি।

ফস করে বলে বসে শুভেন্দু—ধর তোকে দেখতে আসি। বিশ্বাস হয় না ?

সামান্য থতমত খেয়েই সামলে নেয় অলকা, মৃদু হেসে বলে—খুব হয়। অবিশ্বাসের কি আছে ? পূর্ণিমার মাহাত্ম্য বাড়াবার জন্যেই তো অমাবস্যার দরকার।

হঠাৎ ওর একটা হাত ধরে ফেলে শুভেন্দু গম্ভীরভাবে বলে—এত কথা কবে শিখলে ফাজিল মেয়ে ?

হাতটা ধরে মনে হয় রোগা গড়নের হাত বেশ সহজে আয়ত্ত করা যায়। নিটোল ভারী ভারী হাতে হাত ঠেকলে যেন নিজেকে বড় ক্ষুদ্র বলে বোধ হয়।

অলকা হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে, সহজে পারে না। হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত কাণ্ড করে বসে।

—আঃ, ছেড়ে দাও বলছি, খেলার পুতুল পেয়েছ নাকি—বলেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে।

এর পর ঘটনার গতি দ্রুত।

বাঁধ-ভাঙা নদী উদ্দাম হয়ে ওঠে কূলহারানো বন্যার বেগে।

একদিন তুচ্ছ একটা কারণে শুভেন্দুর মা বাড়ি বয়ে এসে অলকার মায়ের সঙ্গে বচসা করে যান, অলকার মাও বেশ দুকথা শুনিয়ে দেন।

অলকার পথে বেরোন বন্ধ হয়, সাহানাকে আনাবার জন্যে শুভেন্দুর বাপ বেয়াইকে চিঠি লেখেন।

আরও কদিন পরে অলকাদের উঠে যেতে দেখা যায় এই পাড়া থেকে। আরও গম্ভীর হয়ে বরের ঘর করতে আসে সাহানা। অনেক কিছুই কানে গেছে তার।

আর এরও কিছুদিন পরে দেখতে পাওয়া যায় পশ্চিমের একটা অখ্যাত শহরের নিতান্ত শ্রীহীন ওয়েটিঙ্-রুমে দুখানা লোহার চেয়ার পেতে বসে প্যাকিং বাক্সের টেবিলে রেখে চা খাচ্ছে দুটি অ-সম প্রাণী।

ছেলেটি সুন্দর সুকান্তি। বেশভূষায় আভিজাত্যের ছাপ।

মেয়েটা রোগা কালো, পরণপরিচ্ছদে পারিপাট্যের নিতান্তই অভাব। তবু সব ত্রুটি তার পুষিয়ে গেছে বোধ হয় মুখের ঔজ্জ্বল্যে।

খালি পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ছেলেটি বলে—আশ্চর্য! মানুষের কাছে সব থেকে অপরিচিত বোধ হয় নিজের মনটা! তাই না?

মেয়েটি বলে—কি জানি, হয়তো অপরিচিত নয়। পরিচয় প্রকাশ হয়ে যাবার ভয়ে, চোখ বুজে মনটাকে অস্বীকার করতে চেষ্টা করে মানুষ।

ছেলেটি একটা নিঃশ্বাস ফেলে আত্মগতভাবে বলে—মাঝখানের ব্যাপারটা যদি না ঘটত!

মেয়েটি রুদ্ধশ্বাসবক্ষে মনে মনে ভাবে সে ব্যাপারটা না ঘটলে, হয়তো এ ব্যাপারটাও ঘটত না!

কে জানে ওর ধারণাটাই ঠিক কিনা!

মুখ্যু হোক, অতি সাধারণ হোক, জাতটা যে ভয়ঙ্কর! সহজাত বুদ্ধিতে বুঝে ফেলে অনেক কিছু।

কে জানে—সহজাত নারীপ্রকৃতির বশে ছাই-চাপা আগুনটাকেই আবিষ্কার করে বসেছিল সাহানা, না অবিশ্বাস আর অবহেলার অরণি কাঠে নিজেই সে আগুনকে সৃষ্টি করল।

নিঃশঙ্ক শিশুকে একবার ভূতের ভয় দেখালেই যে সে অবিরত ভূত দেখতে শুরু করে এ জ্ঞান বোধ হয় ছিল না সাহানার।

অপমান

কবে কোথায় যেন একবার দুজনের দেখা হয়েছিল। পৃথিবীর এই বিশাল জনারণ্যে এমন তো কতই হয়। কত ভীড় কত মুখ—কে কাকে চিনে রাখে, কে কাকে মনে রাখে?

সেদিন দুজনের মধ্যে হয়তো কথা হয়েছিল, হয়তো কথা হয় নি। যদি হয়ে থাকে তো, সে কথা নিতান্তই সাময়িক প্রয়োজনের তুচ্ছ কথা, সে কথাকে মনে রাখবার কথাই ওঠে না। যদি না হয়ে থাকে তো, বুঝতে হবে, সে তুচ্ছ প্রয়োজনটুকুরও প্রয়োজন হয় নি। চেষ্টা করে প্রয়োজন ঘটাবে এমন দায় পড়ে নি কারুর। তবু দেখা-মুখ দেখেই চিনতে পারা যায়।

লোহার রেলিঙ্ দেওয়া বড় গেট্টার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছিল নিবেদিতা। খবরের কাগজে চাকরীর বিজ্ঞাপন দেখে, ঠিকানা মিলিয়ে রাস্তা খুঁজে এসেছে, ধারণা করতে পারে নি এত বড় বাড়ি। ঢুকতে সাহস হচ্ছে না এখন।

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে যে বাড়ির দরজায় ধাক্কা মারা যায়, তার দরজাটা খোলা পেলেই ঢুকে পড়া যায় বিনা দ্বিধায়।···কিন্তু—দুইটি করে খোলা দরজার সামনে যেখানে খাড়া করা থাকে সারি সারি লোহার শিক সাজানো আর একটা ফাঁকা দরজা, তার ফাঁক দিয়ে চট করে ঢুকে পড়া শক্ত! ঢুকতে গেলে ভাবতে হয়, ইতস্ততঃ করতে হয়।

সেই ইতস্ততের ছাপ পড়েছে নিবেদিতার মুখে। ঢুকবে, না ফিরে যাবে? চাকরীটা যদি হয়ে যায় তাহলে তো প্রতিদিন ঢুকতে হবে, একবার করে! সম্ভব হবে তো?

প্রত্যহ কি জুটবে এমন ধোপদস্ত শাড়ি, বাক্সে-তুলে-রাখা সবচেয়ে ভাল ব্লাউসটি ইণ্টারভিউ দিতে আসবে বলে যে সেট্‌টি অনেক দিনের অনেক প্রলোভন জয় করে বাঁচিয়ে রেখে এসেছিল ?

নেহাৎ সাদাসিধে কম দামী ভ্যানিটি ব্যাগটা ছিল বাঁহাতে ঝোলানো, অকারণে ওর মুখটা খুলে নিবেদিতা দুটো আঙুল ঢুকিয়ে একবার ভিতরের কাগজপত্রগুলো অনুভব করে নিল। এরা যে আসতে বলেছে তার প্রমাণ পত্র রয়েছে ওর মধ্যে।

ঠিক এই সময় লোহার গেট ঠেলে বেরিয়ে এল অনিরুদ্ধ।

একসঙ্গেই দুজনের মুখ থেকে উচ্চারিত হল—'আপনি এখানে' ?

পরবর্তী কথা আবার নিবেদিতাই বলল। হাতের ব্যাগটা দোলাতে দোলাতে বলল—আমি তো এসেছি চাকরীর ধান্ধায়। আপনি ?

—দৈবক্রমে এখানেই বাস করতে হয়, এই আর কি।

—এই আপনার বাড়ি না কি ?

নিবেদিতা প্রায় মূর্ছা যায়।

'—আমার বাড়ি' বলাটা হাস্যকর। এখানে থাকি এই মাত্র।

আশ্বস্ত হল নিবেদিতা।

বোঝা যাচ্ছে অনিরুদ্ধ ওরই সগোত্র। হয়তো এবাড়ির ছেলেদের গৃহশিক্ষক।

—কিন্তু আপনি ? আপনাকে এখানে চাকরী দিচ্ছে কে ?

—কে তা জানি না। দিচ্ছে কিনা তাও জানি না, তবে ডাকা হয়েছে। জেনেছি 'মহিলা টাইপিস্ট আবশ্যক' বিজ্ঞাপনদাতা সুজিত মল্লিক।

—ওঃ ! বুঝেছি।

—কিছু জানেন নাকি ?

—সামান্য সামান্য ! গৃহকর্তার শখ বাঙলা সাহিত্যকে ইংরেজিতে তর্জমা করবেন, তাই এই বিজ্ঞাপন।

—তাইতো ! তাহলে ? পারব তো ?

—মেয়েরা সবই পারে। কিন্তু একটি কথা, আমার নামটা উল্লেখ করবেন না। তাহলে চাকরী পাওয়া শক্ত।

—কেন বলুন তো ?

—সে এক অবোধ্য রহস্য।

—বেরুচ্ছেন নাকি ?

—বেরোচ্ছিলাম বটে !

—ভেতরে চলুন না আমার সঙ্গে !

—কেন, ভয় করছে নাকি ?

—ভরসাও খুব হচ্ছে না। যা বড় বাড়ি !

—বাড়ি বড় হলে তার মানুষগুলো ছোট হয়, এই বোধ হয় আপনার ধারণা ? অবশ্য খুব ভুল ধারণাও নয়।

—এই দেখুন কি মুস্কিল! অনেকদিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা হল। কিন্তু—কুণ্ঠিত একটি হাসির সঙ্গে কথাটা শেষ করে নিবেদিতা—নাম ভুলে গেছি আপনার !

—মুখ মনে রেখেছেন এই যথেষ্ট ভাগ্য। আমি কিন্তু নাম ভুলি নি।

—দেখছি আমার ভাগ্যটা জোরালো।

—তবে আর কি, ভাগ্যের ভরসায় ঢুকে পড়ুন, লেগে যাবে চাকরি।

নিবেদিতা একটু ইতস্তত করে বলে—আপনার সঙ্গে এখন আর দেখা হবে না বোধ হয় ?

অনিরুদ্ধ একটু হেসে বলল—ঘুরে আসুন না, আছি কাছে-পিঠে।

চাকরি হতে আটকাল না।

কারণ নিবেদিতার সংসারে প্রয়োজন প্রবল, শর্তের সুবিধে-অসুবিধের দিকে তাকাবার অবসর ওর নেই।

আর এই যাওয়া-আসার সূত্রেই ধীরে ধীরে অনিরুদ্ধর সঙ্গে আলাপ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে, ঘনিষ্ঠতা পর্যবসিত হয় নিবিড় অন্তরঙ্গতায়। যদিও অনিরুদ্ধর এখানে থাকাটাকে নিবেদিতা খুব বেশি সমর্থন করে না। কারণ গৃহ-শিক্ষকের পদমর্যাদাও এখানে নেই অনিরুদ্ধর। অনিরুদ্ধর এড়িয়ে যাওয়া কথা থেকে এইটুকুই ধরতে পারা যায়—কেবলমাত্র আশ্রিতের দাবী ছাড়া আর বিশেষ কোন দাবী ওর নেই এ-বাড়িতে।

তবু অভাবগ্রস্তের সঙ্গে অভাবগ্রস্তের যত তাড়াতাড়ি বন্ধুত্ব হয়, হৃদয়গত আর-কোন মিলেই বোধ হয় তেমন হয় না।

বাড়িতে দেখা অবশ্য কমই হয়।

দৈবাৎ কোনদিন দরজার কাছে বেরোতে আসতে, কারণ অনিরুদ্ধর কাজ হচ্ছে

টো-টো কোম্পানীর ম্যানেজারি। দেখা হয় শহরের অন্যত্র যেখানে সেখানে। সেটা দৈবাতের ঘটনা নয়, ঘটানো ঘটনা।

দেখা হল—কলেজ স্ট্রীটে বইয়ের দোকানের আশে-পাশে।

নিবেদিতা একগাল হেসে বলল—আপনি ?

—আর বলেন কেন, বাতিক। সেই কাল যে বইটার কথা বলছিলাম ?

—পেয়েছেন ?

—হুঁ।

—কিন্তু প্যাকেটটা তো বেশ মোটা-সোটা দেখছি ? আরও বই আছে বুঝি ?

—হুঁ দেখুন না।···দোকানির হাতের বাঁধা নিখুঁত প্যাকেটটি নির্মম টানে খুলে ফেলে অনিরুদ্ধ।

—আরে, এ-বই আপনি কিনলেন যে ? আমিই তো বলছিলাম—

—আপনার জন্যেই তো কিনলাম!

মুখ লাল হয়ে ওঠে নিবেদিতার—না না, এ কিন্তু আপনার ভারি অন্যায়! কেন মিথ্যে মিথ্যে এত খরচ করলেন ?

—গরীবের এটুকু বিলাসিতা করবার অধিকারও নেই ?

—আঃ—তা কেন, বাঃ! কিন্তু দেখুন আপনার হয়তো এর জন্যে কত অসুবিধেয় পড়তে হবে!

অনিরুদ্ধ মৃদু হেসে বলল—'অসুবিধে' জিনিসটার কোন মাপকাঠি আছে ? ওটা আপেক্ষিক। যাক ভাগ্যক্রমে যখন দেখাই হয়ে গেল, পার্কে গিয়ে বসি চলুন। উপহার কার্যটি ওখানেই সারা যাক।

পার্কে একটা বেঞ্চে বসে অনিরুদ্ধ কলমটা হাতে নিয়ে বলে—যা ইচ্ছে হচ্ছে লিখি ?

—তার মানে ? সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায় নিবেদিতা—'যা-ইচ্ছে'র অর্থ ?

—অর্থ খুব প্রাঞ্জল।

—না না ওসব চলবে না। শুধু নাম। শুধু নাম।

—বেশ।···কলমটা বাগিয়ে ধরে অনিরুদ্ধ।

—আপনার কলমটা কিন্তু রীতিমত দামী। আসলে আপনি খুব শৌখিন।

—বেকারদের প্রাণে মাঝে মাঝে এমন একটু-আধটু শখ জাগে।

—বেকার বেকার বলে ধিক্কার কেন ? চেষ্টা করলেই তো—আরে আরে

ওকি লিখলেন ? কী সর্বনাশ, এ আবার কি ?

—কি আবার ? 'নিবেদিতাকে নিবেদন।' ভুল হয়েছে কিছু ?

—ভুলের কথা হচ্ছে না।

—তাহলে ধৃষ্টতা ?

—কিছু নয়। এত বাজে কথা বলেন! মুস্কিল হল কারুর হাতে দেওয়া যাবে না।

—নিভৃতে একাকিনী পড়বেন।

বইয়ের গল্প থেকে বাড়ির গল্প, সংসারের গল্প, ভবিষ্যৎ জীবনের গল্প।

কথার ধরণ শুনলে মনে হয় দুজনের ভবিষ্যৎ জীবন বুঝি একসূত্রে গাঁথা। আর সে সব খবর ওদের জানা।

হয়তো কোনদিন চলে যায় শহর ছাড়িয়ে শহরতলীতে। এখানে সেখানে। যেখানে সবাই যায় সেখানে, যেখানে কেউ যায় না, হয়তো বা সেখানেও।

নিবেদিতা বলে—আজকের খরচটা কিন্তু আমার।

অনিরুদ্ধ গম্ভীরভাবে বলে—বরদাস্ত করতে পারব না, পৌরুষে ঘা লাগবে।

—কিন্তু দেখুন, তাহলে তো এ রকম আসাই চলে না। আপনি সব সময় এ ভাবে—

—তা একটু কষ্ট করতে দাও না! সেকালের বীররা কত কষ্ট সইত। আর এ-কালের হতভাগ্যের একটু কৃচ্ছ্রসাধন করাও চলবে না ? ভারি নির্দয় তুমি।

'তুমি' সম্বোধনটা কানে বাজল।

বাজের মত নয়। বাঁশীর মত।···

অবশেষে রফা হয়—দুজনেব খরচে হোক।

কোনখানে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে।

একজনের কোলে ডালমুটের ঠোঙা, অপরজনের কোলে কবিতার বই।

বাড়িতে নিবেদিতার মার চোখ এড়ায় না মেয়ের ভাব-বৈচিত্র্য। মেয়ের রোদে ঘোরা খেটে-খাওয়া নীরস চেহারায় হঠাৎ লালিত্যের ছাপ কেন ?

বিশ্বের অবসাদ আর ক্লান্তি মাখানো দুই চোখে নতুন ঔজ্জ্বল্য কিসের ?

বাড়িতে অনুপস্থিতির সময়টা প্রায়ই বেড়ে যাচ্ছে।

একদিন খেতে বসে জেরা সুরু করলেন মেয়েকে।

—যেখানে কাজ করিস, সে কর্তা লোক কেমন রে ?

—লোক কেমন তা আমি কি করে জানব ? আমার সঙ্গে কাজের সম্পর্ক, কাজ করে যাই, ব্যস !

মা মনে মনে বললেন—'হুঁ' ! মুখে বললেন—তবু—কথায় বলে 'মনিব'। ব্যবহার ভাল-মন্দ বোঝা যায় না ?

—ব্যাভার ? নিবেদিতা হেসে ফেলে—খুব ভাল। অতটা ভাল না হলেই বোধ হয় ভাল হত।

হুঁ, 'পথে এসো' !—হ্যাঁরে তা বয়েস কত ?

—কে জানে পঞ্চাশ ষাট হবে হয়তো।

—শোন কথা ! পঞ্চাশ আর ষাট এক হল ?

—কে জানে বাবা, বুড়োদের বয়েস বোঝা যায় না !

এই তাচ্ছিল্যের ভাবটাই সন্দেহজনক।

মা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক প্রশ্ন করেন এবং প্রায় নিঃসন্দেহ হয়ে রায় দেন—ও কাজটা ভাল নয়, আর একটা ভাল কাজ-কর্ম খোঁজ।

যেন ভাল জিনিসের প্রাচুর্য পৃথিবীতে এত বেশী।

কিছুদিন বাদ আর একদিন তিনি ধরলেন মোক্ষম করে।

দেখলেন মেয়ের চির অভ্যস্ত সাদাসিধে সাজসজ্জায় লেগেছে রঙের ছাপ। অনেকদিন নীরব-হয়ে-যাওয়া কণ্ঠে সঙ্গীতের গুঞ্জরণ।

অবিবাহিত চাকরে মেয়েছেলে হঠাৎ শৌখিন হয়ে গেলে ভয় করবে বৈকি। সারা সংসার যার মুখ চেয়ে বসে, সে যদি সহসা নিজের মুখ চাইতে শুরু করে সংসার দাঁড়াবে কোথায় ?

কলঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই দামী সাবানের গন্ধটা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে !

তের বছরের মেয়ে সবিতার সঙ্গে অর্থপূর্ণ একটা দৃষ্টি-বিনিময় হয়ে গেল মায়ের।

—নিবু আজকাল কি সাবান মাখিস রে ? সুগন্ধে বাড়ি ভরে গেল !

নিবেদিতা একটু কুণ্ঠিত হাসি হেসে বলে সাবানটা এবার একটু দামীই কেনা হয়ে গেছে মা।

—শুধু সাবান কেন, নজরটা তোর আজকাল খুব লম্বা হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি !

অবিশ্যি নিজের বেলায়—সবিতা ফোড়ন কাটল !

অবাক হয়ে যায় নিবেদিতা ছোটবোনের স্পর্ধা দেখে। সবিতাই না স্কুলের মাইনে বাকী পড়ায় অপমানিত হয়ে এসে দিদির কাছে কেঁদে পড়েছিল ? দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে একটা আধপাগল বুড়োর খেয়ালের খেলার চাকরী নিয়ে বসার প্রধান কারণটাই ত নিবেদিতার তাই।

—খোকার জন্যে একটা টনিকের কথা কতদিন বলছি তা আর ফুরসুৎই হয় না তোর। তাকিয়ে দেখেছিস কোনদিন ছেলেটার দিকে ? এদিকে ত দেখি শাড়ির ওপর শাড়ি কিনছিস। অবিশ্যি তোমার রোজগারের টাকা। এদিক ওদিক বলতে আমার মাথাটা কাটা যায়। ছেলে নয় যে জোর আছে। মেয়ে সন্তান পর হয়েই জন্মায়।...

একসঙ্গে এর বেশী আর বলেন না।

বলবার দরকারই বা কি ? এইটুকুই ত যথেষ্ট।...ওপক্ষ থেকে উত্তরটা কি আসে দেখা যাক।

না। লজ্জিত উত্তর এল না নিবেদিতার কাছ থেকে।

সম্মুখবর্তিনীদের ওপর বজ্রাঘাততুল্য একটি কথা বলে ঘরে ঢুকে গেল সে ...হয়তো এক মিনিট আগে একথা নিজেও ভাবে নি।

—মেয়েসন্তান যে পর সে কথা যখন জানই মা, তখন আর আশা কিসের ? কদিনই বা আর তোমাদের উপকার করতে পারব। শীগ্‌গিরই বিয়ে করব আমি।

'বিয়ে করব।'

এ কি অদ্ভুত কথা উচ্চারণ করে বসল নিবেদিতা ?

কাকে বিয়ে করবে ? বেকার, বাকসর্বস্ব, পরাশ্রিত অনিরুদ্ধকে ? তাছাড়া আর কার ভরসায় এমন কথাটা বলে বসল ?

না কি মায়ের ওপর আক্রোশের বশে সেই অতি আগ্রহশীল আধপাগল বুড়োটার কথাতেই সম্মতি দিয়ে বসবে ? কাজের ছুতোয় ছলে-কৌশলে অবিরত যে নিজের আবেদন জানিয়ে জানিয়ে জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে নিবেদিতার। প্রতিদিন তো ইচ্ছে হয় ছেড়ে দিই চাকরী। সংসারের প্রতি দায়িত্বের বশেই তো আবার পরদিন সব ঝেড়ে ফেলে যেতে হয়।

অথচ সেই কষ্টের টাকায় নিজের তার এতটুকু দাবি নেই ? পৃথিবীটা কি স্বার্থপর।

বিরক্তি-তিক্ত মন নিয়ে বেরিয়েছিল···সেই প্রথম দিনের মত গেটের কাছে দেখা।

অনিরুদ্ধর মুখে আনন্দের দীপ্তি।

—সিনেমা যাবে ?

—না।

—আধাআধি খরচে ? আমারটা তুমি, তোমারটা আমি ?

—ওসব ছেলেমানুষীর আর কোন মানে হয় না। সংসার জায়গাটা বড় বাজে।

—কি হল হঠাৎ ?

—পথে দাঁড়িয়ে অত কথা হয় না।

—তবে চলো বাড়ির মধ্যে। তোমার বড়বাবু আজ অনুপস্থিত।

—কী ভাগ্যি !

—ওটা বুঝি ভাগ্যের ব্যাপার ?

—বিলক্ষণ। বুড়ো তো আমাকে জালিয়ে খেল। হাসি এবং বিরক্তি দুটো চেপে কি করে যে কাজ করে যেতে হয়।···কি হল ? শুনে আপনার রাগ-টাগ হল নাকি ?···কি জানি আপনার যে আবার কি রকম আত্মীয় হন উনি, তা মনে ছিল না।

—না না তার জন্যে কি। অন্যের মুখ চেয়ে নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে ভয় পাবে কেন ? কিন্তু এইটাই কি তোমার বিরক্তির একমাত্র কারণ ?

—ঠিক তা নয় !···আসলে কি জানেন পৃথিবীর সবাই স্বার্থপর।···নিজের বাড়িতেই আমার যে ব্যবহার পেতে হয়, শুনলে বিশ্বাস করতে পারবেন না।

ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ বাড়ির সব কথা বলে বসে নিবেদিতা, বলে বসে রাগের মাথায় মায়ের কথার উত্তরে কি বলে বসেছিল।

হঠাৎ অনিরুদ্ধ রুদ্ধকণ্ঠে বলে বসে—রাগের কথাটাই সত্যি হোক না নিবেদিতা ?

—তা আর নয় ! বিয়ে করলে আমি আর খেটে খাব ভেবেছ ? খাওয়াবে কোথা থেকে ?

—যাবেই জুটে। যেমন করে হোক জোটাব। তবে এ চাকরীটা করতে দেব না নিশ্চিত।

—কেন বুড়োকে ভয় ?

—থাক নিবেদিতা, ও প্রসঙ্গটা বিরক্তিকর।

—তুমি তো থাক পরের বাড়িতে, রাখবে কোথায় আমাকে ?

—সব ঠিক হয়ে যাবে নিবেদিতা।

—আইডিয়াটা মন্দ নয়। একজন কানা, একজন অন্ধের ঘাড়ে চাপবে। কিন্তু আশ্চর্য, কিছু যে কর না তার জন্যে কোন বিকার নেই কেন তোমার ?

—একেবারে যে কিছু করি না তাই বা কি করে বলি। রোজ একবার করে য়্যাটর্নি অফিসে হাজরে দিই।

—য়্যাটর্নি অফিসে ? য়্যাটর্নিশিপ পড় তুমি ?

—অন্ততঃ সে খাতায় তাই আছে।

নিবেদিতার কাছে এ সংবাদটা প্রীতিকর হওয়াই উচিত ছিল। কারণ এ সংবাদের মধ্যে রয়েছে তারই ভবিষ্যতের আশা। তবু যেন সুখী হতে পারল না সে! বরং একটু আহতই হল।···বেকার বাউণ্ডুলে ছন্নছাড়া লোকটা যে অন্তরঙ্গতার সুযোগ পেয়েছিল সেটায় চিড খেল। বললে—আশ্চর্য! এ-কথা তো কোনদিন বলো নি ?

—কথাটা এতোই অকিঞ্চিৎকর, বলতে মনে পড়ে নি।

—তোমার কাছে দামী কথাটা তাহলে কি ?

—আমার কাছে ? আমার কাছে দামী কথা একমাত্র তুমি।

—থাম, হয়েছে!···আচ্ছা—

—কি, বলতে বলতে থামলে কেন ?

—বলছি এ-সব পড়াটড়ার তো খরচ ঢের ?

—তা মন্দ নয়।

—পাচ্ছ কোথায় ? এ দিকে তো বলা হয়—'ত্রি-জগতে আমি একা নিঃসঙ্গ!' দিচ্ছে কে ?

—দিচ্ছে ? ক্ষেপেছ নিবেদিতা, নিঃস্বার্থ হয়ে দেবে কে ? আর দিলে নেবই বা কেন ? দেনা দেনা। স্রেফ দেনা! মাথার চুলটি পর্যন্ত দেনার দায়ে বিকিয়ে আছে।···শোধ পাবে এই আশায় দিয়ে যাচ্ছে, এর পর সুদ-সমেত শোধ না পেলে হয়তো—কিন্তু ও-কথা থাক। আমার কথার উত্তর দাও।

হ্যাঁ, এইবারে বরং উত্তর ভাবতে পারে নিবেদিতা।

হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে তবু।

দেনার দায়ে যার মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে আছে, ঝোঁকের মাথায় প্রিয়-

বান্ধবীকে একটা উপহার দিয়ে বসলে, যাকে নিজের অনেক অবশ্য-প্রয়োজনীয় আইটেম বাদ দিতে হয়, প্রাণে হঠাৎ একটা সাধ-বাসনা জাগলে, সে সাধকে ছাঁটতে ছাঁটতে ছোট করে ফেলা ছাড়া উপায় থাকে না যার, তাকে বিশ্বাস করা সহজ, বন্ধু বলে গ্রহণ করা চলে।

বললে—এত দেনা করতে সাহস হয় তোমার ?

—করতেই হচ্ছে আপাতত। নেহাৎ যখন একটু বেকায়দায় পড়ে আছি।

—এই অবস্থায় বিয়ে ? মাথাটা ঠিক আছে তো ?

—ঠিক থাকতে আর দিচ্ছ কই ? তোমার অবস্থা শুনে মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছে হলে তুমি একটা ভাল শাড়ি পরতে পাবে না, একটা শৌখিন সাবান ব্যবহার করতে পাবে না, এ আমি ভাবতেই পারছি না নিবেদিতা !

নিবেদিতা হেসে ফেলে।

—আর নিজে ?...নিজে যে একটা শৌখিন রুমাল পর্যন্ত কিনতে পার না, তা, বুঝি মনে পড়ছে না ?

—নিজের কথা অত মনে পড়ে না নিবেদিতা। কিন্তু—তোমার ভার আমাকে নিতে দাও।

—বইতে পারবে ?

—বিশ্বাস রাখি হয়তো পারব।

—তবে আর কি, আব একবার মাকে জানিয়ে দিই তোমার জামাই পর্যন্ত ঠিক হয়ে আছে, এখন লগ্নের যা দেরি।

—না নিবেদিতা না। দেরি আর নেই, লগ্ন এসে গেছে। মনের মধ্যে তার আবির্ভাব অনুভব করছি।

—আচ্ছা এসে সব কথা হবে, একবার চাকরীটা বজায় করে আসি।

আজ আর কাজ ভাল লাগবে না। মনের মধ্যে অনেক আলোড়ন। তবু অভ্যস্ত নিয়মে ধীরে পদে ঘরে ঢুকে টাইপ-মেশিনের ঢাকা খুলে বসল নিবেদিতা।

মল্লিক-কর্তা ভুরু কুঁচকে বললেন—সব সময়টা যদি গেটে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিতেই কেটে যায়, কাজগুলো হবে কখন ?

—হয়ে যাবে।—

—হলেই ভাল।...কাল কতটা পর্যন্ত হয়েছিল দেখো ?

দরকারী কাগজ-পত্র দেখে-শুনে নিয়ে মেসিনে কাগজ পরাতে পরাতে

নিবেদিতা নির্লিপ্তভাবে বলে—আপনি আর কাউকে খুঁজে নেবেন আমার পক্ষে আর এ-কাজ সম্ভব হবে না।

—সম্ভব হবে না?

সুজিত মল্লিক হাঁ হয়ে যান। ন্যায্যের অতিরিক্ত মাইনে দিয়ে যাকে আটকে রাখতে চেয়েছেন তার মুখেও এই কথা।

—সম্ভব হবে না কেন, শুনতে পাই না?

—সে উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই।—

—এক কথায় চাকরী ছাড়া যায় না, এ আইন তোমার বোধ হয় জানা নেই নিবেদিতা?

—কোন চাকরীর কি আইন সেটুকু জানা আছে মিষ্টার মল্লিক।

—আর যদি আমি জোর করে আটকে রাখতে চাই?

—সেটা মিথ্যা ধৃষ্টতা হবে মিষ্টার মল্লিক!

টেবিল থেকে একটা কাগজ টেনে নিয়ে খস্ খস্ করে দু লাইন লিখে টেবিলে ফেলে রেখে বীর-দর্পে এগিয়ে যায় নিবেদিতা।

পদত্যাগ-পত্রখানা যেন সুজিত মল্লিককে ব্যঙ্গ করে হাসতে থাকে।

অথচ কালকে হলেও কি এতটা দুঃসাহস দেখতে পারত নিবেদিতা?...অনেক বিবেচনা করত। আজ সাহস বেড়েছে। আজ ওর কাছে এক পুরুষকণ্ঠ আবেদন জানিয়েছে—"আমাকে তোমার ভার নিতে দাও।"

—চাকরীটা ছেড়ে দিলাম।

—বাঁচলাম! তাহলে বিয়েটা তাড়াতাড়ি হোক? এ-বাড়িতে আসা বন্ধ হলে দেখা-সাক্ষাতের অসুবিধে একটু ঘটবেই!

—তারপর? আমাকেও এই বাড়িতে থাকতে হবে না কি?

—অন্তর কিছুদিন। যতদিন না কোন রকমে বিদেশ পালাতে পারি।

—বিদেশ? কোথায়? কোথাও চাকরীর আবেদন করছ বুঝি? আর সেই আনন্দে ভাসছ?

—আবেদন একটা করেছি বটে, কিন্তু সেটা চাকরীর নয়, বরং বলতে পার কিছু শিক্ষার।

নিবেদিতা কৌতূহলী হয়ে ওঠে, সেটা আবার কি বস্তু? কোথায় শুনি না?

—ধরো—অক্সফোর্ড।

—ধরতে তো আর পয়সা খরচ নেই—হেসে ওঠে নিবেদিতা। বেশ—ধরলাম। তারপর ?

—তারপর তোমাকে নিয়ে একেবারে সটান জাহাজে পাড়ি।

—চমৎকার পরিকল্পনা! কিন্তু পরীর কল্পনা রেখে বাস্তব কথা কও।… তোমাদের বাড়ির ওই বুড়ো ভদ্রলোকটির হেফাজতে আমাকে এনে ফেললে কিন্তু আমি 'জবাব'! সুবিধের নয় ভদ্রলোক।

অনিরুদ্ধ একটু ম্লান হেসে বলে—বাঙালীর মেয়েরা তো অনেক অসুবিধে সহ্য করে স্বামীর ঘর করে ? ওঁকেও না-হয় একটু সহ্য করে গেলে ?…দুদিন পরেই তো পালাব।

—কিন্তু ওঁর সঙ্গে তোমার সম্পর্কের সূত্রটা কি তা তো কোনদিন শুনলাম না। কে হন তোমার ?

—আমার দাদা।

—দাদা ?…কি রকম দাদা ?

—রকম-সকম কিছু নেই, এক মাতৃগর্ভজাত।

বিস্ময়ে দুই চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে নিবেদিতার।

—তার মানে ? উনি তোমার নিজের ভাই ?

—সমাজ ত তাই বলে। তবে 'নিজের' কথাটার মানে বড় শক্ত নিবেদিতা।

কিন্তু নিবেদিতার ও-সব ফাঁকা কথা শোনবার সময় কোথা ? দুই চোখে আগুন ঠিকরে পড়ে ওর।

—তার মানে তুমিও এ-বাড়ির একজন মালিক ? এতদিন ধরে তাহলে ঠকিয়ে এসেছ আমায়। পুতুল-নাচ নাচিয়ে এসেছ ?

—কী আশ্চর্য, এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন নিবেদিতা ? এতে ত তোমার কোন ক্ষতি হয় নি ?

—ক্ষতি হয় নি ? এত সহজে এই কথা বলছ ?…কেন, কেন তুমি আমাকে এমন অপমান করে এসেছ ?

—কিন্তু আমি তো বুঝতে পারিনি নিবেদিতা এতে তোমার অপমানের প্রশ্ন আসে ?

—এ-রকম অনেক তুচ্ছ কথাই বড় লোকেরা বুঝতে পারে না।…শুধু এই ভেবে অবাক হচ্ছি, কি প্রয়োজন ছিল এর ?

কি প্রয়োজন ছিল সে-কথার—কাতর-চিত্তে ব্যক্ত করে অনিরুদ্ধ।...মস্ত বাড়ি দেখে ভয় খাচ্ছিল নিবেদিতা তাই তখন আর নিজেকে সে-বাড়ির 'একজন' বলে পরিচয় দিতে সাহস হয় নি।

আর সত্যি বলতে—মনে-প্রাণে কেন জানি না নিজেকে ঠিক এ-বাড়ির বলে মনে করতে পারি না। মনে হয়—

নিবেদিতা গম্ভীর-মুখে বলে—আপনার চরিত-কথা শোনবার সময় আমার নেই। সরুন যাই। ঈশ্বর শেষ-রক্ষা করেছেন এই ভাগ্য।

—অভিমানে অন্ধ হয়ে যা-হয়-কিছু স্থির করে ফেল না নিবেদিতা। স্বীকার করছি আমার অন্যায়ই হয়েছে, তবু অপরাধেরই ক্ষমা থাকে।

—'ক্ষমা' 'অপরাধ' ও-সব এক-একটা অর্থহীন শব্দ অনিরুদ্ধ! যে জায়গায় দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে সহজে মিলতে পেরেছিলাম, সেখান থেকে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছ! ফিরে আর সেখানে দাঁড়ান যায় না।...আশা করি এটুকু মনে রাখবে!

—নিবেদিতা! এত বড় ভুল কোর না। আমি আবার বলছি এখুনি যা হয় কিছু স্থির করে বোস না। ভাল করে ভাববার ক্ষমতা তোমার এখন নেই।

—আচ্ছা, ভাল করে ভেবে দেখবার চেষ্টা করব। সৎ-পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ।

কম-দামী ভ্যানিটি ব্যাগটা দৃঢ়হস্তে চেপে ধরে এগিয়ে যায় নিবেদিতা। মিশে যায় রাজপথের জনারণ্যে।

কিন্তু অনিরুদ্ধ কি এত সহজে হাল ছাড়বে? সে কি আবার যাবে না অভি-মানিনীর কাছে? আবার গিয়েছে, বারবার গিয়েছে।

কিন্তু অদ্ভুত নিবেদিতা, অসম্ভব নিবেদিতার অচল মনোভাব অচলই থাকে।... তাই ওর শেষ উত্তর হচ্ছে—"ভেবে দেখলাম—আমি কাজ ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে গেলে বাড়িতে মা-ভাই-বোনের কষ্ট হবে।"

—দোহাই তোমার নিবেদিতা, সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না।

—দয়া করে একেবারে ভুলে যেও না, গরীবেরও কিছু আত্ম-সম্মানবোধ থাকে।

—শুধু শুধু আমাকে এত শাস্তি দেবে নিবেদিতা?

—ওটা নিমিত্ত মাত্র।

—নিজেও তো তুমি কম শান্তি পাবে না ?

—সেটা অদৃষ্ট।

ম্লান মুখে ফিরে গেল অনিরুদ্ধ।

তা যাক।—কিন্তু আর হয় না।

গড়ান অলঙ্কার ভেঙে নতুন ছাঁদের অলঙ্কার গড়ান যায়, গাঁথা ছন্দ ভেঙে নতুন ছন্দ গাঁথা যায় না।

নিবেদিতা কি করে ভুলতে পারবে দিনের পর দিন অনিরুদ্ধ অভাবগ্রস্তের ভূমিকা নিয়ে তার কাছে অভিনয় করে গেছে, আর নিবেদিতা মমতায় সহানুভূতিতে বিগলিত হয়ে তাকে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছে ?

অনিরুদ্ধকে সগোত্র জেনে, শুনিয়েছে নিজের জীবনের দারিদ্র্য আর সংগ্রামের কাহিনী। ছি ছি। হয়ত মনে মনে কত হেসেছে অনিরুদ্ধ।

একথা কি কোন দিন ভোলা যাবে!

যে অপমানের জ্বালা যত সূক্ষ্ম, তত তীক্ষ্ণ।

অনিরুদ্ধর সে অভিনয় যে ব্যঙ্গ নয়—মমতা, সে কথা বোঝবার বুদ্ধি কি নিবেদিতার আছে ? পুরুষের মমতাকে বোঝবার ধৈর্য কি মেয়েদের ভেতরে থাকে ?

অভিমানে আচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে সে কেবলই পুরুষের কাজের মধ্যে অভিসন্ধি আবিষ্কার করে ফেলে জ্বলে মরে।

মায়াজাল

মামা মামীর সঙ্গে তীর্থভ্রমণ করে এল প্রতিভা। যেমন তেমন তীর্থ নয়, একেবারে কেদার-বদরী। দেবতাত্মা হিমালয়!

প্রতিভা যে তার মামা মামীর ঐ একটি মাত্র ভাগ্নী, আর সেই কারণেই তার এহেন মামার বাড়ির আব্দার, সেটা ভাবলে ভুল হবে। প্রতিভার মায়েরা চার বোন, আর চার বোনের—ঘাটতি বাড়তি মিলিয়ে সর্বসাকুল্যে চার আষ্টে বত্রিশটি।

এতগুলি ভাগ্নে-ভাগ্নীর মাঝখান থেকে শুধু প্রতিভাকে আদর করে নিয়ে

যাওয়ার কারণ হচ্ছে—প্রতিভা অল্প বয়সের বিধবা ভাগ্নী। অল্প বয়স বলে অল্প বয়স। এ যুগে অত কম বয়সে বিয়েই তো বড় একটা হয় না।

নেহাৎ নাকি প্রতিভা বড্ড টুকটুকে সুন্দর মেয়েটি ছিল তাই পনের বছর বয়সেই একটা বিয়ে-বাড়ির নেমন্তন্নে গিয়ে ভাবী শাশুড়ীর এমন নজরে ধরে গেল, যে তিনি পনেরো ছেড়ে ষোল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজী হলেন না।

আবার চিত্রগুপ্তের এমন টনক নড়ল যে, তাঁরও হিসেব মিলাবার দেরি সইল না। বোধ করি খাতার পাতায় নাম দেখেই সেই বেচারা বাইশ বছরের বরটিকে তলব করে বসলেন বছর খানেকের মধ্যেই।

তদবধি প্রতিভা 'আহা বেচারা' 'হতভাগী ছুঁড়ি' ইত্যাদি। প্রথম প্রথম 'আর একবার বিয়ের' কথা উঠেছিল, কিন্তু কথাটা তেমন দানা বাঁধে নি, বরং একটু দানা বেঁধেছিল—'আবার পড়ানো'র প্রস্তাবটা।

ক্লাশ 'টেন'এ উঠেই তো বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, আর বিয়ের পরই শ্বশুরদের সঙ্গে চলে যেতে হয়েছিল মোগলসরাই। দুমাস সেখানে, দুমাস এখানে করেই তো বছরটা কোন ফাঁকে কেটে গেল।

তারপর—কলেজ হোস্টেলে দিন তিনেকের জ্বরে জামাই গেল মারা, বাড়িতে শোকের ঝড় বইল। সকলের মুহ্যমান অবস্থাটা কাটতেই আরও বছর খানেক গেল কেটে। আবার স্কুলে যাবার কথা যখন উঠল, প্রতিভা তখন আঠারোয় পড়ো-পড়ো। নিজেই ও বেঁকে বসল, বলল,—তিন বছরের ছোটদের সঙ্গে পড়তে পারব না।

অতএব প্রাইভেটে ম্যাট্রিক।

পড়াতে লাগলেন একজন দিদিমণি, কিন্তু ঠিক সেই বছরেই প্রতিভার মা আর খুড়ি দুজনে পর পর "শিশুমঙ্গলের" সদস্যা হলেন।

অতঃপর কেমন করে কে জানে সেই শিশু দুটির মঙ্গলের ভার পড়ে গেল প্রতিভারই ওপর। সে বছর ম্যাট্রিক দেওয়া হল না, তার পরের বছরও না। কারণ নেহাৎই বৈষয়িক কারণে সেই দিদিমণিটিকেও বরখাস্ত করা হয়েছিল, আর প্রতিভাকে দেওয়া হয়েছিল স্বাবলম্বনের শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত। প্রতিভা তার মান রাখতে পারল না, বলল—পড়া তৈরী হয় নি, পরীক্ষা দিতে গিয়ে শেষে কি লোক হাসাব ?

তার পরের বছর বাড়ির লোক ভুলেই গেল প্রতিভার পরীক্ষার কথা। ততদিনে—সংসারচক্রের যতগুলি দাঁত আছে, তার খাঁজে খাঁজে নিজেকে দিব্যি

খাপ খাইয়ে বসিয়ে নিয়েছে প্রতিভা। প্রতিভা নড়লে চাকা অচল।

"একটানা এক ক্লান্তকরুণ সুরে, কাজের চাকা চলল ঘুরে ঘুরে।"

তবু মামা-মামীর সঙ্গে যে কেদার-বদরী যাওয়া হল, সে একরকম ওর ছোট বোন অনুভার দাক্ষিণ্যে। অনুভাই ওকে একরকম ঠেলে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

মা বাপ বলেছিলেন—"ওঁরা আগ্রহ করে বলেছেন, যাওয়াই তো উচিত, কিন্তু" —নিজের যে কখনও কোন তীর্থ হল না এই কথা উল্লেখ করে মা নিশ্বাস ফেলেছিলেন।

প্রতিভা বলেছিল—"মামাবাবু বলেছেন বটে, কিন্তু—মায়ের শরীর ভাল নয়, গেলে কি করে চলবে" এই বলে নিশ্বাস ফেলেছিল প্রতিভা।

অনুভা নিজের জোরে 'কিন্তু'গুলো-ও দিল উড়িয়ে। বলল—এমন সুযোগ আর জন্মে পাবি না দিদি, 'সংসার সংসার' করে মরে কেন নিজের আখের ঘোচাবি।

—তীর্থে গিয়েই বা আমার কি হবে? প্রতিভা বলেছিল ম্লান হেসে।

অনুভা বলেছিল—কিছু না হোক, ওই লঙ্কা পাঁচফোড়নের কবল থেকে ছুটি পাবি দুদিন। তোর ওই চাঁপারকলি আঙুল দিয়ে যখন রাতদিন বড়ি দিস, মোচা কুটিস, লঙ্কা হলুদ নাড়িস দেখে আমার গা জ্বলে যায়।···জুতো জামা পরে বেড়িয়ে নিগে না দুদিন? যেমন করে হোক চলেই যাবে। ভয় নেই, তোর ভাঁড়ার ঘর অক্ষত অনাহত থাকবে।

অতএব জুতো জামা কেনা শুরু হয়েছিল প্রতিভার জন্যে। ভাল ব্যবস্থাই করতে হল, বড় লোক মামীর সঙ্গে যাবে, প্রতিভার বাপ-মা'র একটা প্রেষ্টিজ আছে তো?

যাক সে সব তো গত কথা।

এখন তো আবার বাড়ি ফিরে এসেছে প্রতিভা। কিন্তু যে প্রতিভা গিয়েছিল সেই কি ঘুরে এল?···সংসারের সেই খাঁজে খাঁজে নিজেকে ঠিক মত করে আর বসাতে পারছে না কেন তাহলে? পথক্লেশের ক্লান্তি অবশ্য ছিল, চেহারাটাও কিছু মলিন হয়েছিল, কিন্তু শুধু তাই নয়, তাছাড়াও কিছু ছিল।

মনে হচ্ছে ও যেন সংসার থেকে আলগা হয়ে গেছে। কে জানে এটা প্রতিভার দোষে না অনুভার গুণে। প্রতিভা দেখল—তার অনুপস্থিতিতে সংসার চক্রটা অচল তো হয়ই নি, বরং যেন নতুন 'অয়েল' করা মেসিনের মত আরও

স্বচ্ছন্দ গতিতে চলছে।

প্রতিভার চাইতে অনুভার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, ক্ষিপ্রকারিতা বেশি, সংসার সদস্যদের ওপর শাসন প্রবল।

প্রতিভা যেখানে অনুনয় করত, অনুভা সেখানে হুকুম চালায়। প্রতিভা অবাক হয়, রূপে অনুভা দিদির ছায়ায় দাঁড়াতে পারে না, কিন্তু সাহসটা কী ভীষণ! কে জানে কখন তলে তলে এসব 'ক্যাপাসিটি' জন্মেছে ওর। হয়তো—দুমাসের জন্যে প্রতিভা বাড়ি-ছাড়া না হলে ওর গুণাগুণ ধরাই পড়ত না।

অনুভার গুণে চাকার নাট্ বল্টু ক্রু কোথাও কোনখানে ঢিলে হয় না, তাই প্রতিভার ভাববৈলক্ষণ্য বড়ো কারুর নজরে পড়ে না। অসুবিধে হলে, বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে, হয়তো চোখে পড়ত!

হয়তো—মা কোন সময় বলেন—কথায় বলে 'পাহাড় ভাঙা'! মেয়েটা সেই অবধি সারতে পারল না!

বাবা বলেন—ওকে একটু দুধটুধ দিচ্ছ ভাল করে?

—দুধ? মা উদাস হাসি হাসেন—দুধ ও জন্মে খায়?···ভাল যা বাসত—ওই মাছটুকু, ডিমটুকু!

অতএব বাবার মুখ বন্ধ।

হয়তো বা কাকী একসময় কাকার কাছে বলেন—মামীর সঙ্গে দুমাস ঘুরে এসে মামীর মত আয়েসী হয়ে উঠেছেন মেয়ে! বললে বিশ্বাস করবে না, বিষ্টি এসে একছাদ কাপড় ভিজে গেল সেদিন, গ্রাহ্য করে তুলল না! এই জন্যেই বলে বড়লোকের সঙ্গে বেশি মেশামেশি ভাল নয়!

কাকা বলেন—প্রত্যেক বিষয়ে ও হুঁশিয়ার হবেই এমন আশা কর কেন? কী আছে ওর জীবনে? নিজের ভবিষ্যৎ ভাবতে ভাবতে কোন সময় যদি খেয়াল একটু কমই হয়, রাগ করা মনুষ্যত্ব নয়।

অতএব তখনকার মত কাকীর মুখ বন্ধ হয়।

তবু কেউ সন্দেহ করে না, প্রতিভা এই দুমাসের মধ্যে হৃদয়রাজ্যে একটা বিপ্লব বাধিয়ে এসেছে!

কাজেই তীর্থ ঘুরে আসার পর থেকে, অনেকটা—তোলা মাটিতে লাগানো চারার মত খানিকটা আলগা হয়েই রয়ে গেল প্রতিভা। অবিশ্যি সংসারের কাজ কি করছে না? তা করছে বৈকি, কিন্তু সেটা এইভাবে—

অনুভা রান্নার ফিরিস্তিটা বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, প্রতিভা বসে বসে কুটনোগুলো কুটছে। অনুভা মাঝখানে একবার শাসিয়ে যাচ্ছে—সব আলুগুলো কুটে ফেলিসনে দিদি, গোটাকতক ফেলে রাখ, নইলে সকালে বাজার আসতে দেরি হলে মুস্কিল!

প্রতিভা যদি বলে—ওমা এথেকে আবার রাখব কি? কুলোবে কেন?

ও বলে—নাঃ কুলোবে না? না কুলিয়ে ছাড়ব? সকালে অফিসের বেলায় মরব নাকি?

মা খুড়ি তো এখনও কচিছেলের মা, ওঁদের সব ঝাড়িয়ে কাটিয়ে স্নান সেরে আসতে অফিস ইস্কুলের লোকেরা খেয়ে ওঠে। ওঁরা কখন কি দেখবেন? বরং মা কি খুড়ির চান হল কিনা সাতবার খোঁজ করতে হয়, ঠিক সময় চা তৈরি রাখতে হয়।

অনেক জল ঘেঁটে, আর অনেক খাটুনি খেটে কাহিল হয়ে এসে পড়েন বেচারারা!

আগে আগে মাছের সংখ্যা নির্ণয়ে ভুল হয়ে যায় বলে প্রতিভা নিজে দিত মাছ কুটে, এখন অনুভা হয়তো বা জামার লেস বুনতে বুনতে নয়ত চুলে চিরুণী চালাতে চালাতে মাছ কোটার কাছে এসে দাঁড়ায়, চাকরকে নির্ভুল নির্দেশ দিয়ে দিতে। বামুনকে যা বোঝায় তার এতটুকু এদিক ওদিক হলে বকে শেষ করে দেয় তাকে।

আশ্চর্য! এসব দিকে তো কখনও তাকিয়ে দেখত না অনুভা, জানল কি করে এত?

প্রতিভা এর মাঝখান থেকে নিজের সেই পুরনো খাঁজগুলো খুঁজে পায় না। …অথচ দেখ, অনুভা এতর মধ্যেও যেন হাওয়ায় ভাসছে। ওর কোনখানে চাকার দাঁতের দাগ পড়ে নি।

অবসর সময় একরকম লুকিয়েই আবার পড়ার বইপত্তরগুলো খুলে বসে প্রতিভা, কিন্তু ঠিক যেন অর্থবোধ হয় না। দেখল, যা যা শেখা ছিল, প্রায় ভুলেই গেছে। ওগুলো ফেলে রেখে খুঁজে খুঁজে ধর্মগ্রন্থ পড়তে চেষ্টা করল, সেটা আরও ভারি ঠেকল। শেষ পর্যন্ত ধরল খবরের কাগজ। তবু বেশ-কিছু সময় কাটে।

আগে চোখ বুলোবারও সময় হত না—এখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আদ্যোপান্ত পড়ে। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? সব সময় কী যেন এক শূন্যতা! একি শুধুই কাজের অভাব?

একদিন···বর্ষার এক বিকেলে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চেয়ে বসেছিল প্রতিভা, কোলে একখানা মাসিক পত্রিকা খুলে ধরে। ওঘর থেকে চোখে পড়ল অনুভার।

তখন অনুভার জোর তর্ক চলছিল প্রদীপের সঙ্গে, সিনেমা দেখার অপকারিতা নিয়ে।

মাঝখান থেকে হঠাৎ বলে বসল—এই, তুমি না সেদিন বলেছিলে আমার প্রেমে পড়েছ?

প্রদীপ চমকে বললে—বলেছি? আমি?

—আহা স্পষ্ট উচ্চারণ না কর, বলি বলি করছিলে, তো?

প্রদীপ হেসে ফেলে বলল—তা করছিলাম বোধ হয়।

—হুঁ! তা বলছিলাম কি—আমার প্রেমে না পড়ে, দিদির প্রেমে পড় না?

—কি যা তা বলছ? ধমকের সুর লাগানো প্রদীপের কণ্ঠে।

—যা তা কিসে? দিদি আমার চাইতে দশগুণ সুন্দরী।

—তুমি বড্ড বাচাল!

—এত দিনে চিনলে?···সে যাক, কিন্তু দেখ, ও ঘরের জানলার দিকে? কিরকম বেচারীর মত বসে আছে দিদি। দেখলে মায়া হয়। সত্যি আমার ইচ্ছে হয়, কেউ একজন ওকে ভাল বাসুক!

—সেটা, আমি হলে সইবে?

—পরীক্ষা করে দেখতাম। আমি হয়তো—আবার জোগাড় করে ফেলতাম। দিদিটার যে সে ক্যাপাসিটিও নেই। চল না হয় ওঘরে গিয়ে তর্ক জুড়ি।

প্রদীপ বলল—এই সভ্য সুন্দর নির্দোষ প্রস্তাবটি যদি আগে করতে তাহলে যাওয়া যেত। তার চাইতে আমি আজ চলি, তুমি বরং দিদির কাছে যাও।

—তাহলে মনে হবে আমিই তাড়ালাম তোমায়!

—না, আমি উঠতামই একখুনি, ভীষণ বৃষ্টি আসছে!

প্রদীপ চলে গেলে অনুভা ওঘরে গিয়ে বিনা বাক্যে দিদির পিঠটা জড়িয়ে ধরল।

প্রতিভা চমকে উঠে বলল—কি রে?

—কিছু না, তোমায় একটু আদর করতে ইচ্ছে করছে দিদি।

প্রতিভা একটু হেসে ফেলে বলল—রোস বাবাকে বলছি! প্রদীপের পড়া শেষ হওয়ার অপেক্ষায় দরকার নেই!

অনুভা কপট নিশ্বাস ফেলে বলে—বাবা শুনলে ত? ডাক্তারী শাস্ত্রে উত্তীর্ণ হয়ে না বেরোলে যে বিয়ে করতে নেই, একথা আবার কোন শাস্ত্রে আছে কে জানে।...বাবার কথা শুনে মনে হয় বিয়েটা যেন একটা রোগ।

ঠিক এই সময় ঠাকুর এসে বলল—ছোড়-দিদিমণি, লুচির ঘি বার করে দিয়ে আসেন নি, ছোটবাবু খেতে আসছেন।

—হুঁ! তা তোমার ছোট মা-টি গেলেন কোথা? তাঁকে বলগে না।

—ছোট মা পুজো করছেন।

এ একটা নতুন ঘটনা ঢুকেছে বাড়িতে। ছোট গিন্নী হঠাৎ এক গুরু লাভ করেছেন। সম্প্রতিকার ব্যাপার, কাজেই সদ্য দীক্ষাপ্রাপ্তের নিয়ম অনুসারে ঈশ্বরোপাসনার মাত্রাটা এখন প্রবল।

অনুভা উঠে গিয়ে ঘি বার করে দিয়ে এসে দিদির কোলে মাথা রেখে বলে—ভাল লাগছে না দিদি, তোর ভাঁড়ারের ভার তুই নে আবার। অনেক দিন জিরিয়েছিস!

কে জানে এ ওর নিজেরই বিরক্তি, না দিদির প্রতি মমতা। 'আহা তবু—ছাই মাটি নিয়েই ও ভুলে থাক। শূন্যতাটা কিছু ভরাট হোক!'

প্রতিভা ম্লান হেসে বলল—আমার ভাঁড়ার? 'আমার' বলতে এ জগতে কি আছে রে?

—কারই বা কি আছে? অনুভা রাগ দেখায়—এ জগতের সবই তো মিথ্যে মায়া মাত্র! সেই যে ভিখিরীটা কি গায়—

"এই কলেবর, এও পরের ঘর,
ভাড়া দিয়ে আছ ভাড়াটে এ ঘরে—
যখন সময় হবে, শমন 'সমন' দেবে
উঠে যেতে হবে মন তোমারে!"

তবে?...না ভাই দিদি, বেশ ছিলি বাপু, কেদার-বদরী ঘুরে এসে তুই কেমন বদলে গেছিস!

হঠাৎ প্রতিভা কেমন এক অদ্ভুত ভাবে তাকায় অনুভার দিকে, তারপর চোখটা ফিরিয়ে নিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলে—ভুল বলিস নি তুই অনু, বদলেই গেছি।...ভাগ্য আমাকে বদলে দিয়েছে!...সেই অবধি কেবল ভাবি—এটা কি ঠিক, এতে কি পাপ হচ্ছে আমার? মনের ওপর কি শাস্ত্র চলে?

অনুভা চোখ ঠিকরে বলে—বলিস কি দিদি? 'মহাপ্রস্থানের পথে'র রাণীর ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি নয়তো?

প্রতিভা ম্লান করুণ হেসে আঁচলটা আঙুলে জড়াতে থাকে।

—সব আমাকে খুলে বল দিদি!

প্রতিভা সেই ভাবেই বলে—দূর, ছোট বোনকে এসব কথা বলতে নেই!

—ইস! রেখে দে তোর ছোট বড়র হিসেব। তিন বছরের বড় হলে কি হবে, তুই আমার চেয়ে ঢের নাবালক।…বল শীগগির—না বললে রক্ষে রাখব না!

দু চার বার অনুরোধের পরই প্রতিভা ধীরে ধীরে ব্যক্ত করে তার নতুন উপলব্ধির ইতিহাস। হিমালয় অভিযানের পথে যা ওর জীবনে এসে পড়েছিল! যা দেখে প্রতিভা ভয় পেয়েছে, কিন্তু মনকে ঠেকাতে পারে নি!

অনুভা মাঝখানে মাঝখানে এক আধটা মন্তব্য বা প্রশ্ন করল, বেশি কথা প্রতিভাই বলল। স্বল্পবাক্ প্রতিভা বলতে বলতে কেমন যেন মুখর হয়ে ওঠে, যেন বলার নেশায় মেতেছে।

অনুভা প্রশ্ন করে—মামা-মামীর লক্ষ্যগোচর হল না—কি করে?

—চলার পথে কত বাঁক, কত পিছিয়ে যাওয়া, এগিয়ে যাওয়া! তাছাড়া—কথা আর কটাই বা হয়েছে তার সঙ্গে?

—শুধু চাক্ষুষ প্রেম?

—যা বলিস! শুধু একটা ভয় রয়েছে আমার—

—কি ভয়?

—হঠাৎ যদি কোন চিঠি এসে পড়ে। ফেরার সময় ঠিকানা নিল কিনা।

—তা এসেছিস ত অনেক দিন, এতদিন কি ঘুমোচ্ছেন ভদ্রলোক?

—আমার মনে হয় সাহস সঞ্চয় করতে পারছে না।

—তাহলে তিনি একটি মহিলা বল?

—তা নয়রে, ওর শুধু ভাবনা, পাছে আমার কোন নিন্দে হয়।

অনুভা গম্ভীর ভাবে বলে—নিন্দের ভয়ে প্রেমকে প্রকাশ করবে না? এত বিবেচনা? তাহলে সে 'বেনে' নম্বর ওয়ান!

প্রতিভা হেসে ফেলে বলে—তোর সঙ্গে কথায় কে পারবে? আমার জীবনটা কি সাধারণ মেয়ের মত রে? যে—

—নাঃ, তুমি একটি অসাধারণ! আসলে লোকটা ভীরু!

প্রতিভা নীরব।

—দিদি রাগ করলি?

—দূর!

—সত্যি দিদি, বলনা রে কি রকম দেখতে।

—অত নিরীক্ষণ করে দেখি নি।

—আরে বাস! বলিস কি? কথায় আছে, "আগে দর্শনধারী পরে গুণবিচারি—" তুই কি না দেখেই—

—আমার কথা বাদ দে ভাই, সে-ই—ইয়ে—শেষ পর্যন্ত—মানে—ঠিকানার জন্যে অস্থির হল! তাইতো ভয় হঠাৎ কোনদিন যদি চিঠি আসে!

—ভয়! ভয়টা কিসের? যত সব বাজে কথা। তা তুইও তার ঠিকানা জেনে নিয়েছিস ত?

—আমি? প্রতিভা যেন শিউরে ওঠে—না ভাই, না।

—কেন একটা লোকের ঠিকানা কাছে থাকলেও কি ধর্মে পতিত হতিস? না কি—একেবারে শ্রীমতী রাধা, 'কি জাতি কি নাম ধরে, কোথায় বসতি করে; আমি তো চিনি না তারে, চেনে মোর দু'নয়ন!' ঠিকানাটা জানা থাকলে আমিই না হয় একখানা প্রেমপত্র লিখে ফেলতাম! রোস দিদি আর একবার রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে এসে ভাল করে সব শুনব।

প্রতিভা ম্লান হেসে বলল—ভাল করে শোনবার কিছুই নেই রে!

কিছুই নেই, তবু 'কিছু' আছে।

মনের ভার একজনের কাছে মুক্ত করতে পেয়ে যেন বেঁচেছে প্রতিভা।··· প্রতিদিনের মুখস্থ কথা হয়ে গেছে—অনু লেটার-বক্সটা একবার দেখিস ভাই?··· অনু লেটার-বক্সটা দেখেছিলি?

অনু কখনও ব্যথায় করুণ হয়, কখনও হতাশায় ম্লান হয়, কখনও সেই অদেখা লোকটার ওপর চটে লাল হয়। আবার মাঝে মাঝে ঠাট্টা-তামাসা করতেও ছাড়ে না। দিদির সঙ্গে গল্প করার একটা বিষয়বস্তু হয়েছে।

আগে প্রতিভার অহরহ আতঙ্ক ছিল—'ওই বুঝি চিঠি এসে পড়ে' এখন অষ্টপ্রহরের ধ্যানমন্ত্র হয়েছে—'আজ বোধ হয় চিঠি আসবে!'

কিন্তু কোথায় চিঠি?

প্রতিভা অবশ্য কঠিন দিব্যি দিয়ে নিষেধ করেছিল, কিন্তু সেই মুখের নিষেধটাই এত প্রবল বাধা হল তার কাছে? চোখের ভাষায় যে প্রশ্রয় ছিল তা দেখল না?

দুই বোনে এসব আলোচনা হয় মাঝে মাঝে।

প্রদীপের সঙ্গেও অছুভার গল্প করবার আর একটা বিষয়বস্তু হয়েছে। দিদির হৃদয়-বেদনা।

প্রথম দিন বলেছিল—এই, শুনছ? ব্যাপার গুরুতর! কেদার-বদরীর পথে দিদি এক ইতিহাস রচনা করে এসেছে!

প্রদীপ অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছে—তার মানে?

—মানে অতি প্রাঞ্জল! দিদি মহাপ্রস্থানের পথের নায়িকা হয়েছে! একটা লোককে ভালবেসে বসেছে।

—একটা লোক? প্রদীপের চোখে বিস্ময়।

—আহা লোক না হয় একটি সুন্দর সুকান্তি ইয়ংম্যান, হল ত? লোক আবার কে নয়? মোটকথা সে হাবুডুবু, দিদি বিভোর।

—আরে দিদির সঙ্গে ত গার্জেনরা গিয়েছিলেন? তাঁদের গর্জন উপেক্ষা করেই?

—আহা তাঁরা অত সন্দেহ করবেন কেন? অভাগিনী বিধবা ভাগ্নীকে নিয়ে গিয়েছিলেন, তার পরকালের মাশুল জোগাড় রাখতে। সে যে ইহলোকের দিকে তাকাবে তা ভাবেনই নি। আর সে ছোকরা গিয়েছে শখের খাতিরে বেড়াতে। ও-হেন জায়গায় দিদির মত একটি সুন্দরী তরুণী দেখে তার মাথা ঘুরে যাওয়াই স্বাভাবিক।

—তা তো নিশ্চয়—প্রদীপ নিজের বুকে হাত দিয়ে বলে—আমার মত এমন স্বস্থানে অবিচল মাথা কজনের থাকে, বল?

আবার এর পর থেকে প্রদীপেরও কাজ হল চিঠির খোঁজ নেওয়া। 'কি, আজ দিদির চিঠি এসেছে?'

—নাঃ! লোকটা একের নম্বরের কাপুরুষ বুঝলে? যদিও দিদি বলে—দিদির সুনাম রক্ষার জন্যেই তার এই আত্মসংযম। কি জানি ওসব অপার্থিব প্রেমের মর্ম বুঝব না আমি।

—দিদি কিন্তু খুব রোগা হয়ে গেছেন।

—হবেই ত! ব্যর্থ প্রেমের যন্ত্রণা কি সোজা? 'কলিক পেনের' বাড়া।

—তোমার প্রাণে কিছু মায়া নেই।

—কেন থাকবে না? খুব আছে। তবে ওই প্যানপ্যানানি মায়া নেই।··· ওসব আত্মসংযম টংযম বুঝি না আমি। ভালবাসাকে জাহির করব না, মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখব, ওসব এযুগে অচল। দিদিকে দেখলে আমার মায়া হয় না

মোটেই, বরং রাগ হয়। ওর এদিক ওদিক দুদিক গেল। সংসারের সঙ্গে যোগসূত্র যেন একেবারে ছিঁড়ে গেছে, কি রকম আল্‌গা আল্‌গা ঘুরে বেড়ায়, 'বেচারী বেচারী' হাসে! আর সর্বদা পিয়নের পদধ্বনির আশায় মিনিট গোণে। অথচ সেই হতভাগা লোকটা—

—সে হতভাগ্য কোন দেশে থাকে সে বার্তাও জানা নেই?

—একবার নাকি বলেছিল ব্যারাকপুর থেকে গিয়েছে!

—লোকটা নেহাৎ বাজে বলেই মনে হয়, কি বল?

—কি জানি! দিদি কিন্তু সত্যিই ভালবেসেছে!

তা ভালবেসেছে বৈকি, তা নইলে শবরীর প্রতীক্ষার মত কেন ওর এই প্রতীক্ষা? বাইরের দিকের ওই জানলাটাই হয়েছে ওর পীঠস্থান। সময় পেলেই বসে থাকবে এসে।

না প্রতীক্ষা ওর নিষ্ফল হয় না, অবশেষে একদিন আশার স্বপ্ন সফল হল। এল সেই চিঠি। টানা টানা স্থছাঁদের লেখা ঠিকানা, স্পষ্ট নির্ভুল প্রতিভার নাম লেখা।

পড়েছে অনুভারই হাতে। পড়বেই তো, দিনে দশবার যে লেটার-বক্স খোলে সে। খামটা হাতে নিয়েই দুই চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে গেল ওর। তারপর ছুটে গেল দিদির কাছে।

রুদ্ধ কণ্ঠে বললে—দিদি এসেছে!

প্রতিভা চমকে বললে—কি?

—চিঠি!

কোলের ওপর ফেলে দিল অনুভা।

চট করে তুলে নিতে পারল না প্রতিভা, আড়ষ্ট হয়ে তাকিয়ে রইল খামখানার দিকে। কালো কালো অক্ষরগুলো যেন এক একটা জীবন্ত সরীসৃপ হয়ে ওর মাথার মধ্যে চলাফেরা করতে শুরু করেছে।

—ওমা, অমন হাঁ করে তাকিয়ে রইলি কেন? খোল, পড়! এই দেখ, বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েই রইল। আচ্ছা বাপু নির্জনেই পড়, আমি চলে যাচ্ছি।

ও চলে যাচ্ছিল, প্রতিভা একটা হাত বাড়িয়ে ওর হাত চেপে ধরে ভয়-ভয় স্বরে বলল—তুই পড়!

—আমি পড়ব? আমি পড়ব কি বল?

অনুভা হেসেই খান খান।

প্রতিভা উদ্‌ভ্রান্তের মত বলে—আমার ভয় করছে, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। মনে হচ্ছে স্বপ্ন, মনে হচ্ছে যাদু।

—ওরকম অনেক কিছুই মনে হবে বাপু। নাঃ, তুই আমাকে অকাল-পক্ক করে তুললি। চললাম। পড়া হয়ে গেলে ইচ্ছে হয়তো ফ্যাক্টটা বলিস।

তবু প্রতিভা ওকে ধরে থাকল, বলল—তুই খামটা খুলে দে।

অগত্যা তাই।

কিন্তু খাম খোলার সঙ্গেই পড়াও হয়ে যায়, কতটুকুই বা চিঠি?

সম্বোধনহীন, স্বাক্ষরবিহীন কয়েকটি মাত্র লাইন:

"বহুবার লিখেছি, বহুবার ছিঁড়েছি, সাহস সঞ্চয় করে পাঠাতে পারি নি। আজ প্রতিজ্ঞা করে বসেছি। জানি না তোমার আজও আমাকে মনে আছে কিনা। যদি মনে থাকে তো শুধু একটুখানি উত্তর দিও।

উত্তর নয়, অনুমতি-পত্র।

মাঝে মাঝে যেন এ রকম এক-আধটা চিঠি লিখতে পাই, এই অনুমতি চাইছি। এ প্রার্থনা কি অসঙ্গত?

ইতি—"

—তাহলে শেষ পর্যন্ত দিল!

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল অনুভা।

প্রতিভা কোন উত্তর দিল না, শুধু নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল চিঠিখানার দিকে। মাথার ওপর ঠিকানা রয়েছে একটা—বি. টি. রোডের কোন একটি নম্বর, প্লট নম্বর আর বাড়ির নম্বর মিলিয়ে দুর্বোধ্য গোছের।

প্রদীপ এল পরদিন।

অনুভা আরক্ত মুখে খবর দিল—কাল এলে না? উচ্ছ্বাসটা জুড়িয়ে গেল! দিদির চিঠি এসেছে!

—বল কি?

—আর বলি কি! দস্তুরমত চৌকো নীল খাম, প্রেমিকসুলভ ভাষা।

প্রদীপ বলে—তাহলে তো আমারই একটা অন্যায় ধারণা ছিল। আমি ভাবতাম লোকটা একটা ধাপ্পাবাজ, দিদি ভালমানুষ বুঝতে পারেন নি। শেষ

পর্যন্ত চিঠি দিল তাহলে ?

—তাইতো দেখছি। সত্যি বলতে কি, আমার ধারণা আরও উচ্চাঙ্গের ছিল। এতদিন বলি নি, আজ ভুল ভাঙল তাই বলছি—আমার সন্দেহ ছিল লোকটা বোধ হয় কাল্পনিক! দিদির দুরন্ত ইচ্ছার বা বাসনার একটা মনগড়া মূর্তি!

—ছি ছি দিদিকে এরকম প্রতারক ভাবা—

—না, দিদিকে মোটেই প্রতারক ভাবিনি কোনদিন, ভাবতাম দিদির মনই দিদিকে প্রতারণা করেছে। 'এই রকমটি যদি হত—' এই ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একসময় ধারণা জন্মে যায় 'এই রকমটি হয়েছিল!' এ এক ধরণের চিত্তবিলাস। অবিশ্যি সাহস করে বলি নি তোমায়।

—যাক তোমার ধারণা তাহলে বদলেছে ?

—অবশ্যই! যখন জলজ্যান্ত প্রমাণ পেলাম।

—এখন দেখ গার্জেনরা টের পেলে কি বলেন ? তোমার দুঃসাহসটা তবু সইছেন, এটা সইবেন কিনা সন্দেহ। খুব বেশী উচিত ব্যাপার তো হল না এটা ?

—কেন অনুচিত কিসে ? মাত্র বাইশ বছর বয়স দিদির তা জান ?

—তা জানি। আবার গোঁড়া হিন্দু ঘরের বিধবা তাও জানি।

—আমি অত উচিত অনুচিত বুঝি না। সত্যি বলতে কি, খুব মজা লাগছে আমার।

—তা লাগবে বৈকি। নিজে হাওয়ায় উড়ছ কিনা।

—হয়তো সত্যিই তাই। কেউ বঞ্চিত থাকবে, কেউ দুঃখী থাকবে, এ যেন এখন আর ভাবতেই ইচ্ছে করে না। আগে ঠিক বুঝতাম না, এখন বুঝতে পারি কী বিরাট শূন্যতা দিদির জীবনে। বুদ্ধি করে ঠিকানা দিয়েছে ভদ্রলোক, আমি তো কালই দিদিকে চিঠি লিখিয়ে ছাড়বো।

—এই অনু খবরদার! প্রায় বকে ওঠে প্রদীপ—অত দুঃসাহস করতে যেও না। জিনিসটাকে ইন্ধন দিয়ে লাভ কি ? হনুমানের ল্যাজের আগুনে লঙ্কাকাণ্ড হয়েছিল জান তো ?

—জানি সব, কিন্তু মানি না সব। মানুষটা দৈবক্রমে বিধবা হয়ে পড়েছে বলে, ওর জীবন থেকে একেবারে 'জীবনে'র নির্বাসন দণ্ড ? এ কী অবিচার! কেন ও বাতিল হয়ে পড়ে থাকবে ? কেউ একজন ওকে ভালবাসুক না ? আমি তাহলে বাঁচি! আমার মনে হচ্ছে এইবার হয়তো একটু স্বস্তি পেয়ে তোমার সঙ্গে প্রেম করতে পারব। দিদির ওই রকম দুর্ভাগ্য সামনে রেখে—সত্যি,

ভারী বিবেক দংশন অনুভব করতাম।

—আমি শুধু ভাবছি—এটা কি ঠিক? এটা কি ভাল?

—তুমি এখনও উনবিংশ শতাব্দীতে আছ। চল দিদিকে অভিনন্দন জানিয়ে আসবে।

প্রদীপ দুহাত জোড় করে বলে—মাপ কর, ওই অনুরোধটি কোর না। নেহাৎ তোমার দিদির ওপর মমতার বশেই এটা সমর্থন করছি, নইলে—সে হিসেবে আমি সত্যিই উনবিংশ শতকের।

—আমারও ওই মায়া ছাড়া কিছু নয়—বলল অনুভা।

অনেক রাত্রে প্রতিভা খাতা কলম নিয়ে বসল।

বসল না, উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে লিখতে লাগল। চিঠির উত্তর নয়—ডায়েরী। লিখল—'এ কী? একে কি নাম দেবো? একি আমার ইচ্ছাশক্তি? একি স্বপ্ন? একি মায়া? আমি তো বুঝতে পারছি না একি!'

পরদিন অনুভা তোড়জোড় করে এসে বসল,—চিঠি লেখ দিদি।

—চিঠি! প্রতিভার সমস্ত মুখটা আকস্মিক রক্তোচ্ছ্বাসে লাল হয়ে উঠল—চিঠি লিখব কি বল? পাগল হলি তুই?

—তা হয়তো হয়েছি, কিন্তু করেছিস তুই। নে নে চটপট লিখে ফেল বলছি।

—আমি পারব না।

—কি মুস্কিল! তবে কি আমাকে পারতে হবে? সে কালের নিরক্ষরা মহিলাদের প্রেমপত্র লিখে দেওয়ার মত?

হেসে গড়িয়ে পড়ল অনুভা। একটু যেন বেশি বেশিই হাসল।

—আচ্ছা অনু!

—কি গো!

—এই ঠিকানায় সত্যিই কোন বাড়ি আছে?

—নাঃ, পাগলটা তুমিই হয়েছ। আছে না তো চিঠিটা এল কোথা থেকে?

—তাই তো ভাবছি।

—ভাবনা চিন্তা ছেড়ে উত্তরটাই লিখে ফেল। লেখ—"বহুদিন প্রতীক্ষার শেষে তোমার চিঠি পেলাম। পেয়ে—"

—যাঃ! আমি পারব না ও সব লিখতে!

—না পারবি তো—যা প্রাণ চায় লেখ। এই কাগজ পত্র রইল, রইল—ঠিকানা-লেখা খাম। এক ঘন্টা পরে আসছি।

অনুভার জবরদস্তিতে চিঠি লেখা হল।

সংক্ষিপ্ত!

আবার এল সে চিঠির উত্তর। তেমনি নাম-সম্বোধনহীন, সংক্ষিপ্ত! তবে একটু যেন বেশি ভাবগম্ভীর।

আবার উত্তর গেল বি. টি. রোডের সেই দুর্বোধ্য গোছের নম্বরওলা বাড়িটার ঠিকানায়।

আবার এল উত্তর। লেটার-বক্সের চাবি অনুভার কাছে, কাজেই ফাঁস হয়ে পড়বার ভয় নেই।

প্রদীপ এলে অনুভা বলে—দিদির মুখের চেহারাটা কি রকম পাল্টেছে দেখেছ? ঠিক যেন নব-অনুরাগিনী রাধার ভাব! সত্যি তুমি একদিনও অভিনন্দন জানালে না।

—ক্ষ্যাপাপি কোর না! তোমার উচিত এসব বন্ধ করে দেওয়া। বড়রা জানতে পারলে দিদির অবস্থা কি হবে ভাব তো?

—রাধার যা হয়েছিল!

—তুমি বড় ভয়ঙ্করী। আগুন নিয়ে খেলা করা কি উচিত?

—খেলতে যদি হয় তো আগুন নিয়েই খেলব। সেখানেই ত থ্রিল্। মরা বাঘকে শিকার করে কোন্ সুখ?

—ও কথার মানে?

—মানে আবার কি! আমার ভয়ঙ্করীত্বের আর একটু নমুনা।

সেই রাত্রে প্রদীপ তার বিডন ষ্ট্রীটের বাসার তেতলার ঘরে বসে ডায়েরীতে লিখল—প্রতিভার কথা ধরিনা, ও বুঝতে পারেনি, ও বিশ্বাস করেছে। ও ভাবতে পারেনা যে ওর ভাগ্যে জুটেছিল একটা বাজে ব্লাফার। লোকটা শুধু পথশ্রমের নীরস ক্লান্তি দূর করে সরসতা আনতে চেয়েছিল খানিকটা প্রেম-অভিনয় করে। তার বেশি আর সাহস নেই তার। সাহস নেই গার্জেনদের হাতে পড়বার। র‍্যাবিশ!

কিন্তু অনুভা ?

ওকে কি শেষ পর্যন্ত ঠকানো যাবে ? ও যদি ধরে ফেলে ? ও কি বিশ্বাস করবে এ শুধু করুণা, শুধু মায়া।

প্রায় সেই একই সময় অনুভাও তার খাতার পাতায় লিখে চলেছিল, দিদি রীতিমত বিশ্বাস করে চলেছে। নিজের গল্পের জালেই আটকা পড়ে গেছে ও, আটকা পড়ে গেছে অলৌকিকের স্বপ্নে। হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি, ও একরকম অপ্রকৃতিস্থ। আত্মাকে ভাবতে ভাবতে লোকে যেমন ভগবানের মূর্তি দেখে, ভূতের ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে শুরু করে ব্রহ্মদৈত্য দেখতে, ওর অবস্থা হয়েছে তাই।

সংসার-বন্ধনের বাইরে গিয়ে খোলা আকাশকে দেখেই ওর মনে প্রথম অভাব-বোধটার সৃষ্টি। তাই সেই অবধি অনবরত ভেবেছে "যদি হঠাৎ—" এখন ভাবছে "হয়তো সত্যিই—" এটা একটা মনোবৈকল্যও।

কিন্তু প্রদীপ ?

ও ধরতে পারবে না তো, যে আমি সব ধরে ফেলেছি! ও জেনেছে আমিও ওর মতই দিদির গল্পটাকে সত্যি ভেবে বসে আছি, আর দিদির মত বিশ্বাস করছি। জানুক, তাই ভাল! দিদির সেই বঞ্চিত মূর্তির সামনে সত্যিই আমার লজ্জা করত, প্রেমে পড়তে প্রেমে পড়াতে।

তাছাড়া—এও তো একটা মজার খেলা।

হ্যাঁ, আগুন নিয়ে।

প্রদীপ দিদিকে মমতা করতে শুরু করেছে। করুক। মমতার আর একটা নাম তো মায়া ? আবার বিভ্রান্তিরও। তিনকাঠির মোজা বোনার মত তিনজনের হাতে যে মায়ার জালটা বুনে উঠছে, দেখিই না তার শেষ গড়নটা কি দাঁড়ায়।

মোড় ঘুরে আগের রাস্তাটা ছেড়ে নিজের বাড়ির রাস্তায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পা থেকে মাথা অবধি প্রচণ্ড রাগের একটা বিদ্যুৎ-শিহরণ খেলে গেল সুরঞ্জনের।

উঃ, কী নির্লজ্জ! এখনও—এত রাত্রেও! আজও বাদ যায় নি!

আজও ঠিক সেই একটি নির্দিষ্ট ভঙ্গীতে, বাড়ির সামনের সেই বিশেষ একটি নির্দিষ্ট জায়গায়, পরিচিত ভঙ্গীতে নিশ্চিন্ত বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করছে অতিপরিচিত সুদৃশ্য চকোলেট-কলার গাড়িখানা। যে গাড়িখানা দেখতে চায় না বলেই আজ অনেক—অনেক দেরি করে বাড়ি ফিরেছে সুরঞ্জন।

মসৃণ পালিশ করা গাঢ় চকোলেট রংটাও যে কারও কারও কাছে কত কুৎসিত মনে হতে পারে, কত চোখজ্বলা হতে পারে, সেটা বোঝা যেত, যদি—কেউ ঠিক এই মুহূর্তে সুরঞ্জন মল্লিকের চোখের দিকে তাকাত।

নিজের গাড়ির স্টীয়ারিংয়ে রাখা হাতখানা এক সেকেণ্ডের জন্য একবার অনড় হয়ে গেল সুরঞ্জনের। কোন কিছু করবার না থাকলেই যেমন অনড় হয়ে যায় মানুষ।

পরক্ষণেই কী একটা কঠোর প্রতিজ্ঞায় কঠিন মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ওঠে। সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় পরিচালিত গাড়িখানাকে উন্মত্তবেগে ছুটিয়ে সজোরে আছড়ে পড়া যায় না ওই-অলস-বিশ্রামে-এলায়িত অতিথি-গাড়িখানার ওপর? একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ বিধ্বস্ত করে জন্মের শোধ ওর গাড়িজন্ম ঘুচিয়ে দেওয়া যায় না?

নিজের অজ্ঞাতসারে হাতখানা নিশপিশ করতে থাকে, মন হিংস্র দুর্দান্ত হয়ে ওঠে, তবু অভ্যস্ত নিয়মে গাড়ির গতি শিথিল করে আনে সুরঞ্জন।...মন্থরগতিতে এসে থামে ঠিক চকোলেট রঙের পিছনে।

গাড়ি থামার শব্দেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে পুরনো চাকর বিশ্বরূপ। এসেই উঁকি দিয়ে দেখে পেছনের সীটটা।

হ্যাঁ, কিছু আছে।

প্রায়ই থাকে কিছু-না-কিছু।

আজকের জিনিসটা একটু বিশিষ্ট বটে। দুটো ফুলের তোড়া আর ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভারী ভারী একজড়া মোটা গোড়ে মালা।

জিনিসগুলো নামিয়ে নিয়ে বাবুর পিছনে পিছনে বাড়ির মধ্যে ঢুকে আসে বিশ্বরূপ। মুখের ভাবটা করুণ আর অপ্রতিভ অপ্রতিভ। যেন বাড়ির-দরজায় দাঁড়িয়ে-থাকা অবাঞ্ছিত গাড়িখানার জন্য সে বেচারীও কতকাংশে দায়ী।

ফুলকপির জোড়া কি ল্যাংড়া আমের টুকরি হলে বিশ্বরূপ সানন্দে বহন করে

নিয়ে যেত, কিন্তু আজকের জিনিসগুলো ওর কাছে কি অস্বস্তিকর।

বিশ্বরূপ ইতস্তত করে প্রশ্ন করে—এগুলো কোথায় রাখব বাবু?

সুরঞ্জন অবলীলায় উত্তর দেয়, রাখ্‌গে কোথাও। ফেলেও দিতে পারিস।

নির্দেশটা সুবিধের নয়। বিশ্বরূপ বোঝে, বাবুর মেজাজ খারাপ।

মনে ভাবে—হবে না? তবু নাকি এঁরা বাবু ভদ্রলোক, তাই শুধু মেজাজ খারাপের ওপর দিয়েই ফাঁড়া কাটে। তাদের ঘরে হলে?

মুখে কিছু বলে না। বাবুর পিছন পিছন উপরে উঠে সামনের দালানেই রেখে দেয়।

সভ্যভব্য সাজানো-গোছানো বাড়ি। ঘরের দরজায় দরজায় ভারী পর্দা ফেলা। ভিতরকার তীব্র বিদ্যুতালোকের জের চৌকো খানিকটা আলোর কার্পেটের মত দরজার বাইরে এসে স্থির হয়ে আছে।

সুরঞ্জন সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই একটা ঘরের পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে আসে লতিকা, সুরঞ্জনের স্ত্রী।

বোঝা যাচ্ছে, সুরঞ্জনের আসার বারতা তার অজ্ঞাত নেই।

গাড়ির শব্দ···জুতোর শব্দ···ছোট্ট একটু কাশির শব্দ···এইটুকুই যথেষ্ট। উৎকর্ণ কর্ণের পক্ষে এইটুকুই ঢের।···এর বেশি সাড়াশব্দ সুরঞ্জনের দিক থেকে পাবার আশাও নেই।

চাকর বাকরকে কখনও একটু চড়াগলায় ডাকাডাকি করে না সুরঞ্জন।

তবু নতুন করে যেন আশ্চর্য হয়েছে লতিকা।

দীর্ঘক্ষণ বিরহ-অন্তে পতিসন্দর্শনে উৎফুল্লমুখী লতিকা, সাগ্রহ আনন্দে বলে—এসেছ তুমি?···মোটেই কিন্তু টের পাই নি। এমন চুপচাপ ভাল ছেলেটির মত আস। নিজের বাড়িতে—বাড়ির কর্তা একটু দাপট দেখাতে জান না। ওই জন্যেই ত—চাকর-বাকরগুলো পর্যন্ত মানে না।···কই, হাত মুখ ধোবে না?

এতখানি উৎফুল্ল হাসি একফুঁয়ে নিভিয়ে দেওয়া যায়? দেওয়া সম্ভব? মানে—দেওয়া মনুষ্যজনোচিত?

সুরঞ্জন মৃদু হেসে বলে—এত তাড়া কি?

—বাঃ! তাড়া কি? বলতে মুখে বাধল না? কত রাত্তির করে এলে বলে তো? আর আমি সেই বিকেল থেকে প্রহর গুণছি।

সুরঞ্জন আর একটু হাসে।

হাসিটা কি বেশ মিষ্টি? কি জানি। মনে হল যেন তিক্ত কটু কষায়ের একটা

অপূর্ব সংমিশ্রণ।

হেসে বলে—যাক তবু মন্দের ভাল। প্রহর গুণছ। কড়ি-বরগা গুণতে হয় নি।

—কড়ি-বরগা!

ভারি যেন একটা নতুন কৌতুক কথা। রহস্য হাসির একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে যায় লতিকার মুখে-চোখে।

—কড়ি-বরগা গোণবার অবকাশ পেলেও তো বেঁচে যেতাম।...গলা নিখাদে নামিয়ে বলে—সন্ধ্যাবেলা একটু একা থাকব—সে জো আছে? ওই দেখোগে না তোমার বন্ধুরত্নটি ঠিক এসে বসে আছেন! যত ভাবছি এইবারে উঠে গেলে বাঁচি বাবা, ততই গল্প জমাচ্ছেন ভদ্রলোক। যত রাজ্যের—ওঁব সেই ছেলেবেলাকার কাহিনী কার যে শুনতে ভাল লাগছে! তা খেয়াল নেই। যাই বল, তোমার বন্ধুটি বাপু বড ডালল্।· উঃ, আজ এত বিশ্রী লাগছিল বসে থাকতে —হাই তুলে মরছি, তাও বুঝতে পাবে না।

যেন এটা নেহাৎই দৈবাতের ঘটনা। যেন প্রত্যহ এই আদুরে আদুরে গা-জ্বালা-কথা একঘেয়ে কথাগুলো শুনতে হয় না সুরঞ্জনকে।

এত কথার পর একটাও কথা না কওয়া অভদ্রতা নয় কি? অগত্যাই কথা খুঁজে বার করতে হয় সুরঞ্জনকে—কতক্ষণ এসেছে সিতাংশু?

—কতক্ষণ?—লতিকা মাথা দুলিয়ে বলে—তা—অনেক-ক ক্ষণ! সেই ত—সন্ধের খানিকটা পরেই। তোমাব সঙ্গে দেখা না কবে আর তোমার বন্ধু নড়ছেন না।

—তাই দেখছি—বলে ঘরের দিকে এগিয়ে যায় সুরঞ্জন।

লতিকা যেন উদ্বেগে ভেসে পড়ে—ঢুকে পড়বে একখুনি? তাহলেই হয়েছে। দুই বন্ধু বসলে এখন অর্ধেক রাত কেটে যাবে। একেবারে পোশাক-টোশাক ছেড়ে এলে হত না?

—নাঃ এখন আর বেশিক্ষণ থাকবে না—বলে পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে সুরঞ্জন।

—এই যে—কতক্ষণ?

একটু সম্ভাষণ করতেই হয় গৃহকর্তাকে, নিজের বাড়িতে অতিথি বন্ধুর অভ্যর্থনা করতে। না বললে ভাল দেখায় না। আবার এর চাইতে বেশিই বা কি বলা যায়?..."কি, খবর ভাল তো?"—এ কুশল প্রশ্নটাও দৈহিক বরাদ্দের অতিথির সম্বন্ধে বাহুল্য, হাস্যকর।

সিতাংশু কিন্তু হৈ হৈ করে ওঠে যেন কতকাল দেখে নি সুরঞ্জনকে।

—যাক আসা হল বাবুর! আমি তো ভাবছিলাম—আজ আর দেখাই হল না। এতক্ষণে বন্ধুর অদর্শনে ম্রিয়মান এবং সম্প্রতি বন্ধুর দর্শনে উৎফুল্ল সিতাংশু উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে বাকবিন্যাসে।—তুমি তো রাত দশটা অবধি আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফের, এদিকে ঘরের গৃহিণী তো পলকে পলকে ঘড়ি দেখছেন! উঃ সে যন্ত্রণা যদি দেখতে!—বলে লতিকার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে।

লতিকা কি বলতে যাচ্ছিল, সুবঞ্জন থামিয়ে দেয় যেন। ও বলে ওঠে—সে যন্ত্রণা না-দেখেও বুঝতে পারছি।

লতিকা ঈষৎ শুকনো মুখে বলে—যন্ত্রণা না হাতি, এত বানাতে পারেন সিতাংশুবাবু।

সুরঞ্জন অদ্ভুত একটু হেসে ওঠে—কেন, বানানো কেন? ঠিকই তো, যন্ত্রণা তো বটেই, দারুণ যন্ত্রণা। আচ্ছা যাক, ডাক্তার চ্যাটার্জি এসেছিলেন?

লতিকা ঘাড় কাৎ করে।

সিতাংশু যেন এ খবর নতুন শুনল। যেন আচমকা ডাক্তারের নামে উৎকণ্ঠায় ভেঙে পড়ছে। সকাতরে বলে—ডাক্তার কার জন্যে? অ্যাঁ? কই ন—ইয়ে—মিসেস মল্লিক এতক্ষণ তো কিছু বললেন না আমায়?

লতিকা স্বামীর প্রতি একটি সপ্রেম কটাক্ষ নিক্ষেপ করে স্বামীর বন্ধুকে বলে—বলবার মত হলে তো বলব? কালকে রাত্রে সামান্য একটু সর্দিজ্বর গোছের হয়েছিল, সকালেই ছেড়ে গেছে, তবু তাই নিয়ে তিলকে তাল করছেন আপনার বন্ধু। সকালে বাড়ি থেকে ফোন করে পান নি, অফিসে গিয়েই আবার ফোন করে তাকে ঠেলে পাঠিয়ে তবে শান্তি।

—তা মাঝে মাঝে কোনখান থেকে কিছু শান্তি আহরণের চেষ্টা করতে হবে বৈকি, কি বল সিতাংশু?

সুরঞ্জনের এই আলগা একটা প্রশ্নে সিতাংশু যে হঠাৎ পাংশু হয়ে যায় কেন কে জানে। শান্তি শব্দটাকে কেন্দ্র করে বোকার মত এমন কতকগুলো কথা বলে বসে, যার মানে বোধগম্য হয় না। ওর বক্তব্য বিষয়টা আন্দাজ করতে পারলে বলা যেত—ও যেন দার্শনিকের দৃষ্টিতে বলতে চাইছে—শান্তি নামক বস্তুটা কি সত্যিই কোথাও আছে? সোনার পাথর-বাটির মতই দুর্লভ বস্তু ওটা।

সুরঞ্জন এবারে একেবারে যেন প্রাণ খুলে হেসে ওঠে। একটু বেশিই হাসে বরং। হেসে হেসে বলে—একেবারে যে কারও কাছে ও বস্তুটা নেই, তাই বা বলা যায় কি করে? কি বল লতিকা? ধর—জগতের সবাইকে বোকা আর নিজেকে

চালাক ভেবে যারা নিশ্চিন্ত থাকে, জগতের সবাইকে অন্ধ আর নিজেদের চক্ষুষ্মান ভেবে যারা নির্ভাবনায় কাটায়, তাদের কাছে? তাদের কাছে তো অখণ্ড শান্তি!

—তোমার কথাগুলো এক এক সময় যেন হেঁয়ালির মত লাগে—বলে কালিবর্ণ মুখে উঠে দাঁড়ায় সিতাংশু।

—চললে?

—হ্যাঁ উঠি—বলে কথার শেষে বিলম্বিত একটা ড্যাস টেনে সিতাংশু দরজার দিকে পা বাড়ায়।

—আসছ তো কাল?

সহজ স্বাভাবিক প্রশ্ন আসে সুরঞ্জনের দিক থেকে। বন্ধুর কাছে বন্ধুর অনুরোধের সুরেই।

লতিকা এই অবসরে অতিথির সম্মান রক্ষার ভার নেয়। আদরে এলানো সুরে বলে—হ্যাঁ, আসবেন না আরও কিছু! কেন কি দায় পড়েছে ওঁর রোজ তোমার বাড়িতে আসতে? তুমি তো সাত জন্মেও যাও না। তাই কি বন্ধুর টানে একটু সকাল-সকাল ফিরতেই পারেন? সে তো সেই ক্লাবের আড্ডাটি সেরে তবে। না সিতাংশুবাবু, আপনি আসবেন না তো আর।

সিতাংশু, সুরঞ্জন, কেউ কোন কথা বলে না।

একজন ধীরে ধীরে চলে যায়, আর একজন একভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। অতিথিকে এগিয়ে দেবার প্রশ্ন ওঠে না।

আর পরক্ষণেই লতিকা প্রায় আছড়ে গিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে।

—কি হল তোমার?

যেন সকৌতুক প্রশ্ন করে সুরঞ্জন।

উত্তর পায় না।

মিনিট খানেক ধরে অভিমানিনী প্রিয়ার ক্রন্দনাবেগে উচ্ছ্বসিত মূর্তির পানে চেয়ে থেকে, বিনাবাক্যে তোয়ালেটা টেনে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় সুরঞ্জন এবং ধীরেসুস্থে স্নান প্রসাধন সব কিছু সেরে যখন ঘরে ফিরে আসে, তখনও তেমনি কাঁদছে লতিকা।

এবারে বিছানায় বসে পড়ে বলে—হল কি?

লতিকা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে—কেন তুমি এমন কর! কেন করবে?

—কি মুস্কিল! কেমন আবার করলাম আমি?

কেন তুমি রোজ রোজ যত ইচ্ছে দেরী করবে? কেন সন্ধ্যেবেলা বাড়ি আসবে না?

—তাতে আর এমন কি এসে যায় তোমার?

—কি এসে যায়, তা তুমি কি বুঝবে? নিত্যি তোমার ওই এক নিরেট-মগজ বন্ধুটি তোমার খোঁজে এসে জুটবে, যতক্ষণ তুমি না আস নড়তে চাইবে না, আর আমার প্রাণান্ত! নিজের অবসরটুকু মাটি, রোজ সেই চা দাও, জল-খাবার দাও, বিরক্ত লাগে না? অথচ—যতই বিরক্তিকর হোক—জলজ্যান্ত একটা ভদ্রলোককে কিছু আর স্পষ্ট করে বলাও যায় না 'তুমি বাপু বিদায় হও—'। যায়? বল না? ভদ্রতার দায় বলেও তো একটা কথা আছে? সত্যি তুমি বলতে পার—'আর জ্বালাতে এস না হে—' এঁ্যা?

—পাগল, তাই কখনও পারা যায়? পারলে তো—কিন্তু সে কথা যাক, হঠাৎ বিদায়ের প্রশ্ন কেন?

—কেন নয়? লতিকা ঠিকরে ওঠে। তোমার বন্ধুকে নিয়ে আমি এত জ্বালা ভোগ করতে যাই কেন? শুধু শুধু বাজে বাজে গল্প করতে বড্ড বুঝি ভাল লাগে আমার? তোমার ঠাকুর চাকরগুলিও হয়েছেন তেমনি চমৎকার। সংসারের দরকার, রান্নাবান্নার জন্যে কিছু যদি জিজ্ঞেস করতে এল, যেন মিলিটারী মেজাজে। যেন সাধ করে আমি সংসার ভাসিয়ে দিয়ে আড্ডা দিচ্ছি। আমার যা জ্বালা, তা যদি বুঝতে—

—বুঝি বইকি লতিকা, সুরঞ্জন হেসে ওঠে—বুঝি না আবার! অনেক জ্বালা তোমার। কিন্তু জ্বালার কথা আজ থাক, আজ হচ্ছে মালার দিন। ওঠ, উঠে বসো। প্রথাটা সব সময় রক্ষা করাই ভাল। কি বল?

উঠে গিয়ে পাশের ঘর থেকে ফুলের তোড়া দুটো এনে সাজিয়ে দেয় বিছানার দুপাশে। আর দুগাছা মালাই চাপিয়ে দেয় লতিকার গলায়।

ফিক্ করে হেসে ফেলে লতিকা—বাঃ দুটোই আমাকে কেন? তোমার প্রাপ্যটা তুমি নাও?

গলা থেকে একগাছা খুলে নিয়ে সযত্নে স্বামীর গলায় পরিয়ে দিয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে।

আজ ওদের বিবাহ-বার্ষিকী।

—আরে দূর, এ সব আবার আমায় কেন, এ তোমার শ্রীকণ্ঠেই মানায়—বলে নিজের মালাটা খাটের ছত্রিতে ঝুলিয়ে দেয় সুরঞ্জন। ঝুলিয়ে দিয়ে বিছানায়

বসে থাকে চুপচাপ।

তা মানুষ কি একেবারে চুপ করে বসে থাকতে পারে ?

অন্তত কিছু ভাবেও। তাই হয়তো সুরঞ্জন ভাবতে থাকে—পুষ্পমাল্যের মাধ্যমে লোহার বাসরেও বিষকীট প্রবেশ করতে পারে, অথচ এত অজস্র পথ খোলা থাকতে ও ফুলগুলো কীটশূন্য থেকে যায় কেমন করে ?

এত বড় তুগাছা মালায় কত ফুল, সবগুলোই অম্লান নির্মল ?

ফুলের আশ্রয় ছেড়ে কীটেরা আজও গভীর আরও গোপন আশ্রয় খুঁজে পেয়ে গেছে বলেই কি ?

ছোটলোক

হুড়মুড় হুড়মুড় হুমদাম হুদ্দাম। পড়ছে ইঁট রাবিশ, পড়ছে চুনবালির পলস্তারার ভারী ভারী থান, পড়ছে নকশা-কাজের টুকরো। ফুল-লতা, মাছ হাতি পাখ-পাখালি। বিরাট অট্টালিকার ফাটল-ধরা দোতলা ভেঙে নামানো হচ্ছে।

না, এত বড় বাড়ি মেজে ঘষে মেরামত করে খাড়া করবার মত পাগলামি নেই বাড়ির মালিকের, শুধু ওর উদ্ধত মাথাটাকে ছেঁটে নিজের আয়ত্তে আনার চেষ্টা।

সাড়ে তিন হাত চওড়া ভিতের দেওয়াল ভেঙে নামাতে মুহুর্মুহুঃ ভূমিকম্পের প্রলয়-শব্দ তাণ্ডব। তার সঙ্গে পাড়া-অন্ধকার-করা'এক নারকীয় ধুলোর ঝড়। তু-চার হাজার পায়রা বাস্তহারা হল, মরল হাজার তু-হাজার চামচিকে। হয়তো বা অনেকগুলি মর-মর হয়েও মরল না, নতুন করে আশ্রয় খুঁজে নিল স্তূপীকৃত ভাঙা ইঁটের খাঁজে খাঁজে।

পাড়ার ছেলেগুলি আর কোনখানে নেই, মা-বাপের সাবধানবাণী নস্যাৎ করে স্কুল পালিয়ে ঘুরছে এরই আশেপাশে। কত দুর্লভ রত্নের হাট এখানে। যে-সে বাড়ি তো ভাঙা হচ্ছে না, ভাঙা হচ্ছে বাবুদের বাড়ি। একদা যে বাড়ির দরজা-জানলার খিলেনে খিলেনে ছিল সাতরঙা কাঁচের রামধনুচ্ছটা, যার পাখিদার জানলার প্রত্যেকটি শার্সির কাঁচে কাঁচে ছিল লক্ষ্মী-সরস্বতী, কৃষ্ণ-রাধা, আর দশ-মহাবিদ্যার ছাপ, যার দেওয়ালে-দেওয়ালে রঙিন ইটালিয়ান টালির বর্ডার।

কালের হাওয়ায় সব শোভা-সৌন্দর্যই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তবু লুপ্ত শিল্পচিত্রের লক্ষ্মীভাণ্ডার। তবু পুরনো ঐতিহ্যের পাকা দলিল।

সাত মহলা অট্টালিকা।

তবে সব মহল এক ঝোঁকেই তৈরি হয় নি। প্রয়োজনের তাগিদে চক-মিলানো মূল ইমারতের গায়ে-গায়ে বেড়েছে নতুন মহল, বেড়েছে ঘর দালান জাফরি খিলেন, পাল্টেছে নক্‌শার ভোল। তখন মল্লিকবাবুদের কি বোলবোলাও! নামের ডাকে গগন ফাটে! যতদিন গড়নের কাজ চলেছিল, ততদিন কাজ করেছিল লক্ষ্ণৌ ওস্তাদ মিস্ত্রী জাফর আলি, জাফরের ছেলে বাহার আলি, বাহার আলির ছেলে লতিফ।

তারপর এল ভাঙনের কাজের পালা।

ওতে আর মিস্ত্রীর দরকার হয় নি। বাবুদের বোলবোলাওয়ে ভাঙন ধরিয়েছিল তাদের ভাগ্য আর দুর্মতি, বাড়ির ভাঙনের ভার নিয়েছিল প্রকৃতি। লতিফের ছেলে ফৈজু বাবুদের শেষ কাজ করেছিল পার্টিশনের দেওয়াল তুলে। দেওয়াল তুলেও বিবাদ মেটে নি, অতএব প্রবল পক্ষ চলে গেল শহরে জাঁকিয়ে বসতে এবং দুর্বল পক্ষ দু-বেলা তাদের শাপ-শাপান্ত করে, আর তাদের 'নির্বংশ' হবার মানতে শ্মশানকালীর পুজো করে নিজেই একদিন মরল লিভার পেকে। বিধবা বৌটা বাপের বাড়ি পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল। জীবনে আর এ-মুখো হল না। তদবধি মল্লিকদের এই সাতমহলা প্রাসাদ চাবিবন্ধ পড়ে আছে।

রাজবাড়ির প্রথম রাজমিস্ত্রী জাফর আলিকে নাকি এই বংশেরই বড়কর্তা নবীনচাঁদ মল্লিক লক্ষ্ণৌ থেকে আনিয়েছিলেন, নতুন বড়লোক হয়ে। আনিয়ে বসত করিয়েছিলেন, খাজনা-মাপ-করা জমি দিয়ে, আর বাৎসরিক বৃত্তি দিয়ে। অলিখিত দলিলে খত লিখিয়ে নিয়েছিলেন কেনা গোলামের। আর কোথাও খাটতে যেতে পাবে না জাফর, গেলে মল্লিকবাবুদের মান যাবে।

কাজ তো আছেই সব সময় কিছু না কিছু। টুকটাক এটা-সেটা।

নেহাৎ যখন কাজ থাকবে না?

তখন বসে বসে তামাক খাও ফুরুত ফুরুত, বিবি ছাওয়াল নিয়ে সোহাগ কর, সোহাগ না পার কাজিয়া কর, ব্যস। আর কিছু নয়, আর এদিক-ওদিক তাকাবে না।

বাবুদের মান যখন আপনিই গেল তখন রাজবাড়ির রাজমিস্ত্রী ফৈজু বাধ্য

হয়ে নিজের মান খুইয়ে গ্রামের এখানে-ওখানে কাজ ধরল। করল অনেকদিন অবধি। দুই ব্যাটা পট পট করে মরে যাবার পর, আর তাদের বৌ দুটো আলাদা ঘর বাঁধতে যাবার পরও করেছে, কাজ করে মানুষ করেছে মেয়ের ঘরের নাতি জামিরকে। শৈশবে মা-মরা জামির, ফৈজুর শেষ বয়সের মেয়ে সুফিয়ার ছেলে।

ঠাকুর্দা বাহার মিস্ত্রীর মত নাকি হাত ছিল ফৈজুর, কিন্তু জীবনে কোন বাহারের কাজের বায়না পায় নি বেচারা। এ-গ্রামে, কি আরও পাঁচখানা গ্রামে, মল্লিকবাবুদের মত এত পয়সা কার আছে যে, মাসের পর মাস বছরের পর বছর মিস্ত্রী পুষে দেওয়ালের কার্নিশে নক্‌শা আঁকাবে ?

মোটামুটি কাজই করে এসেছে ফৈজু জীবনভোর। এখন আর করে না। এখন আর নড়তেই পারে না। চোখে পড়েছে ছানি, চুল দাড়ি শনের নুড়ি, পিঠ দুমড়েছে, মাজা ভেঙেছে। গায়ের চামড়াগুলি কুঁচকে কুঁচকে ঝুলে না পড়ে গায়ের উপর সেঁটে বসেছে—রোদে শুকোন কসি আমের মত। বুড়ো হয়ে গেছে ফৈজু, বেজায় বুড়ো।

কিছুদিন আগে পর্যন্তও এক গাছা লাঠি ঠুক-ঠুকিয়ে একটু-আধটু বাইরে বেরিয়েছে, এখন তাও না। সারাদিন ঘরে বসে তামাক টানে আর ঝিমোয়। লাঠিগাছটা রসুই ঘরের কোণে রেখে দিয়েছে জামিরের বৌ চাঁদবেগম,—বেড়াল তাড়াতে।

হঠাৎ একদিন একটা ব্যাপার হল।

তিন-পুরুষে ভিটে-ছাড়া মল্লিক বংশের বর্তমান বংশধর সুধাংশুমোহন হঠাৎ একদিন মোটরযোগে দেশে এসে হাজির হলেন। এখন সুধাংশুমোহন লক্ষ্মীছাড়া নন, বরং রীতিমত লক্ষ্মীমন্তই। নিজের চেষ্টায় লক্ষ্মীমন্ত। কাজেই লক্ষ্মীকে বেঁধে ফেলবার অনেক প্যাঁচ তাঁর মাথায় খেলে।

তিনি ভেবে দেখেছেন, এই ঘর-আকালের বাজারে, ভাঙা হোক পচা হোক ঘুণ-ধরা আট-কাটা যা-ই হক, দুশ-ঘরা বাড়িখানাকে বেকার বসিয়ে রাখার কোন মানে হয় না। কাজে জুতলেই টাকা আনবে ঘরে। কিছু কায়দা করলেই দুশ-খানা ঘরে এক-শ-ঘর বাস্তুহারাকে ঠাঁই দেওয়া যায়। ওরা তো আর ভালমন্দ বিচার করবে না, বিচার করবে না নতুন পুরনোর। মাথার উপর আচ্ছাদন, গায়ের পাশে দেওয়ালের ঘের, শুধু এইটুকু পেলেই ওরা বেঁচে যাবে। চক-মিলোনো চার-দালান জুড়ে বাঁশ আর করোগেট টিন দিয়ে একটু একটু খোপ কেটে দিলেই

চলবে। নবীনচাঁদ মল্লিকের বাগানবাড়ির বারান্দায় যেমন খোপ-কাটা ছিল পায়রাদের জন্যে।

কতটা জল ঢাললে কতখানি জল বাঁধা যাবে, তার একটা হিসেব কষে নিয়ে পুলকিত চিত্তে একদিন মোটরে চড়ে দেশে এলেন সুধাংশুমোহন। এবং গ্রাম-সম্পর্কে জ্ঞাতিভাই রাজমোহনকে ডেকে বিনীত আবেদন জানালেন, 'তোমার ভরসাতেই একটা কাজে হাত দিতে এসেছি রাজা। এখন আমাদের মিস্ত্রীঘরকে তো একবার খবর দিতে হয়। ভেবেছিলাম কণ্ট্রাক্টর লাগাব, কিন্তু হাজার হোক, ওরা আমাদের সাতপুরুষের প্রজা—ওদের বঞ্চিত করে—'

জ্ঞাতি-ভাই রাজুর কলকাতায় যাওয়া-আসা আছে, সেই সুবাদে পরিচয়টা রয়েছে। কাজেই ঈর্ষার জ্বালা বুকে চেপে মুখে হাসি টেনে বললেন, 'যাক, এতদিনে তাহলে ভিটেকে মনে পড়েছে দাদা? দেখে বড় আনন্দ হল। তবে ভিটের যা অবস্থা হয়েছে, এখন একে মেরামত করে তোলা—'

দাদা কুণ্ঠিত বিনয়ে বলেন, 'ঠিক মেরামত করে তোলা নয় রাজু, সে-ক্ষমতা কোথায়? কর্তাদের মত প্রজা-ঠেঙানো পয়সা তো নয়? খেটে-খুটে খুঁটে জড়-করা পয়সা। মেরামত তেমন করে কিছু করব না। ভাবছি দোতলার ওই বড্ড ডেঞ্জারাস দেওয়াল কখানা নামিয়ে দিয়ে, মারাত্মক অবস্থাটা কিছু সহনীয় করে নিচের তলাটায় তাপ্পি-তুপ্পি দিয়ে কিছু ভাড়া বসিয়ে দেব। হাজার হাজার লোক আশ্রয়ের অভাবে স্টেশনে পড়ে আছে রাজু, চোখে দেখা যায় না। যার যতটুকু সাধ্য সেটুকু না করাও পাপ।'

বাড়ি মেরামত করাতে আসা নয় শুনেই রাজুর ভারী নিশ্বাসটা হালকা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল, এবার সঙ্কল্পের শেষ শুনে একটু চোরাগোপ্তা হাসি উঁকি মারল ঠোঁটের কোণে। তবে রাজমোহন সাবধান হতে জানেন, গদ গদ কণ্ঠে বললেন, 'দাদা, চিরদিনই আপনি মহানুভব।'

'কী যে বল রাজু—' সুধাংশু প্রতিবাদ তুললেন, 'সে-সব কিছু নয় রে ভাই, জগতের সবই স্বার্থঘটিত। তোমার দাদা তো আর জগৎ-ছাড়া নয়? এতে আমারও তো লাভ রয়েছে। তবে সবই তোমার ভরসা। ভাড়াটে বসানো, আদায়-পত্তর করা, সবই তোমার ঘাড়ে চাপাব।'

জলে বাস করতে এসে কুমিরের তোয়াজ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

রাজু মনে মনে বললেন,—'কেতাত্থ করবেন,' মুখে বললেন, 'সে আপনি কিছু ভাববেন না দাদা।'

'সেই আশ্বাসেই তো এ-কাজে হাত দিতে আসা। এখন হেড্ মিস্ত্রি কাউকে ডাকলে একটা এস্টিমেট হয়ে যায়।'

'হেড? হেডমিস্ত্রি? আলিদের ঘরে হেড আর আছে কে? এক তো ফৈজু। তা সে বেহদ্দ বুড়ো হয়ে গেছে, জ্ঞানগম্যি বলতে কিছু নেই। তার দৌত্তুর জামির কাজ-টাজ করে বটে, হাতও ভাল ছোঁড়ার, যতই হোক ওস্তাদের বংশ তো। তবে ছেলেমানুষ।'

'ছেলেমানুষ? তাই তো! কত বয়েস?'

'মানে জোয়ান হয়েছে। পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে—'

'ঠিক আছে। তাকেই একবার ডাক দিকি। না পারে অন্য ব্যবস্থা করব। পরে দুষতে পারবে না।"

জামির এসে সব শুনল। সব মানে বাবুর মতলব।

মজুর খরচা করতে রাজী নয় কর্তা, দুধ বেচে গরুর খোরাকি-তোলার কায়দা। ভাঙা মাল সব জামির নিক, কর্তা শুধু 'মাথামারা গাঁথনির' বিলিতি মাটিটা দেবেন। আর দেবেন কিছু টিন, বাঁশ, পেরেক, দড়ি, তার।

না, দক্ষিণা-টক্ষিণা কিছু নয়। বিবেচনা করুক জামির, না পোষায়, কলকাতার কনট্রাক্টর আছে।

দুমড়ে পড়া বুড়ো-দৈত্যের মত বিশালদেহ বাড়িটার দিকে চোখ তুলে একবার তাকাল জামির। দেখল সাড়ে তিন হাত ভিতের দেওয়ালের ইঁটের ওজন, দেখল দামী সেগুন কাঠের পাখি, খড়খড়িদার দু-হাত উঁচু জানালা-দরজাগুলো, মনশ্চক্ষে দেখল ভিতরের বনেদী লোহাকাঠের কড়ি-বরগা আর সরদালের রাশি!

পচে গেছে, উইয়ে ধরেছে, রং জ্বলেছে, ঘুণ ধরেছে, তবু মরা হাতি লাখ টাকা! কে জানে এই সুযোগে বাবুদের লক্ষ্মীর হাঁড়ি-ভাঙা খোলামকুচি থেকে জামিরের ঘরে সৌভাগ্যের বেদী গাঁথা হবে কি না।

রাজী হয়ে গেল জামির।

কর্তা ভাবলেন, ঠিক আছে। ওই ভাঙা ইঁট আর পচা কাঠের বোঝা চুরি সামলে আগলে রেখে দাঁও মারবার মত খদ্দেরের আশায় কোথায় ঘুরে মরতে যাব। ঘর থেকে পয়সা বার করতে হবে না, এই ঢের।

ঘটনাস্থল থেকে জামির সরে যেতেই রাজমোহন হাত চুলকে চুলবুলিয়ে উঠলেন, 'করলেন কি দাদা? একেবারে দানছত্তর খুলে বসলেন? এ-মতলব আগে আমার কাছে ভাঙলে আমি যে—ইঃ ইঃ ঈস! কথায় বলে মরা হাতি! কি

আর বলব, বিশ্বাস করে, যদি আমার হাতে দিতেন, এর থেকে আপনাকে লাখ টাকা তুলে দিতে পারতাম। ছি ছি! গিয়ে পড়ল কিনা ব্যাটা মেলেচ্ছর হাতে!'

দাদা মনে মনে ব্যঙ্গহাস্যে বললেন, 'বড্ড আপসোস হচ্ছে, না?' মুখে উদার অমায়িক হাস্যে বললেন, 'যেতে দাও ভাই, যেতে দাও! চিরকালের প্রজা ওরা, না হয় পেলই কিছু।'

দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছিল ফৈজু, আর কাসছিল খক খক করে। বেড়ার দরজা ঠেলে ঢুকল জামির। বুড়ো হাতের হুঁকোটা নাতির দিকে এগিয়ে দিয়ে লোমশ ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল, 'রাজুবাবু ডেকেছেল ক্যান রে?'

পাঁচপুরুষের বাসে লখ্নউয়ের আলি সাহেবের বংশ পরিষ্কার বাঙালী হয়ে গেছে। বলতে গেলে প্রায় আধাআধি হিন্দুই হয়ে গেছে। দাঙ্গার সময় পালায় নি, হাত জোড় করে বলেছে, "রাখতে হয় রাখ, কাটতে হয় কাট।"

দাদামশায়ের প্রশ্নের জবাব চট করে দিল না জামির, এটা চট করে দেবার নয়ও। সংবাদের মধ্যে অপ্রত্যাশিতের বিস্ময় আছে, অজানা লাভের রোমাঞ্চ আছে, রহস্য আর বৈচিত্র্য আছে। অতএব আরও কৌতূহল জাগাতে অন্তত মিনিট দুয়েক নিঃশব্দে তামাক টানা যায়।

'কী হল? গোঙা বনে গেলি যে?'

'বলছি।' জামির থিতিয়ে জিরিয়ে হুঁকোটা নামিয়ে রেখে টিপে টিপে বলে, 'রাজুবাবু নিজের কাজে ডাকে নি, ডেকেছে অন্যের কাজে।'

'বলি সেটা আবার কোন সুমুন্দির?' বয়েস হয়ে অসহিষ্ণুর একশেষ হয়ে গেছে বুড়ো।

'সেটা হচ্ছে বাবুদের বাড়ির কর্তার।'

'বাবুদের বাড়ির?' ফৈজু ঘোলাটে চোখ দুটো ঠিকরে বলে, 'কোন বাবুদের বাড়ির?'

'দশা বুড়োর! 'বাবু' আবার এ তল্লাটে কটা ছেল? তোদের মল্লিক-বাবুদের পোড়ো ভিটের বাবু। কলকেতা থেকে হাওয়া-গাড়ি চেপে ভু-স্ করে এল, কাজকামের কথা পাকা করে ভু-স্ করে চলে গেল।'

ফৈজুর মরা গাঙে কি হঠাৎ জোয়ারের স্পন্দন? নইলে ভাঙা কোমর সোজা হয়ে উঠল কী করে? কাঁপা গলায় বলল, 'কলকেতা থেকে হাওয়া-গাড়ি চেপে বাবু এসেছেল মিস্তিরির খোঁজে? ভিটে সারাবে?'

'সারাবে!' জমির তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলে, 'হুঁঃ তাহলে আর ভাবনা ছেল না। ভাঙবে গো, ভিটে ভাঙবে।'

'ভিটে ভাঙবে!' আধ হাত নিচু হয়ে গেল ফৈজু। হাপরের মত একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'এতকাল পরে সায়েব হাওয়া-গাড়ি চড়ে গেরামে এলেন ভিটে ভাঙতে? তোবা তোবা!'

'সবটা ভাঙবে না, পশ্চিমের দালান-কোঠাটা ভেঙে নাবাবে। ভালই করছে। মানুষ মারা কল হয়ে রয়েছে বৈ তো না। আটফাটা হয়ে ঝুলছে, কেনদিন আচিত্তির হয়ে পড়ে খেলুড়ে ছেলেপেলে গুলানের প্রাণ বধ করত।'

ফৈজু তার শীর্ণবিশীর্ণ কুৎসিত মুখখানাকে ঘৃণায় আরও কুৎসিত করে বলল, 'তা হঠাৎ বাবুর এমন ধম্মে মতি হল যে?'

জামির মুচকে হেসে বলে, 'শুদু শুদু না। নিচতলার রুমগুলান ভাড়া খাটাবে।'

'ভাড়া খাটাবে? সাতপুরুষের ভিটেয় ভাড়া খাটাবে?' ফৈজুর গায়ে কে কে যেন একপাল কেন্নো ছেড়ে দিয়েছে। তাই ছিটফিটিয়ে উঠল সে! 'কেন? হালার পুতের চুলোয় হাঁড়ি চড়ছে না বুঝি!'

'কেরপা গো দাদাজান, কেরপা!'

কালো চকচকে মুখে ছুরির ফলার মত চকচকে একটু হাসি খেলে যায়। এদের যারা নির্বোধ ভেবে বোকা বোঝাতে আসে তাদের কারও চোখে এ-হাসি পড়লে লজ্জায় একেবারে অধোবদন হত সন্দেহ নেই।

ফৈজু তার মুখের চেহারায় গায়ে-কেন্নো-লাগার অভিব্যক্তি ফুটিয়ে রেখেই বলে, 'কেরপা আবার কোন সুমুন্দিকে?'

'আহা গো বোজছ না? দেশ-ভিটে ছেড়ে যেনারা এখেনে এসে ভেসে বেড়াচ্ছে, তেনাদের! বাবুদের দু-শখান রুম পড়ে থাকতে ওরা ভেসে বেড়াবে?' আর একবার হেসে উঠল জামির হা হা করে।

দোমড়ানো পিঠ খাড়া করে বুড়ো হঠাৎ দাঁড়িয়ে ওঠে। ঝাঁঝালো গলায় বলে, 'ওঃ বাবু তালে এবার ভিটেয় ঘুঘু চরাতে এসেছে।'

'ছেড়ে দে দাদাজান, ছেড়ে দে। তোরই বা কী, আমারই বা কী?'

ছানি-পড়া ঘোলাটে চোখের কালো কোটরে জ্বলে উঠল দু ডেলা আগুন। জোর দিয়ে কী একটা বলতে গিয়ে বলতে পারে না ফৈজু, দম-আটকানো কাসি এসে কণ্ঠরোধ করে ধরে। শেষ পর্যন্ত বসে পড়ে বলে, 'আমারই বা কী? তা

তুই বলতে পারিস বটে! তুই আর কী দেখলি! ওই এমারত আমার বাপদাদার পাঁজিরার হাড়, বুঝলি?'

জামির অবশ্য এ-ভাবুকতায় বিচলিত হয় না। বলতে যাচ্ছিল, 'রাজের কাজই মশলা মেখে ইট গাঁথা—রাজ্যময় গেঁথে বেড়াচ্ছে সবাই। তার মধ্যে পাঁজরার হাড় আবিষ্কার করতে গেলে চলবে কেন?' বলল না। বুড়োর রকমসকম দেখে আর খেপাল না, হুঁকোটা ফের তুলে নিয়ে টানতে লাগল, আর ভাবতে লাগল। বিরাট একটা দায়িত্বের কাজ ঝোঁকের মাথায় হাতে নিয়ে ফেলেছে, কিভাবে কাজ আরম্ভ করবে রীতিমত করে ভাবতে হবে বৈ কি।

ফৈজু একটু নড়ে চড়ে বসে বলে, 'তোর সঙ্গে সলা তাহলে এমারত ভাঙার?'

'হুঁ!'

'আমার মাথার 'কিরে' জামু, তুই যদি ওই শয়তানের কাজ নিস।'

বুড়ো ফৈজুর মাথার দিব্যিতে খুব বেশি বিচলিত দেখা যায় না জামিরকে। উড়িয়ে দেবার ভঙ্গিতে বলে 'ভেঙেই ত যাচ্ছে, দুদিন বাদে তামাম কাটামোখানাই তো ভূমিসার হয়ে যাবে।'

'যাক্! খোদায় নিলে সয়, মানুষে নিলে সয় না।' নিজের বুকে থাব্‌ড়া মেরে বলে বুড়ো, 'এই কাটমোখানাও তো জের্ণ হয়ে গেছে, ধাক্কা মেরে ফেলে খতম করতি পারিস?'

'ধ্যেত!'

'তাহলে?'

'তুই থাম্। ক্যানক্যান করিস না।'

ফৈজু জানে জামির রোখা ছেলে। বাবুর সঙ্গে পাকা কথা যদি কয়ে এসে থাকে, সে-কথার নড়চড় করবে না। তাই একটু ঝিমিয়ে গিয়ে বলে, 'প্রাণডার মধ্যি কেমন করে রে জামু! ছোটকালে ওই বাড়িতে কত বোলবোলাও দেখেছি। কত রমরমা, কত দবদবা! তবু তখন কলসির জল তলায় ঠেকেছে, পিদ্দিপের পলতে জ্বলছে।'

বুড়ো যেন সুদূর অতীতে হারিয়ে যায়। বিড় বিড় করে বলে, 'মেজবাবুর শখের মেজাজ, ঘরের সামনে জাফরি-দালান তুলল। আমি তখন এই এট্টুকু। দাদাজানের সাথে সাথে গিয়ে বসে থাকি। হাঁ হয়ে তেকিয়ে তেকিয়ে দেখি কেমন করে মশলা মাখে, কেমন করে ঘুরিয়ে ইট গেঁথে গেঁথে খিলেন তোলে, কেমন করে ছাদের গায়ে নক্‌শা আঁকে। দাদাজানের নামের ডাকে তখন গগন ফাটে।

নাম শুনে ভিন্‌গাঁ থেকে লোক এসেছে ফুসলে নে যেতে। বলে, ডবল রোজ দেব, ছিটের বালাপোষ দেব, হ্যান ত্যান,—বাগানবাড়ির কার্নেশে নক্‌শার কাজ করে দিতে হবে। দাদাজান মাথা নেড়ে বলল, নেমক খেয়েছি, হারামি করতে পারবু নি। আমি কেনা নফর। তা বাবুরাও মান-মর্যাদা রাখত। দালালের বাহার দেখে মেজকর্তা আহ্লাদে ডগমগ হয়ে গা থেকে শালের জোড়া খুলে বাহার মিস্তিরীর গায়ে পরিয়ে দিল। সে-সব একদিন গেছে।'

জামির অবশ্য বুড়োর এই ভ্যানভ্যানানিতে কান দেয় না। সে তখন মনে মনে লাভ-লোকসানের হিসেব কষতে থাকে।

কদিন পরেই ঝিমিয়ে-পড়া গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনে তরঙ্গ ওঠে, ভূমিকম্পে ভিত নড়ে। সকাল থেকে সন্ধে অবধি তাণ্ডব শব্দ ওঠে, হুড়মুড়, দুমদুম, দুদ্দাড়াম। পায়রা ওড়ে, চামচিকে ওড়ে, ওড়ে সুরকি ধুলোর আঁধি। গ্রামের লোকের মুখে আর কোন কথা নেই, শুধু হায় হায়। এতদিন পরে নতুন করে আবার মনে পড়ছে সবাইয়ের বাবুরা কি ছিল, বাবুদের কি ছিল! প্রত্যক্ষদর্শীর দাবিদার বড় কেউ নেই, সবই শোনা কথা, তার উপরে অনেক রং চড়িয়ে নাতিপুতিকে বলে তারা।

মিস্তিরীদের ঘর বাবুদের বাড়ির পিছনে, পুকুরের ধারে।

শব্দে শব্দে নাকি কে জানে, ফৈজু আজকাল আর দুপুরে ঘরে টিঁকতে পারে না। ঝিমোয় না ঘুমোয় না, হুঁকো হাতে দাওয়ায় বসে থাকে। উঠোনের সামনের তেঁতুল গাছটা ঝির ঝির করে নড়ে, বাতাস বয় উড়ো-উড়ো, মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধ পরিবেশে কালের ব্যবধান হারিয়ে যায়। দেখতে পায়, ভারায় বসে বাহার মিস্ত্রী বড় দরজার মাথায় নক্‌শার কাজ করছে। জোড়া পরী! 'উবলো উবলো' নিটোল গড়ন নিয়ে দেয়ালের গায়ে সেঁটে আছে উড়ন্ত ভঙ্গিতে। ডানায় গাঢ় নীল রঙের প্রলেপ, কটিচ্যুত বসনের রঙ উজ্জ্বল রক্তিমাভ।

নিচেয় দাঁড়িয়ে ঊর্ধ্বমুখী এক মুগ্ধ বিহ্বল বালক। পরীর রূপে মুগ্ধ, দাদাজানের কৃতিত্বের মহিমায় মুগ্ধ। ঊর্ধ্বমুখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘাড়ের শির টন টন করে, চোখ জ্বালা করে ওঠে, তবু নড়ে না।

আর এক মহিমময় মেজবাবু। রঙের জেল্লায় আগুন ঝরে, বাবরি-কাটা চুলের কেয়ারিতে যেন সিংহের কেশরের ভঙ্গি। লাল লাল চোখ, দীর্ঘাকৃতি দেহ —দেখলে ভয়ও করে, সমীহও আসে। চোখ মেলে চাওয়া যায় না, তবু চাইতে ইচ্ছে করে। ছোট ছেলেটার ঊর্ধ্বমুখী এই অভিভূত দৃষ্টি দেখে হেসে হেসে

বলতেন, 'বাহার, তোর নাতির একটা পরীর দরকার হয়েছে। ওকে ওর মনের মতন একটা পরী গড়ে দিস।'

স্বপ্নভঙ্গ হয়। জলপানির টাইমে জামির আসে ভাত খেতে। দূর থেকে দেখেই ফৈজু হাঁক পাড়ে, 'চাঁদবেগম ভাত আন, জামু এল।' চাঁদবেগমের কিন্তু এ-সময় বুড়ো জেগে থাকলে ভাল লাগে না। বুড়োর ভ্যানভ্যানানিতে ওর আর জামিরের সঙ্গে দুটো কথা কইবার ফুরসত হয় না।

তা আজকাল রোজই এ-ব্যাপার ঘটছে।

পুকুর থেকেই হাত-পা ধুয়ে আসে জামির, এসেই বসে পড়ে গামছা পেতে। চাঁদবেগম এনামেলের শানকিখানায় ভাত ঢালে বেপরোয়া, মুহূর্তে উড়েও যায়।

ফৈজু খানিকটা কেশে নড়ে চড়ে বসে ভাঙা-ভাঙা গলায় বলে, 'কাজ কতদূর এগলো ?'

জামির মাথা নেড়ে বলে, 'কোথায় ? এক একখানা ভিত কি চ্যাওড়া। মাথা নাবাচ্ছে আর যেন এক-একটা দাওয়া বেরোচ্ছে। কি কাজ-কামই করে থুয়েছেল কর্তারা। উঃ।'

'হুঁ—উ ! ও আর তোদের একেলে ফঙ্গবেনে কাজ নয়। কাদার গাঁথনি দিয়ে এমন দ্যাল তুলত যে, পিরথিমীর বুকে বজ্জর হয়ে বসত।'

জামির মুচকে হেসে বলে, 'কাদার গাঁথনির গুণ কত ! ভিতরে অঙ্গে-সঙ্গে বট-অশত্থের জঙ্গল।'

কথার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ায় ফৈজু। হাতের হুঁকোটা নিয়ে এমন করে ফুঁসে ওঠে, মনে হয় মারবে বুঝি। তারপর জামিরই যেন অপরাধী এইভাবে খিঁচিয়ে বলে ওঠে, 'বলতে সরম লাগে না—হালার পুত হালা ? ভিটেকে শ্যাল-কুকুরের ভাগাড় করে ফেলে রাখলে জঙ্গল গজাবে না ? এই যে স্মুন্দির দেহের এত গুমোর, ভাত-পানি না দিলে টিঁকবে ? গাঁথনির অপরাধ ? থু ! থু !'

চাঁদবেগম ওদিক থেকে চোখ টেপে, বুড়োকে আর খেপিও না।

জামির পিঠে হাত-বুলনো স্বরে বলে, 'তা বটে ! বাবুদেরই অন্যায়।'

বেরোবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল জামির।

তেঁতুলপাতার ঝিলিমিলির দিকে উদাস-উদাস ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে ফৈজু বলে, 'এর আগে বাবুদের বাড়ির ভেতরে তো কখনও সেঁদোস নাই, জাফরি দালানের

ভেতরডা দেখলি ?'

জামির ফতুয়ার বোতাম আঁটতে আঁটতে বলে, 'আর তোর জাফরি দালান ! সে তো খতম !'

'অ্যা !'

ফৈজু দুরন্ত উত্তেজনায় টাল খেতে খেতে আর কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়েই বসে পড়ে বলে, 'কী কইলি ? কইলি কি তুই ?'

'এই দেখ বুড়োর মতিচ্ছন্ন। সবই ত যাচ্ছে।'

'তুই কইলি পচ্চিমের কোঠা নাবাচ্ছে ! ওডা কেন ? ওডা ত সিদিনের ?'

'হলে হবে কী ! আস্তরে আস্তরে বিলকুল জখম হয়েছিল, ইদিকের অশ্বত্থের শেকড়ে টান ধরছে কি হুড়মুড় দুড়মুড়। ও তোর কিছু আর থাকবে নি।'

ফৈজু আবার কোমরটা টান টান করে খাড়া হয়ে দাঁড়ায়, কাঁপা-কাঁপা ফাঁপা-ফাঁপা গলায় বলে, 'চাদু, আমার লড়িডা একবার দে তো।'

চাঁদবেগম লাঠিটা নিয়ে এসে দাঁড়ায়, কিন্তু জামির হাঁ হাঁ করে ওঠে, 'লড়ি নিয়ে করবি কী ? যাবি কোথা ?'

'যাই এট্টু।' বলে ফৈজু তড়বড় করে উঠোনে নামে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে হাটু কাঁপছে, তবু তড়বড়িয়ে হাঁটার ধরণ দেখে মনে হয় যেন 'রনপা' চড়েছে।

'ঝোঁকের রোখে পড়ে মরবে বুড়ো।' বলতে বলতে জামির ছোটে পিছন পিছন।

কিন্তু গন্তব্য স্থানের কাছ বরাবর এসেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ফৈজু। এ কী, এই বিরাট স্তূপ জমেছে ! এ যে পাহাড়। রোদের উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে লোমশ ভুরুজোড়া কপালে তুলে ছানিপড়া চোখ কুঁচকে কুঁচকে কেন্দ্রীভূত দৃষ্টি নিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে বুড়ো, অবস্থাটা কি ! কোথায় কি ছিল।

কিন্তু কিছুই আর ঠাহর হচ্ছে না। দিকভ্রম হয়ে যাচ্ছে নাকি ফৈজুর ? কোন দিকের রাবিশ কোন দিকে পড়েছে. কোনটা পশ্চিম কোনটা দক্ষিণ ?

মজুররা গেছে জলপানি খেতে, কাজ থেমে রয়েছে। রাজু মল্লিক বিনি পয়সায় খানকতক বরগা জোগাড়ের তালে এদিক ওদিক উঁকি দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, নাতি-ঠাকুরদাকে দেখে অপ্রতিভ হাসি হেসে বলেন, 'কি ব্যাপার ? ফৈজু যে ? এই রোদ্দুরে বেরিয়েছ কেন হে ?'

'আজ্ঞে এই দেখাশুনা করতে।' মুরুব্বিয়ানার সুরে বলে ফৈজু।

আশি বছরের বুড়োর এই মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গি দেখে হেসে ওঠেন রাজু মল্লিক।

বলেন, 'বটে! তা সাবধান বাপু, ইট-পাটকেলে হোঁচট খেয়ে পড় না। নাতিই ত বেশ কাজকর্ম শিখেছে, তুমি আর কি দেখবে?'

লাঠিটার উপর ভর দিয়ে বুড়ো দিব্যি সোজা হয়ে দাঁড়ায়। বুড়ো মুখে ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে, 'আজ্ঞে কর্তা, কাজকামের কিছু ত্থাখতে আসি নাই। এইছি মল্লিকবাবুদের গোর খোঁড়া ত্থাখতে।'

রাজু মল্লিক একটু চমকে উঠেই মুচকে হেসে জামিরের দিকে তাকিয়ে ইশারা করেন। অর্থাৎ—বুঝেছি! বুড়োর ভীমরতি ধরেছে।

ওরা কাজের কথা কইছে, ফৈজু লাঠির ডগায় ইট ঠেলতে ঠেলতে এদিক ওদিক এগোচ্ছিল। সামনের দিকে কতকগুলি ছেলে সহসা তুমুল কোলাহল করে উঠল, 'আমি আগে পেয়েছি,' 'আমি আগে দেখেছি,' 'আমি আগে হাত দিয়েছি।'

কি একটা বস্তু নিয়ে কলহ জুড়েছে।

কী ওটা? কী?

ফৈজু, হুমড়োতে হুমড়োতে এগোয়, কী ওটা দেখা চাই যে।

কিছু নয়, খানিকটা চুনবালির চাপড়া। তাতে একটা হাঁটুভাঙ্গা আর ডানাভাঙা উড়ন্ত পরীমূর্তির আদরা। এই নিয়ে ছেলেগুলির এত ঝগড়া। অবিশ্যি আ স্ত থাকলে জিনিসটা লোভনীয় হত সন্দেহ নেই। নষ্ট হয়েও নষ্ট হয় নি। এখনও তার কটিবিচ্যুত ওড়নায় লাল রঙের আভাস, ভাঙা ডানার গোড়ায় গোড়ায় নীলাভা। আশি বছরের পুরনো চোখ, তবু চিনতে ভুল হয় না।

বিবদমান পারাবতদলের উপর ছোঁ দিয়ে পড়ল বাজপাখি। ছেলেগুলো চিৎকার করে উঠল সঙ্গে সঙ্গে—'আমাদের জিনিস। আমাদের জিনিস! অঁা—অঁা—অঁা! আমাদের জিনিস নিয়ে নিল! এই মিস্তিরি! আমাদের জিনিস নিলে কেন?'

জ্বর-তপ্ত রোগীর চোখের মত লাল লাল চোখে তাকায় বুড়ো। বাঁ হাত দিয়ে সেই গুরুভার বোঝাটাকে বাগিয়ে বুকের উপর চেপে ধরে রেখে ডান হাতে লাঠি উঁচিয়ে বলে, 'যাঃ যাঃ!'

একেই ছোট ছেলেদের বুড়োয়-ভীতি থাকে, তার উপর এই ক্রুদ্ধমূর্তি! কিন্তু আশা ছাড়ে না। পিছন পিছন ধাওয়া করে।

বরগার দর নিয়ে রাজু মল্লিকের সঙ্গে জামিরের পটেছে, তাই রাজু মল্লিক স্নেহবিগলিত স্বরে বলেন, 'আহা হা, দেখ দিকি ছোঁড়াগুলোর কাণ্ড! বেচারা

বুড়োমানুষকে উৎখাত করছে। এই পাজী ছোঁড়ারা—'

ছোঁড়ারা অভিযোগের সুরে বলে, 'মিস্তিরি আমাদের জিনিস নিয়ে নিয়েছে।"

'তোদের জিনিস? তোদের আবার কি জিনিস?'

রাজু আর জামির দুজনেরই সন্দিগ্ধ দৃষ্টি পড়ে ফৈজুর বাম বক্ষের দিকে। ওটা আবার কি কুড়িয়েছে বুড়ো!

'তোদের জিনিস মানে?'

'ওই যে পরীটা—'

পরী!

রাজু মল্লিক উঁকি দিয়ে দেখেন তাই বটে। বালির চাপড়ায় একটা পরীগোছেরই নকশা দেখা যাচ্ছে বটে। ফৈজু ততক্ষণে জিনিসটাকে বুকে আঁকড়ে ধরে দৌড় মেরেছে। পড়ে কি মরে। হাঁটু দুমড়ে দুমড়ে আসছে, লাঠির উপর যতটা পারে ভর দিয়ে ছুটছে যেন।

মনে মনে হাসেন রাজু মল্লিক।

গোরে যাবার সময় উতরে গেছে বুড়োর, তবু পেরানে রস কম নয়। ছেলেপুলের হাত থেকে কেড়ে নেবার আর জিনিস পেলে না। কিনা উলঙ্গ পরী! হুঁঃ! ছোটলোক আর কাকে বলেছে!

বিভ্রম

পাশের ফ্ল্যাটের অবাঙালী ছোকরা তিনটি উঠে গিয়ে একটি বাঙালী পরিবার আসায় এত খুশী লাগল যে, ইচ্ছে হল হরির লুঠ দিই।

শুনে যদি কেউ ভেবে বসেন, আমার চিত্ত একেবারে প্রাদেশিকতার বিষে পরিপুর্ণ, তাহলে ভুল ভাববেন। ছোকরা তিনটি যদি অবাঙালী না হয়ে বাঙালীই হত, শুধু বাঙালী কেন, আমার জ্ঞাতি কুটুম্বর ছেলেও হত, তাহলেও তারা উঠে গেলে যে আমার প্রাণে এই রকম হরিভক্তিই চেগে উঠত সে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ।

কিন্তু এ-গল্প তাদের গল্প নয়। কাজেই তাদের কথা এখানে তুলছি না। তুলতে গেলে জ্ঞানকাণ্ড হারিয়ে বসতে পারি। 'পারি' নয়, হারিয়ে বসবই।

শুধু এইটুকু মাত্র বলে রাখি, তারা থাকাকালীন অবস্থায় প্রায়ই আমার প্রাণে 'খুন করে ফাঁসি যাবার' সদিচ্ছা জেগে উঠত।

সে জায়গায় ছোট্ট একটি বাঙালী পরিবার! যেন জলন্ত আগুনে বরফ জল!

রোগাপাতলা ফর্সা ধবধবে একটি বৌ, তার মোটাসোটা কালোকোলো একটি স্বামী, আর তাদের না-রোগা না-মোটা, না-ফর্সা না-কালো একটি ছেলে। শুধু এই! আনন্দের অতিশয্যে ওরা আসামাত্রই দালানের মাঝখানের দরজাটা—যেটা এযাবৎ কোন দিনই খোলা হয় নি—খুলে সাদর অভ্যর্থনা জানালাম, নিজের হাতে চা করে পাঠিয়ে দিলাম, এবং ছোট ছেলেটির জন্যে দুধভাত অথবা রুটি, যা কিছুর প্রয়োজন হবে, আমার সংসার থেকে পাওয়া যাবে এ আশ্বাস দিয়ে রাখলাম।

তা কৃতজ্ঞতা বোধ আছে বৌটির। বরং একটু বেশি মাত্রাতেই আছে। সেই সাধারণ ভদ্রতাটুকুকে আমার মহানুভবতার পরাকাষ্ঠা বলে ধরে নিয়ে এমন সাধুবাদ দিতে শুরু করল যে পালিয়ে আসতে পথ পাই না।

হায়! সেদিন যদি স্বপ্নেও আশঙ্কা করতাম, সেই নিরীহ চেহারার জীবটি ক্রমশঃ আমার পক্ষে এমনই মারাত্মক হয়ে উঠবে যে, অহরহই পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে ইচ্ছে হবে, তাহলে কি দালানের মাঝখানের ওই দোরটা খুলে সেই সামান্য ভদ্রতাটুকু করতে যেতাম?

দরজা পশ্চিমমুখো, কিন্তু এখন চব্বিশ ঘণ্টা মনে হয়, নিজের হাতে নিজের দক্ষিণ দরজা খুলেছি সেদিন।

একবার খুলে দেওয়া দরজা কি আর বন্ধ করা যায়? যায় না! তাই জন্যেই না জীবনের সব ক্ষেত্রে, বন্ধ দরজা খুলে দিতে গেলে বিচার-বিবেচনার আর অন্ত থাকে না।

যে দরজা নিজে হাতে খুলে দিয়েছিলাম, নিজে হাতে সে আর বন্ধ করতে পারি নি। ওদের দিকে একটা ছিটকিনি আছে, বাড়ির কর্তা মাঝে মাঝে লাগিয়ে দেন সেটা, কিন্তু তাতে আর কতটুকু রক্ষে হয়? সে ত সমুদ্রে বালির বাঁধ!

আতঙ্ক! আতঙ্ক! সারাদিন আতঙ্কের বিভীষিকা। ওই বুঝি সেই ছিটকিনিটুকু খোলার শব্দ! তার পরই দেখা যাবে একখানি রঙিন শাড়ির আঁচল আর সেই রোগা মুখের এক গাল হাসি।

কি? শুনে মুস্কিলে পড়ছেন, মারাত্মক বস্তুর সঙ্গে 'এক গাল হাসি' ঠিক ম্যানেজ করতে পারছেন না? পারবেন, শেষ অবধি শুনলেই পারবেন।

আসলে ত মেয়েটি পাড়া-কুঁদুলেও নয় বা মুখরা মেজাজী, দজ্জাল জাঁহাবেজেও নয়। মেয়েটি শুধু আমার গুণগ্রাহী। সাংঘাতিক রকমের গুণগ্রাহী। আর সেই হচ্ছে আমার মৃত্যুবাণ!

প্রথম দিনের কথা মনে আছে। সেটা বোধ হয় ওরা আসার দিন চার পাঁচ পরের কথা! বৌটি অর্থাৎ অনিলা আমার কাছে এসে আরক্তমুখে এবং প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, 'দিদি, একটা কথা শুধোব, মনে কিছু নেবেন না?'

হেসে বললাম, 'মনে নেবার মত হলে নিশ্চয়ই নেব।'

'যাঃ! দিদি তামাশা করছেন! শুধোচ্ছি আপনার নামটি কি?'

বাল্যকাল পার করে আসার পর এ প্রশ্ন আর কেউ করেছে বলে মনে পড়ল না। আরও হেসে বলি, 'কেন, হঠাৎ নামের কি দরকার পড়ল?'

'আছে দরকার, বলুন না?'

বললাম নাম।

অনিলা একটু চমকে বলল, 'তবে ত আমার ভাই যা বলেছে ঠিক। আপনি বই লেখেন!'

বললাম, 'তোমার ভাই কোথা থেকে জানল?

'জানে, ওরা পুরুষ বেটাছেলে, কত খবর রাখে। কাল এসে আমার সঙ্গে মহা তর্ক। ও বলে—আব আমি বিশ্বাস করি না। তর্ক থামে না।'

আমি বলি, 'তা অবিশ্বাসের কি আছে? বই-টই তো মানুষেই লেখে? না কি বাঘ-ভালুকে লেখে?'

অনিলা বিপন্ন মুখে বলে, 'কথাটা অবিশ্যি বলেছেন ঠিক, কিন্তু আমার মনে কেমন বিশ্বাস ধরে নি। ভাইয়ের সঙ্গে যে কতক্ষণ মিছে তর্ক করলাম। বলি—ধেৎ ঠিক আমাদের মত কুটনো কুটছেন, রান্না করছেন, রুটি বেলছেন, বই লিখলেই হল? তোর যত বাজে কথা!'

হাসব না কাঁদব ভেবে পাই না। শেষ পর্যন্ত হেসেই বলি, 'তা তোমার কি ধারণা লেখিকার বাড়ির লোকেরা কাঁচা মাংস খায়?'

শুনে হেসেই কুটিকুটি। যেন আর কেউ কখনও এমন অপূর্ব পরিহাস-রস পরিবেশন করতে পারে না।

সেই থেকে শুরু। হয়তো সকালের সময়ে সংসারের কাজ নিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি, অনিলা এসে হাজির।

'দিদি, আপনার কিছু সাহায্য করে দেব?'

যদিও সে সময়টাতে সাহায্য পেলে বর্তে যাবারই কথা, তবু সঙ্গত অসঙ্গত বলেও একটা কথা আছে ত? অবাক হয়ে বলি, 'সে কি অনিলা, তোমার ঘরের কাজকর্ম দেখবে কে?'

অনিলা অগ্রাহ্য ভরে বলে, 'ও করবে অখন। চাল ডাল মাপ করে রেখে এসেছি, কুকারে চাপিয়ে দেবে।'

'কি যে বল! যাও পালাও, পাগলামি কোর না', বলে ভাগাতে চেষ্টা করি, কিন্তু অনিলা না-ছোড়!

—'দিদি! আলু কটা ছাড়িয়ে রাখি না?'

—'কি মুস্কিল! কেন বল ত? নিজের সংসার ফেলে—'

—'আপনার সময়ের কত মূল্য দিদি, তার কাছে আমাদের তুলনা? আপনি কত বড় কাজ করেন—'

বলি,—'রক্ষে কর অনিলা, সকাল বেলা পাগলামি জুড়ে দিও না।'

অনিলা আরও অভিভূত হয় এবং বেশ ভাল বাঙলায় আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করে, বিনয়ই মহত্তের লক্ষণ। জলজ্যান্ত একটা লেখিকা খাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে, একেবারে নেহাৎ সাধারণ সব কাজ করছে, এমন অপূর্ব দৃশ্য দেখতে পাওয়া ভাগ্যের কথা ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ হল একটা দিক।

কিন্তু মারাত্মক দিকটার কথা বলি।

কাগজ-কলমের ধারে কাছে গিয়েছি কি সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করব পিছন থেকে ঘাড়ের কাছে একটি উষ্ণ নিশ্বাস।

'দিদি লিখছেন?'

এ বাহুল্য প্রশ্নের উত্তর হয় না, কাজেই একটু হাসি। ভাবি, ভাগ্যিস জগতে এই সৌজন্যসূচক হাসিটুকু ছিল! নইলে মানুষের কি দুর্দশাই হত!

পূজো-আর্চায় যেমন গঙ্গা হচ্ছেন সর্ব উপচারময়ী, লোকব্যবহারে তেমনি হাসিই হচ্ছে সর্বভাবময়ী।...সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বিষাদে, বিনয়ে-সৌজন্যে, ভদ্রতায় মূঢ়তায় হাসিই আমাদের সম্বল। কারও কোন প্রশ্ন, উত্তরের উপযুক্ত না হলে অথবা উপযুক্ত উত্তর না জোগালে ওই এক টুকরো হাসিই আমাদের রক্ষা করে। কাজেই হাসি ছাড়া করব কি।

—'দিদি!'

মুখ তুলে তাকাই।

—'কি লিখছেন?'

—'এই যা হোক কিছু।'

—'এ লেখা ছাপা হবে?'

—'তা হবে বৈকি।'

—'কোন্ কাগজে ছাপা হবে?'

কাগজটার নাম করি।

একটি অভিভূত নিশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত হয়—'ভাইকে বলব একটা কিনে আনতে।'

লেখাটা বিশেষ তাড়াতাড়ি দরকার, ভদ্রতা রক্ষা করতে গেলে সম্পাদকের কাছে প্রতিশ্রুতি রক্ষা হয় না। কাজেই জলজ্যান্ত একটা মানুষের উপস্থিতি প্রায় অস্বীকার করে খাতায় মনঃসংযোগ করি। কিন্তু বলেছি তো, সমুদ্রে বালির বাঁধ!

—'দিদি!…এই যে এত কথা হুস হুস করে লিখে যাচ্ছেন, এ সবই আপনার মনের মধ্যে উদয় হচ্ছে? আগে থেকে মুখস্থ নেই কিছু?'

এ প্রশ্নের পরও বসে বসে 'হুস হুস' করে লেখা আর কারও পক্ষে সম্ভব হয় কি না জানি না, আমার তো হয় না।

হতাশ হাসি হেসে কলমটা নামিয়ে রেখে বলি, 'বই-টই তো প্রায়ই পড় দেখি, এমন ছেলেমানুষের মত কথা বল কেন? মুখস্থ করে লিখলে আর নিজের লেখা কি হল?'

কুণ্ঠিত একটু হেসে মুখ নিচু করে।

'বই তো পড়ি দিদি, পড়তে ভালও বাসি, কিন্তু 'ও' বলে আমার মাথার মধ্যে নাকি কিছু ঢোকে না। আমি বলি হবে বা! কিন্তু আপনার ওই যে কি বই নিয়ে গেলাম সেদিন, "রাতচরা" না কি, ওইটা খুব মন দিয়ে পড়েছি দিদি। 'ও' বলে, দিদির বই বলে তিনবার করে পড়তে হবে নাকি? আমি আপনাকে ভালবাসি বলে ভারি ঠাট্টা করে দিদি!…আমি খুব তর্ক করি। বলি, এ ভালবাসা আলাদা জিনিস, তুমি বুঝবে না।'

সত্যি বলতে কি, এমন একটা আলাদা জাতের প্রেমের পরিচয় পেয়ে তখনকার মত মন্দ লাগে না।…স্তুতি জিনিসটা এমনই মজার। অগত্যা সে বেলাটা বরবাদ যায়।

কিন্তু একদিন ত নয়, দিনের পর দিন। ক্রমশঃ উত্যক্ত হয়ে উঠি; অস্থির হয়ে উঠি। যে লেখার জন্যে আমাকে এত ভক্তি সেই লেখাই আমার মাথায় উঠিয়ে দিতে বসেছে সে খেয়াল নেই।

লিখতে বসলেই ঘাড়ের কাছে উষ্ণ নিশ্বাস। অন্যমনস্কতার ভান করে পার পাওয়া যাবে না, একটু পরেই মৃদু কুণ্ঠীত একটি প্রশ্ন শুনতে পাব।

'দিদি লিখছেন?'

অতঃপর প্রশ্নের শরজালের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

বাড়িতে যিনি একজন আমার বিশেষ হিতৈষী আছেন তিনি বলেন, 'এ সব তোমার ইচ্ছাকৃত অসুবিধা ঘটানো। বুদ্ধি-সুদ্ধির তো বালাই দেখি না মেয়েটার, ওর সঙ্গে অত ভদ্রতা করতে যাও কেন? ওতেই প্রশ্রও পেয়ে যায়। ওর সঙ্গে ভদ্রতা করতে গিয়ে যে তোমার সম্পাদকদের কাছে 'অভদ্র' নাম কিনতে বসেছ।'

অভিযোগ মিথ্যা নয়। কিন্তু কি যে করি!

একদিন ঘরে খিল দিয়ে লিখতে বসলাম, দেখি বারান্দার ওদিক দিয়ে ঘুরে বাথরুমে যাবার প্যাসেজটার দাঁড়িয়ে আছে জানলার শিক ধরে।

না দেখার ভান করে কতক্ষণ থাকা যায়? অগত্যাই বলতে হয়, 'কি অনিলা, কিছু বলবে?'

'না দিদি! আপনাকে দেখছি! আপনি যখন লেখেন আমি হাঁ করে আপনার মুখপানে তাকিয়ে থাকি। এত ভাল লাগে!······আপনিই মানুষ দিদি!······আর কি মিথ্যে মানুষই হয়েছি আমরা! আমাদের বেঁচে থাকা—মা বসুমতীর চারটি ধান-চাল ধ্বংস করতে পড়ে থাকা!'

এরপর আর দোরে খিল দিয়ে বসে থাকা সম্ভব? আমার দ্বারা তো সম্ভব নয়। দোর খুলে ডাকতে হয়, অনেক বাক্য-ব্যয় করে বোঝাতে চেষ্টা করতে হয়, মানুষ কিছুতেই মিথ্যে হয়ে যায় না। কত রকমের কাজ আছে জগতে, সবাই কি সব কাজ পারে? কেউ এটা পারে ওটা পারে না, কেউ ওটা পারে এটা পারে না, এই আর কি!···এই যে তুমি কী সুন্দর উল্ বুনতে পার, আমি পারি না!'

শুনে সেই হাসি।

হেসে খান খান! 'দিদি এত মজার মজার কথা বলতে পারেন! কিসের সঙ্গে কি, পান্তাভাতে ঘি—!'······

সেদিনটাও বরবাদ।

অথচ সত্যিই আর চালানো যাচ্ছে না। সত্যিই বাইরের লোকের কাছে 'অভদ্র' হয়ে দাঁড়াচ্ছি।

কিন্তু সকাল নেই সন্ধ্যা নেই দিন দুপুরে তো কথাই নেই, আমাকে একবার বসতে দেখলেই হল! সেই মৃদু উষ্ণ নিশ্বাস, সেই সলজ্জ হাসি আর সেই কুণ্ঠিত নিবেদিত ডাক 'দিদি!'

এদিকে লেখার গাদা জমে আছে, ওদিকে পুজোর বাড়তি লেখা এসে পড়ছে, অথচ লেখবার অবসর কিছুতেই পাচ্ছি না।

স্পষ্ট করে বলতে শুরু করি 'ভীষণ কাজ জমে আছে অনিলা, গল্পে গল্পে ভাই কিছু হবে না, পালাও তুমি।'

অনিলা পূজা নিবেদনের বিনীত ভঙ্গিতে বলে, 'লিখুন না দিদি। আমি আপনাকে কিচ্ছু ব্যস্ত করব না। একটি পাশে চুপ মেরে বসে থাকব।'

বিরক্তিতে রাগে হাড় পর্যন্ত জলে যায়। সত্যি বলতে কি, ক্রমশ ভদ্রতাবোধও লুপ্ত হতে বসেছে। তবু জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে বলি, 'চুপ করে বসে থেকে সময় নষ্ট করে কি হবে? তার চেয়ে খানিক ঘুমিয়ে নাও গে না?'

অনিলা ম্লান হাসি হেসে বলে, 'আমাদের জীবন তো ঘুমিয়েই কাটল দিদি, জ্ঞানদৃষ্টি আর খুলল কই?'

বুঝুন! কথাগুলি কি অজ্ঞানের মত? পণ্ডিতের মত কথা আর বুদ্ধুর মত ব্যবহার!

আবার যেদিন মোটেই আমল দিই না, কিছুতেই খাতা থেকে মুখ তুলি না, সেদিন খানিকটা ঘোরাঘুরি করে চলে গিয়ে একটু পরেই নতুন উদ্যমে আসে ছেলে নিয়ে।

'এই দেখেন দিদি, মাসীর কাছে যাব বলে বায়না লাগিয়েছে! যত বোঝাই তোর মাসী কি যে সে, তার কত কাজ, এখন গিয়ে কাজে বাগড়া দিতে নেই মানিক, সেকথা কে শোনে! নিন এখন কি করবেন করুন?'

বলে যেন মস্ত কৌতুক করেছে এইভাবে হাসতে থাকে।

ছেলেটির মুখ দেখে বোঝা যায় এসব ষড়যন্ত্রের কোন ধারই সে ধারে না।

আমার হিতৈষী বন্ধু ওর নাম রেখেছেন—'বিঘ্নস্বরূপিণী দেবী'।...ওর ছায়া দেখলেই বলেন, 'ওই দেখো এলেন তোমার 'বিঘ্নস্বরূপিণী'। উঃ, তোমরা মেয়েরা এদিকে প্রত্যেক বিষয়ে এত অসহিষ্ণু, অথচ কি করে যে এই বিরক্তিকর ব্যাপার

সহ্য কর! এ আমাদের হলে কোন কালে ঠিক করে দিতাম। তাও যদি বুঝতাম একটু বুদ্ধিওলা জীব।'

হেসে ফেলে প্রশ্ন করি, 'বুদ্ধিওলা জীবের পক্ষে এই ব্যবহারটা করা সম্ভব?'

অনিলার ভক্তির বাড়াবাড়িতে নানা কারণেই অস্বস্তি আমার।

ওকে অনেক সময় বোঝাতে চেষ্টা করি, 'দেখ বাপু, খাতা কলম নিয়ে নাড়াচাড়া করি বলেই যে আমারই জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হয়েছে তা ভেব না। এমন কিছু লিখি না আমি। গোটা কতক গল্প উপন্যাস, ও চেষ্টা করলে সবাই লিখতে পারে।'

কিন্তু বুঝছে কে?

এ কথাটাকেও আমার রসিকতা মনে করেই এক চোট হেসে নেয় সে। আবার বলে, 'তাই জন্যেই তো এত করে আপনার হাওয়া গায়ে লাগাচ্ছি দিদি, যাতে আসছে জন্মে একটু গুণ ধরতে পারি।'

এমনি করে আমার দিনের সমস্ত অবসর আর বিশ্রাম নিহত হচ্ছে।

শুধু একটি কথার জন্যে।

স্পষ্ট করে একবার বলতে পারলেই হয়, 'তোমার জন্যে বাপু আমার অসুবিধে হচ্ছে।'......কিন্তু তাই কি বলা যায়? হিতৈষী বন্ধু বলেন, 'না যায় তো মর!'

তা প্রায় মরতেই বসেছি। সর্বদা আতঙ্ক ওই বুঝি ছিটকিনির শব্দ। ওই বুঝি আমার কাজের সাহায্য করতে আসছে, ওই বুঝি লেখার ব্যাঘাত ঘটাতে আসছে।

দুটোই সমান অসহ্য!

ওদিকে ওর সংসারে বিশৃঙ্খলার সংবাদ কানে আসে। কালোকোলো মোটাসোটা ভদ্রলোক আমার কান বাঁচাবার চেষ্টা না করে সভ্য ভাষায় যা বলেন, তার মর্মার্থ অসাধু ভাষায় এই দাঁড়ায়, আমি লিখিয়ে পড়িয়ে বিদুষী আছি, বেশ আছি, অন্যের ঘরের বৌকে ধিঙ্গি করে তুলছি কোন আক্কেলে? তাদের ঘরে সময়ে রান্না হয় না, সময়ে ছেলের খাওয়া হয় না, অথচ আমি দিব্যি তার স্ত্রীকে বেগার খাটিয়ে নিচ্ছি!

স্পষ্ট এই ভাষা নয় বটে, তবে অপরের মনের চেহারাটা স্পষ্ট দেখে ফেলবার একটা আর্শী আমার কাছে আছে কি না।

অনিলাকে এ সম্বন্ধে কঠোরভাবে সাবধান করে দেবার চেষ্টা করেছি কিন্তু গায়েও মাখে না। স্বচ্ছন্দে হেসে বলে, 'পুরুষ মানুষের কথা ছেড়ে দিন দিদি,

হিংসুটের জাত।…এই যে আমি আপনাকে একটু ভালবাসি, তাতেই হিংসেয় ফেটে মরে।…বলে কিনা তোমার 'দিদির নেশা' যেন মাতালের মদের নেশা। শুনুন তো দিদি অভব্যি কথা!…এই যে আমার শাশুড়ীকে দেখেছি তিন ঘণ্টা পূজোর ঘরে বসে থাকে, সে কি মদের নেশায়?'

আর কি বলব! বলবার কিছু রাখছে?

মাঝে মাঝে এক একদিন বাড়ি থাকে না অনিলা, কাছেই কোথায় পিসীর বাড়ি নাকি যায়।

সেদিন মহোৎসব।

মনে হয় একদিনে সব জমানো কাজ উদ্ধার করে ফেলি। কিন্তু পরদিন তার শোধ নেয়।…ছেলেটাকে নিয়ে এসে প্রায় এখানেই পড়ে থাকে।

আবাব নিতান্ত উঠে যাবার সময় বলে যাওয়াই চাই, 'দিদির কত সময় নষ্ট করলাম!…আজ আর কিচ্ছু লেখাটেখা হল না আপনার। আমাদের মত সস্তার সময় তো আপনার না, কত দামী সময়।…যখনই ভাবি তখনই অবাক লাগে।… আপনার সময় নষ্ট করে কত পাপ হচ্ছে আমার।'

শুনুন! জ্ঞানপাপী আর কাকে বলে।

একদিন পিসির বাড়ি থেকে এসে এক নতুন উপদ্রব! সেই প্রথমদিনের মত আবক্ত মুখ, রুদ্ধ কণ্ঠ। 'দিদি। আপনি রেডিওতে গল্প বলেন?'

অগ্রাহ্যভাব দেখিয়ে বলি, 'বলি তো কি হয়েছে তাতে?'

কিছুক্ষণ আব কথা জোগায় না অনিলার। খানিক পরে একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, 'আর এই বসে বসে মোচা কুটছেন?'

—কি মুস্কিল! মোচা কুটব না? রেডিওতে আবার কে না যাচ্ছে আজকাল!…আর যদিই কেউ না যেত, মোচার সঙ্গে কি?

—কিন্তু, কেমন করে বলেন দিদি?

—এই যেমন করে তোমার সঙ্গে গল্প করছি!

—আপনার ভয় লাগে না?

—কই না তো!

আর একটা গভীর নিশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত হয়, 'আপনিই ধন্য দিদি!'

রেডিওর খবরের পর দেবত্বের আর এক ধাপ ওপরে উঠেছি!…নেহাৎ লোক-

লজ্জায় না বাধলে বোধ হয় অনিলা নিত্য আমাকে ফুলচন্দন দিতে আসত।

এ বিপজ্জনক অবস্থা আর কতদিন সহ্য করা যাবে ঈশ্বর জানেন। কায়-মনোবাক্যে প্রার্থনা করি ওরা যেন উঠে যায়। তার বদলে আবার আমার সেই অবাঙালী পড়শীরা আসুক! তাও ভাল।

কিভাবে আমার জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছে, সেকথা বন্ধুবান্ধবের কাছে গল্প করি। কিন্তু আশ্চর্য, কেউ তেমন গুরুত্ব দেয় না! আমার সমস্তটা দিন যে আতঙ্কে কণ্টকিত হয়ে থাকে এটা যেন একটা হাসির কথা! তারা পরামর্শ দেয়—একটু অগ্রাহ্য ভাব দেখালেই হয়। কিন্তু কোন 'ভাবই' যে বোঝে না, নিজ-ভাবেই যে থাকে, তার সম্বন্ধে ব্যবস্থা কি?

অতএব আমার অবস্থা যথাপূর্বং তথা পরং! সেই ঈষদুষ্ণ নিশ্বাস···সেই মৃদু-কুণ্ঠিত 'দিদি' ডাক, সেই সম্ভ্রমে বিস্ময়ে মুগ্ধ দৃষ্টি।···সেই একটু কাজ করে দিতে পারলে কৃত-কৃতার্থ ভাব।

গৃহকর্তাকে তাড়না করছি···বাসা বদলের জন্য।

ভক্তের হাত এড়িয়ে মুক্ত হাতে না পারলে আর আমার ইহকালও নেই পর-কালও নেই।

কিন্তু এতটা অস্বাভাবিক অবস্থা সত্যিই চিরদিন চলে না। একটা কোন আঘাতে সেটা মোচড় খায়!

নিত্য নিয়মে 'বিঘ্নস্বরূপিণী দেবী' ছায়াস্বরূপিণী হয়ে আমার কাছে বসে থাকে, নিত্য নিয়মে ও চলে গেলেই আমি বলতে থাকি, 'কী জ্বালাই হয়েছে বাবা! আর তো পারা যায় না···পাগল-টাগল হয়ে যাব এবার। ওরা তো যাবে না···চল আমরাই অন্য কোথাও উঠে যাই···আমার লেখিকা নাম তো ঘুচে গেল, ইত্যাদি ইত্যাদি···।' নিত্য নিয়মে গৃহকর্তা আমার ভদ্রতা ও চক্ষু-লজ্জাকে ব্যঙ্গ করে শানানো শানানো বুলি প্রয়োগ করেন। এর মধ্যে থেকেই হঠাৎ একদিন পালা বদলাল।

ও-বাড়ির কর্তার বন্ধুর বাড়ি নেমন্তন্ন। ছেলেটাকেও নিয়ে গেছে। অতএব অনিলা মনের আনন্দে রাত দশটা পর্যন্ত এ-বাড়িতে আসন গেড়ে বসে আছে, এবং বারবার কৌতুক-হাস্যের সঙ্গে ব্যক্ত করছে, কর্তার এমন নেমন্তন্ন রোজ হলে মন্দ হয় না।

এ-বাড়ির কর্তা-নামধারী ভদ্রলোকটিরও যে সুখদুঃখবোধ থাকতে পারে, সে

সম্বন্ধে অবশ্য কোন দুশ্চিন্তা নেই অনিলার। মনে মনে প্রমাদ গণছি! কি দুর্মতিতে হঠাৎ মনে হল এমন একটা কিছু ঘটে না, যাতে আমার বাড়ি আসা ওর বন্ধ হয়।

ঠিক এমনি সময় ও-বাড়িতে একটা তুমুল চিৎকার। আধ-ঘুমন্ত ছেলেটার কান্না এবং তার পিতৃদেবের ধমকের ঐক্যতান বাদন।

—'এই সর্বনাশ! ওরা এসে পড়েছে।' বলে অনিলা উঠে যায়। পরক্ষণেই একটা চাপা ক্রুদ্ধ স্বর কানে আসে।…হয়তো…বেশি রাত্রি বলেই আসে। হয়তো এটা নতুন নয়—হয়তো এমনই হয়—দিনের বেলার অনেক গোলমালে চাপা পড়ে যায়…কানে আসে—'এইবার একদিন মার খেলে তবে তুমি জব্দ হবে। ওরা তোমাকে বড্ড ভালবাসে তাই যাও—না?…নির্বোধ ইডিয়ট! ওরা তোমায় কত অগ্রাহ্য করে সেটুকু বোঝবার বুদ্ধি ঘটে আছে?…কাল থেকে খবরদার যদি যাবে—'

চোখ-মুখ আগুন করে চুপ করে শুনি। লোকটা অমার্জিত, তবু মনে মনেও সম্পূর্ণ অপরাধী করতে পারি না। ওর অভিযোগ তো মিথ্যে নয়।

বিরক্ত হই, অসহিষ্ণু হই, এসব তো মিথ্যে নয়। অগ্রাহ্য? তাও করি বৈ কি!

পরদিন সকাল থেকে আর আসে না অনিলা। বন্ধ দরজাটার দিকে তাকিয়ে ভাবি, যাক্‌গে—ভালই হল! অতিষ্ঠ হয়েই তো উঠেছিলাম, এ বরং রেহাই পেলাম।

দুপুরবেলা সংসারের পালা মিটিয়ে তোড়জোড় করে লিখতে বসি।…কাল আমার সন্ধ্যাবেলাটাও হত্যা করে গেছে অনিলা, বিশেষ একটা তাগাদার লেখা পড়ে রয়েছে। লিখতে বসেছি, মনটাও একটু বসিয়েছি…হঠাৎ ঘাড়ের কাছে… উষ্ণ নিশ্বাস!

চমকে মুখ তুলে দেখি অনিলা।

সলজ্জ-কুণ্ঠিত মুখে একটু ক্লিষ্ট হাসি। 'দিদি! খুব লিখতে শুরু করে দিয়েছেন, না? মনে ভাবছেন আজ আর অনিলা জ্বালাতে এল না, কেমন?'

ওর রোগা মুখটা আরও রোগা, এবং ফ্যাকাশে রঙটা আরও ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল, তবু হঠাৎ কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায়!

রাগ সামলাতে পারি না ওর নির্লজ্জতা দেখে। এ কী নেশা! মদের নেশার

সঙ্গে তুলনা করা তো অসঙ্গত হয় না। কি যে হয়। ক্রুদ্ধ স্বরে বলে বসি, 'সত্যিই আমার কাজের বিশেষ ক্ষতি হয় অনিলা। তুমি আর এস না।'

একটু থতমত খেয়ে ও আবার হেসে ফেলে। বলে, 'ঈস! দিদি, বড্ড তামাশা করছেন যে!'

আমি একই স্বরে বলি, 'তামাশার কিছু নেই অনিলা! আমি তো তোমার সমবয়সী নই, সব সময় এখানে বসে থাকার কোন মানে হয় না! এতে তোমারও ক্ষতি, আমারও ক্ষতি!'

অবোধ পশুও কখনও কখনও মর্মাহত হয় বৈ কি! অনিলা একটু সরে গিয়ে বলে, 'আমার লাভ ক্ষতি আপনি বুঝবেন না দিদি। একটা জানোয়ারের সঙ্গে বাস করি—আপনার কাছে এসে স্বর্গবাস হয়। যাক্‌, আপনার যদি ক্ষতি হয় আর আসব না, বেশ!'

ধীরে ধীরে চলে যায়!

মরচে-ধরা ছিটকিনিটা বন্ধ হবার একটা ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ হয়।

নিজের হাতে খোলা দরজা নিজের হাতে বন্ধ করলাম আমি! কিন্তু আমিই কি? ছিটকিনিটা তো ওদিকে। তা এদিকে থাকলে আমিই দিতাম না কি?

ওর মধ্যে মানসম্ভ্রম জ্ঞান না থাকতে পারে, আমার তো আছে। একটা বুদ্ধি-হীন ভালবাসার খাতিরে তাকে তো বিসর্জন দিতে পারি না!

কি বলছেন আপনারা? ওই কালো মোটা তুচ্ছ লোকটার কথা অগ্রাহ্য করে উড়িয়ে দিতে পারতাম?

তাই কি পারা যায়? 'কথা' যে অগ্নিদেবতার কন্যা। ওর মধ্যেও যে আগুনের ঝলসানি, গায়ে লাগলে জ্বালা করে ফোস্কা পড়ে।

এরপর বেশ নিশ্চিন্ত হয়েই নিজের কাজকর্ম করতে পারব আশা করছিলাম! কিন্তু বিঘ্ন কাটছে না! খাতা-কলম নিয়ে বসলেই যেন সেই ঘাড়ের কাছে একটা উষ্ণ নিঃশ্বাসের স্পর্শ পাই।

চমকে মুখ তুলে দেখি। কই? সেই রোগা মুখের একগাল হাসিটা তো নেই! কিন্তু ঘাড়টায় ওরকম অস্বস্তি হয় কেন?

ঘাড়ে ভূত-টুত চেপে আছে নাকি?…কিছুই লেখা হয় না! হতাশ হয়ে কলম নামিয়ে রেখে বসে বসে ভাবি। বিঘ্নর অভাবটাও একটা বিঘ্ন না কি?

পরীরা মাটিতে নামে

কনককান্তি ঢুকল নেমন্তন্ন পত্তর হাতে নিয়ে। দেখেই হৈ হৈ করে উঠলাম! শুভ সংবাদের আশাতেও বটে, অনেকদিন ওর অদর্শনের পর বলেও বটে! তবু সাবধানের পথ ধরে প্রশ্ন করি—কি হে, বাড়ির আর কারও নয় তো?

কনক মৃদু হেসে বলল—নাঃ এই অধমেরই।...

শুনে সত্যিই ভারি আনন্দ হল। শুধু বন্ধুর বিয়ে বলেই নয়, অনেক দুঃখের বিয়ে বলে।...সত্যি, এ ভাবে চিঠি হাতে করে নেমন্তন্ন করতে আসবে কনক—এ আশা ছিলনা।

খামটা হাতে নিলাম। দেখেই বোঝা যাচ্ছে খরচ করেছে। আর্ট পেপারে ছাপা, সুন্দর ডিজাইন। খামটা হচ্ছে একটা স-শীর্ষক ডাব মুখে চাপানো পূর্ণঘটের আকৃতির। স্বস্তিকার চিহ্নটিতেও ত্রুটি নেই।

—এই ও ভাবে নয়, ছিঁড়ে যাবে! ওর একটা বেশ ট্রিক্‌স্ আছে—বলে কনক কান্তি ওটা আমার হাত থেকে নিয়ে টুক্ করে চিঠিটা খুলে বার করে টেবিলে রাখল।

একনজর তাকিয়ে 'যথাবিহিত' দেখেই সহর্ষে বলে উঠলাম—যাক, শেষ পর্যন্ত বাড়ির সমর্থন পেলি তাহলে? একেই বলে অধ্যবসায়!'

কনক পকেট থেকে ধীরে সুস্থে সিগারেট কেস আর লাইটারটা বার করতে করতে বলল, 'সমর্থন না পাবার কি আছে!'

'না পাবার কি আছে!'

'শোন কথা!'

বিদ্রূপ ক'রে বলি—ঈস্! প্রার্থিত ফলটি হাতে এসে গেছে বলে এখন বড্ড দেমাক, কেমন? আশা কিছু ছিল নাকি? ঈশ্বর তোমাদের কর্তৃপক্ষকে সুমতি দিয়েছেন বলে ভদ্রলোককে ধন্যবাদ।

কথা কইতে কইতেই পুরো চিঠিটায় চোখ বুলোন হযে গেছে। দেখলাম কনের নামটা পাল্টে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কনকের মায়ের কিছুদিন আগের একটা কথা মনে পড়ে গেল। আমরা গিয়েছিলাম তাঁর মন নরম করতে, তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—'না বাবা না, মিথ্যে অনুরোধ তোমরা আমায় কোর না। সে মেয়েকে আমি দেখেছি! ওই খটখটে নামওলা হটহটে মেয়েকে আমি ছেলের বৌ করে আনতে পারব না!'

তবুও বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম, তাঁর আদরের ছেলেটি সেই খটখটে নামের মধ্যেই দুনিয়ার সব সেরা রস আবিষ্কার করে ফেলেছে। কিন্তু ভদ্রমহিলা সেদিন টলেন নি।

যাক্ শেষ পর্যন্ত টলেছেন দেখা যাচ্ছে। হেসে বললাম—কি, এই নাম বদলেই রফা নাকি ?

কনক অন্যমনস্কের মত বলল—নাম বদল ? কার সঙ্গে ?

আমি হাসতে থাকি—কার সঙ্গে আর! বদল আধুনিকের সঙ্গে প্রাচীনের, 'খটখটের' সঙ্গে 'মোলায়েমের,' বৈজয়ন্তীর সঙ্গে কমলার। নতুন নামকরণে বৈজয়ন্তী খুশি তো ?

—খুশি ? কি জানি ? কিন্তু বৈজয়ন্তীর আবার নতুন নামকরণ হতে যাবে কেন ?

রেগে বলি—ঢং রাখ। বিয়েটা কার শুনি ?

—আমারই তো!

—কনেটা কে ?

—ওই তো দেখছ—কমলা।

—খুব কায়দা হয়েছে, থাক। কিন্তু যাই বলিস এ তোর মায়ের এক অন্যায় খুঁৎখুঁতুনি। বৈজয়ন্তী নামটা আমার বেশ পছন্দ ছিল।

কনককান্তি সিগারেটটা টেবিলে ঠুকতে ঠুকতে গম্ভীরভাবে বলে—হ্যাঁ নামটা নতুন ধবনেব। কিন্তু বিয়েটা তো বৈজয়ন্তীর সঙ্গে হচ্ছে না!

কনকের গলার শব্দ শুনে ঘাবড়ে গেলাম। ঠিক ঠাট্টার মতও তো শোনাচ্ছে না। বিমূঢ়ভাবে বলি—বিয়ে বৈজয়ন্তীব সঙ্গে হচ্ছে না ?

—না তো।

শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম! কনকের বিয়ে হচ্ছে, অথচ বৈজয়ন্তীর সঙ্গে নয় ? ওর নির্লিপ্ত গোছের ভাব দেখে হাড় জ্বলে গেল। ক্রুদ্ধস্বরে বললাম—ধাঁধা রাখ। সোজা কথায় বল—এ কমলা কে ?

—ও বাবার এক বাল্যবন্ধুর মেয়ে। ওঁদের দুই বন্ধুর না কি বরাবরের ইচ্ছে ছিল দুজনে বেয়াই হবেন।

এইবার ব্যাপার বুঝে ফেলি। এত কাণ্ডর পর হতভাগা শয়তান পিতৃসত্য পালন করছেন! পা থেকে মাথা অবধি জ্বলে যায়। কনকের বাবাটি যে বেশ ঘুঘু ব্যক্তি তা জানতাম কিন্তু কনককেও তো জানতাম আমরা।

জানতাম কনক আর বৈজয়ন্তীর আত্মহারা প্রেমকে!

গোড়া থেকে আমি তো একরকম সাক্ষীই।

আমি জানতাম পৃথিবীর কোনও বিরুদ্ধশক্তিই ওদের পৃথক করতে পারবে না,

জগতের কারও সম্মতি না পেলেও বিয়ে করবেই ওরা। বিয়েতে কেউ না দাঁড়ায় রেজেস্ট্রী করেই করবে।

মা বাপের মোটেই সমর্থন নেই ওদের প্রেমের প্রতি, একথাও আমার অজানা নয়। রেজেস্ট্রী অফিসে দরখাস্ত দেব দেব করছিল কনক, তাও আমার জানা। মাঝখানে মাত্র কদিন দেখা নেই, হঠাৎ এই বিস্ময়কর নিমন্ত্রণপত্র আর কনকের রহস্যময় ভাবভঙ্গি। তবে কি রাস্কেলটা—?

তীব্রস্বরে বলি—এ কমলাটি বোধ হয় কোন টাকার কুমীরের মেয়ে?

—না রে! ওর বাবা একটা ছোট ব্যাঙ্কের সাধারণ কেরানী!

—ওঃ, তাহলে সবটাই পিতৃভক্তি? ভাল! ভাল! চমৎকার! কলিতে এমন পিতৃভক্তি দেখা যায় না। তবে এতটা অগ্রসর হবার আগেই তো এ পিতৃভক্তিটুকু দেখালে পারতে? প্রেমের প্রথম পর্যায়েই বলতে পারতে "হে বৈজয়ন্তী, বিদায়! প্রেমের চাইতেও পিতৃ আদেশ অনেক জোরাল জিনিস।"

—মিথ্যে বাবার কথা তুলছিস কেন? বৈজয়ন্তীর সঙ্গে বিয়েতে বাবার আপত্তি ছিল সত্যি, কিন্তু কমলাকে বিয়ে করবার জন্য মা বাবা কেউ জোর করেন নি। আমিই ভাবলাম ওটা যখন ভাঙ্গল, তখন বাবার চিরদিনের ইচ্ছাটাই মিটুক।

এবার আমার নরম হবার পালা। বুঝলাম ভাঙ্গাটা ওপক্ষের কেরামতি। কিন্তু বৈজয়ন্তী? মেয়েদের কি সত্যই চেনা যায় না! বৈজয়ন্তীকে কি তবে ভুলই বুঝেছিলাম? সেই আত্মহারা বেপরোয়া প্রেম নেহাৎই ভান মাত্র!

ব্যঙ্গস্বরে বলি—ওঃ বৈজয়ন্তীই তাহলে মা বাপের অনুগত কন্যা হয়ে উঠল?

—না ভাই, ওর দোষ নেই! বিয়েটা আমিই ভেঙ্গে দিয়েছি। নিজের ইচ্ছেয়! আজকের তারিখে আমাদের রেজেস্ট্রী অফিসে যাবার কথা ছিল। দিন সাতেক হল ওকে চিঠি লিখে দিয়েছি বিয়ে সম্ভব নয় বলে।···হ্যাঁ, আমিই ভেঙ্গে দিলাম। লোহার হাতুড়ী ঠুকে ভেঙ্গে দিলাম ওর এতদিনের আশার স্বপ্ন।

এই ন্যাকামি, এই মনোবিকার দেখে আমার আপাদমস্তক যেন জ্বলে উঠল।

বললাম—চমৎকার! কবিত্বের পরাকাষ্ঠা একেবারে। কিন্তু এই লোহার হাতুড়ীটি বসাবার হেতু শুনতে পাই কি?

—শুনতে?···কনক আর একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলে—হ্যাঁ ভেবেছি তোকেই বলব। কথা সামান্যই, মানে বলতে বেশি সময় লাগবে না। সেদিন—মানে যেদিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি বাবা মাকে আমার স্থির সঙ্কল্পের কথা—ইয়ে—রেজেস্ট্রী বিয়ের ব্যাপারটা জানাব, সেই রাত্রেই এটা ঘটল! সে রাত্রে

কিছুতেই কেন জানি না ঘুম এল না। চোখে মুখে জল দিয়ে, পাখার স্পীড্ বাড়িয়ে —কিছুতেই না।···দৈহিক কোন যন্ত্রণা নেই, অথচ ভেতরটা যেন মুচড়ে মুচড়ে উঠছে, কি যে হচ্ছে বলতে পারছি না।···কি মনে হল, ঘরে টিকতে পারলাম না! উঠে গেলাম তিনতলার ছাদে।·· উঠেই যেন চমকে উঠলাম। দেখি জ্যোৎস্নায় পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে। আলসের ধারে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে···মনে হল— ধূলো মাটি, খোয়া পথ—এগুলো কত নিচে! এই জ্যোৎস্না-ঢালা তিনতলার ছাদে দাঁড়িয়ে ওগুলো আর দেখা যাচ্ছে না। মনে হল বাসনা, কামনা, লোভ, হৃদয়াবেগ —এগুলো কত তুচ্ছ, কত শক্তিহীন! আমি কি ওদের জয় করতে পারি না? আয়ত্ত করতে পারি না নিজেকে? যে পাওয়াকে পরম পাওয়া বলে ভাবছি, তাকে যদি ছাড়তেই হয়, সে ক্ষতিকে কি মেনে নিতে পারব না? এসব কথা কেন মনে হয়েছিল এখন বুঝতে পারি। সেরকম নিঝুম রাতে, পৃথিবীর সমস্ত ধূলো ধুয়ে দেওয়া জ্যোৎস্নায়, একটা বড় কিছু করবার জন্যে, বৃহৎ কোন ত্যাগ স্বীকারের জন্যে প্রাণের মধ্যে কি যেন করতে থাকে! এই রকম রাতেই বুঝি পরীরা মাটিতে নামে—

চমকে উঠলাম।

কনকের শেষ কথাটা শুনেই চমকে উঠলাম। ঠিক এই কথাটা, ঠিক এমনি আচ্ছন্ন স্বরে আর একদিন উচ্চারণ করেছিল কনক!

সেটা হচ্ছে কোজাগরী পূর্ণিমার রাত। পূজোর ছুটির বেড়ানোর প্রোগ্রামটা যথারীতি এমনভাবে অঙ্ক কষে করা হয়েছিল, যাতে পূর্ণিমার রাতকে গ্রেফ্তার করা যাবে তাজমহলের আঙিনায়।

ব্যাপারটা একেবারেই পচা পুরনো, লোকের কাছে গল্প করবার যোগ্য নয়, তবুও ওই পুরনো ফ্যাশনটা এখনও পর্যন্ত চলেও আসছে।

দুবছর আগে, সেবারে সেই পূজোর ছুটির সুবিধেয় আমরাও তাই দুই বন্ধুতে তাজ দেখতে গিয়েছিলাম পূর্ণিমা তাক্ করে।

সামনের চত্বরে বসে আছি।

হাতের কাছে টর্চ আর ক্যামেরা। রাত খুব গভীর না হলেও নেহাৎ কমও নয়। আশেপাশে কেউ নেই, নিজেরাও কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছি না, জ্যোৎস্নার মাদকতায় পৃথিবী যেন আচ্ছন্ন, সে মাদকতা আমাদের মত কঠিন

প্রাণকেও স্তব্ধ করে দিয়েছে যেন !

হঠাৎ সেই স্তব্ধতা ভঙ্গ করে কনক একটা নিশ্বাস ফেলে বলল—এমনি রাতেই বুঝি পরীরা মাটিতে নামে !

প্রশ্ন নয় ! কাউকে উদ্দেশ করেও বলা নয়। কাজেই কথাটা যেন জ্যোৎস্নাতেই মিলিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মিনিট কয়েক পরেই এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল ! কে জানে স্বর্গপরীই মাটিতে নেমে এল, না কি মাটি ফুঁড়ে উঠলো পাতালপরী !

দেখলাম সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক রূপসী তরুণী !

না, বুদ্ধিবৃত্তি একেবারে ভোঁতা হয়ে যায় নি, সঙ্গে সঙ্গেই বুঝেছিলাম আমাদের অন্যমনস্কতার অবসরে পিছনের বারান্দা থেকে ঘুরে এদিকে এসেছে, তবু মনে করতে ইচ্ছে হল এ যেন এক অলৌকিক আবির্ভাব।

তাকিয়ে দেখলাম !

একটি তরুণীকে যতটা দেখে নেওয়া সম্ভব, এক নজরে দেখে নিলাম। সাজ সজ্জায় রীতিমত শক্তপোক্ত আধুনিকা। কাঁধে ষ্ট্র্যাপ ঝোলানো ভ্যানিটি ব্যাগ, গলায় ঝোলানো রয়েছে ক্যামেরা।...কোথাও কোনখানে রহস্যের অবগুণ্ঠন নেই। তবু 'পরী' কথাটা বাজতে লাগল মনের মধ্যে।

গোটা কয়েক মুহূর্ত সেও চুপ করেছিল, তারপর সুন্দব একটি সুরেলা গলায় বলে উঠল—দয়া করে একটু স্থির হয়ে বসবেন ? ছবি তুলব।

কনকটা এমন বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে রইল যে বাধ্য হয়েই আমি কথার ভার নিলাম। বললাম—এই আলোয় ? তাছাড়া আপনার নির্বাচনটা কি খুব ভাল হয়েছে ? ছবি তোলার উপযুক্ত বিষয়ের তো অভাব নেই এখানে।

—তা হোক ! এটাও আমার বিবেচিত নির্বাচন। অনেকক্ষণ থেকে দেখছি আপনাদের, এমন চুপ করে বসে আছেন যেন পাথরের পুতুল ! উঃ আমি তো এক মিনিটও—দাঁড়ান, একটু এদিকটায় সরে আসুন,...না !...হ্যাঁ ঠিক আছে... রেডি !

ব্যাপারটা যদি উল্টো হত, আমরা যদি অলক্ষে বসে অনেকক্ষণ দেখতে দেখতে হঠাৎ এসে কোন তরুণীকে বলে বসতাম—'দয়া করে একটু স্থির হয়ে বসবেন ? আপনার ছবি তুলব—' তাহলে পরিণামটা যে কি দাঁড়াত ঈশ্বর জানেন।

কে জানে জেলেই যেতে হত, না হাসপাতালে !...সন্দেহ নেই যে তেমন কথা উচ্চারণ করলে, উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই মাটি ফুঁড়েও দণ্ডদাতা উঠত।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে কিছুই হল না। বরং আমরা দুই বন্ধু এমন কৃতকৃতার্থের ভঙ্গীতে বসে রইলাম যে—বোধ করি হাঁ-করা ছবিই উঠল।

দু-তিনটে ছবি নিয়ে তরুণী ক্যামেরা বন্ধ করে স্মিতহাস্যে বললেন—'আচ্ছা, ভাল হয়তো এক কপি পাঠিয়ে দেব—নমস্কার!'

ব্যস, চলে গেল গটগটিয়ে।

আমরা হাঁ করে দুজনের মুখের দিকে দুজনে তাকালাম। পাঠিয়ে দেবে মানে কি? কোথায় পাঠিয়ে দেবে? কাকে পাঠিয়ে দেবে? ও কি আমাদের চেনে?

কনক যদি অমন মন্ত্রাহতর মত হয়ে না যেত, হয়তো, আমিই সেই রহস্যময়ীর প্রেমে পড়ে বসতাম, কিন্তু কনকের অবস্থা যে সঙ্গীন মনে হচ্ছে। ওকে ঠেলা মেরে বললাম—কি হে, ব্যাপারটা কি বুঝলে?

কনক মাথা নেড়ে বলল—কিছু না!

—কী মার্ভেলাস একখানা কায়দা করে গেল, এ্যাঁ? আর আমরা দু-দুটো ক্যামেরা নিয়ে গোবর-গণেশের মত বসে থাকলাম?

—ওঃ! ঈস!

—আধুনিকার ছদ্মবেশে তোর পরীই মাটিতে নেমে এল নাকি রে?

—অসম্ভব কি? পরীরা তো ছদ্মবেশেই নামে।

—আহা রে! মোটে একটি! আমিও যদি একটা পরী-টরীর বায়না করে বসতাম।

—অসভ্যতা করিস নি!

আর একটা জোর কনুইয়েব গুঁতো দিয়ে বললাম—ব্যাপার কি হে কনক-বাবু! লক্ষণ ভাল ঠেকছে না তো! দর্শনমাত্রেই কিছু নয় তো?

কনক যদি বলত—'তাই মনে হচ্ছে' তাহলেও আশা করবার কিছু থাকত, কিন্তু হতভাগা আমাকে একেবারে জল করে দিয়ে ফিকে ফিকে গলায় বলল কিনা—কি যে বলিস।

অর্থাৎ কি না—যা বলেছি তা সত্যি হওয়া অসম্ভব নয়। হয়তো বা হয়ে বসে আছে।

গম্ভীরভাবে বললাম—ভাই হে সাবধান! ব্যাপারটা অনুধাবন কর! নিশীথ রাত্রি, তাজমহলের সামনে সহসা মাটি ফুঁড়ে উঠল এক সুন্দরী তরুণী। সঙ্গে ত্রিসীমানায় কেউ নেই। এত স্মার্ট যে আমরা দু-দুটো সা-জোয়ান 'কাঠ' বনে গেলাম। কী এ? কি জাতি, কি নাম ধরে? কোথায় বসতি করে?

কনক বলে—তাই ভাবছি।

—আমার কিন্তু ব্যাপারটা সুবিধের ঠেকছে না। এবার চল পালান যাক।

—কেন?

—কেন! বিদেশ-বিভূঁই জায়গা, কি হয় বলা যায়? আমাদের এই রাত অবধি বসে থাকা, হয়তো কোন রাতচরা শকুনের চোখে পড়েছে। সামনের দিকে তরুণী এগিয়ে দিয়ে, গুণ্ডামীর ইতিহাস তো ঢের শোনা আছে বাবা! নে নে ওঠ্।

দুজনেই গা ঝেড়ে উঠে পড়ি। বোধ হয় দু-চার পা এগিয়েও ছিলাম, হঠাৎ বেশ একটু হাসি, কথার আওয়াজ কানে এল। কারা কথা কইতে কইতে আসছে।

চুপি চুপি বললাম—কনক সর্বনাশ! যা ভেবেছি বোধ হয় তাই।

কনক বলল—তোর উচিত বানপ্রস্থ নেওয়া। দেখছিস না পূর্বেরটি এবং আরও একটি তরুণী, আর সঙ্গে একটি ইয়ংম্যান।

—ইয়ংম্যান! আমি ভয়ের ভান ত্যাগ করে হতাশার ভান করি—তবে তো সব দিকেই কেস্ হোপলেস!

—থাম! আসছে। অসভ্যতা করবি না!

তারপরই কলরব নিকটবর্তী হয়। পূর্বদৃষ্টা তরুণীর পিঠে হাত রেখে ইয়ংম্যানটি দরাজ গলায় বলে ওঠে—এই দেখুন মশাই—আমার শ্যালিকাটির বুদ্ধির বহর। উনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন আপনাদের ফটো আপনাদের কাছে পাঠাবেন, কিন্তু কোথায় পাঠাবেন সে হদিশ নেওয়ার দরকার বোধ করলেন না।

একটা হাসির শোরগোল, একটা প্রতিবাদ, দুটো ভদ্রতার কথার আদান-প্রদানের পর যখন একপক্ষ অপর পক্ষকে প্রশ্ন করা হয়—'কোথায় উঠেছেন?' তখন আরও একবার হাসির হুল্লোড় ওঠে।

একই হোটেলের বাসিন্দা আমরা।

কে কখন আসে, কখন বেরোয়, কারও সঙ্গে কারও চোখোচোখিই হয় না। আজ এখানে এসে—চোখোচোখি হত না তো হত না, হল যদি তো এমন হতে শুরু হল যে রক্ষে থাকে না।

নাঃ সত্যি, বন্ধুটাকে আর রক্ষে করতে পারলাম না। বিদেশে এসে ছোকরা হৃদয়টিকে একেবারে হারিয়ে বসল।

মেয়েটি—মানে বৈজয়ন্তী কলকাতারই মেয়ে, গিয়েছিল দিদি-জামাইবাবুর

সঙ্গে আগ্রা-দিল্লী জয়পুর-উদয়পুর বেড়াতে। তাই এত মুক্ত জীব।

দিদি জামাইবাবুও প্রায় নাবালক, কাজেই বুদ্ধিমতী বৈজয়ন্তী সদা-সর্বদাই 'তৃতীয় ব্যক্তি' হবার দুর্ভোগ পোহাতে রাজী হত না। ঘুরে বেড়াত একা একা। এরপর ভর করতে শুরু করল আমাদের স্কন্ধে।

ভারটা অবশ্য ফুলের মালার মতই লাগত আমাদের, তবে কনক মরল।

তারপরের ঘটনা দ্রুত পরিণতির পথে এগোতে থাকে। কলকাতায় এসে দেখা-সাক্ষাৎ বজায় থাকে, প্রেম বাড়তে বাড়তে দুকূল ভাসায়।

কিন্তু প্রেমের পথ চিরদিনই বন্ধুর।

এ কাহিনী জানাজানি হতেই হল মুশকিল। যেভাবে দেখা-সাক্ষাৎ চলছিল তার সুবিধে ঘুচল। দেখা চলছিল দিদির বাড়ির মাধ্যমে, আর চলল না। আগুন কখনও আঁচল দিয়ে ঢাকা যায়?

বৈজয়ন্তীর মা বাপ একদিন বড় মেয়ের বাড়ি এসে বড় মেয়েকে বুদ্ধিহীনতার জন্যে করলেন তিরস্কার, আর ছোট মেয়েকে স্বেচ্ছাচারিতার জন্যে করলেন নজরবন্দী।

কিন্তু সমুদ্রকে কে কবে বালির বাঁধ দিয়ে ঠেকিয়েছে? কে কবে পেরেছে নবযৌবনের উদ্দাম আবেগকে চোখরাঙানি দিয়ে রুখতে? বৈজয়ন্তী ক্রমশঃ বেপরোয়া হয়ে উঠল। বকুনি খায় তবু পালিয়ে এসে দেখা করে। জানে দেরি করে বাড়ি ফিরলে সহস্র বজ্র মাথায় পড়বে, তবু দেরি করে ফেরে।

অথচ সত্যিই কিছু আর বি-এ পাশ মেয়েকে ঘরে তালা দিয়ে আটকে রাখতে কেউ পারে না। এ সমস্ত খবরই আমি জানতাম, এবং এও জানতাম শেষ অবধি বৈজয়ন্তী না কি বাপের মুখের উপর বলেছে—'আপনারা অনুমতি না দিলে আমি তো পালিয়ে গিয়েও বিয়ে করব বাবা, তবে কেন অনুমতি দিতে কার্পণ্য করবেন?' এবং মেয়ের এই ফতোয়া জারির পর থেকেই তার বাপ মা এমন স্তব্ধ হয়ে গেছেন যে, বাড়িতে আর টিকতে পারছে না বৈজয়ন্তী! রেজেস্ট্রীর দিন নিকটবর্তী করে আনতে তাগিদ বৈজয়ন্তীর দিক থেকেই বেশি ছিল।

এই তো কদিনের কথা সে সব।

মাঝে দিদিকে শ্বশুরবাড়ি থেকে আনতে দিন চার পাঁচের জন্যে জিয়াগঞ্জে গিয়ে ছিলাম। আর এই দিন পাঁচ সাত এসেছি। এর মধ্যে কি ঘটল? কিসের বন্যা এল, যে বৈজয়ন্তী ভেসে গেল!

—আমার কথায় যে মোটেই কান দিচ্ছ না হে, কী অত ভাবছ ?

চমকে বললাম—কই না, কী আর ভাবব ?

—ভাববার অবশ্য আছেও ঢের। আমিও সেদিন অনেক ভাবলাম…! ভেবে ভেবে বুঝবাম—এই যে ভেতরে একটা মোচড় দেওয়া যন্ত্রণা উঠছে, এর কারণ মা বাবার আহত গম্ভীর মুখ।…আমার এই অবাধ্যতা, এই স্বেচ্ছাতান্ত্রিক বিবাহের সংকল্প যে তাঁদের মাতৃপিতৃ-মর্যাদাকে লঙ্ঘন করেছে সে তাঁদের মুখের চেহারাতেই ফুটে উঠেছে।

বিরক্ত হয়ে বলি—সেটা আরও বেশি করে ফুটিয়ে তোলবার কৌশল মা বাপের বেশ আয়ত্ত থাকে।…ওতে ছেলের মধ্যে অপরাধী ভাবটা দিব্যি ঢুকিয়ে দেওয়া যায় কি না!

—না ভাই না,—কনক ব্যাকুলভাবে বলে—ও কথা বললে সত্যিই তাঁদের প্রতি অবিচার করা হবে।—অপমান হয় বৈ কি! অভিমানে আঘাত পড়লেই অপমান হয়।…সেটা বুঝতে পারছিলাম বলেই না অত যন্ত্রণা হচ্ছিল।…সে যেন এক শারীরিক যন্ত্রণা! ইচ্ছে হচ্ছিল ছাদের আলসেয় মাথা ঠুকি, ছুরি দিয়ে হাতের তেলোটা চিরে ফেলি।

—উন্মাদের পূর্বলক্ষণ। বললাম হতাশ হয়ে।

—তা যা বল। তবু সেই যন্ত্রণার মধ্যে হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর সত্য আবিষ্কার করে ফেললাম! আর—ফেলে যেন স্তব্ধ হয়ে গেলাম!…হ্যাঁ সেটা আবিষ্কার করেই বুঝতে পারলাম, এ বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বৈজয়ন্তীর মত নিষ্ঠুর মেয়েকে বিয়ে করা যায় না।

নিষ্ঠুর।

অবাক হয়ে যাই। বলি—এর মধ্যে ওর নিষ্ঠুরতার কি পেলে ?

—সবটাই! হ্যাঁ, সবটাই নিষ্ঠুরতা। ভেবে অবাক হয়ে গেলাম সুজিৎ, আমি পুরুষ হয়ে যে কথা মা বাপের মুখের ওপর বলতে পারছি না, তাঁদের বিষণ্ণ মুখ দেখে নিজের সুখের চিন্তায় ধিক্কার আসছে, সেই কথা বৈজয়ন্তী অবলীলাক্রমে বাপের মুখের ওপর বলেছে! তাকে এই ভয়ঙ্কর অপমানটা করতে দ্বিধা করে নি, দ্বিধা করছে না দশের সামনে তাঁদের মাথা হেঁট করতে! নিজের হৃদয়াবেগই যার কাছে একমাত্র সত্য, তেমন মেয়েকে নিয়ে আমি কি করব সুজিৎ ?

অদ্ভুত একটা অসহায় ভাব ফুটে ওঠে কনকের মুখে।

অবাক হই, কিন্তু মমতা হয় না। ব্যঙ্গ-তিক্তস্বরে বলি—এই পরম সত্যটি

আবিষ্কার করতে তোমার এতদিন লাগল ?

—পরম সত্য নয় সুজিৎ, বরং ভয়ঙ্কর সত্য। তুইই ভেবে দেখ, যে মেয়ের মা-বাপের ওপর মমতা নেই, মমতা নেই আজীবনের আশ্রয়ের ওপর, ডিম ফুটে বেরনো পাখীর ছানার ডিমের খোলাটা ত্যাগ করার মত অক্লেশে ত্যাগ করে আসতে পাবে সে আশ্রয়, জগতে আর কার জন্যে তার মমতা থাকবে ?

ওর এই অদ্ভুত হিসেবের হিসেব পেয়ে রাগ করতেই ভুলে যাই, প্রায় শান্তভাবেই বলি—অক্লেশে একথা তোমায় কে বললে ? একটা পরম প্রত্যাশায় এ রকম চরম মূল্যই ত দিতে হয়।

কনক ধীরে ধীবে মাথা নাড়ল। বলল—ওসব বইয়ের কথা। শেষ কথা হচ্ছে —পারল ত ? এই স্বার্থপরতার বোঝা আমি কি করে আজীবন বইব সুজিৎ ?

গম্ভীরভাবে বললাম—বেশ, বুঝলাম—সে স্বার্থপর, নিষ্ঠুর, হৃদয়হীনা! তোমাবও না হয় হঠাৎ দিব্যদৃষ্টি খুলে গেছে, আত্মসুখে ধিক্কার জন্মেছে, কিন্তু আপাততঃ এই অবস্থায় সে কি করবে ভেবে দেখেছ ?

কনক আমাব চোখেব উপর একটা লক্ষ্যহীন দৃষ্টি ফেলে বলে—তা জানি না।

—চমৎকার। কিন্তু ওহে মহানুভব হৃদয়বান। যে বেচাবা সব দিক ছেড়ে তোমায় ধবেছিল তার প্রতি তোমাব এই ব্যবহাবটি বেশ মমতার পরিচয় দিচ্ছ তো ?

হঠাৎ কনক টেবিলের ওপর কনুই রেখে মেয়েদের মত দু-হাতে মুখ ঢাকে। আর তাব মধ্যে থেকে ভাঙা ভাঙা কাঁপা কাঁপা গলায় বলে—ও কথা মনে করিয়ে দিসনে সুজিৎ, ভাবতে গেলে বুকটা ভেঙে যায়। তবু ওকে বিয়ে করা আমার পক্ষে অসাধ্য। হয়তো—যদি সেদিন বাত্রে ছাদে না উঠতাম, যদি মাথার ওপর অবারিত আকাশ আর পায়ের নিচে অগাধ জ্যোৎস্নার জোয়ার না দেখতাম, এ সবের কিছুই হত না। হয়তো—এই ভয়ঙ্কর সত্য চিরদিনের মতই অনাবিষ্কৃত থেকে যেত, কিন্তু এখন—এখন আর ওর ভালবাসায় বিশ্বাস রাখবার ক্ষমতা আমার নেই!

আঙুলের ফাঁক নিয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে টপ টপ করে ঝরে পড়ে ওরই সামনে পড়ে থাকা বাহারে সেই নিমন্ত্রণ পত্রটার ওপর।

স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি।

কি বলব ওকে ?

শয়তান, না হতভাগ্য ? কাপুরুষ, না অসহায় ?

* * *

কে জানে সত্যিই এমনি বেয়াড়া জ্যোৎস্না-রাতে পরীরা মাটিতে নামে কি না! কে জানে তারাই মানুষের জীবনে নতুন নতুন সত্যের আবিষ্কার করে দিয়ে যায় কি না!…তাই—শুধু তেমন রাত্রেই এমন আকস্মিক সমাধান সম্ভব হয়!

হ্যাঁ, এর পরে একদিন কনক বলেছিল আমায়, 'জীবনের কোথাও যদি কোন সংশয় দেখা দেয় সুজিৎ, তুমি একদিন শুধু মাঝ রাতে একেবারে নিঃসঙ্গ একলা উঠে যেও ছাদে! নয়তো—নেমে যেও নির্জন প্রান্তরে! যেখানে পৃথিবী জ্যোৎস্নার চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে।…দেখবে তোমার সমস্ত সন্দেহ শান্ত হয়ে গেছে, দেখবে 'লাভ' আর 'ক্ষতি' এ দুটো কথার আলাদা কোন অর্থ নেই।

পলাতক

অভিমন্যুর দুর্ভাগ্য যে তার প্রথম প্রেমের তীব্র আবেদন নিয়ে যে মেয়েকে ভালবাসল, জীবনের সমস্ত সম্ভাবনা আর সমস্ত স্বপ্ন চুকিয়ে বসে আছে সে।

সুমিতা বিধবা।

সভ্য সমাজে 'বালবিধবা' শব্দটা আজ অর্থহীন হয়ে গেছে তাই, নইলে, বালবিধবা বলাই উচিত ছিল বোধ হয়। একুশ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে, সে মেয়ে যদি বাইশবছর না হতেই বিধবা হয়ে ফিরে আসে, বারো বছরের চাইতে সে কি কম ভয়াবহ?

তাকে নিয়ে কী করবে বাপ মা?

কী সান্ত্বনা দেবে তাকে সভ্য ভব্য আধুনিক সমাজ? বড়জোর দেবে—'স-জলা' একদশীর অনুমতি, দেবে—'থানধুতি' থেকে অব্যাহতি। আর কি? আর কিছু ত নয়?

মেয়েদের "দ্বিতীয় পক্ষের" পক্ষ নিয়ে আইন যতই উঠে পড়ে লাগুক, সমাজে—সুমিতাদের মত মধ্যবিত্ত সমাজে—আজও ও আইন অচল।

কিন্তু সমাজসমস্যার কথা হচ্ছে না, কথা হচ্ছে অভিমন্যুকে নিয়ে।

অভিমন্যু পচা পুরনো প্রথার দাস নয়। কুসংস্কারকে ভাঙবার মত জোর ওর আছে। ও জানে—যৌবন নিঃশেষিত হবার আগে জীবনের সমস্ত সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায় না। 'বৈধব্য" একটা ঘটনা মাত্র। সেই দৈবাতের একটা ঘটনাকে

অনর্থক প্রাধান্য দিয়ে, সুমিতার মত একটা জীবনকে অপচয় হতে দেওয়া পাগলামীর সামিল।

অভিমন্যু কোন কিছুকেই ভয় করে না। ভালবেসে সে অনুতপ্ত নয় মোটেই। অথচ সুমিতা ভয় করে প্রত্যেককে।

পাপ-পুণ্য, শাস্ত্র-সমাজ, আচার অনাচার, থেকে শুরু করে—মা বাপ, ঠাকুমা পিসী, পাড়াপ্রতিবেশী, একধার থেকে সকলকে ওর ভয়।

বাইশ বছরের নিরর্থক যৌবনকে নিয়ে সে যেন নিজেকে লুপ্ত করে ফেলতে পারলেই বাঁচে। অদৃশ্য হয়ে যাবার কোন মন্ত্র যদি জানা থাকত সুমিতার!

জানা ছিলনা।

তাই দৃশ্যমান হওয়া ছাড়া উপায় কোথা? অতএব কোন এক দৈবমুহূর্তে অভিমন্যুর মুগ্ধ দৃষ্টির মধ্যে পড়ে গেল সে। বলাবাহুল্য নিজেব দৃষ্টির এই নীতি বিগর্হিত কাজের জন্য মোটেই কুণ্ঠিত হল না অভিমন্যু। ন্যায়-সঙ্গত মিলনের সমস্ত পথঘাট খোলা না রেখে প্রেমে পড়াটা অসঙ্গত—এ ওকে বোঝাতে পারল না সুমিতা।

অথচ সুমিতাব পক্ষে ভাল করে বোঝানোর অসুবিধে কত!

যাবতীয় ভীতিকর বস্তুর চোখ বাঁচিয়ে তবে ত?

কিন্তু সুমিতার নিজের চোখই কি ছিল নিষ্ক্রিয় হয়ে? বৈধব্য কি হরণ করে নিয়েছে ওর দৃষ্টিশক্তিকে?

কে জানে সুমিতাদের মত চাপা স্বাভাবের মেয়েরা—কী ভাবে, কী না ভাবে, বোঝা দায়!

এদিকে—বেপরোয়া অভিমন্যু যেই আবিষ্কার করল—সুমিতাকে তার চাই, সুমিতাকে না হলে তার চলবে না, সেই মুহূর্তেই ব্যক্ত করে বসল দ্বিধাহীন সরল ভঙ্গীতে।

বলল—সুমিতা, তোমাকে আমার চাই।

শুনে সুমিতা চমকে উঠল, শিউরে উঠল, স্তব্ধ হয়ে গেল।

অভিমন্যু আবার বলল—জেন এটা আমার আবেদন নয়, সংকল্প!

সুমিতা একবার ওর দিকে তাকিয়ে ঠাণ্ডাগলায় বলল—কিন্তু তোমার সংকল্পটাই তো সংসারের শেষ কথা নয়!

—সংসারের ধার আমি ধারি না। আমার কাছে আমার সংকল্পই শেষ কথা।

তোমাকে আমি নেবই।

সুমিতা মৃদু হেসে বলল—ছলে বলে কৌশলে—যে কোন উপায়ে?

—তাতেও আপত্তি নেই—অভিমন্যুও হাসল—বলপ্রয়োগ যদি বল? সে তো করতেই হবে প্রচলিত ব্যবস্থার ওপর। আর কৌশল করতে হবে তোমার গার্জেনদের নিকট। বাকিটা—

—বাকিটা বোধ হয় আমার জন্যে?—বলে আর একবার হাসল সুমিতা।

যে হাসি দেখলে—প্রতীক্ষা দুঃসহ হয়ে ওঠে অভিমন্যুর।

অভিমন্যু বলল—তোমার জন্যে তোলা আছে যথা-সর্বস্ব, সেখানে বাকিও থাকবে না, ফাঁকিও থাকবে না, কিন্তু সে ত পরে। এখন চললাম তোমার গার্জেনদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছবার সুড়ঙ্গ খুঁজতে।

—পাগলামী কোর না—বলে পালায় সুমিতা।

একটানা বসে গল্প চালিয়ে যাবে, এত সহজ তো নয় পৃথিবীটা! এখানে শুধুই কি আছে অভিমন্যুর অভিভূত চোখ? আছে—সুমিতার আত্মনিবেদনের দৃষ্টি? নেই সতর্ক প্রহরীর সজাগ চোখ? নেই—নিঃস্বার্থ হিতৈষীর তীক্ষ্ণ শ্যেন দৃষ্টি?

তবু—এমনি টুকরো দেখা আর টুকরো কথার সোনালী রেশমে বোনা হচ্ছে ওদের রঙিন প্রেমের উত্তরীয়।

অদ্ভুতকর্মা অভিমন্যু।

কি করে যে ও সুমিতার বাবার সঙ্গে দিব্যি জমিয়ে ফেলল, আদায় করে নিল সুমিতার মার স্নেহের ভাঁড়ারের চাবিকাঠি, সে এক অলৌকিক রহস্য!

পাঁচজনে শুনতে পেল সুমিতার মাকে 'মা-জননী' বলে ডাকছে অভিমন্যু। প্রথম দর্শনেই ও নাকি বলেছে—কথা বলতে বসে 'আপনি আজ্ঞে' করতে পারব না কিন্তু, ডাকতে পারব না সেই তন্তকেলে 'মাসীমা' ডাকে। তোমায় আমি 'মা জননী' বলব।

বলাবাহুল্য বিগলিত স্নেহে স্নেহের ভাঁড়ারের চাবি খুলে দিতে দেরি হয় নি নিরুপমা দেবীর।

কথাটা যা-তা ঘরের বাজেমার্কা কোন ছেলের মুখে শুনলে অবশ্যই গা জ্বলে যেত। মনে হত 'আদিখ্যেতা'। কিন্তু তা তো—নয়। ও যে 'হীরের টুকরো'দের একশ যে গাড়িখানা চড়ে বেড়ায় সে, তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে হয় সেটাকে।

সেই গাড়িতে চড়িয়ে—অভিমন্যু নিরুপমাকে—নিরুপমার পিতৃসম্পর্কের

যত আত্মীয় আছে, মামাতো, মাসতুতো, জ্ঞাতি আর পড়শী, প্রয়োজনও ছিল না, তাদের বাড়ি বাড়ি বেড়িয়ে আনল একে একে।

সুমিতার বাবার হাঁটুর বাত চাগলে সেই গাড়িতে চড়িয়ে অফিস পৌঁছে দিল পর পর এগারো দিন। সুমিতার ঠাকুমা আব পিসীকে নিয়ে গেল কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বরে।

এর পরেও যদি বজ্র-আঁটুনির গেরোটা একটু ঢিলে না হয়, তাহলে—মনুষ্য-মনস্তত্ত্ব যে বেবাক মিথ্যে হয়ে যায়! অতএব—'গেবো' একটু ঢিলেই হয়ে গেল একদিন।

ছোট ছোট ভাইবোনদের রক্ষীদল হিসেবে নিয়ে একদিন বেলুড়ে যাবার অনুমতি পেলো 'সুমিতা' অভিমন্যুর সেই চকোলেট রঙেব চকচকে গাড়িখানা চড়ে।

—গাড়িখানা আজ ধন্য হল।

মন্দিরেব গেটের কাছে নামবাব সময দরজা খুলে দিয়ে এই মন্তব্যটি প্রকাশ করল অভিমন্যু।

—শুধু গাড়িটা?⋯ মৃদু চাপা গলায় বললে সুমিতা—আর কেউ নয়? কিন্তু থাক, শিশুরা সব সময় শিশু নয়।

—উঃ! তুমি বোধ করি কীট-পতঙ্গকেও ভয় কর, না? এত ভয় কেন?

সুমিতা উত্তর দিলে না। একবার কেবল অভিমন্যুর মুখের দিকে সোজাসুজি তাকাল। সাদা ধবধবে সরু সিঁথিব দুপাশে ভাগকরা ঈষৎ সোনালী চুলের নিচে চকচকে মাজা কপালটাও যেন তাকিয়েছে অভিমন্যুর দিকে—ঈষৎ সোনালী দুটি চোখের সঙ্গে।

চোখেরই শুধু ভাষা থাকে না, থাকে—চুলের, কপালের, আঙুলের ডগার ভাষা—বাঁকানো গ্রীবার বিশেষ ভঙ্গীর।

উত্তর বোধ করি পেল অভিমন্যু, তাই আবার বলল—কিন্তু এ ভয়কে জয় করতেই হবে সুমিতা। কারণ আমরা দুজনে দুজনকে চাই।

—তোমার কথাই বল—সুমিতা হাসল—বাড়ির গণ্ডির বাইরে বলেই বোধ-করি সত্যিকার হাসি—যে হাসি কোনদিন দেখে নি অভিমন্যু।—তোমার নিজের কথাই বল—আমার কথা কি জান তুমি?

—সব জানি।

—কে বললে?

—আমার অন্তর্যামী। আচ্ছা ছেলেগুলো ছিটকে পালাল কোথায়? এই শোন্ শোন্ দেদার চকোলেট এনেছি তা জানিস? কি করব? মা গঙ্গাকে অর্ঘ দিয়ে দেব? না নিবি তোরা?

চকোলেট এবং স্বাধীনতা। জগতে আর বেশি কি কাম্য থাকতে পারে?

ছোটরা মহোৎসাহে শুরু করল ছুটোছুটি। ওরা দুজনে বসল গঙ্গার ধারে। আরতি আরম্ভ হলে উঠে যাবে। আগে ভেবেছিল—কত কথা কইবে, এতবড় সুযোগ ব্যর্থ হতে দেবে না। কিন্তু কথা জোগাচ্ছে না মুখে।

মিনিটের পর মিনিট কাটছে···পশ্চিমের জলন্ত আগুন স্তিমিত হয়ে আসছে··· রূপান্তরিত হচ্ছে সোনায়।

হঠাৎ এক সময় অভিমন্যু বলে উঠল—ঠিক এই মুহূর্তে কি ইচ্ছে করছে জান সুমিতা?

—কি?

—ওই জলে ঝাঁপিয়ে মরতে।

—চমৎকার!

—পরিহাস কোর না, দোহাই তোমার। সুখের পাত্র যখন উপ্‌ছে ওঠে, তখন বড় একটা কিছু ত্যাগ করতে ইচ্ছে করে সুমিতা।

—কিন্তু প্রাণত্যাগটা বাদে হলেই ভাল হয় না কি?

—সুমিতা, সব সময় সব কথা হেসে উড়িয়ে দাও কেন? এ যেন তোমার নিজের চারিপাশে দুর্ভেদ্য-দেয়াল খাড়া করে রাখা। একটু গম্ভীর হতে পার না?

—হলে তোমার ভাল লাগে?

—সব সময় না হোক, এক এক সময়!···

—আচ্ছা গম্ভীর হচ্ছি। যা বলবে—শুনে যাব, কথাটি কইব না।

—তাই বলেছি আমি?

অভিমন্যু রেগে ওঠে।

—তবে? উত্তর চাও—কিন্তু নাটকীয় ভাষায়। এই বলছ?

—হ্যাঁ বলছি।

বলে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল অভিমন্যু।

সুমিতা অস্থির হল না, চুপ করে তাকিয়ে থাকল গঙ্গার একূল-ওকূল-ভরা জলের দিকে।···ওই ভরা হৃদয়ের ওপর যখন ভেসে আসছে এক একখানা নৌকো ছল্ ছল্ করে উঠছে জল। তরঙ্গ উঠছে অনেকটা জায়গা জুড়ে···কিন্তু নৌকো-

খানা চলে গেলেই তো নিস্তরঙ্গ হয়ে যাচ্ছে আবার।

জলের বুকে তরঙ্গ তোলা নৌকোর কাজ, জল নির্লিপ্ত।...

আচ্ছা, মানুষের হৃদয়কে তবে নদীর সঙ্গে তুলনা করা হয় কেন?...সে কি নির্লিপ্ত? কিন্তু অভিমন্যু কি অভিমান করল? চোখ বুজে পড়ে আছে যে। ওর কপালটার ওপর যদি একটিবারের জন্মে রাখতে পারা যেত ডান হাতখানি!

ক্ষতি কি? পৃথিবীটা তাহলে চলতে চলতে থেমে যাবে? বাতাস স্তব্ধ হয়ে যাবে? নদীর জল শুকিয়ে উঠবে? সুমিতার এই অনাচার দেখে?

চমকে উঠল অভিমন্যু।

আবেগের বেগে চেপে ধরল কপালে রাখা ঠাণ্ডা হাতখানা।

—সুমিতা, সুমিতা, তোমাকে আমার চাই। আর অপেক্ষা করতে পারছি নে। আজকেই আমি--তোমার মাকে—

—পাগলামী কোর না। তাহলে বাড়ির লোকে ভাববে ষড়যন্ত্র করবার জন্মেই এসেছিলাম আমরা।

কথাটা মিথ্যা নয়। অভিমন্যু বুঝল। তবু বলল—উঃ, কি বিরাট ধৈর্য তোমার! কি অগাধ বিবেচনা!

এরপর সন্ধ্যা নেমে এল, বেজে উঠল আরতির ঘণ্টা। তৎপর হয়ে উঠল দুজনে। ছোটদের ডেকে নিল।

ফিরবার সময় আর কথা নেই।

কানায় কানায় ভরা-পাত্র নাড়াচাড়া করতে ভয় করছে বুঝি বা।

সেদিন নয়—কদিন পরে এক সময় এই অদ্ভুত প্রস্তাবটা করে বসল অভিমন্যু নিরুপমার কাছে।

কিন্তু নিরুপমাও কি মনে মনে প্রস্তুত ছিলেন? চমকে উঠলেন না কেন? শুধু কণ্ঠে যথাসম্ভব বিষাদ এনে বললেন—কি বলব বল বাবা? আমাদের মত ঘরে এ রকম তো এখনও চল হয় নি। আমি যদি বা হতভাগীর মুখ চেয়ে সংস্কার ত্যাগ করতে পারি, আর সবাই? আমার শাশুড়ী ননদ তাহলে জীবনে আর মুখ দেখবেন আমার?

অভিমন্যু বলল—তাতে কি পরিমাণ ক্ষতি হবে তোমার বলতে পার?

নিরুপমা বিমূঢ় ভাবে বলেন—ক্ষতি নয়? সংসারে অশান্তি, লোকনিন্দে, আত্মীয়স্বজনের কাছে—

বাধা দিয়ে অভিমন্যু বলল—এ সমস্তই তো তোমার নিজের অহঙ্কার মা জননী। না হয় নিন্দে করলই লোকে, না হয় আত্মীয়স্বজনে ত্যাগই করল তোমাকে। সুমিতার সুখের জন্যে এটুকু মূল্য দিতে পার না? তোমাকে লোকে কি বলল, সেইটাই এত দামী কথা? সুমিতার জীবনটা—বাজে খরচ হয়ে যাওয়ার চাইতেও?

অভিভূত নিরুপমা বললেন—কিন্তু উনি? উনি কি রাজী হবেন?

—সে ভার তোমার। যদি না পার, বোঝা যাবে তোমার মাতৃস্নেহে ফাঁকি আছে।

এ এক অশ্রুতপূর্ব নতুন কথা।

এদিক দিয়ে তো কোনদিন চিন্তা করে দেখেন নি নিরুপমা।

তা চিন্তা করতে যদি শুরু করে একবার, তাহলে অসাধ্য সাধন করতে পারে মেয়েরা। স্বামীকে রাজী করিয়ে ছাড়লেন তিনি। মা বাপ হঠাৎ মরে গেলে কি না কি দুর্দশা হতে পারে মেয়ের, তার প্রজ্বলিত উদাহরণ দেখিয়ে দেখিয়ে একেবারে মূক করে দিলেন ভদ্রলোককে।

তবে শাশুড়ী-ননদরূপী ভয়ঙ্কর প্রাণীদের স্বমতে আনবার অনর্থক চেষ্টাটা আর করলেন না। ঠিক হল বিয়েটা হবে চুপি চুপি, সুমিতার এক উদারপন্থী বিপত্নীক পিতৃবন্ধুর বাড়ি থেকে। কেবলমাত্র স্ত্রী কন্যাকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরনো এবং পুরো একটা দিন-রাত্তের অনুপস্থিতির কৈফিয়ৎ দিতে—গল্প একটা বানাতে হল সুমিতার বাবাকে অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে।

নিয়ম-লক্ষণ, দাবী-দাওয়া, যৌতুক-অলঙ্কার-বর্জিত বিয়ে। অন্য হাঙ্গামা তো কিছু নেই। অভিমন্যুর দিকে অত চিন্তা নেই, ও স্বাধীন।

এরপরে বাসরঘর অথবা ফুলশয্যার রাত্রির একটি মধুর ছবি এঁকে শেষ করা যেত সুমিতার কাহিনী। সুখী হত শ্রোতারা, শান্তি পেত লেখনী। কিন্তু তা হল কই?

নাশকতামূলক কার্যের জন্য বিখ্যাত বিধাতা-পুরুষ, ছোট্ট একটি 'ফিশ্‌প্লেট' অপসারিত করে লাইনচ্যুত করে দিলেন—সুমিতার জীবনের মেলট্রেনখানা। যে-খানা—বহুক্ষণ 'সাইডিং'-এ পড়ে থেকে সবেমাত্র আবার চলতে শুরু করেছিল।

সকালবেলা বন্ধুর বাড়িতে মেয়েকে প্রতিষ্ঠিত করে রেখে কর্তা-গিন্নী দুজনে ছুটেছেন গুরু-আশ্রমে। বোধ করি অসামাজিক কাণ্ডের জন্য অনুমতি আদায় করতে। সংস্কার যেখানে প্রবল, সেখানে বাইরে থেকে কিছু সমর্থন না পেলে চলে না।

তাছাড়া—এখন আর ভয় কি? ভয় কি সুমিতাকে একা রাখায়?

অভিমন্যু যদি আসেই তো আসুক না।

করুক না যত খুশি প্রেমালাপ।

আজ রাত্রেই তো আইন-সঙ্গত অধিকার দেওয়া হচ্ছে ওদের।

তা অভিমন্যু এলই সত্যি সত্যি।

সুমিতার সঙ্গে প্রেমালাপ করতে নয়—তার অভিভাবকদের সঙ্গে কাজের কথা কইতে। ওর বিয়েতে তো আর লুকোচুরি নেই, বন্ধুরা বরযাত্রী হয়ে আসবার দাবি ছাড়তে চাইছে না। কি করে ঠেকানো যাবে তাদের? সে তাদের ঠেকাতে না পারলে, এঁরা ঠেকাবেন কিসের জোরে?

কিন্তু পরামর্শের লোকেরা পলাতক।

গৃহকর্তা বোধ করি অভিমন্যুকে বিয়ের বর বলে আন্দাজ করতে পারেন নি, আত্মীয় গণ্য করে সহজভাবে বলেন—ওঁরা নেই, মেয়ে রয়েছে—যান। এই যে সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ডানহাতি ঘর—উঠে যান না।…কুণ্ঠিত হবার কিছু নেই, আমি একা মানুষ, সদর-অন্দর সবই সমান।

এরপর আর কে পারে লোভ সামলাতে?

সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডানহাতি ঘর-অভিমুখে অগ্রসর হয় অভিমন্যু খোশমেজাজে।

কিন্তু ঘরের এক কোণে নিবিষ্ট হয়ে বসে কি করছে সুমিতা?

পূজো না কি?

পূজো আর্চাও আছে বুঝি ওর? জানা ছিল না তো!

ঈষৎ সোনালী কোঁকড়ানো খাটো ধরনের চুলে সমস্ত পিঠটা ঢাকা পড়ে নি। দেখা যাচ্ছে কালো পাড়ের গরদের শাড়ির একাংশ, দেখা যাচ্ছে—অনাবৃত দুটি বাহুমূল। পিছন থেকেই বোঝা যাচ্ছে করযোড়ের ভঙ্গী।

ভাগ্যদেবতার কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করছে সুমিতা?

অসম্ভব নয়। আজকের দিনে সেটাই স্বাভাবিক।

নিঃশব্দ-পায়ে ঘরে ঢুকল অভিমন্যু, দাঁড়াল পিছনে এসে।

কিন্তু এ কী?

এ কে?

এই কি সুমিতার ভাগ্যদেবতা? এর কাছে আশীর্বাদ চাইতে এসেছে সুমিতা? এই সুমিতার ধ্যানের মূর্তি?

একটি তরুণ যুবকের আ-বক্ষ ফটো।

ফ্রেমে বাঁধানো নয়, শুধু কার্ডবোর্ডে-আঁটা।

হাসি হাসি পুরন্ত' মুখ। উল্টে আঁচড়ানো চুলের নিচে চওড়া কপালটা চোখে পড়বার মত। শেলের চশমার নিচে চোখ দুটি কৌতুকে উজ্জল।

কৌতুক কেন? অভিমন্যুর খেলোমী দেখে?

যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনি নিঃশব্দেই ফিরে যায় অভিমন্যু। সুমিতার ঘর থেকে মিলিয়ে যায় ওর পদচিহ্ন।...

বিধাতা পুরুষের দুষ্কর্ম সারা হয়েছে। অপসারিত হয়েছে ফিশপ্লেট।

ট্রেণখানা যে চলতে চলতে লাইনচ্যুত হয়ে খাদে গিয়ে পড়েছে—সেটা ধরা পড়ল সন্ধ্যার পর।...যখন লগ্ন গিয়েছে পার হয়ে, ফুলের মালা ম্লান হয়ে এসেছে, চন্দন উঠেছে শুকিয়ে।...চেলির শাড়িতে দুঃসহ জ্বালা!...

অনেক রাত্রে গাড়ি নিয়ে ফিরে এলেন পিতা আর পিতৃবন্ধু।

নাঃ কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না অভিমন্যুকে।...জানা অজানা, সম্ভব অসম্ভব, কোনখানেই খুঁজতে বাকী রাখেন নি তাবা।

বাড়ির চাকরটার কাছে, এইটুকুই শুধু জানা গেল—কোন এক বন্ধু না কে আসবে বলে, কদিন ধরে নাকি বাড়ির সাজানো গোছানো নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছিল অভিমন্যু। ,কাল তো আসবার কথা। কি হল—অভিমন্যুই জানে। বন্ধুকে আনতেই গেল বুঝি বা।

তার অনুমানে ভর করেই সে বলেছে যা হোক।

কিন্তু বন্ধু আর এল কই?

বন্ধুর আসার দরজা নিজের হাতে বন্ধ করে দিয়ে গেছে অভিমন্যু। জীবন থেকে বিদায় দিয়ে গেছে তাকে।

অথচ কেন?

বি, এন, আর, লাইনের একখানা ফার্স্টক্লাস কামরার বাঙ্কে শুয়ে সেই কথাই ভেবে চলেছে অভিমন্যু...কেন? হঠাৎ এমন কাণ্ডজ্ঞানহীনের মত পালিয়ে এল কেন সে?

সুমিতার সেই নিভৃত প্রণাম-নিবেদনের কোমল ছবিখানি এমন অসহ্য হল কেন তার? সুমিতা বিধবা—এ তো তার অজানা নয়?…জীবনের মোড় ফেরাতে গিয়ে সুমিতা যদি পুরনো পথের হারানো সাথীকে উদ্দেশ করে একটি প্রণাম নিবেদন করতে চায়, কি এমন অপরাধ? অভিমন্যুর কি এল-গেল তাতে?

সেই তো স্বাভাবিক। সেটাই তো উচিত।

সুমিতা যদি এর চাইতে হাল্কা হত—হত—নতুন সুখের আবেশে বিভোর, হত—হৃদয়ধর্মের বালাই-হীন, তাহলেই কি সুখী হত অভিমন্যু? কই, অভিমন্যু তো এমন হৃদয়হীন নয়।

বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে বসলে—বিচারফল যাই হোক, নিজের কাছে অস্বীকার করে লাভ নেই—পালিয়ে আসা ছাড়া উপায় ছিল না তার। গ্রহণ করবার শক্তি ছিল না সুমিতাকে।

তর্কের জোরে উড়িয়ে দিতে পারে স্থবির শাস্ত্রের অর্থহীন অনুশাসন, সাহসের জোরে ভাঙতে পারে পচা সমাজের চিরাচরিত শৃঙ্খল, অস্বীকার করতে পারে আইন-কানুন দেশাচার, শুধু অস্বীকার করতে পারে না—শিরায় শিরায় প্রবাহিত পূর্বপুরুষের রক্তকে। যে রক্ত বহন করছে ওর পৌরুষ, ওর আত্মাভিমান।

সামাজিক কুসংস্কারকে ত্যাগ করা যায়, কিন্তু মজ্জাগত সংস্কারকে?

উদারতার প্রশ্ন নিষ্ফল। অন্য পুরুষের পদপ্রান্তে আপন প্রেয়সী নারীর নম্র প্রণাম নিবেদনের জ্বালাময় ছবি সহ্য করা অসম্ভব।

তাই নিজের দুষ্কৃতির জন্য অনুতপ্ত হবার একান্ত চেষ্টায় যতবারই মনে আনতে চাইছে সুমিতার অপমানাহত মুখচ্ছবি, ততবারই ব্যর্থ হচ্ছে অভিমন্যু। সুমিতার কোন মূর্তিই আর মনে পড়ছে না ওর। শুধু ঈষৎ সোনালী চারটি চুল, শাড়ির কালোপাড়ের বঙ্কিম একটি রেখা, আর অনাবৃত দুখানি হাতের প্রণামভঙ্গী।

আর—আর—সুমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা কৌতুক-উজ্জল দুটি চোখের দৃষ্টি নয়? যে দৃষ্টির অঙ্কুশ তাড়া দিয়ে দিয়ে এনে ফেলেছে অভিমন্যুকে—দুশো—তিনশো—পাঁচশো মাইল দূরে।…সে দৃষ্টি হারিয়ে গেলেও বিজ্ঞানের আলোক-বন্ধনে বন্দী হয়ে, অক্ষয় হয়ে আছে চিরদিনের জন্যে।

নাঃ, হার মানছে অভিমন্যু।

পালিয়ে আসা ছাড়া উপায় ছিল না ওর।

পয়সা! পয়সা! পয়সা ছাড়া আর কিছু বোঝে না অণিমা। ওর ভাষায় 'টাকা' শব্দটা কদাচিৎ উচ্চারিত হয়, সব কথায় বলে 'পয়সা'। একটি পয়সা যেন ওর গায়ের একটি ফোঁটা রক্ত।

অথচ অসিতের রুচিতে এই জিনিসটা সবচেয়ে বাধে। টাকার প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করে না অবশ্যই, তাই বলে পয়সা সম্বন্ধে এই নির্লজ্জতা ওর অসহ্য। কিন্তু করবার কিছু নেই। অণিমা বিদ্রূপকুঞ্চিত মুখে অহরহ স্মরণ করিয়ে দেয়—চৌষট্টিবার একটা করে পয়সা রাখলেই সেটা টাকা হয়ে দাঁড়ায়। অসিত যদি মনে করে রোজগারটা তার নিজের বলে যথেচ্ছ অপচয় করবার অধিকার তার আছে, তাহলে ভুল করবে, আইনে তা বলে না।

আইন আদালত সব অণিমার নখ-দর্পণে, কাজেই মাস-মাস মাইনেটা আনার সঙ্গে সঙ্গেই পাই-পয়সাটি পর্যন্ত মিলিয়ে নেয় অণিমা। তারপর তিরিশ দিন ধরে চলে একটা যন্ত্রণাদায়ক হিসেবের কষাকষি। অণিমার কাছে মাসের প্রথম বলে কিছু নেই, ওর সংসারে তিরিশ তারিখ আর দোসরা তারিখের একই রং। বাজার বেলায় কোন উপলক্ষে কোনদিনই অসিত সাড়ে এগার আনার বেশি পয়সা হাতে পায় না। অণিমার হিসেবে ওই যথেষ্ট। ছেলে নেই, মেয়ে নেই, একটা নিঃসন্তান দম্পতির দৈনিক বাজার খরচা এগারো আনাই ঢের।

না হাত-খরচা বলে এক সঙ্গে কিছু হাতে পায় না অসিত যে মবলগ একটা কিছু করে বসবে, ট্রাম ভাড়ার পয়সাটি দৈনিক গুনে গুনে বার করে দেয় অণিমা। একটা বাড়তি জিনিস কিনতে দিলে সাতবার দাম জিজ্ঞেস করে। অবশ্য শুধু যে অসিতকেই শাসন করে অণিমা এ বললে ভুল হবে, শাসন সে নিজেকেও করে। দৈবাৎ কোন অতিথি অভ্যাগত এসে দু পেয়ালা চা খেয়ে গেলে, সেই চিনিটুকুর শূন্যস্থান পূরণ করতে পাঁচবেলা নিজের চা-টা বিনা-চিনিতে সারে অণিমা। উনুনে আগুন ধরাতে ঝি যদি একটার জায়গায় দুটো দেশলাই কাঠি খরচ করে ফেলে, তাহলে বাড়িতে অগ্নিকাণ্ড শুরু হয়, তার দাহে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে অসিতের।

সেই মানুষের কাছে এই কাণ্ড!

তা অণিমার কাছে কাণ্ড ছাড়া আর কী!

অসিতের একতলার একখানা ঘরে মাস-চারেক হল যে ভাড়াটে এসেছে সে নাকি মাত্র দু মাস ভাড়া দিয়ে, আর দেয় নি। গত মাসের বাকি ছিল, এমাসেও

দিয়ে উঠতে পারবে না বলছে।

তার মানে বাইশ বাইশ চুয়াল্লিশ টাকার ঘাটতি। অণিমাকে করাত দিয়ে কাটলে এর চাইতে আর বেশি কি যন্ত্রণা হত তার?

অনেকক্ষণ গলা ফাটিয়ে স্বামীর সঙ্গে বকাবকি করে কুটনো কুটতে বসেছিল অণিমা, পারল না স্থির হয়ে কাজ করতে, আবার উঠে এল। বিকৃত মুখভঙ্গীর সঙ্গে সমতা রেখে কটুকণ্ঠে বলে উঠল, 'তোমার ও-সব ভালমানুষীতে আমি নেই, বুঝলে? জিনিস-পত্তর আটকে রেখে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দাও।'

অণিমার বয়সের সঙ্গে কথাটা এত বেমানান বিসদৃশ লাগে, চোখ বুজতে ইচ্ছে করে অসিতেব, তবু চোখ খোলা রাখতেই হয়, কথাও কইতে হয়। অবাক হয়ে বলে, 'এতক্ষণ তো তাগাদা দেবার কথাই হচ্ছিল, এটা আবার কি হল? পুনর্বিবেচনা?'

'ইয়ার্কি রাখ,' ভাড়া বাকি রেখে সব নিয়ে-থুয়ে যদি সরে পড়ে, করবে কি শুনি?'

'করব কি? করবার জো কিছু দেখছি না। বড়জোর মনে করব দুমাস আগে উঠে গেছে, সেই অবধি ভাড়াটে জোটে নি।'

'দেখ, ও-সব পরমপুরুষগিরি অন্যত্র কর, আমার কাছে করতে এস না। জিনিস আটকে রেখে দূর করে দাও—এই আমার শেষ কথা। ভাড়া ও দিতে পারবে না। তখনই বলেছিলাম মাস-মাইনের কাজ করে না এমন লোককে ভাড়াটে রেখ না, তখন শোনা হল না। বুঝছ আমার কথা না শোনার ফল?'

'তা বুঝছি! হাড়ে হাড়ে বুঝছি, কিন্তু জিনিসপত্র আটকে কি লাভ হবে? জিনিস বেচে ভাড়াটা উশুল করবে?'

'কেন নয়? টাকা অমনি আসে?'

অসিতের মুখের আগায় একটা উত্তর আসে, কিন্তু থেমে যায় সে। সুখের চাইতে স্বস্তি ভাল। উচিত জবাব দেবার সুখের চাইতে নির্বিরোধের স্বস্তি। উদ্যত উত্তর থামিয়ে আপসের সুরে বলে, 'বলেছে তো—শিগগির দিয়ে দেবে, দেখাই যাক না আর দু-চারদিন?'

অণিমা বিরক্ত বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলে, 'দেখ তাহলে! আরও দুমাস দেখ। ছোটলোকের কথায় আবার বিশ্বাস!'

'আঃ অণিমা! দোহাই তোমার একটু আস্তে। রাগলে তোমার যেন জ্ঞান থাকে না। ভদ্রলোকের ছেলেকে এভাবে···যদি ঘরে থাকে?'

অপরূপ এক হাসি হেসে ওঠে অণিমা, 'ভদ্রলোকের ছেলে! তা হতে পারে হয়তো, তবে ভদ্রলোক নয়। সিনেমার পোস্টার আঁকেন, তিনি আবার ভদ্রলোক। বলি—ভাড়া যদি দিতে না পারবি তো কোঠাঘরে থাকবার শখ হয় কেন? বস্তিতে থাকগে যা! তাও না পারিস ফুটপাথে পড়ে থাক!'

এ-কথাগুলো অবশ্য একটু গলা খাটো করেই বলে।

অসিত হতাশভাবে বলে, 'তুমি এত ইয়ে হয়ে গেছ যে তোমার সঙ্গে কথা কইবার প্রবৃত্তি হয় না আমার!'

'থাকগে, তাতে আমার কিছু এসে যাবে না। বরং, চুয়াল্লিশটা টাকার লোকসান অনেক বেশি। লজ্জা ঘেন্না দিয়ে চুপ করাতে পারবে না আমায়, যাও, এখুনি গিয়ে ওকে বলগে—জিনিস-পত্তর রেখে চলে যাক।'

'আমি তো পাগল হই নি—' বলে দাড়ি কামানোর সরঞ্জামগুলো গুছিয়ে তুলে উঠে পড়ে অসিত।

অণিমা আর যাই বলুক বাজে কথা বলে না। পয়সা জিনিসটা যারা চিনে ফেলেছে, তাদের লজ্জা-ঘেন্না দেওয়া বৃথা। তাই অসিতকে প্রস্তাবটা উড়িয়ে দিতে দেখে অণিমা দৃঢ়কণ্ঠে বলে, 'বেশ, তুমি না পার আমিই বলব।'

'তুমিই বলবে? তা ভাল! পারবে?'

'দেখ পারি কি না।'

'এ পর্যন্ত তো ওর মুখই দেখ নি, হঠাৎ গিয়ে মুখের ওপর বলতে পারবে, 'দূর হও'!'

'আমি সব পারি, তোমার মত অত চক্ষু-লজ্জার ধার ধারি না আমি।'

এবার সত্যিই ভয় পায় অসিত। সত্যিই টাকার ব্যাপারে চক্ষু-লজ্জার ধার ধারতে দেখা যায় না অণিমাকে। অগত্যাই সান্ত্বনার ভঙ্গীতে বলে, 'ছেলেমানুষি কোর না, ওবেলা এসে আমি যা হয় একটা কিছু করব।'

'তুমি যা করবে, তা জানতে বাকি নেই আমার।'

'একটা বেলা সবুর করে দেখ।'

'গত মাসে তিরিশ দিন সবুর করে দেখেছি।'

কথাটা ঠিক। আর সেই সবুর করাটা যে অণিমার পক্ষে কত কঠিন সেকথা অসিতের চাইতে আর কে বেশি বুঝবে?

'আমি যে কেন একটা কাবুলীওলাকে বিয়ে করি নি তাই ভাবি।'—বলে ভারী মুখে স্নান করতে যায় অসিত। যত বড় পর্বই ঘটতে থাকুক সংসারে,

'অফিসের বেলা' সকলের উর্ধ্বে।

অফিসে যাবার আগে আর একবার অনুনয় করে যায় অসিত। অণিমা যেন ব্যাপারটা নিজের হাতে তুলে না নেয়। কিন্তু অণিমা অনমনীয়।

হ্যাঁ, যে-কথা সেই কাজ অণিমার। স্থিরসঙ্কল্প নিয়ে সংসারের কাজ সারতে থাকে কানটা খাড়া রেখে। একটু সাড়া-শব্দ পেলেই নিচে নামবে, একেবারে নিঃশব্দ অবস্থায় একলা যেতে কেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। অবশ্য সাড়া-শব্দ লোকটার দৈবাৎ পাওয়া যায়, কতটুকু সময়ই বা বাড়িতে থাকে। যদিও বা থাকে, আছে কিনা টের পাওয়া যায় না। তাছাড়া ঘরখানার ভিতরের দিকের দরজা তো বন্ধই থাকে। হ্যাঁ, শব্দ একটা হয়েছে। চেয়ার কি বেঞ্চ টানার শব্দ। একবার দুবার—করছে কি লোকটা? যাই হোক, এই সময়ই যাওয়া ভাল। সঙ্কল্প স্থির করে তর তর করে নেমে যায় অণিমা।

বার তিনেক টোকা মারার পরই ভিতর থেকে ছিটকিনিটা খুলে গেল। খুলে দিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত একটু তাকিয়েই যে লোকটা সরে দাঁড়াল, তাকে চার মাস এক বাড়িতে থেকেও এই প্রথম দেখল অণিমা। উপরের জানলা থেকে দৈবাৎ কোনদিন দেখেছে, শীর্ণ দীর্ঘ একটা দেহের উপর রুক্ষ চুলে-ভরা একটা মাথা। না, ঝুল-বারান্দা নেই অণিমার ঘরের সামনে, ওই একটা খেদ আছে তার। নিন্দে করে শ্বশুরের, একদা যিনি বাড়িটা করে রেখে গেছেন।

ঘরে ঢুকেই একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ে অণিমা, তার মত মুখরারও মুখে কথা জোগায় না, ইতস্তত এদিক-ওদিক তাকায়। রুক্ষ চুলের নিচে শ্যামবর্ণ একটি মুখেও অপ্রতিভতার চরম প্রকাশ। 'এই যে ইয়ে···বসুন না।' আর একবার চেয়ার টানার শব্দ।

'আমি আপনাকে একটা কথা কথা বলতে এসেছিলাম!' মনকে প্রস্তুত করে নিচ্ছে অণিমা। বলার সঙ্গে সঙ্গে তাকিয়ে দেখছে চারদিকে—হ্যাঁ, জিনিসপত্র রেখে ঘর ছেড়ে দিয়ে চলে যাবার কথা বলতে এসেছে সে।

কিন্তু জিনিসপত্র মানে কি? জিনিসপত্র কোথায়? অণিমাকে বসতে দিয়েছে যে চেয়ারটায় তার পিঠটা ভাঙা, পায়াগুলো নড়বড় করছে। তদ্রূপই একটা চৌকি, ওতেই বোধ হয় বাবুর শোওয়া চলে, কিন্তু বিছানাটা জড়িয়ে দড়ি বেঁধে রাখা হয়েছে কেন? তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে অণিমা—থাকার মধ্যে আর একটা জিনিস আছে, মইয়ের মত উঁচু তেঠেঙে একটা কি যেন ওতেই আটকে রেখে ছবি

আঁকিয়েরা ছবি আঁকে, দেখেছে বটে অণিমা কোথায় যেন।

না, জিনিস বলতে আর তো কিছু চোখে পড়ছে না।

চোখে যা পড়ছে সে হচ্ছে একটা শ্রীহীন বিশৃঙ্খলা। ঘরের মেঝের মাঝখানে বসানো রয়েছে একটা প্যাকিং বাক্স, তাতে চারটি বই, বোধ করি এইমাত্র তাক থেকে পেড়ে ভরা হয়েছে, তাকের উপর ছেঁড়া ছেঁড়া ঝুরো ঝুরো কয়েকটা কাগজ, বইয়ের থাকের নিচে পেতে-রাখা পাট-করা খবরের কাগজখানা আধছেঁড়া হয়ে ঝুলছে। তবে ঘরের চেহারা ঘরের অধিবাসীর চেহারার সঙ্গে বেখাপ্পা নয়, পারিপাট্যহীন কেশ-বেশ, উদ্‌ভ্রান্ত মুখভাব, সব মিলিয়ে ঘরের মতই শ্রীহীন বিশৃঙ্খল।

লোকটা কি অপদার্থ! এইভাবে থাকে!

'হ্যাঁ, বলছিলাম যে—'

'কি বলবেন আমি জানি—' ম্রিয়মান গলায় বলে লোকটা, 'চলে যাবার ব্যবস্থাই আমি করছি, সন্ধ্যার মধ্যেই ঘর ছেড়ে দেব।'

অণিমা ক্রমশঃ বাক্‌শক্তি ফিরে পাচ্ছে, 'ঘর ছাড়তে তো বলছি না আমরা, বাকি ভাড়াটা যাতে শোধ করে ফেলতে পারেন তাই বলতে এসেছি।'

'দেখুন, দেবার উপায় থাকলে আপনাকে বলতে আসতে হত না। অসিত-বাবুকে আমার অবস্থার কথা জানিয়েছি, লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করছে আমার কিন্তু—'

ভাঙা নড়বড়ে চেয়ারের মধ্যে একটু নড়ে-চড়ে বসে অণিমা, মৃদু আর্তনাদের মত একটা শব্দ ওঠে 'ক্যাঁচ্ কোঁচ'।

'আপনি পুরুষ মানুষ, একা মানুষ, অবস্থাকে এ রকম দুরবস্থা করেই বা রেখেছেন কেন? ভালভাবে থাকার চেষ্টা করতে পারেন না?'

ম্লান একটা হাসি খেলে যায় লোকটার মুখে, 'এ-কথার উত্তর এক কথায় দেওয়া শক্ত।'

'নিজেকে যারা ফাঁকি দেয়, তারা এইরকম কথাই বলে।'

লোকটা একটু চমকে তাকায়। তারপর আবার তেমনি মৃদুম্লান হেসে বলে, 'আপনার অভিযোগটাই হয়তো ঠিক! কিন্তু বিশ্বাস করুন পরকে কখনো ফাঁকি দিই নি আমি। যে ভাড়াটা বাকি রইল, সেটা যত শিগ্‌গির পারি শোধ দিয়ে যাব। শুধু—'

একটু ইতস্তত করে চুপ করে সে।

অণিমা আবার নড়ে চড়ে বসে। চেয়ারটা তো স্প্রিঙের গদি দেওয়া নয়, শক্ত কাঠের, তবে কেবলি কেন মনে হচ্ছে তার ওর মধ্যে কিরকম যেন তলিয়ে যাচ্ছে সে? নাঃ—সোজা খাড়া হয়ে বসাই ভাল।

'শুধু কী?'

লোকটা একটু করুণ, অপ্রতিভ হাসি হেসে মিনতির স্বরে বলে, 'আমার জিনিসপত্রগুলো এমনই অকিঞ্চিৎকর যে টাকাব বদলে জমা রেখে যেতেও আমার লজ্জা করবে, তবুও এই বইয়ের বাক্সটাই রেখে যাচ্ছি—'

হঠাৎ হেসে ওঠে অণিমা; হেসে বলে 'কপয়সা দাম ওগুলোর?' 'পয়সা' বলে অভ্যস্ত অণিমা, পয়সাই বলে। অবশ্য খুব ভুল বলে না, অধিকাংশ বইই মলাট ছেঁড়া, আধময়লা। সন্দেহ নেই পুরনো বইয়ের দোকানে সংগৃহীত।

লোকটা হাসে, দেখলে লজ্জিত হতে হয় এমন কাতর হাসি!

'ঠিকই বলেছেন। শিশিবোতল-ওলার কাছে এগুলোর দাম হয়তো আনাকতক পয়সা, কিন্তু বিশ্বাস করুন আমার কাছে এর মূল্য অপরিসীম! অন্তত এগুলোর জন্যেও ঘুম হবে না আমার। কিন্তু বাকি আর যা আছে সেগুলো নিয়ে না গেলে—'

অণিমা মুচ্‌কি হেসে বলে, 'আর কি যে আছে আপনাব তাও তো দেখতে পাচ্ছি না। কি খান, কি পরেন? আস্ত একটা বড়-সড় জিনিসের মধ্যে তো ওই তেপেয়ে মইটা।'

এবার একটা নির্মল হাসির আভা ছড়িয়ে পড়ে লোকটার মুখে। ফি কথায় হাসিটাই বোধ হয় ওব রোগ। দয়া ভিক্ষে করছে তাও হেসে। 'তেপেয়ে' কথা-টাতেই বোধ হয় এমন কৌতুকের হাসি। 'তা সত্যি—ওইটিই হচ্ছে একমাত্র সম্বল! কিন্তু মুশকিল হচ্ছে কি, ওটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে একটা জায়গা না হলে চলে না। নইলে নিজে তো সত্যি ফুটপাথেও—'

বলতে গিয়ে থামে লোকটা, আর গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে অণিমার! ওঃ সকালের সব কথাই তবে কানে এসেছে ওর? কী লজ্জা! কী লজ্জা!

কান মাথা যেন ঝিম্ ঝিম্ করে আসে অণিমার, তবু শুনতে পায়—'আপনাদের অনেক অসুবিধে ঘটালাম, বিশ্বাস করুন একেবারে নিরুপায় হয়েই করেছি। মুশকিল এই—আর কয়েকটা দিন সময় পেলেই হয়ত ওটা শোধ করে দিতে পারতাম, একটা ভালমত অর্ডার পেয়েছিলাম—কিন্তু সে বললে কি আর এখন বিশ্বাস করবেন? কেউই করবে না।'

লোকটা কি অণিমাকে ধিক্কার দিতেই এমন সরলতার ভান করছে? অণিমা

তাকিয়ে দেখে ও মুখে কি ব্যঙ্গ আছে? কই? অবিশ্বাসীর মুখ? মিনতি কাড়িয়ে বিনা ভাড়ায় থাকায় মেয়াদটা আরও কিছু বাড়িয়ে নিতে চায়?

নাঃ, বুঝতে পারছে না অণিমা। কথা বলবার সময় কখনও কারও মুখের দিকে কি তাকিয়ে দেখে নি অণিমা, তাই মুখের চেহারার ভাষা ওর অপরিচিত? আবার নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসতে হচ্ছে। ছাই চেয়ারটা! যেমন 'চেয়ারম্যান' তেমনি চেয়ার! অণিমা এবার কঠিন মুখে বলে, 'যাচ্ছেন তো, একবেলার মধ্যে ঘর জোটাতে পারবেন?'

'ঘর?'

আর এক ঝলক নির্মল কৌতুকের হাসি। 'ঘর জোটানোর আবার ভাবনা, কত অগাধ খালি ঘর পড়ে রয়েছে কলকাতায়! হা হা হা! সত্যি কত কষ্টে এই ঘরখানা জোগাড় করেছিলাম! আবার সেই পুনর্মূষিক! সেই বন্ধুর মেস! মুশকিল কি, ও-রকম জায়গায় মোটে কাজ করা যায় না। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ই একটা অর্ডার পেলাম! না পেলে—এত ইয়ে হত না! এই—'তেপেয়ে' মইটাকে বন্ধুর ঘরের দেয়ালে ঠেসিয়ে রেখে টো টো করে ঘুরে বেড়াতাম!'

অণিমা আর ওর মুখের দিকে তাকাবে না, তাই জানলার বাইরে তাকিয়ে আগের চাইতে আরো রূঢ় গলায় বলে, 'এগুলো আমাকে শোনানোর উদ্দেশ্য বোধ হয় লজ্জা দেওয়া?'

'ছি ছি, সে কী বলছেন?' লোকটা ভারি মুসড়ে পড়ে। 'আমার প্রতি ওরকম ভাবে অবিচার করবেন না। উদ্দেশ্য নিয়ে কোন কথা বলা আমার—মানে আমি—না, না, ও আপনি ভাববেন না! সত্যি আপনার কাছে এসব কথা বলা আমার উচিত হয় নি। দেখুন আপনি কে আমি কোন অবস্থায় আছি, কথা বলার সময় সে সব কিছু খেয়াল হয় নি আমার। সত্যি বলছি বিশ্বাস করুন।'

অণিমা গম্ভীরভাবে বলে, 'বেশ বিশ্বাস করলাম! কিন্তু কথা হচ্ছে মেসবাড়ির অসুবিধেয় আপনি যদি কাজ করতে না পারেন, তাহলে আমার ধার শোধ করবেন কী করে?'

'সেই ত ভাবনা—' লোকটা চিন্তিত ভাবে বলে—'হয়ে যাবে যা হোক করে।'

'তার চাইতে শুনুন, আর একটা মাস সময় আপনি নিন! এখানেই কাজটা সেরে তুলুন!'

'এখানে?' লোকটা চকিত-স্বরে বলে, 'আরও একমাস? ভাড়া না দিয়ে?'

'উপায় কী? নিজের স্বার্থেই বলছি আমি। অন্যত্র চলে গিয়ে আপনার

আমাদের ঋণের কথা মনে থাকবে কি না তার নিশ্চয়তা কি ?'

'বলছি যে বইগুলো রেখে যাচ্ছি—' লোকটাকে এবার চটে উঠতে দেখা যায়—'আপনারা মেয়েরা বড় সন্দিগ্ধ। অসিতবাবু হলে কক্খনো এভাবে কথা বলতে পারতেন না।'

'হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়। পুরুষ মাত্রেই মহাপুরুষ! কিন্তু রাগ করে লাভ নেই যা বলি শুনুন। আপনি খান কোথায় ? হোটেলে তো ?'

'তা ভিন্ন আবার কি ?'

'ওই ওতেই আপনার পয়সা বাজে নষ্ট হয়।'

'কি করব বলুন, নিজে নিজে তো আর রেঁধে খেতে পারি না ? তবু সবদিন দু বেলা—'

নিতান্ত উদোমাদা লোকটাও হঠাৎ লজ্জিতমুখে চুপ করে যায়।

অণিমা গম্ভীরভাবে বলে, 'শুনেছি শিল্পীদের খিদে পায় না। সে যাক, এবার থেকে যা কিছু রোজগার করবেন, আমার হাতে দিয়ে দিবেন, বুঝলেন ?'

'আপনার হাতে ? মানে—অসিতবাবুকে—' বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকায় লোকটা।

'না, অসিতবাবুকে দেবার দরকার নেই। হিসেবে-পত্তরের বালাই মাত্র নেই তাঁর। আমার হিসেব নির্ভুল। দুবেলা খাওয়ার দাম আর বাড়ি-ভাড়ার টাকা চুল চিরে হিসেব করে নিয়ে বাকী কিছু থাকলে আপনাকে ফেরত দেব।'

'খাওয়ার দাম।' বিহ্বলতা আর ঘোচে না লোকটার, 'আপনি কি আমাকে খেতে দেবেন ? মানে আমাব খাওয়ার ব্যবস্থা করবেন না কি ?'

'উপায় কি ? নিজের স্বার্থেই করতে হবে। মেসে হোটেলে খেলে একটা পয়সাও বাঁচবে আপনার ?'

'তা সত্যি'—লোকটা সহসা উচ্ছ্বসিতভরে বলে ওঠে, 'ঠিক বলেছেন! কিছু কিছু বাঁচে না। অথচ কিই বা খাই! পরা তো দেখতেই পাচ্ছেন। এভাবে যদি কেউ আমার ভার নেয়—'

'ভার নেব এই শর্তে, আপনি আমার ধার শোধ করবেন। বুঝলেন ?'

'নিশ্চয়! নিশ্চয়! শোধ করতে পারলে তো বেঁচে যাই! দিন রাত কাঁটার মত ফুটছে।'

—'আচ্ছা, আপাতত মাসখানেকের জন্য কাঁটাটা উপড়ে ফেলুন! আর ওই বিছানাপত্তরগুলোর বাঁধন খুলে ফেলুন। বইগুলো তুলে ফেলুন তাকে।'

'তাহলে আরও একমাস থাকবার অনুমতি দিচ্ছেন ?'

'কি মুশকিল! বলছি তো! আচ্ছা বোকা লোক তো আপনি! একমাস কেন, থাকুন না বরাবর, নিশ্চিন্ত হয়ে কাজ করুন, দেখবেন আপনার টাকা জমিয়ে দেব আমি।'

লোকটা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বলেছে, এবার হঠাৎ চৌকিটার উপর ধপাস করে বসে পড়ে বলে, 'সত্যি, কি নিশ্চিন্ত যে করলেন! কী যে মহৎ আপনি! কিন্তু আচ্ছা—আপনার বাড়িতে আর কে আছেন বলুন তো?'

'আর কে থাকবে? আর আপনার অসিতবাবু আছেন।'

'না না! ইয়ে মহিলা! তাঁর কথাবার্তাগুলো তেমন—' হেসে চুপ করে যায় লোকটা।

অণিমা গম্ভীরভাবে বলে, 'থাকে না কেউ। তবে আসেন বটে মাঝে মাঝে আমার এক পিসশাশুড়ী। এই তো আজ সকালেই এসে—'

'এসেছিলেন, না?' লোকটা যেন অকূলে কূল পায়, বলে 'আমিও তাই ভাবছিলাম!'

'ও রকম হতচ্ছাড়া লোকের পক্ষে এই উচিত শাস্তি। এখন দেখ—তোমার বুদ্ধি আর আমার বুদ্ধি!' অণিমা বিজয়গৌরবে গৌরবান্বিত মুখে বলে— "শুনলে তো কেমন প্যাঁচে ফেললাম লোকটাকে? ভাড়া ফাঁকি দিয়ে নড়ুক দিকি এবার?'

'না, আর নড়তে পারবে না!' মৃদু হেসে বলে অসিত।

'ঠাট্টা হচ্ছে?'

'তোমার সঙ্গে ঠাট্টা? পাঁগল! সত্যিই বলছি।' বলে ডান হাতে অণিমার হাত থেকে চায়ের পেয়ালাটা নিয়ে বাঁহাতে ওকে একটু কাছে টেনে নেয়।

অণিমা হেসে ফেলে বলে, 'ইস দেখো! হঠাৎ আদর উথলে উঠল যে! বুদ্ধির বাহাদুরি দেখে বুঝি?'

'বুদ্ধির বাহাদুরি? নাঃ! সে আর দেখাতে পারলে কোথায়? এমনি।'

অণিমা আবার সরে দাঁড়িয়ে বলে 'চা খাচ্ছ না যে? ভাবছ কি?'

'ভাবছি? ভাবছি—কাবলীওলার বদলে তোমাকে বিয়ে করেছি বলে হতাশ না হলেও চলবে। এখনও আশা আছে।'

'ও কথার মানে?'

'সব কথার মানে বলতে নেই।'

মেয়েদেরকে আমি দেশলাই-বাক্সর সঙ্গে তুলনা করে থাকি। কেন? কারণ দেশলাই-বাক্স যেমন—একশটা লঙ্কাকাণ্ডের উপযুক্ত বারুদের সঞ্চয় ভিতরে ভরে রেখেও নিরীহ চেহারায় পড়ে থাকে রান্নাঘরে, ভাঁড়ার ঘরে, শোবার ঘরে, আর এখানে সেখানে, মেয়েরাও যে প্রায় তেমনি!

নজীর চান?

দেখুন তাহলে সামনের ওই প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়িটার দিকে তাকিয়ে—

রবিবারের সকাল।

ধোবা এসে বসেছিল।

অজিতের ময়লা পোশাকের রাশি ধোবার হাতে সমর্পণের পূর্বমুহূর্তে শেষ-বারের মত পকেটগুলো সার্চ করতে গিয়ে চিঠিটা আবিষ্কার করল নমিতা।

মোচড়ানো-দোমড়ানো মুখ-ছেঁড়া একখানা খাম, খামের ওপর নমিতারই নাম লেখা।

দপ্ করে একটা আগুন জ্বলে উঠল নমিতার সমস্ত স্নায়ু-শিরায়। হাতের কাজ ফেলে রেখে বিছানার ওপর বসে পড়ে চিঠি খুলে প্রথমেই দেখল তারিখ। তারিখের হিসেবে অন্ততঃ দিন-তিনেক আগে এসেছে চিঠিটা।

খামখানা উল্টে ডাকের ছাপের তারিখ মেলাল, সেও একই সাক্ষ্য বহন করছে।

হ্যাঁ, তিনদিন আগে এসেছে চিঠিটা।

অজিত সেটা খুলেছে পড়েছে, মুচড়ে দুমড়ে পকেটে ফেলে রেখেছে। নমিতাকে একবার বলবার প্রয়োজনও অনুভব করে নি।

দপ্ করে জ্বলে ওঠা আগুনটা 'রি রি' করে জ্বলতে থাকে মনের সমস্ত তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে।

কারণ এ ঘটনা তো দৈবাতের ভুল নয়, ইচ্ছাকৃত।

অজিতের প্রকৃতিই এই।

একান্নবর্তী পরিবারের বাহান্নখানা হাতের-ফাঁক থেকে লেটার-বক্সের চাবিটি সে নিজের হাতে রাখে। আর নমিতার নামে খামের চিঠি এলেই খুলে পড়ে তবে দেয়। অনেক সময় হয়তো বা দেয়ও না। অন্ততঃ নমিতার মনে সে সন্দেহ বদ্ধমূল।

অথচ সত্যি বলতে আজ পর্যন্ত এমন দাবি অজিত করতে পারে না—সন্দেহ-জনক কোন চিঠি সে আবিষ্কার করতে পেরেছে।

তবু—তবু—এই বিশ্রী অভ্যাস দূর হয় না তার।

নমিতার রাগে নয়, অভিমানে নয়, কটুকাটব্য ধিক্কার শ্লেষবাক্য, কোন কিছুতেই নয়।

বললে প্রথমে হেসে ওড়াবার চেষ্টা করে, আর হাসিতে হালে পানি না পেলে ধমক দেয়।

মিনিট খানেক স্তব্ধ হয়ে থেকে চিঠিটা পড়ল নমিতা।

কিছু নয়, নমিতার মার চিঠি।

তাঁর গৎ-বাঁধা ভাষায়—নানা অভাব-অভিযোগের খবর লিপিবদ্ধ করে ভদ্র-মহিলা বাড়তি জানিয়েছেন, বিপদের উপর বিপদ, ঘরের ছাদ ফেটে অজস্রধারায় বৃষ্টির জল পড়ছে, আশু প্রতিকার না করলে ছাত-চাপা পড়ে মরতে হবে তাঁকে। অবশ্য সে আশঙ্কা তিনি করেন না। তাঁর মেয়ে রাজরাণী, জামাই মহানুভব, দিলদরিয়া। অতএব—ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্বামী-পুত্রহীনা দুঃস্থ বিধবা, মেয়েটিকে বড়লোকের বাড়ি চালান করতে সক্ষম হয়েছিলেন কেবলমাত্র তার রূপের জোরে। কিন্তু নিজের কৃতিত্বের ক্রেডিটটি কোনদিন ছাড়লেন না ভদ্রমহিলা। আর তার সুযোগও নিয়ে আসছেন এ-যাবৎ।

নমিতার মায়ের চিঠি আসতে দেখলেই অজিত মুচকে হেসে বলে, "ও আর পড়ে কি হবে? মণিঅর্ডারের কুপন একখানা লিখে ফেলি গে।"

লজ্জায় অপমানে মাথা কাটা যায় নমিতার। রাগে দুঃখে গেল দিন তাই নমিতা মাকে নিষেধ করে দিয়েছিল, পোস্টকার্ডে চিঠি দিতে। ভেবেছিল এরপর থেকে লুকিয়ে-চুরিয়ে নিজেই যা হোক কিছু পাঠাবে। তা—খামের চিঠির এই ফল।

হঠাৎ মায়ের উপরও রাগে আগুন হয়ে ওঠে নমিতা।

কেন, কেন, তাঁর এই ভিক্ষাবৃত্তি?

কেন নমিতার মান-সম্মান বজায় রাখতে দেবেন না তিনি। নাঃ, এবারে মাকে স্পষ্ট লিখে দেবে সে—"আমার দ্বারা কিছু হবে না, আমার আশা আর কোর না।"

ঠিক এই সময় অজিত ঘরে ঢুকল রবিবারের আয়েশী স্নানটি সেরে। নমিতার এতক্ষণকার তীব্র অপমান-বোধের বিক্ষোভ যেন আছড়ে গিয়ে তার উপর পড়তে চাইল।

গর্জে উঠল নমিতা—"এ চিঠি কবে এসেছিল ?"

আড়চোখে তাকিয়ে প্রমাদ গুণল অজিত।

'আবার চাট্টি টাকা খসবে' এই ভেবে চিঠিখানা নমিতাকে দেয় নি সে, ভেবেছিল ছিঁড়ে ফেলে দেবে। ভারি ভুল হয়ে গেছে।

তা বলে দমবে না অজিত।

যেন মনে পড়ছে কি পড়ছে না, এইভাবে বলে, "চিঠি ? কোন্ চিঠি ? ও হো হো হো! তোমার মার একখানা চিঠি এসেছিল বটে। দেওয়া হয় নি তোমায়।"

"কেন দেওয়া হয় নি ? কেন ? কেন ? জবাব দাও, কেন দেওয়া হয় নি ?"

"কি মুস্কিল!" অজিত বলে, "ভুলে গিয়েছিলাম আবার কেন ?"

"মিথ্যেবাদী!"

সর্পিনীর মত ফুঁসে ওঠে নমিতা।

"যা মুখে আসছে তাই বলছ যে ? ভুলে যায় না মানুষ ?"

"না যায় না! খুলেছিলে কেন আমার চিঠি ?"

অজিত এ অভিযোগকে হাওয়ায় উড়িয়ে দেয়, "খুলেছিলাম তো হয়েছে কি ? নিজের স্ত্রীর চিঠি—"

"চুপ কর, চুপ কর বলছি। কিসের জন্যে তুমি আমার চিঠি খুলবে ? হাজার দিন বারণ করি নি ?"

নমিতার রাগকে ভয় নেই অজিতের, ভয় যে গোলমালকে। তাই কাষ্ঠহাসি হেসে বলে, "বারণ করছেন তো একেবারে 'ইয়ে' হয়ে গেছে। তলে তলে তোমাকে কেউ প্রেমপত্র দিচ্ছে কি না সেটাও তো দেখা দরকার ?

"থামো! ইতর ছোটলোক কোথাকার!"

এরপরও অজিত কাষ্ঠহাসি হাসতে পারবে এমন হতে পারে না। সেও এবার বিষের ছুরি ধরে। বলে, "তা বটে! যারা রাতদিন কাঁদুনী গেয়ে জামাইয়ের কাছে হাত পাতে তারাই আসল ভদ্দর! ঘুঁটেকুড়ুনির মেয়ে রাজরাণী হয়েছেন কিনা—"

"চুপ!" চিৎকার করে ওঠে নমিতা।

ঘরটা ওর তিনতলায় তাই রক্ষে। নইলে এ চীৎকারে এ-ও-সে উঁকি মারত!

"চুপ ?" অজিত সগর্জনে ঘোষণা করে, "কিসের চুপ ? বেশ করব বলব! বেশ করব চিঠি খুলব। আমার ইচ্ছে, আমার খুশি! করবে কি ? পারবে কিছু করতে ?"

"পারব না ? কিছু পারব না ?"

প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে উচ্চারণ করে নমিতা—"পারি কি না দেখবে ?"

সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত একটা কাজ করে বসে সে। টেবিলের উপর থেকে খপ্ করে অজিতের সিগারেটের দেশলাইটা তুলে নিয়ে ফস্ করে একটা কাঠি জ্বেলে ধরিয়ে দেয় নিজের শাড়িতে।

মুহূর্তে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে বড়লোকের বৌয়ের অতি মিহি-শাড়ির চিকন আঁচল।

অবশ্য পরমুহূর্তেই "ক্ষেপে গেলে নাকি ?" বলে লাফিয়ে সরে এসে অজিত জ্বলন্ত জায়গাটায় দু-হাতে থাবড়া মেরে আগুন নিভিয়ে ফেলে।

আর—সত্যি বলতে কি এবার তার একটু ভয়ই হয়। ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে দেখে নমিতার মুখের দিকে। দেখে সেখানেও জ্বলছে আগুন, টকটকে, গনগনে।

এ আগুনকে থাবড়া মেরে নিভোতে যাবার সাহস তার নেই, তাই জল ঢালবার চেষ্টা করে। কষ্টে সহজ হয়ে বলে, "রাগলে আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, কেমন ? মেয়েমানুষের এত রাগ ! উঃ !"

এরপর নমিতা আর কি বলত কে জানে, কিন্তু সেই মুহূর্তে ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে ভাসুরঝি রিনি।

সে ঢুকেই খর খর করে বলে ওঠে, "ন-খুড়িমা ধোবা আর কতক্ষণ বসে থাকবে ? তোমাদের কাপড়-জামা কিছু না দেবে তো তাও বলে দাও ?"

সেকেণ্ড-দুই স্তব্ধ হয়ে গিয়ে নমিতা বোধ করি নিচের তলার চেহারাটা কল্পনা করে নেয়, তারপর ময়লা কাপড়গুলো গুছিয়ে তুলে নিতে নিতে শান্তস্বরে বলে, "বলগে যা যাচ্ছি। দিচ্ছি গিয়ে।"

নমিতা মুখরা, তাই ওকে সহজে কেউ সোজাসুজি আক্রমণ করে না, কথার চিমটিতে যতটা হয়। মেজ-জা এতক্ষণ কাজ নিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিল, ওকে দেখে কালিমুখে মুচকি হেসে বলে, "তবু ভাল যে, শেষ পর্যন্ত ওপর থেকে নামলে ! বাবা ! তোমার আর সময়-অসময় নেই, ঘরে ঢোকবার একটা ছুতো পেলে, কি বরের সঙ্গে জমে গেলে ! প্রেমালাপ আর পুরনো হয় না !"

নমিতা একবার পরিবেশটার দিকে তাকিয়ে দেখল। দেখল সকালের সংসার, এপাশে ওপাশে জনারণ্য। কণ্ঠস্বর যেন না কাঁপে। অতএব সেও প্রায় মুচকে হেসে নিতান্ত লঘুকণ্ঠে বলে, "আহা তা আর নয় ! দেখবেন একদিন আড়াল থেকে।

আমাদের আলাপ মানেই ক্রোধালাপ, বুঝলেন ?”

মেজগিন্নী হুঁ হুঁ করে হেসে বলেন, “থাম গো ন-গিন্নী, শাক দিয়ে আর মাছ ঢেক না। আমরা ঘাসের ধান খাই নে। আড়াল থেকে আর দেখতে হবে কেন ? চোখের ওপরই চব্বিশ ঘণ্টা যা দেখাচ্ছ—”

ফর্সা-মুখে আবির ছড়ানো হাসি হাসে নমিতা। সেই হাসি হেসে বলে, ‘যান। ভারি অসভ্য আপনি।”

ব্যস্ত বড় গিন্নী ছুটে আসেন, “হল তোদের কুটনো ? না শুধু গাল-গল্প হচ্ছে ?”

বলেই থমকে গিয়ে শিউরে ওঠেন, “ও কি ? এ কি অলক্ষুণে কাণ্ড ন-বৌ ? আঁচলটা অমন করে পোড়ালি কি করে ?”

শিউরে নমিতাও উঠেছিল, কিন্তু সে নিমেষের জন্যে। পরক্ষণেই তাড়াতাড়ি আঁচলটা উল্টে নিয়ে সহাস্যে বলে, “আর বলেন কেন ? আপনি যা বারণ করেন তাই! কথা না শোনার ফল! আঁচল দিয়ে উনুন থেকে গরম জলের বাটি নামাতে গিয়ে—ব্যস।”

আলুর ঝুড়িটা টেনে নিয়ে আলু ছাড়াতে বসে নমিতা, আর মনে মনে ভাবতে থাকে কোন উপায়ে লুকিয়ে মাকে কিছু টাকা পাঠানো যায় কি না। সত্যি তো আর লেখা চলে না—“আমার দ্বারা কিছু হবে না, আমার আশা আর কোর না।”

সেখানে গ্রামসুদ্ধ লোক জানে নমিতা ‘রাজরাণী’—নমিতার স্বামী ‘মহানুভব’।

এই—এইজন্যেই মেয়েদেরকে আমি দেশলাই-বাক্সর সঙ্গে তুলনা করি। ভিতরে অনেক অগ্নিকাণ্ডের উপকরণ মজুত থাকতেও ওরা কোনদিন জ্বলে উঠে জ্বালিয়ে দেয় না পুরুষের মহানুভবতার মুখোশটা। জ্বালিয়ে ফেলে না নিজের রঙিন খোলসখানা।

জ্বালিয়ে দেবে না—সে-কথা পুরুষের জানা।

তাই তারা ওদের অনায়াসে ফেলে রাখে রান্নাঘরে, ভাঁড়ার ঘরে, শোবার ঘরে, আর—এখানে-সেখানে।

নির্ভয়ে পকেটে তোলে।

তুছড়া করে ফুলের মালার জোগান দিতে হয় মালীকে।

নিত্যকার বরাদ্দ।

পুরুষানুক্রমে চলে আসছে এই প্রথা, এর আর ব্যতিক্রম হয় না। মালীরাও পুরুষানুক্রমে এ বাড়ির খাতায় নাম লিখে রেখেছে। সারা বৎসর ধরে প্রকৃতি দেবীরও জোগান আছে সুগন্ধি সম্ভারের।—বেলা আর মল্লিকা, যুঁথি আর রজনীগন্ধা, বকুল আব হেনা—কেউ না কেউ আসর বজায় রাখে। নিতান্তই যখন হিমের হাওয়ায় সুবাসিনীদের পাত্তা মেলে না তখন আছেন কুন্দ। গন্ধ না থাক, গোড়ে মালার পাটটা থাকা চাই।

অশোকার শাশুড়ীর দিদিশাশুড়ী মধুমালা দেবী, যাঁর পায়ে ছিল বেঁকি মল—আর হাতে বাউটি, নারকোল ফুল, জশম, মুড়কি-মাদুলি, তিনিও তিলের তেলে জবজবে চুল 'পেটি পেড়ে' আঁচড়ে 'বেনে খোঁপায়' জড়াতেন মল্লিকার গোড়ে।

কালের পরিবর্তনের সঙ্গে দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে নারীর রূপচর্যার,—'বেনে খোঁপা' থেকে একশো গুছির 'বসন্ত বাহার', তার থেকে কিছুটা আধুনিকা অশোকার শাশুড়ি পরিপাটি করে বেঁধেছেন ফিবিঙ্গি খোঁপা, টুপি খোঁপা। আব অশোকা তো খোঁপাই বাঁধে না। চল্‌কো কবে হাত ফিরিয়ে রাখে, পিঠের ওপর দোলে সেই খোঁপার ভগ্নাবশেষ।

কিন্তু ফুলের মালাটি ঠিক আছে।

বনেদী বড়লোকের বাড়ি।

দোল দুর্গোৎসব আর বারোমাসে তেরো পার্বণ করবার মত নিরেট বড়লোক নয়—আবাম আয়েশ আর বিলাসিতার বনেদে গড়া বংশ। পৃথিবীটা যে উপভোগের জায়গা এ তথ্যটা যেন বড্ড বেশি জেনে ফেলেছে ওরা।

ওরা তাই সেকেলে বড়মানুষের মত মার্বেল পাথরের মন্দির বাঁধিয়ে দিয়ে ফুলের মালার জোগান রাখত না পাথরের বিগ্রহের গলায় দোলাতে।···সুন্দরী তরুণীর কবরীতে পুষ্পমাল্যের বেষ্টনীর যা সৌন্দর্য, সে সৌন্দর্য উপভোগ করবার মত শৌখিন অনুভূতি কজনের থাকে? সে অনুভূতি এদের ছিল বংশানুক্রমে।

এ বাড়ির বৌদেব সাজ আছে কাজ নেই।

সকাল থেকে কলহ করে গাল-গল্প করে, দাসীর হাতের সাজা বাটা-ভর্তি পান খেয়ে, আর পালঙ্কে গড়াগড়ি দিয়ে দিনটা কাটিয়ে দেওয়া নিয়ে কথা। বিকেল পড়তেই সাজের পালা।

সরময়দা রূপটান, চিরুণী গন্ধতেল, আর ফুল-কোঁচানো সিমলে শান্তিপুরের

শাড়ি নিয়ে ব্যস্ততা পড়ে যেত তখন। সাহায্য করতে আছে মাথাপিছু খাস ঝি একটা করে। কোলের ছেলে মানুষ করতে থাকত আলাদা ঝি, এ ঝি শুধু সৌন্দর্যের খবরদারী করবার।

অশোকাই প্রথম এ বাড়ির হাওয়াটা কিছু বদলেছে।

প্রসাধনের নিভৃত নিরালায় একটা কুদর্শন দাসীর সান্নিধ্য ওর অসহ্য। একশ গুছির খোঁপাও বাঁধে না, পানও খায় না বাটা ভর্তি করে।

ওব স্নো পাউডার, লিপস্টিক কুঙ্কুমের প্রসাধন ভাণ্ডারে দাসীর প্রয়োজন কিসের? নিতান্তই আত্মনির্ভর জিনিস এখনকার। তাছাড়া—আবার নিজের হাতে বিছানা না পাতলে ঘুম ভাল হয় না ওর, স্বামীর খাবার পান কটি নিজে না সাজলে তৃপ্তি হয় না, খাবার কাছে বসে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করতে না পেলে যেন মনে হয় দিনটাই মিথ্যে হয়ে গেল।

তাই অশোকার চালচলনটা কিছু স্বতন্ত্র।

জ্যেঠশাশুড়ী নীলনয়না দেবী এই "ছোট ঘরের মেয়ের" গরিবীয়ানা চাল দেখে আড়ালে নাসিকা কুঞ্চিত কবেন, আর সামনে সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেন—"এইবার এ বাড়ির চালচলন 'হালতি বালতি'র বাড়ির মতন হতে আরম্ভ করল। …হবে না কেন, যেমন ঘরের হাওয়া এসেছে বাড়িতে!"

'যেমন ঘরের মেয়ে' বলে আইনের প্যাঁচে ফেলতে চান না নিজেকে, যতই হোক অশোকাই যে বর্তমানে খোদ গিন্নী এটা ত অস্বীকার করবার উপায় নেই?

কিন্তু হাওয়ার ওপর ত তর্ক চলে না।

হাওয়া বদলেছে কিন্তু বিকেল বেলা—মালাচন্দন ঢাকাই শান্তিপুরী শাড়িতে সেজে তিনতলার ছাদে কর্তাদের আমলের গাঁথানো পাথরের বেদীতে বসে স্বামীর প্রতীক্ষা করার নিয়মটা নিতান্তই মামুলি রয়ে গেছে, ওর মধ্যে আর নতুনত্ব আনতে পারে নি অশোকা।

তাছাড়া—আর করবেই বা কি?

কর্মলেশহীন অলস জীবনের বাইরে যে আরও কিছু আছে, সে কথা কবে শিখল অশোকা? পনেরো বছর বয়সে এ বাড়িতে এসেছে, লেখাপড়া যা শিখে এসেছিল নাটক নভেল পড়তে পারার উর্ধ্বে নয়, কাজেই সমস্ত মন বুদ্ধি চিন্তা সেই একটি মানুষকে কেন্দ্র করেই ফুটে থাকে সূর্যমুখী ফুলের মত।

তবে অশোকার ভাগ্য ভাল।

প্রতীক্ষার শেষে—সহনীয় প্রতীক্ষার শেষেই ওর দেবতার দর্শন মেলে। অসহনীয় প্রতীক্ষার শেষে খোঁপার মালা খুলে নিয়ে টুকরো টুকরো করে বাগানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আছড়ে এসে বিছানায় পড়তে হয় না নিঃসঙ্গ একক বিছানায়। ···মধুমালা দেবীর আমল থেকে যা চলে আসছে।

খাস দাসী নইলে চলতই বা কি করে তাঁদের? সারারাত্রি একলা ঘরে পাহারা দেবে কে, দাসী না থাকলে? অশোকার পাহারাদার প্রদ্যোত নিজে। সন্ধ্যা হলে সেই যে তিনতলায় উঠে আসে আর তাকে নামানো যায় না।

প্রদ্যোত এ বংশের ব্যতিক্রম।

পুরুষ-চিত্তের সমস্ত আবেগ ওর নিতান্তই অগ্নি-নারায়ণ সাক্ষী করা বিবাহিতা স্ত্রীকে ঘিরে। অশোকাকে ও সেতার বাজাতে শেখায় সারা সন্ধ্যা ধরে। পিতৃপুরুষের রক্তের ধারা কিছুটা আছে বৈ কি, আছে এই সঙ্গীতানুরক্তি। কিন্তু হিসেবী ছেলে পিতৃপুরুষদের মত সেই অনুরক্তির পেছনে উন্মাদের মত অর্থব্যয় করবার মত বোকা নয়। শোনার চাইতে শেখার শখ ওর বেশী ছিল, এখন শখটা সঞ্চারিত হয়েছে শেখানোয়।

নীলনয়না তাই মিনিটে মিনিটে ঘৃণায় লজ্জায় কণ্টকিত হতে থাকেন। বৌয়ের আঁচল-ধরা পুরুষমানুষ তাঁর যেমন অসহ্য, তেমনি অসহ্য ঘরের বৌয়ের বাইজীর মত আচার আচরণ।

প্রতি পদে নিজেদের আমলের সঙ্গে তুলনা করে হতাশায় ক্ষোভে ক্ষতবিক্ষত হন নীলনয়না। সন্ধ্যার অন্ধকারে চুপিচুপি সিঁড়িতে উঠে যান, বেহায়াপনা কতদূর এগোতে পারে তার হিসাব নিতে। তিনতলার ছাদের মাঝখানে ছাতার মত গড়নের ঢালু ছাদ দেওয়া মার্বেল পাথরের গোল বেদীটায় ওরা দুজনে বসে। প্রদ্যোত আর অশোকা। যেখানে সারা বিকেল আর সারা সন্ধ্যা একলা বসে থাকতেন নীলনয়না।

প্রসন্ননারায়ণের পায়ের ধুলো?

পড়ত বৈকি। কদাচিৎ কখনও পড়ত না এমন নয়। সেই অনিশ্চিত একদিনের আশায় আগুনের মত গায়ের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে আগুন রঙা রেশমী শাড়ি পরে আর 'পদ্মপাতা' খোঁপায় মল্লিকার মালা জড়িয়ে পাথরের মেজেয় ভেলভেটের আসন পেতে বসে থাকতেন নীলনয়না হাল ফ্যাসানি মেয়েদের মত বই খাতা নিয়ে অথবা গানবাজনা নিয়ে সময় কাটাবার বিদ্যে ছিল না তাই সময়

কাটাত দীর্ঘশ্বাসে…

গোল বেদীব খিলেনে খিলেনে সেই দীর্ঘশ্বাস কি পুঞ্জীভূত হয়ে নেই? হতাশ বিক্ষুব্ধ বেদনামর্মরিত বহু সন্ধ্যা আর রাত্রির সাক্ষ্য এই বেদীটার? বাগানের আনাচে কানাচে সেই স্তূপীকৃত গোড়েমালার ধ্বংসাবশেষ কি এখনও খুঁজলে মেলে না? মধুমালার আমল থেকে যা জমা হচ্ছে?

মধুমালার তবু সন্তান ছিল, সন্তান ছিল তারাসুন্দরীর, গিরিবালার, আর বসন্ত-মঞ্জরীর, যৌবনের জ্বালা স্তিমিত হয়ে এসেছিল তাদের। কিন্তু নিঃসন্তানা নীল-নয়নার প্রখর যৌবন, মধ্যাহ্ন সূর্যের মত জ্বলে জ্বলে নিজেকেই পুড়িয়ে মেরেছে শুধু।

অশোকাও আজ পর্যন্ত নিঃসন্তান, তবু সুন্দর একটি স্নিগ্ধ দীপ্তি ওর মুখে! দাহ নয়, দীপ্তি।

ভস্মাবশেষ নীলনয়না নতুন করে পুড়ে মরছেন সেই দীপ্তিতে।…

প্রদ্যোতের হাসি-গল্পে উচ্ছ্বসিত অশোকার কলহাস্য মুখরিত হয়ে ওঠে গোল-খিলানের খোপে খোপে…আব সিঁড়ির অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অবশ হয়ে আসে নীল-নয়নার হৃৎপিণ্ড।…

অশোকা যেন কি সর্বনাশ করতে বসেছে।

প্রথম দর্শনের আদর সোহাগের পালা শেষ হয়ে যখন সেতারের ঝঙ্কার সুরু হয়, তখন নিতান্ত বিরক্ত হয়েই নেমে যান নীলনয়না। ঘরের বৌয়ের এই বাইজীর মত আচার আচরণ তাঁর অসহ্য।

অসহ্যপণায় সায় দেবার মত লোকেরও অবশ্য অভাব নেই এত বড় বাড়িটায়। বয়েসকালে যাদের দিকে কোনদিন তাকিয়ে দেখেন নি নীলনয়না, আজ তাদের ডাক পড়ে তাঁর সান্ধ্যসভায়। এ সময়টা যে ওরা কিছুতেই নামবে না—না অশোকা না প্রদ্যোত, সেটা নিশ্চিত জানা বলেই এখনকার আসরটা জমজমাট।

—বৌমা এবাড়ির মুখ হাসালে—

এবাড়ির বিরাট মহিমায় মহিমান্বিতা নীলনয়না রূপোর পানের বাটাটা কোলের গোড়ায় টেনে নিয়ে বিষ-হাসি হেসে বলেন—ঘরের পয়সা কেন বাইরে যাবে, তাই খোকা আমাদের বৌকে বাইজী করে তুলে পয়সা বাঁচাচ্ছে!

সভার সদস্যাদের মধ্যে পুরনো আমলের বামুনদিদি আছেন এক সদস্যা। নিরিমিষ ঘরের ভার ছিল তাঁর হাতে, এখন হস্তান্তরিত হয়েছে তাঁর বিধবা মেয়ে নারাণীর কাছে। বামুনদিদির অবসর এখন প্রচুর।…মানুষটা বোকাগোছের,

তাই প্রতিবাদ করে বসতে বাধে না তার।

নীলনয়নার মন্তব্য শুনে বলে—তাই বা কেন বড় বৌঠাকরুণ,…এখনকার তো ঘরে ঘরেই হয়েছে গান-বাজনা।

—এখনকার কথা আর তুলো না বামুনঠাকরুণ, যেমন পদে আছ থাক বড় কথা কইতে এস না। 'হালতি বালতি' ঘরের মতন চালচলন কখনও চলেছে এ বাড়িতে? চিরদিন রাজা-রাজড়ার চালে চলে এসেছে সবাই।—তখনকার কথা একবার ভাব দিকি নি? বলি কেউ তো আর তোমরা নতুন আস নি? কি জমজমাটে বাড়ি, পুরুষদেরই বা কি বোলবোলাও!…আর খোকা? ছিঃ ছিঃ ছিঃ।…

ঘৃণায় নাক সিঁটকে দুটো পান আর এক মুঠো দোক্তা মুখে ফেলে দিয়ে নীলনয়না বলেন—খোকা একেবারে হদ্দ করল আমাদের! এ বংশে যে এমন মেনিমুখো ব্যাটাছেলে জন্মাবে তা কখনও ভাবি নি! কর্তারা ওপর থেকে দেখে বোধ হয় হাসছেন।

জ্ঞাতি ননদ শশীমুখী বলেন—তা যা বলেছ, কেলেঙ্কারী একেবারে! সেই বিকেল বেলা এসে ওপরে উঠেছে প্রদ্যোত? ও মা কি ঘেন্না!…যাই বল বড় বৌ, পুরুষ মানুষের একটু 'বারটান' না থাকলে যেন স্বাদ থাকে না। ব্যান্নন্যেব স্বাদ করতে যেমন লঙ্কা-মরিচের জ্বলুনি একটু চাই।

চিরদিনের আশ্রিতা শশীমুখী, অনেক দিনের অনেক লঙ্কা-মরিচের ইতিহাস তাঁর জানা।

—তাও যদি তোমার আমার মত রূপ থাকত!

'তোমার'টা নিতান্ত অনুপ্রাস হিসেবেই ব্যবহার করেন নীলনয়না।…আদ্দির সেমিজ আর ফরাসডাঙ্গার থানপরা নিভাঁজ নিটোল নিজের শরীরটির দিকে একবার চোখ বুলিয়ে হেসে উঠে নীলনয়না বলেন—ওইরূপেই তদ্গত খোকা! দেখত যদি সেকালের 'কুসুম কীর্তুনী' কিম্বা 'কিশোরী বাইজী'কে? রূপ তো চক্ষে দেখে নি।

বামুনঠাকরুণের কথা কওয়াই চাই—তাই বলে ওঠেন—এ তোমার অসঙ্গত কথা বড় বৌঠাকরুন, খোকার কি পয়সার অভাব আছে? ইচ্ছে করলে কর্তাদের মতন সবই করতে পারে। গুরুর দয়া যে কুপথে মন যায় নি।…

—আবার বকবক্ করে বকছ বামুন ঠাকরুণ? লোকের বাড়ি ভাত রেঁধে তবে দুটো অন্ন জুটিয়ে এসেছ, সভ্যতা-সৌষ্ঠবের জ্ঞান কি?

তখনকার মত চুপ করে যান বামুন ঠাকরুণ। কিন্তু সভ্যতা-সৌষ্ঠব সম্বন্ধে খুব

যে অবহিত হন এমন নয়।

নীলনয়নার মাধবী-সন্ধ্যা এখন আর দীর্ঘশ্বাসে মুখর নয়, অনুগত কৃপাপ্রার্থিনী-দের কলগুঞ্জনে মুখর।...

কিন্তু বাড়াবাড়ি আর সহ্য হয় না।

প্রদ্যোত নাকি মাস্টার রাখছে বৌকে লেখাপড়া শেখাতে!

কিন্তু নীলনয়নার কি সব প্রতিপত্তি শেষ হয়েছে? স্বামী না হোক, এ সংসারটা কি একদিন হাতের মুঠোয় ছিল না তাঁর? তবে?...মুখ বুজে এত অনাচারই বা সহ্য করবেন কেন?

মধ্যাহ্নের আসরে ডেকে পাঠালেন একদিন অশোকাকে।

দিনের ঘুম থেকে উঠে এসেছে অশোকা, নীলাম্বরীর শিথিল আঁচল গায়ে জড়ানো, দুই চোখে জড়ানো গত রাত্রির জাগরণের ক্লান্তি।...

নীলনয়না এমন বুড়ো হন নি যে এসব চিনতে ভুল হবে।

সর্বাঙ্গ আর একবার নতুন করে জ্বালা করে উঠল তাঁর। বললেন—এ সব কি শুনছি বৌমা?

—কি শুনছেন বড় মা!

থতমত অশোকা প্রশ্ন করে।

—এই সব মাস্টার রাখারাখির কথা? আমি বলে দিচ্ছি এ বাড়িতে ওসব চলবে না, এখনও আমি আছি।

—কিন্তু বড় মা—লেখাপড়া ভাল করে শিখি নি বলে রাগ করেন যে।

—ঢং আর কোর না বাছা! 'রাগ করবেন'! রাগ কি আর আছে ওর শরীরে? সে সব ছিল তখনকার আমলের বাবুদের। খোকার হালচাল দেখলে লজ্জায় মাথা কাটা যায় আমাদের। ছিঃ ছিঃ। এ বংশের ছেলে হয়ে চব্বিশ ঘণ্টা বৌয়ের আঁচল ধরে বসে থাকে!

—এ বংশ বলেই তো ভয় করে বড় মা—অশোকা মুখ তুলে পরিষ্কার গলায় বলে—এ বংশের ইতিহাস তো আমার শুনতে বাকি নেই।

—তবুও সে ভাল বাছা, ঢের ভাল! সে তবু পুরুষের পৌরুষ ছিল। যাকৃগে আমার এই সাদা কথা—এ বাড়িতে ওসব চলবে না। বৌ নিয়ে আদিখ্যেতা এ বাড়ির কেউ কখনও করে নি।

অশোকা ধীরে ধীরে সরে যায়।

নীলনয়না ডাকিয়ে পাঠান বাড়ির সরকারকে।

—আপনাদেরও বলি সরকার মশাই, বাড়ি যে একেবারে মঠ মন্দির হয়ে উঠল।

সরকার মশাই অবাক হয়ে মাথা চুলকোতে শুরু করেন।

—বলি আমোদ আহ্লাদ ফুর্তিটুর্তি কি পৃথিবী থেকে উড়ে গেছে? আপনি বিচক্ষণ লোক, কত আর বোঝাব আপনাকে? খোকা আমার সুছেলে, আমার ভয়ে মুখটি ফুটতে পায় না, কিন্তু বেটাছেলে—সাধ আহ্লাদ কি নেই? বিশেষ তো এ বাড়ির বেটাছেলে?

মুচকে একটু হাসলেন নীলনয়না।

সরকার মশাই আমতা আমতা করে বললেন—তাহলে কি করতে বলেন?

কি আবার বলব? নতুন কিছুই নয়। বাগানবাড়িটা ঝাড়া-মোছা করান—ভালো 'গাউনী কীর্তনী' নিয়ে এসে দুদিন জলসা টলসা দিন—কেবল বাড়ি বসে থেকে থেকে ছেলের আমার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেল যে।

—কিন্তু বড় মা, খোকাবাবু রাগ টাগ করবেন না তো?

—রাগ যাতে না করে সেই কৌশল করবেন। সেটুকু বুদ্ধি আপনার ঘটে আছে আশা করি?···সে আমলে আপনিও তো কম ঘুঘু ছিলেন না।

নীলনয়নে নীলাভ আগুন জেলে উঠে যান নীলনয়না।...

আর প্রতীক্ষা করতে থাকেন দিনের পর দিন···কবে অশোকার প্রতীক্ষা শেষ হবে দীর্ঘশ্বাসে। সে দীর্ঘশ্বাস গোল থিলানের ফাঁকে ফাঁকে জমা হবে অনেক দিনের সঞ্চিত দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে।···

পুরনো বাগান বাড়ির তালা-বন্ধ ঘর আবার আলোয় ঝলমল করে ওঠে, কাঁচের গ্লাসের ঠুন ঠুন আওয়াজের সঙ্গে নর্তকীর নূপুর নিক্বন শোনা যায়।

তিনতলার ছাদে মার্বেলের বেদীতে বসে সে শব্দ কানে আসে অশোকার···

কানে আসে শুধু রাত্রি যখন গভীর হয়।···বাইরের আর সব শব্দ কমে আসে।

—খোকার আবার এ কী হল বৌ? একগাল হেসে প্রশ্ন করেন শশীমুখী।

—আর ভাই বাঘের বংশে বাঘই হয়।···এতদিন চাপা ছিল বৈ ত নয়। ছিল আমারই ভয়ে। এখন যতই হোক বড় হচ্ছে।··

সান্ধ্য-আসর মুখর হয়ে ওঠে খোকার নতুন কীর্তির বর্ণনায়।

এই আসরে একদিন অশোকাকে ডেকে পাঠালেন নীলনয়না।

দাসীকে বলে দিলেন—ডেকে আন—বৌমাকে।…আহা মরে যাই, বাছা মুখ শুকিয়ে বসে আছে, কাছে এনে—দুদণ্ড দুটো কথা, ঠাকুর-দেবতার কথা বলি। কপাল দেখ না, দুদিন স্বামী-সুখের আস্বাদন পেয়ে—

অশোকা ডাক শুনে নেমে এল, না কি আসছিলই—কে জানে!…সাজ-সজ্জায় যেন একটু বেশী অসাধারণত্ব।…

—এস বৌমা। কোথায় একলাটি বসে আছ, এখানে এসে বোস খানিক।

—ফিরে এসে বসব বড় মা।

—ফিরে এসে? যাচ্ছ কোথায়?…অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন নীলনয়না।

—বাগান বাড়িতে।…বিমলা দেখত বাইরে গাড়ি এসেছে কি না।

—তুমি বাগান বাড়িতে যাবে!…নীলনয়নার আর কথা জোগায় না।

—যাব বৈকি বড় মা! এই বেলা সাবধান না হলে আবার ভবিষ্যতে কার সুখের ঘরে আগুন জ্বালাতে যাব হয়তো।

রণবীর যে এমন একটা প্রস্তাব করে বসবে একথা অসীমা স্বপ্নেও ভাবে নি! একটু চুপ করে থেকে ও বলে—সে কি আর সম্ভব?

—একেবারে সম্ভবই নয়? রণবীর ব্যঙ্গের আমেজ-মাখানো তিক্তস্বরে বলে—কেন মাথাটা কাটা যাবে?

—মাথা কাটা যাওয়ার কথা হচ্ছে না। তবে কতকাল দেখা-সাক্ষাৎ নেই, হঠাৎ এতদিন পরে গিয়ে এরকম একটা প্রস্তাব—

রণবীর কণ্ঠে তিক্ততার স্বাদ বজায় রেখেই 'হা হা' করে হেসে উঠে বলে—তা কে আর স্বামীপুত্তুর নিয়ে সংসার করতে করতে "প্রথম প্রেমের" কাছে নিত্য হাজরে দেয় বল?

—থাম, অসভ্যর মত কথা বোল না।

—আহা আগে তো সুসভ্যের মতই বলছিলাম, তুমি বেঁকে বসেই যে মেজাজ বিগড়ে দিচ্ছ! বলি অসম্ভবের কি আছে এতে?…কম বয়সের 'ইয়ে'টা লোকে

সহজে ভোলে না, এটা তো ঠিক? ঘোষাল সাহেব বয়েসকালে তোমাকে ভাল-বাসার চক্ষে দেখতেন, এখন তোমার একটা অনুরোধ রাখতে পারলে বরং খুশিই হবেন।

অসীমা গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে—'ইয়ে' সম্বন্ধে জ্ঞানটা তোমার বেশ টনটনে দেখতে পাচ্ছি। সে যাক, তিনি যদি বা খুশি হলেন, আমি খুশি হই কি করে? আমার পোজিশনটা ভেবে দেখছ?

রণবীর ভারি যেন আশ্চর্য হয়ে গেছে, এইভাবে বলে—এর আবার ভাবাভাবির কি আছে? লোকটার হাতে এখন, কি বলে—তোমাদের ঐ 'ঈশ্বর কৃপায়'—ক্ষমতা রয়েছে প্রচুর। ইচ্ছে করলেই একটা ভাল চাকরী আমার করে দিতে পারে। একটু শুধু বলার ওয়াস্তা। সেইটুকু বলতে এত মানের হানি হচ্ছে কিসে বোঝা শক্ত।

—বোঝানোটা আরও শক্ত।—বলে অকারণে টেবিলটা গোছাতে থাকে অসীমা।

রণবীরের চোয়ালের পেশী দৃঢ় হয়ে ওঠে, কপালে খাঁজ পড়ে। কটু কণ্ঠে বলে ওঠে—যে বেটাছেলেকে বৌয়ের খোশামোদ করতে হয়, তার জীবনে ধিক্!

—খোশামোদ? আমাকে খোশামোদ করছ তুমি?

আরক্ত হয়ে ওঠে অসীমার মুখ।

—তাছাড়া আর কি! রণবীর শ্লেষতিক্তস্বরে বলে—এতক্ষণ যা করছি, বাংলাভাষায় তাকে খোশামোদই বলে।···তুমি এমন করছ, যেন কারও ঘরে আগুন লাগাতেই বলেছি! কিছুই না···তোমার সঙ্গে ঘোষাল সাহেবের পুরনো আলাপ, তোমার পক্ষে অনুরোধ করা সহজ, তাই এত করে বলা।

সহজ।

অসীমার মুখে একটা সূক্ষ্ম হাসি—হ্যাঁ, হাসির রেখাই ফুটে ওঠে।

কী সহজ!

এগারো বছর অদেখার পর, দেবব্রতর বাড়ি বয়ে গিয়ে দেখা করে, বেকার স্বামীর জন্য একটি চাকরীর আবেদন করা কত সহজ! রণবীরদের হিসেবে বোধ হয় তাই বলে! দেবব্রত এককালে অসীমার সহপাঠী ছিল, বিশেষ একটু অন্তরঙ্গ-তাও ছিল, এ খবর জানে রণবীর। সেই সহপাঠী যে এখন আপন কৃতিত্বে ভাগ্য-দেবীকে হাতের মুঠোয় পুরেছে, এ খবর আবার রণবীরই সংগ্রহ করে এনে অসীমাকে জানিয়েছে। 'ঘোষাল এণ্ড কোম্পানীর' বাড়-বাড়ন্তর কথা জানতে

পারলেই সে খবর এসে অসীমার কর্ণগোচর করে।

অসীমা কখনও কৌতূহল প্রকাশ করে না, বরং বিরক্তিই প্রকাশ করে, বলে—'হয়েছে তো হয়েছে' তাতে আমার কি মাথা কিনেছে ?'

রণবীর চোখ-মুখ কুঁচকে হেসে হেসে উত্তর দেয়—আহা যতই হোক, এক-কালে সম্পর্কটা তো কিছু মধুর ছিল ? সে একটা কেষ্ট-বিষ্টু হয়েছে, শুনলে খুশী হবে বলেই বলা।

কিন্তু সে তো অন্য কথা।

এখন রণবীরের এ কী অন্যায় আবদার ! দেবব্রত একটা মস্তবড় কোম্পানীর অংশীদার, দেবব্রত ইচ্ছে করলেই একটা ভাল চাকরি দিতে পারে, অতএব দেব-ব্রতর কাছে গিয়ে মিনতি জানাও, "আমার স্বামীকে তোমার অধীনস্থ একটি কর্ম-চারী করে নাও। যেহেতু আমি ছেলে-মেয়ে নিয়ে কষ্টে পড়েছি !"

ছি ছি ছি !

অসীমা স্থির স্বরে বলে—সহজ শক্তর ধারণা সকলের সমান নয়। কিন্তু তোমাকেই বলি—ওকে সেলাম ঠুকে, ওর অধীনে কাজ করতে তুমি পারবে ?

—পারব না ? পারব কিনা জিজ্ঞেসা করছ ? হুঁ ! রণবীর মুখখানা প্যাঁচার মত করে বলে—ভিখিরীর আবার ইজ্জৎ ! তাছাড়া—না পারবার আছেই বা কি ? আমি তো আর কখনও ওর সঙ্গে ডুয়েল লড়তে যাই নি ? ও আমাকে চেনেই না···তোমাকে তো শিখিয়ে দিচ্ছি—এমন ভাবে যাবে যেন আমাকে লুকিয়ে গিয়েছ ! আমি যথারীতি নিয়মতান্ত্রিক ভাবে দরখাস্ত পেশ করব ! তুমি শুধু নাম-ঠিকানাটি জানিয়ে 'বিশেষ বিবেচনা'র জন্যে অনুরোধ জানিয়ে আসবে। ব্যস ! হয়ে গেল শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি !···তারপর কে কাকে জানতে যাচ্ছে ? তাছাড়া—ও হল খোদ কর্তাদের একজন, চুনো-পুঁটিদের সঙ্গে ওদের কি কাজ ?

অসীমা গম্ভীর ভাবে বলে—আর যদি চিনতে না পারে ? বড়লোকের পক্ষে গরীব বন্ধুকে মনে না রাখাই স্বাভাবিক ! ধর চিনতে পারল না !

রণবীর মুচকে হেসে বলে—ওটা তোমার তর্কের কথা। চিনতে যে পারবে, সে তুমিও জান—আমিও জানি। তোমায় যে একবার দেখেছে, সে কি আর জীবনে ভুলতে পারবে ?

আর একবার মুখটা আরক্ত হয়ে ওঠে অসীমার। তবু উত্তেজিত হয় না। শান্তভাবেই বলে—বেশ না হয় চিনলই। কিন্তু অনুরোধ যে রাখবে তার তো

কোন গ্যারান্টি নেই ? তখন আমার মুখটি কোথায় থাকবে ?

—অনুরোধ রাখবে কি না, সে গ্যারান্টি নেই ?…রণবীর আর একটু প্যাঁচালো হাসি হেসে বলে—সে গ্যারান্টিও আছে। আমি জানি, আছে।

অসীমার সারা মুখে যেন আগুনের হল্‌কা !

কণ্ঠস্বরকে আর অনুত্তেজিত রাখতে পারে না বুঝি !—এতই যদি জান, তাহলে কোন সাহসে আমাকে পাঠাচ্ছ সেখানে ?

—কী মুস্কিল, ঠাট্টা বোঝ না ? রণবীর…আর একবার 'হা হা' করে হেসে ওঠে। তারপর বলে—বুঝছ না ? তুমিই আমার শক্তি, তুমিই আমার সাহস। ঠাট্টার কথা থাক, ঘোষাল সাহেব যে পুরনো বন্ধুত্বের খাতিরে 'না' করতে পারবে না সেটা নিশ্চিত। আমি হলে অন্ততঃ পারতাম না !

—বেশ ! ভাল কথা ! তোমরাই তোমাদের বোঝ। কিন্তু আমি পারব না !

—পারবে না ? এতক্ষণের পর ঝাড়া জবাব দিচ্ছ—পারবে না ?

—জবাব না দিয়ে করব কি ? যা পারব না—

—তা পারবে কেন ? রণবীর প্রায় ভেঙিয়ে ওঠে—মানের কানা খসে যাবে যে। মান ! মানের এখনও আছে কিছু ? বলি দেখছ চারদিক তাকিয়ে ? সংসারের চেহারাখানা দেখছ ? ছেলে-মেয়ে দুটোর হাল দেখছ ?

অন্যমনস্কের মতই একবার তাকিয়ে দেখে অসীমা। কিন্তু সংসারের চেহারা-খানা দেখবার জন্যে কে নতুন করে আবার তাকিয়ে দেখে তবে বুঝতে হবে ছেলে-মেয়েদের হাল ?

পুরনো রেস্তহীন বাসাড়ে সংসারে, সংসারের একমাত্র উপার্জনশীল লোকটা যদি সতেরো মাস ব্রেক্‌ বসে থাকে, সে সংসার যাকে চালাতে হয়, হাল বোঝবার জন্যে বাইরে তাকাবার দরকার হয় তার ?

তবু তাকিয়েই দেখেছিল অসীমা, একটা শূন্য দৃষ্টি মেলে। তারপর সেই শূন্য দৃষ্টিই স্বামীর দিকে ফিরিয়ে বলল—আমি কি জানি না ?

—জান তার প্রমাণ তো পাচ্ছি না! নিজের মানের কথাটাই ভাবছ, সন্তানদের প্রাণের কথা ভাবছ কই ? ভাব দিকি কতদিন দুধ আসে নি বাড়িতে ? কতদিন—

—আঃ থাম !

রণবীর ভাবছিল, যতই হোক, মেয়েমানুষের মন, এভাবে বুকে বিঁধিয়ে বললে কাজ হবে, কিন্তু অসীমার 'আঃ থাম' শুনে আর ও-পথে ভরসা হল না।

অতএব অন্য পথ দরকার।

এতক্ষণের নানা ভাব-মিশ্রিত মুখটাকে এবার ভীষণাকৃতি করে ফেলে রণবীর বলে—হুঁ! এবার ধমকও খেতে হবে বৈকি! বেকার পুরুষের আবার মান সম্মান! বেশ এবারে ভিক্ষেই ধরব! স্বামী ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করবে, ছেলেমেয়ে দুটো না খেতে পেয়ে পট পট করে মরে যাবে, তাতে কি? মহা-রাণীর তেজটা বজায় থাকলেই হল!

হ্যাঁ মোক্ষম কামড় দিয়েছে এবার রণবীর। আর আপত্তি করুক দিকি অসীমা! আড়ে আড়ে একবার স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে রণবীর। দেখতে চেষ্টা করে কামড়ের প্রতিক্রিয়াটা কি হয়।

ঠিক বুঝতে পারে না।

রাগ অপমান দুঃখ অভিমান, কোন ভাবেরই ক্রিয়া দেখতে পায় না সে মুখে। শুধু কেমন একটা প্রস্তর-কাঠিন্য! আরক্তিম নয়, রক্তহীন শুভ্রতা নয়, পাংশু বিবর্ণতা নয়, শুধু একটা নিষ্প্রাণ কাঠিন্য।

—বেশ যাব!

বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় অসীমা!

যাক্, রণবীর এবার নিশ্চিন্ত হতে পারে।

অসীমা যখন একবার স্বীকার পেয়েছে, আর সে কথার নড়চড় হবে না। আর গেলে যে কাজ হবে সে বিষয়েও রণবীর নিশ্চিত।

ঘোষাল সাহেবের কাছে পুরনো 'ভাবে'র ছুতো নিয়ে স্বামীর চাকরীর আবেদন করতে যাওয়ার প্রস্তাবে ধ্বক্ করে যে আগুন একবার জলে উঠেছিল অসীমার চোখে, রণবীরের তা চোখ এড়ায় নি।···সে আগুনের স্বরূপ চিনতে ভুল হবে, এত বোকাও নয় রণবীর।

কপাল-দোষে আজ রণবীরের এই অবস্থা।

নইলে বিদ্যেয় সে ঘোষাল সাহেবের চাইতে কম নয়। ঘোষালও সাধারণ গ্র্যাজুয়েট।

কপাল! কপাল!

ধনবানদের দিকে ঈর্ষার কুটিল চাউনি হেনে এই বলেই মনকে সান্ত্বনা দেয় অলস অপদার্থরা!

চেষ্টা নয়, অধ্যবসায় নয়, বুদ্ধিশক্তি নয়, শ্রমশক্তি নয়, শুধু 'কপাল'।...এছাড়া —আর কি সান্ত্বনাই বা আছে!

যাক্, অসীমাকে সময়ান্তরে একটু ঠাণ্ডা করতে হবে। একটু বুঝিয়ে দিতে হবে যে, এতদিন পরে তুমি একটু অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে গিয়েছ, এ দেখে ঘোষাল সাহেব কৃতার্থই হয়ে যাবে। পুরুষ চরিত্র রণবীর তো বোঝে!

দৈনন্দিন জীবন দুর্বহ, রান্না ভাঁড়ারঘরে অভাবের প্রচণ্ড হাঁ, সমস্ত সংসার হতে অহরহ 'নেই নেই' ধ্বনি উঠছে, তবু তোলা বাক্সর পোশাকী পোশাকগুলো এখনও লুপ্ত হয়ে যায় নি।

গহনাপত্র সহজেই যায়, অভাবের প্রথম পদক্ষেপেই বিদায় নেয়, কিন্তু শাড়ি-জামাগুলো তার থেকে স্থায়ী জিনিস। অতএব বাইরে বেরোতে এখনও কিছুটা সৌষ্ঠব রক্ষা সম্ভব। বেশ ভাল করে সেজে-গুজেই বেরিয়ে গেল অসীমা। আর ফিরে এসে—

হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটা বিছানার উপর ফেলে বিছানারই একধারে বসে পড়ল। পরনের সিল্কের শাড়িখানা যে তুলে রাখা উচিত, সে খেয়াল না করেই।

রণবীর জানলার ধারে একটা বেতের চেয়ারে বসেছিল চুপচাপ। অসীমাকে পাঠিয়ে দিয়ে পর্যন্তই ছিল—উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, ক্ষোভ, লজ্জা, অনেক কিছু বহন করে। যাবার সময় অসীমা যে রকম বাক্যহীন কাঠিন্যের আবরণে নিজেকে আবৃত করে যাবার প্রস্তুতি করছিল, তাতে আর তাকে সান্ত্বনা দেবার সাহস হয় নি।

চলে যাবার পর নিজেকেই নিজে সান্ত্বনা দিচ্ছিল নিজের স্বপক্ষে যুক্তি সংগ্রহ করে করে। রণবীরই কি এমন ছিল? ওরই কি আত্মসম্মান-জ্ঞান কিছু কম ছিল? কি করবে, অভাবেই স্বভাব নষ্ট।

মিনিট দুই অপেক্ষা করল রণবীর—অসীমা কোন মন্তব্য করে কি না দেখতে। নাঃ অদ্ভুত একটা স্তব্ধতা! এক মিনিটকে এক ঘণ্টা মনে হয়। বেশীক্ষণ সহ্য করা যায় না এ স্তব্ধতা। তাই মিনিট দুই অপেক্ষা করেই চেয়ারটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে ধাঁ করে বলে উঠল—শেষ অবধি তোমার আশঙ্কাই সত্যি হল নাকি? বড়লোক বন্ধু চিনতে পারল না?

অসীমা উঠে দাঁড়াল। সোজাসুজি রণবীরের মুখোমুখি। ঠোঁটের কোণে একটু ব্যঙ্গ হাসির আমেজ।

—চিনতে পারল না মানে ? আমাকে যে একবার দেখেছে সে জীবনে আর ভুলতে পারে না কি ?

অসীমার আপাদমস্তক একবার চোখ বুলিয়ে নিল রণবীর। এ ভঙ্গী অসীমার নূতন নয়, শুধু বিস্মৃতপ্রায়। কতদিন হল অসীমার এমন প্রসাধন-মার্জিত মুখ দেখে নি, দেখে নি বিশেষভঙ্গীতে সিল্কের শাড়ি পরা চেহারা।

দেখে কি আনন্দ হল রণবীরের ?

আনন্দ হলে কি চোখ দুটো জ্বালা করে ওঠে ?

দুচারদিন দাড়ি-না-কামানো গালে অজ্ঞাতসারে একবার হাতটা বুলিয়ে নিল রণবীর, তারপর কষ্টে হেসে বলল—আমার অস্ত্রেই আমাকে সংহার ? তারপর অভিযানের রেজাল্টটা কি হল ? মুখখানা যা একখানা করে ফিরলে!

—তা আবার কি করব ?···অবজ্ঞার ভঙ্গী ঠোঁটে এনে অসীমা বলে—দুশো পঁচাত্তর টাকার একটা চাকরী জুটে গেল বলেই যে মুখখানা আহ্লাদে আটখানা করতে হবে, তার কোন মানে নেই!

দুশো পঁচাত্তর!

দুশো পঁচাত্তর টাকার চাকরী!

রণবীরের পুরনো চাকরীতেও যা ছিল না! কষ্টে হাসি আনতে হয়েছিল মুখে এখন কষ্টে হাসি চাপতে হয়।

—ব্যাপারটা কি ? ব্যাপারটা কি ?···সত্যি না ঠাট্টা ?

—ঠাট্টা করবার কি গরজ পড়েছে ?

রণবীরের চোখে মুখে ফুটে ওঠে লোভ আর ক্ষোভ! চাকরী হয়েছে এর চাইতে খুশির কি আছে! টাকার অঙ্কটা লোভের উদ্রেককর বৈকি, কিন্তু ? সত্যিই হল! সত্যিই এখনও কোথাও কোনখানে অসীমার এতটা মূল্য আছে! শুধু চোখই নয়, সর্বশরীরের মধ্যেই কেমন একটা জ্বালার অনুভূতি।···রণবীর যেন আশা করছিল হবে না। যেন না হলেই সে বেশি খুশি হত।

না হয় আরও দীর্ঘ দিন বাড়িতে দুধ আসত না, না হয় খুকু আর খোকার পাঁজরের হাড়গুলো আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠত, না হয়—

হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক কিছু হত—তবু তাতে এত অপদস্থ হত না রণবীর।··· অসীমাকে ঠেলে পাঠিয়ে দেবার মূলে যে শক্তি কাজ করছিল, সে তো চাকরী হবার আশা নয়, চাকরী না হবার ইচ্ছে।

তাহলেও কথা কইতে হবে।

ভাল করে জানতে হবে কত কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে অসীমাকে। তার মধ্যেই যদি কিছু সান্ত্বনা খুঁজে পাওয়া যায়।

—গিয়েই দেখা পেয়েছিলে তাহলে ?

—না পেলে আর এত শীঘ্র চলে আসতে পারলাম ?

—আমি তো ভাবছিলাম—পুরনো বন্ধু—অনেক দেরীই করিয়ে দেবে, সহজে ছাড়তেই চাইবে না!

রণবীরের কালো-হয়ে-ওঠা মুখটার দিকে পূর্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করে অসীমা মাজাঘষা টনটনে গলায় উত্তর দেয়—ভাবাই স্বাভাবিক! অলস মস্তিষ্ক কিসের কারখানা, সে তো বাচ্চা ছেলেটাও জানে।

রণবীর হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় ধমকের সুরে বলে—কেবল কথার প্যাঁচ। কি হল তাই বল না ?

অসীমা এ ধমকে নড়ল না! কেঁপে উঠল না।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে স্থির-স্বরে বলল—খানিকটা সময় নিয়ে বলবার মত আর হয়েছে কি ? গেলাম, বললাম, হয়ে গেল! কৃতার্থ হয়ে য়্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার দিয়ে দিল! কাল থেকেই যেতে হবে।

—একেবারে য়্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার! কাল থেকেই যেতে হবে ? এতক্ষণে যেন উষ্মা প্রকাশের একটা পথ পেয়েছে রণবীর—কি কাজ, কি বৃত্তান্ত কিছু জানলাম না, নেবার উপযুক্ত কিনা বিবেচনা করলাম না, একেবারে য়্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার ? আমি যদি না যাই কাল!

অসীমা হঠাৎ কন্‌কনে গলায় হেসে ওঠে!

যেমন হাসি অনেক দিন এ ঘরে বাজে নি, তেমনি হাসি! ঘরের দেয়াল থেকে ছাদ অবধি যেন ধাক্কা খেয়ে ফিরল এই বাজনার সুর।

—তোমার যাবার কি দরকার ? আমি একাই যেতে পারব। অফিস তো ধর্মতলায়। ওখানে যেতে আর পথ হারিয়ে ফেলব না।

—ওঃ। চাকরীটা তাহলে তোমার ?

—তবে ? তুমি যে শেষ অবধি রাজী হবে না, এ তো জানতামই। তাই তোমার নাম না করে নিজের কথাই বলেছিলাম।...না বলবই বা কেন ? গ্র্যাজুয়েটই না হয় হই নি, থার্ডইয়ার পর্যন্ত পড়ে তো ছিলাম ? বললাম—পরের' পয়সায় বসে খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরেছে, একটা চাকরী দাও না করি!...ও বলল —'এখুনি দিচ্ছি, এই দণ্ডে, ধন্য হয়ে।'

শ্রোতার পুড়ে-কালো-হয়ে-ওঠা মুখখানা, আরও পুড়তে পুড়তে পাণ্ডাশমূর্তি হয়ে উঠলেই বা ছাড়বে কেন অসীমা ?

যে মেয়ে নিজেরই নিভৃত নির্জনে পড়ে থাকা ছোট্ট একটু ঘরখানিতেও আগুন লাগাতে বাধ্য হল, অপরের ঘরের দিকে অগ্নিবান ছুঁড়তেই বা মমতা হতে যাবে কেন তার ?

ছেঁড়া তার

তারাপদ !

কর্তার উচ্চ চীৎকারে ছুটিয়া আসিলেন তারাপদ নয়, লাবণ্যপ্রভা। বিরক্ত মুখে কহিলেন—ভর সন্ধ্যেবেলা পাড়া মাথায় করছ কেন ?

—করছি আমার খুশি, সে হতভাগা গেল কোথায় ?

—তাকে পাঠিয়েছি আমার কাজে, তোমার এমন কি দরকার পড়ল শুনি ?

লাবণ্যপ্রভার কথার ভঙ্গীই ওইরকম। বিনয় মল্লিক খুব বেশী বিচলিত হন না, একটু উদ্বেগযুক্ত কণ্ঠে কহেন—ও বাড়ির ছোট খুড়োর উঠোনে আলো দেখলাম মনে হল, লণ্ঠন নিয়ে কে যেন—

—হল, তার হয়েছে কি ?

—হয়েছে তোমার মাথা, গোলা ভেঙে ধানকটা বের করে নিয়ে যাক এই তুমি চাও বোধ হয় ?

লাবণ্যপ্রভা বিদ্রূপহাস্যে মুখ বাঁকাইয়া উত্তর করেন—সন্ধ্যেরাত্তিরে আলো জেলে তোমার গোলায় ডাকাত পড়তে এল, কথা শুনে আর বাঁচি নে—দিনরাত চোরের ভয়ে চমকে চমকেই কোনদিন হার্টফেল করবে দেখছি। চোর নয়, চোর নয়, মানুষ।

লাবণ্যপ্রভার হিসাবে বোধ করি 'চোর' মনুষ্য পর্যায়ভুক্ত নহে।

বিনয় মল্লিকও 'চোর' নয় শুনিয়া কিঞ্চিত নিরুদ্বেগ হন।—মানুষ ? কার দরকার পড়ল ওখানে ? পুবের কোঠাটা তুলব বলে ক-গাড়ি চুন সুরকি এনে ঢালিয়েছি উঠোনটায়—

—তাও চুরি যাবে ? তোমার যথাসর্বস্ব যে রকম চুরি যেতে বসেছে

আজকাল, আমাকেও না কোনদিন—লাবণ্যপ্রভা ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলেন।

—হয়েছে—ইয়ার্কি রাখ, কে গেছে ওবাড়ি?

—ছোট খুড়োর মেয়ে এসেছে যে—

বিনয় মল্লিক হঠাৎ যেন একটা হোঁচট খান, কথাটা বুঝিতে কিছু সময় লাগে।

—ছোট খুড়োর মেয়ে? কোন মেয়ে?

—কথার দশা দেখ, মেয়ে আবার ওঁর ক-গণ্ডা? মণি ঠাকুরঝি—মনোরমা—ভুলে গেছ না কি?

—ভুলব কেন? কিন্তু এতকাল পরে কি মতলবে?

—মতলব আবার কি? জন্মভূমি, বাপের ভিটে, আসতে নেই? ভাসুর মারা গেছেন, ভাসুরপোরা মানে না—চলে এসেছে এখানে বাস করবে বলে!

—বটে? খুব সাধু সঙ্কল্প, তা বাসটি করবেন কোথায় শুনি? কার বাড়িতে?

—কেন? ও বাড়িতেই করবে, তাতে তো তোমার বাড়ি ক্ষয়ে যাবে না। আমি বলেছি থাকতে।

বিনয় মল্লিক হঠাৎ যেন ক্ষেপিয়া ওঠেন, বড় কাজ করেছ, বাড়ি তোমাব 'ইয়ের' কিনা? আমায় একবার বলা কওয়া নেই—

—তোমাকে বলতে কইতে কাছারিবাড়ি ছুটব নাকি? চারটের গাড়িতে এসেছে। দুঘণ্টা আমার এখানে বসে, তোমার আর দেখা নেই। তেতেপুড়ে এসেছে, গা হাত ধোবে কাপড়চোপড় ছাড়বে—তারাপদকে দিয়ে লণ্ঠন আর চাবি দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম। মুখের ওপর তো আর বলতে পারি নে দেনার দায়ে তোমার বাপের ভিটেখানা আমরা নিলেম করে নিয়েছি। চোখের ওপর দু-খানা চামড়া আছে আমার।

'চোখের চামড়ার' উল্লেখটা প্রীতিকর ইঙ্গিত নহে—বিনয় মল্লিকের স্বর উচ্চ-গ্রামে চড়িতে থাকে—বলতেই বা হবে কেন? ন্যাকামি? "দেনার দায়ে বাড়ি বেচে খেয়েছি"—ছোট খুড়ো মেয়েকে এ খবরটুকু জানিয়ে মরতে পারে নি? উড়নচণ্ডে হতভাগা!

লাবণ্যপ্রভা বিরক্তি-গম্ভীর কণ্ঠে কহেন, মরা মানুষকে গাল দিও না বলছি, বাড়ি তো তিনি বেচে খান নি, তুমিই শাইলকের মতন সুদের সুদ কষে অন্যায় করে দখল করেছ। আমার আর জানতে কিছু বাকী নেই।

—হুঁঃ। বড্ড বাক্যি হয়েছে তোমার! রোস আগে পাপ বিদেয় করে আসি—তারপর তোমায় দেখে নেব। আবদার কত? দুদিন পাঁচদিন নয়—একেবারে

বাস করতে এসেছেন। এইবেলা উচ্ছেদ না করলে রক্ষে আছে? কথায় বলে উচ্ছের ঝাড়।

লাবণ্যপ্রভা ঘৃণায় মুখটা যথাসম্ভব কুদর্শন করিয়া বলিয়া ওঠেন—তবে আর দাঁড়িয়ে আছ কেন? যাও গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দাও গে? একাদশীর উপোস করে আধমরা হয়ে এসেছে, গায়ের জোর বেশি লাগবে না, চাইকি শত্রুর শেষ হয়ে যেতেও পারে। উঃ কি পিশাচই হয়ে গেছ! বলি রাঘব-বোয়ালের হাঁ নিয়ে অনেক বিধবার সম্পত্তি তো গ্রাস করেছ, এটা আর নাই করলে? স্বামী পুত্তরহীনা বিধবা—নানান জ্বালায় জ্বলে বেচারা দুদিন জুড়োতে এসেছে—তাকে তাড়িয়ে দিতে হবে? পুরুষের বীরত্ব কত! আপনার বোন না হোক—জ্ঞাতির মেয়ে তো বটে, দাদা বলে ডাকেও তো?

একাদশীর উল্লেখে বোধ করি বিনয় মল্লিক মনে মনে কিঞ্চিৎ নরম হইয়াছিলেন। তবে কিনা লাবণ্যপ্রভা যতই দজ্জাল মেয়ে হোক, বিনয় মল্লিকও সহজ ছেলে নয়, তাচ্ছিল্যের স্বরে বলেন—হ্যাঁ অমন জ্ঞাতি সবাই দেখেছে, সেই যে বলে না—'ধান সম্পর্কে পোয়াল মাসী।' ছোট খুড়ো মরল, তেরাত্তির অশৌচ হল আমাদের, বলি সেটা তো আর ভোল নি? এই তোমায় বলে রাখছি—আজ রাতটা পড়ে থাকে থাক, কাল সকালে এক ঘটি জল গিলে যেন আমার বাড়ি ছেড়ে দিয়ে বিদেয় হয়ে যায়। দখল করে বসলে কি আর ছাড়তে চাইবে? ও বড় সোজা মেয়ে নয়—

—কে সোজা মেয়ে নয় বিনয়দা, আমি?

সহসা বিদ্যুতাহতের মত ছিট্‌কাইয়া কয়েক হাত দূরে সরিয়া যান বিনয় মল্লিক উঠানটা অন্ধকার—বিধবার সাদা থানের ঈষৎ আভাস ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। নিঃশব্দে কখন দাঁড়াইয়াছে কে জানে? কি সর্বনাশ! কোন কোন কথাগুলা তাহার কর্ণগোচর হইয়াছে?

পা-দুইখানা টানিয়া লইয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়া ভিন্ন আর কোন চিন্তা করিবার শক্তি থাকে না।

মনোরমা ঈষৎ হাসিয়া বলে—বেশ মানুষ যা হোক, অসাক্ষাতে মিথ্যে অপবাদ কেন? কবে তোমার কোন জিনিস দখল পেয়ে ছাড়তে চাই নি শুনি? পালাচ্ছ যে—বলে যাও।

লাবণ্যপ্রভা সপ্রতিভভাবে বলেন—খুব যে তড়পাচ্ছিলে—'হ্যান্‌ করেঙ্গা' 'ত্যান্‌ করেঙ্গা—সামনাসামনি বলে যাও? তোমায় কি বলব ঠাকুরঝি, ঘেন্নায়

আমার যেন বিষ খেয়ে মরতে ইচ্ছে করে। 'পয়সা পয়সা' করে মানুষটার মনুষ্যত্ব বলে আর রইল না কিছু। চান টান করেছ তো ভাই? এমন পোড়াদিনে এলে—এক ফোঁটা জল—তাও মুখে দেবার জো নেই। তেতে পুড়ে এসে—

মনোরমা কথার মাঝখানে হাসিয়া ওঠে—সেই একেবারে বিদেয় কালে এক ঘটি জল গিলে যাব বৌদি, দুঃখু কোর না। সেটুকু অনুমতি আছে—

মা বসুন্ধরা বোধ করি পুরুষের আবেদনে কর্ণপাত করেন না। তাই একজোড়া কান সমেত আস্ত শরীরটা লইয়া চৌকীর উপর কাঠ হইয়া বসিয়া থাকিতে হয় একজনকে।

লাবণ্যপ্রভা একটা হ্যারিকেন আনিয়া দাওয়ায় বসাইয়া সস্নেহ অনুরোধ জানান—উঠে এস ঠাকুরঝি, বোস—

মনোরমা উঠিয়া আসে না, দাওয়ার একধারে পা ঝুলাইয়া বসিয়া পড়ে। বলে—এত কথা তো জানতাম না বৌদি, ধানের গোলা দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করাতে তোমার চাকরটা সব বললে। ভালই হয়েছে—বিনয়দার হাতে পড়ে বাড়িখানার তবু ছিরিছাঁদ ফিরবে। তবে বহুকাল পরে এসেছি পাড়ার সকলের সঙ্গে দেখাশুনা করবার বড় সাধ ছিল, আর মা চণ্ডীকে একবার দর্শন করা—তোমার এখানে যদি দুটো দিন থাকতে দাও বৌদি, মনের ইচ্ছেটা মেটে।

পরিহাস না সত্যই মিনতি? লাবণ্যপ্রভাও ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। তবু উত্তর দিতে হয়—ওমা, সেকি কথা! থাকবে বই কি, দুটো দিন কিসের? যতদিন ইচ্ছে 'গ্যাঁট' হয়ে বসে থাক তুমি। দেখি কে তোমায় নড়ায়? তোমার দাদারই নয় মতিচ্ছন্ন ধরেছে, আমার তো ধরে নি। কতদিন পরে দেশে আসা হল—

—হ্যাঁ, এই আঠারো বচ্ছর পরে। বাবা যতদিন কাশীবাস কচ্ছিলেন ততদিন আর কি। কতবার ভেবেছি আসব একবার, হয়ে ওঠে না। আমার কপালটাই বড় মন্দ বুঝলে বৌদি! বাবার অসুখ শুনে ছুটতে ছুটতে কাশী গেলাম, যাওয়া আসাই সার—শেষ দেখাটাও হল না। এখানে চলে এলাম ভাসুরপোদের ওপর তেজ করে—শেষ পর্যন্ত 'ধাষ্টমো'। যাচ্ছি তাহলে—শুয়ে পড়িগে, শরীরটা এইবার ছুটি চাইছে। এসেছিলাম বিনয়দার সঙ্গে দেখা করতে—তা তিনি তো আমায় দেখলেন—না ভূত দেখলেন। কই গো বিনয়দা, ঘর থেকে একবার বেরোও পায়ের ধুলোটা নিয়ে যাই? না কি দর্শনেও বঞ্চিত?

বিনয়দা না রাম না গঙ্গা কোনই উত্তর দিলেন না।

অবশেষে মনোরমা চলিয়া গেল।

লাবণ্যপ্রভা হাতের কাজ সারিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে কহিলেন—তোমার কি আক্কেল গা? মানুষটা 'দাদা দাদা' করে চৌদ্দবার ডাকল—দুটো কথা কইতে পারলে না? এত হিংসে দ্বেষ কিসের? কই কোথায়? য়ঁ্যা!

অন্ধকারে বিছানার মাঝখানে পড়িয়া থাকা বালিশটাকে কর্তা মনে করিয়া অযথা যে কথাগুলি ব্যয় করিয়াছিলেন তাহার জন্য হাসিয়া ওঠেন লাবণ্যপ্রভা।

অসময়ে আবার কোথায় গেল মানুষটা? নিশ্চয় প্রাণের বন্ধু ভূধর বিশ্বেসের বাড়ি, কুমতলবের গুরু যেটি। তারাপদকে পাঠাইয়া এখনি ডাকাইয়া আনা প্রয়োজন।

কিন্তু বিনয় মল্লিক বাড়িতেই ছিলেন, নিজের বাড়িতে উপরকার ছাদে। ঘরের ভিতর প্রাণটা কেমন হাঁফাইয়া আসিতেছিল; প্রচণ্ড গরম পড়িয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। রাশিকৃত জমাট অন্ধকারের মাঝখানে যে মৃদু আলোক শিখাটুকু দেখা যাইতেছিল অন্যমনস্কভাবে তাহারই পানে তাকাইয়া আলসের ধারে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

কিন্তু ছাদেও গরম, বাতাস যেন পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়াছে।...দক্ষিণের ঘরটায় শুইয়াছে মণি? কোথায়? জানলার নিচে মাথা রাখিয়া? বাতাস থাকিলে স্বচ্ছন্দে ঘুমাইতে পারিত, কিন্তু সারা পৃথিবীতেই যে গুমোট। হয়তো জাগিয়া আছে, বসিয়া আছে জানলায়, কতদিন পরে আসিয়াছে বাল্যকালের আশ্রয়ে! কত কথা ভাবিতেছে হয়তো। ঘরের আলোয় কি দূরের জিনিস চোখে পড়ে? এই ধর—বিনয় মল্লিক এখানে দাঁড়াইয়া আছেন? পাগল! এই তো মণিকে, ঘরে আলো থাকা সত্ত্বেও দেখা যাইতেছে কি?

দীর্ঘদিন পরে ওবাড়িতে আলো জ্বালিয়াছে। যদিও বড় মৃদু, তবু—আলো তো? স্তূপীকৃত মৃত্যুর মাঝখানে ক্ষীণ একটু জীবনের রেখার মত। কাল আর জ্বলিবে না, ভাঙ্গা বাড়িখানা জমাট অন্ধকারের পিণ্ডের মত এতদিন যেমন পড়িয়াছিল তেমনি পড়িয়া থাকিবে।

...এত অপমানের পর কে থাকিতে পারে? মণি তো নয়ই। কি অভিমানীই ছিল ছেলেবেলায়, আচ্ছা তাহাকে কি ভাবিল মণি? পাগল না পাষণ্ড? কিন্তু এতদূর পাষণ্ড মানুষে হয় না কি? নিজের কথাগুলা একবার মনে মনে উচ্চারণ করিতে গিয়া সমস্ত শরীর অবসন্ন হইয়া আসে, বিনয় মল্লিকের। সত্যই কি বলিয়াছিলেন না কি? মিথ্যা করিয়া—লাবণ্যকে চটাইবার জন্য নয়তো? মণি কি সব শুনিয়াছে?

…আচ্ছা এমনও তো হইতে পারে, সমস্ত ব্যাপারটাই সে পরিহাস মনে করিয়াছে। সেইটাই সম্ভব নয় কি? বিনয়দা মণিকে গলাধাক্কা দিয়া দূর করিয়া দিবে এটা কিছু আর বিশ্বাস করার কথা নয়…

তবে?

…তবে আর দুশ্চিন্তার কি আছে? এইটুকু শুধু বুঝাইয়া আসা মণিকে—ব্যাপারটা কিছুই নয়—শুধু পরিহাস।…কি আশ্চর্য, এতক্ষণ এই সহজ কথাটা মাথায় আসে নাই কেন?

…এখনই যাওয়া যায় না? কতই বা রাত? 'কই রে মণি'—বলিয়া একবার ডাক দিলেই তো সব গণ্ডগোল মিটিয়া যায়। ছেলেবেলাতেও কতদিন কত ঝগড়া হইত, 'কথা কহিব না' বলিয়া কালীর দিব্যি দিত মণি, আবার যাচিয়া আসিত—'দুটি পায়ে পড়ি' বলিয়া খোশামোদ করিত। আর হয় না? তেমন সহজভাবে?

…ছোট খুড়ো লোকটা কি বদমাইসই ছিল! মিছামিছি বদনাম দিয়া একদিন কি অপমানটাই না করিয়াছিল বিনয়কে, সহসা একটা অদ্ভুত হাসি ফুটিয়া উঠে বিনয় মল্লিকের মুখে। হাসিটা হয়তো অদ্ভুত নয়, অন্ধকারে অদ্ভুত মনে হয়।

…ছোট খুড়ো তাড়াইয়া দিয়াছিল, বাড়ি ঢুকিতে নিষেধ করিয়াছিল, তাই বিনয় মল্লিক শোধ লইল তাহার মেয়ের উপর দিয়া?

আচ্ছা, বাড়ির দলিলখানা ফিরাইয়া দিলে কেমন হয়? মণির জিনিস মণিরই আছে, চিরকাল থাকিবে এইটুকু বলিয়া! মণি খুশি হইবে তো? হওয়া তো উচিত, অন্ততঃ যতটা পাষণ্ড বিনয়দাকে মনে করিয়াছিল, ততটা নয় দেখিয়া?

…লাবণ্য?

…লাবণ্য আবার কি ভাবিতে পারে? সে নিজেই তো—

…দলিলখানা বাছিয়া বাহির করিয়া একবার শুধু রাস্তায় পা ফেলা, এক মিনিটের পথ বৈ তো নয়। কিন্তু মণি ঘুমাইয়া পড়ে নাই তো? অসম্ভব।…ঘুম আজকার রাতে আসিতে পারে? তাছাড়া ভারি গরম যে, এই তো বিনয়-ভূষণ, কবে আবার ছাদে বেড়াইতে আসেন? এত গরম কখনও হয় না কি? বাতাস যেন ভারী হইয়া বুকে চাপিয়া বসিতেছে।

অনেকদিনের কথা…আর একদিন বাতাস এই রকম ভারী হইয়া উঠিয়াছিল, দম আটকাইয়া যাইবার ভয়ে বিনয় মল্লিক একলা ছাদে উঠিয়া আসিয়াছিলেন মাঝরাত্রে।

…কি মাস এটা? আষাঢ়?

সেটাও আষাঢ় মাস ছিল—হ্যাঁ আষাঢ়ই তো, পরদিন মণির বিয়ে ছিল বাইশে আষাঢ়। স্পষ্ট মনে আছে—ও বাড়িতে আট চালার নিচে গ্যাসের আলো জ্বালিয়া ময়রারা ভিয়ান বসাইয়াছিল, আর বাতাসে ভাসিয়া আসা ঘিয়ের গন্ধ কি অরুচিকরই লাগিতেছিল। কি বিরক্তিকর লাগিতেছিল চারিদিকের নিস্তব্ধতার মাঝখানে ছোট খুড়োর হাঁকডাক চেঁচামেচি।

অনেকদিন আগের কথাও এক এক সময় স্পষ্ট মনে থাকে। বিয়ের পরদিন গাঁটছড়া বাঁধা বর-কণেকে লইয়া গাড়িখানা যখন চোখের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল কি অদ্ভুত একটা ইচ্ছাই জাগিয়াছিল, ঠিক ইচ্ছাও নয় একটা যন্ত্রণার মত। নিজের হাত-পাগুলা কামড়াইতে পারিলে যেন শান্তি হয়, নিজের মাথাটা পাথরে ছেঁচিলে আরাম হয় যেন।

অবশ্য কিছুই করা হয় নাই, আপনিই স্থির হইয়া গিয়াছিল সে যন্ত্রণা। সত্যি উনিশ বছর আগে তো আর পাগল ছিলেন না বিনয় মল্লিক! ইচ্ছা? অমন কত অদ্ভুত ইচ্ছাই তো মানুষের হয়।

মণি এখনও অমন ভাবে হাসে কেন? হাসিতে পারে কেমন করিয়া? মেয়েদের কি বয়স বাড়ে না?

হয়তো বাড়ে না, তাই দরজা খুলিবার পর আলোটা উঁচু করিয়া ধরিয়া মুখের উপর অমন হাসিয়া উঠিল মনোরমা।

—কি গো বিনয়দা, মন-কেমন করল বুঝি? না কি বৌকে লুকিয়ে?

কি সর্বনাশ! এখনও এই সুরে কথা কয় মণি? বরং ভাষাটা আরও স্পষ্ট, আরও তীক্ষ্ণ। কথা যেন অন্ধকারকে কাটিয়া কাটিয়া খান্ খান্ করিয়া ছড়াইয়া পড়ে।

—কি গো, কথা নেই কেন? এই দণ্ডে দূর করে দিতে এলে না কি? আর সবুর সইছে না? রাতটুকু পড়ে থাকবার কথা ছিল যে গো! দোহাই বিনয়দা এখন এক পাও নড়তে পারছি না, বড্ড ঘুম পেয়েছে।

খামকা এক অদ্ভুত কাজ করিয়া বসেন বিনয়ভূষণ, উঁচু করিয়া আলো-ধরা ডান হাতখানা মণির, অলঙ্কারহীন কৃশ হাতখানা, দুই হাতে চাপিয়া ধরেন।

—মণি!

মুহূর্তে স্তব্ধ হইয়া যায় মণি, স্তব্ধ আর শান্ত। আস্তে হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া স্নিগ্ধ গলায় বলে—বাড়ি যাও বিনয়দা, আজ তোমার মন ভাল নেই।

—যাব, তুই এটা নে।

—কি ও ? বাড়ির দলিল ! ও নিয়ে আমি কি করব ভাই ? কি দরকার আমার ?

—আছে রে আছে, দরকার না থাকে ছিঁড়ে ফেল—যা খুশি কর, শুধু আমায় একটু হাল্কা হতে দে—

—কিন্তু এর তো দরকার ছিল না বিনয়দা, কালকেই চলে যাব আমি, থাকলে কি চলে ? কত বড় সংসার আমার ঘাড়ে, মিছিমিছি বৌদিকে ঠাট্টা করেছিলাম। আর তোমার বাড়িতে থাকতেই যদি আসি কখনও, সত্যি কি তাড়িয়ে দিতে পারবে ?

—পারি—পারি—সব পারি আমি, আমার অসাধ্য কাজ নেই। শুনলি না তোর বৌদির কাছে ? এই নে ধর, তোর সম্পত্তি ঠকিয়ে খাবে, তোর বিনয়দা এত পাষণ্ড হয় নি এখনও। তোর জিনিস তোরই আছে, তোরই থাকবে—

অকস্মাৎ ছুটিয়া বাহির হইয়া যান বিনয় মল্লিক। আর বাইরের খোলা হাওয়ায় আসিয়াই মাথার রক্ত ঠাণ্ডা হইয়া আসে।

কি সর্বনাশ ! এ তিনি করিয়া বসিলেন কি ? ঘাড়ে ভূত চাপিয়াছিল না কি ? না নেশা করিয়াছিলেন ? নিজের উপর ধিক্কারে সর্বশরীর মোচড় দিতে থাকে, নিজের হাত-পাগুলা কামড়াইতে ইচ্ছা হয়, ইচ্ছা হয় মাথাটা পাথরে ঠুকিতে। অনেকটা যেমন মণির বিয়ের পরদিন বর-কনে বিদায়ের সময় হইয়াছিল।

জমি জায়গা সমেত সাত আট হাজারের কম হইবে না বাড়িখানা ! ভুলাইয়া আবার ফিরাইয়া লওয়ার কোন উপায়ই কি আর নাই ?

দেশত্যাগী

ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি—অনাদিমামা বিলেত যাবেন।

অনাদিমামা আমার মার কাকার ছেলে। আমার দাদামশাইয়ের সঙ্গে বাড়ি এক হলেও হাঁড়ি আলাদা। ওঁদের অবস্থা না কি এঁদের থেকে অনেক ভাল। দিদিমার মুখে প্রায়ই শুনতাম—"ওদের কথা বাদ দাও, ওরা বড়লোক মানুষ—"

ছেলেবেলার কথাই বলছি—গ্রামে থাকতাম, আমাদের দৃষ্টির আলোকপাতে তখন কলকাতাবাসী মাত্রেই 'বড়লোক'। নয় কেন ? সভ্যতার সমস্ত সুবিধে—

এক কথায় পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্যই তো তাদের হাতের মুঠোয়।

দৈবে-সৈবে দাদামশাইয়ের মুখে আর্থিক অনটনের মত কোন মন্তব্য শুনলে হাসি পেত, সেটা যে বৃদ্ধজন-সুলভ কৃপণতা, সে বিষয়ে আর সংশয় থাকত না। কেনই বা থাকবে? দেখতাম তো মামাতো ভাইদের, যারা আমাদেরই সমসাময়িক। আমাদের কাছে যা একান্ত দুর্লভ, তাদের কাছে তা নিতান্তই অবহেলার বস্তু।

স্কুল-জীবনে একখানি বাঁধানো একসারসাইজ বুক ছিল স্বপ্ন, ওরা বাঁধানো খাতায় ভিন্ন লিখত না। লিখত—পাতা ছিঁড়ত—সাদা পাতা সুদ্ধ ফেলে দিত—দেখে 'গা ডোল্' হয়ে উঠত আমাদের।

ফাউন্টেন পেন? তার তো স্বপ্ন দেখবারও সাহস ছিল না। আর ওদের প্রত্যেকের এক একটা ফাউন্টেন পেন! শুধু মামাতো ভাইদেরই নয়—বোনেদেরও। ক্লিপ-আঁটা ছোট্ট ছোট্ট পেন ব্লাউসের গলায় আটকে ইস্কুল যেতেন রাণীদি আর কল্যাণীদি।

মিথ্যে বলব না—মামাতো ভাই-বোনেরা ছিল আমাদের রীতিমত ঈর্ষার পাত্র। বিপরীত ধর্মে আমরাও অবশ্যই তাদের চোখে কৃপার পাত্র ছিলাম। কিন্তু সেটা কিছু কিছু অনুধাবন করতে পারলেও লোভ সামলাতে পারতাম না। মামার বাড়ি যাবার নাম হলেই, চার হাত-পা তুলে নাচতে ইচ্ছে হত।

'কমলে কণ্টক' তো আছেই। দুনিয়ার নিয়ম!

মামাতো ভাই-বোনেদের সেই কৃপা-কটাক্ষ-বিমিশ্রিত হাস্য-কণ্টকটুকু চোখ-কান বুজে হজম করে ফেলতে পারলে বাকিটা তো সবই 'কমল'? সত্যি তারাই কিছু আর বাড়ির মালিক নয়!

দিদিমার প্রশ্রয়, সেজ মাসীর আমাদের উপর পক্ষপাতদুষ্ট স্নেহ, দাদামশাইয়ের সরস আলাপ-আলোচনা—এগুলোরও তো মূল্য আছে। মামা-মামীদের বাহ্যিক ব্যবহারটাও বিশেষ নিন্দনীয় ছিল না।

সকলের ওপর কলকাতারূপী স্বর্গের প্রলোভন!

অতএব মামার বাড়ির নামে নাচতে ইচ্ছে করাটা বোধ করি একেবারে অমার্জনীয় নয়?

মামার বাড়ি গেলেই—অনাদিমামার গুণকীর্তন শুনতাম।

শুনতাম—হীরের টুকরো ছেলে। বংশে না কি এমন ছেলে আর জন্মায় নি। এ হেন ধারালো ছেলে বাংলা দেশে আছে কি না সন্দেহ।

এমন ছেলে বিলেত যাবে না তো যাবে কে ?

এ সব যাদের মুখে শুনতাম—তাদের ধারণায়—এবং বলা বাহুল্য, তখন আমাদেরও ধারণায়—'বহির্ভারত' মাত্রেই বিলেত।—জাহাজে চড়ে যেতে হলেই, গন্তব্যস্থল বিলেত ছাড়া আবার কি হবে ?

এই রকম ধারণার বশবর্তী হয়েই একদিন কি যেন একটা কথা বলেছিলাম—ভবিষ্যতে বিলাতগামী অনাদিমামাকে। বোধ হয় অনাদিমামা তখন সবে কলেজে ঢুকেছেন, প্রবেশিকা পরীক্ষার জলপানি পাওয়ার গৌরবের সৌরভ তখনও মিলোয় নি। খুবই সন্তর্পণে দুঃসাহসের পাথায় ভর করে তাঁর কাছ পর্যন্ত পৌঁছেছিলাম, কিন্তু ব্যবহারটা ভালই পেলাম।

আমি যেতেই বেশ সস্নেহ সুরেই বললেন—কে, নিতাই না ? কমলাদির ছেলে ? আরে এতবড় হয়ে গেছিস তুই ? এবারে অনেকদিন পরে এলি, তাই না ? আয় বোস। পড়া-টড়া কি কচ্ছিস ?

কৃতার্থ হয়ে গেলাম।

কারণ আমার নিজস্ব মামারা সকলেই স্ত্রী-পুত্র-পরিবৃত। তাঁদের আমরা, এবং আমাদের তাঁরা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলবারই চেষ্টা করি। মামাতো ভাই-বোনেদের কথা তো আগেই বলেছি।

দিদিমা মাসীমার স্নেহ-সুধা যে পরিমাণে উদরকে পরিতৃপ্ত করতে পারে—সে পরিমাণে হৃদয়কে নয়।

সত্যিই এবারে অনেকদিন পরে এসেছি ! তাও আবার গতবারে যখন এসেছিলাম পূজোর ছুটিতে, ছোট দাদামশাই সপরিবারে গিয়েছিলেন 'পশ্চিমে'। প্রায় অপরিচিত লাগছিল সদ্য তরুণ অনাদিমামাকে।

অপরিচিতের আকর্ষণ বেশি।

ওঁর ঘর থেকে আর নড়তে চাইছি না। তার ওপর বললে—কেউ বিশ্বাস করবে কি না জানি না, অনাদিমামা আমাকে একটা ফাউণ্টেন পেন উপহার দিয়ে বসলেন। হাত দিতে সাহস পাই না—ভয়ে ভয়ে বলি—দিয়ে দিলে আপনার কি করে চলবে ?

হেসে উঠলেন অনাদিমামা—বাবা, খুব যে এটিকেট-দুরস্ত ছেলে দেখছি, 'আপনি' 'আজ্ঞে' !···ও কমলাদি গেলে কোথায় ? শোন তোমার ছেলের সভ্যতা ? ···নে নে। আমার আরও অনেক কলম আছে, ওটা ছেলেবেলার।

একটা কলম থাকাই যথেষ্ট, কি না 'অনেক কলম'!

অনাদিমামাদের 'বড়লোকত্ব' সম্বন্ধে আর লেশমাত্র সংশয় থাকে না।

তবু হঠাৎ কেমন ভাব জমে গেল। অনাদিমামা এক ফাঁকে মাকে ডেকে বললেন—কমলাদি তোমার এই ছেলেটি খুব বুদ্ধিমান তো! রেখে যাও না একে কলকাতায়! ওখানে তোমাদের তো সেই বাজে ইস্কুল? বুদ্ধি-সুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যাবে।

মা যা উত্তর দিয়াছিলেন, সেটা অবশ্য আশাপ্রদ নয়, তবু প্রস্তাব-কর্তার মহত্ত্বে বিগলিত না হয়ে পারলাম না।

এবং সেই বিগলিত হৃদয়ের ভারে বিচলিত আমি, এলোমেলো কি সব কথা বলতে বলতে এক সময় বোধ হয় মন্তব্য করেছিলাম—আপনার কথা বাদ দিন, আপনি তো এখানে পড়ে থাকবেন না! বিলেত যাবেন!

অনাদিমামা মৃদু হেসে বললেন—বিলেত যাব—তোকে কে বললে?

বললাম—সব্বাই বলে।

অনাদিমামা তাচ্ছিল্য-ভরে বললেন—দূর, বিলেত যাব কি দুঃখে? মানুষে কখনও ইচ্ছে করে বিলেত যায়?

ঠাট্টা ভেবে হাসছি, আবার বললেন—বিলেতটা হল—শয়তানের দেশ বুঝলি? ওখানে কেন যাব—আমি যাব রাশিয়ায়!

বলা বাহুল্য, পূর্ব-ধারণা অনুযায়ী বেশ বিজ্ঞ ভাবেই বলেছিলাম—ও একই কথা!

—একই কথা? সে কি রে? এটা তো বেশ বুদ্ধিমানের মত কথা হল না। ম্যাপ দেখিস নি? পৃথিবীর ম্যাপ? না কি ও-সব বালাই নেই তোদের ইস্কুলে? ভূগোল পড়ায় না?

আত্মসম্মানে আঘাত লাগল, উত্তেজিত ভাবে বললাম—কেন পড়াবে না? পৃথিবীর তিন ভাগ জল ও এক ভাগ স্থল, স্থল ভাগ পাঁচটি মহাদেশে বিভক্ত, যথা—

মনে আছে অনাদিমামা মহোৎসাহে আমার পিঠ ঠুকে দিয়ে বলেছিলেন—ব্যস্ ব্যস্, তবে তো সবই জানিস!

লজ্জিত হয়ে চুপ করে গেলাম।

অনাদিমামা একবার গম্ভীর ভাবে বললেন—শোন, বিলেত হচ্ছে ইংরেজের দেশ। যারা আমাদের দেশে এসে আমাদেরই চাকর করে রেখে দিয়েছে। আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করে কুকুরের মত। গরীবকে ওরা মানুষ ভাবে না, অথচ

আমাদের রক্ত শুষে শুষে ভিখিরীর অধম করে রেখেছে ওরাই। যাক ওসব কথা, তুই এখন বুঝবি না, আর একটু বড় হ, বুঝিয়ে দেব।

সসঙ্কোচে বলি—তাহলে রাশিয়ার লোকেরা সাহেব নয়?

—সাহেব? অনাদিমামা হাসতে থাকেন,—ফর্সা হলেই যদি সাহেব হয়, তাহলে সাহেব। কিন্তু তা নয়, রাশিয়ার লোক রাশিয়ান।

—তারা খুব ভাল, না?

—লোক ভাল-মন্দ জানি না, তবে তাদের আইন-কানুন ভাল, বুঝলি? ওদের দেশে গরীব-বড়লোক তফাৎ নেই, সবাই সমান। মুটে-মজুর থেকে জজ-ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত সব এক।

অবিশ্বাসের কথা কিছু বলি নি বটে, তবে—মুখে তার ছায়া পড়েছিল বোধ হয়। তাই আবার বললেন—বিশ্বাস হচ্ছে না? কিন্তু—নাঃ, সে সব অনেক বড় বড় শক্ত শক্ত কথা, এখন কি করে বোঝাই তোকে? তবে দেখিস, এই হতচ্ছাড়া দেশে আমি থাকছি না। আর একটু বড় হতে দে। সোজা—রাশিয়ায়।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। তখনি যেন বিরহবেদনা তীব্র হয়ে উঠল।

ছেলেবেলায় হঠাৎ কাউকে বেশি-রকম ভাল লেগে লেগে মনের অবস্থা কি রকম অভিভূত থাকে, সেটা অল্প-বিস্তর সকলেই জানেন। সেই অভিভূত অবস্থায় বলে ফেললাম—আমাকে নিয়ে যাবেন অনাদিমামা?

—তোকে?—হো-হো করে হেসে উঠলেন—বেশ তো, মামা-ভাগ্নে দুজনে যাওয়া যাবে।...তার আগে না হয় চল চিড়িয়াখানা দেখিয়ে নিয়ে আসি। যাবি?

এত বড় সৌভাগ্য-গর্বে কথা জোগাল না মুখে। ছেলেমানুষ হলেও বুঝলাম, আমাকেও তাঁর ভাল লেগেছে।

—যাবি তো—জিগ্যেস করে আয় কমলাদিকে।

ভয়ে-ভয়ে বললাম—সতু যদি যেতে চায়?

সতু আমার ছোট ভাই, অর্থাৎ আমার যাবতীয় ব্যাপারের অংশীদার। এবং সে যে আমার অংশীদার, সে সম্বন্ধে নিজে সে যথেষ্ট সচেতন।

অনাদিমামা এক ফুৎকারে ভয়কে উড়িয়ে দিলেন—দূর, ও যাবে কি? বেশি হাঁটতে পারবে না। তুই যা, একটা ফর্সা জামা পরে আয়।

প্রত্যেকটি বিষয় এত পুঙ্খানুপুঙ্খ মনে থাকবার কারণ বোধ করি আমার সেটা জীবনের প্রথম স্মরণীয় দিন বলে। বিশেষ করে আলাদা করে আমাকে কেউ কখনও আদর করে নি এর আগে।

ফর্সা জামা পরে চিড়িয়াখানায় গেলাম।

বস্তুতঃ অনাদিমামাও তখন প্রায় বালকই, কিন্তু তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধির ওপর এতই আস্থা সকলের যে, তাঁর সঙ্গে আর একটি আরও বালককে ছেড়ে দিতে আপত্তি করে নি কেউ। যে আপত্তি সর্বদাই উঠত অভিভাবক মহল থেকে। তাঁদের ধারণা—পথে-ঘাটে ওৎ পেতে বসে আছে 'জুজু'।

সেদিন বেড়ানোর ফাঁকে-ফাঁকে আমার অবোধ্য অনেক কথাই আমার অনিচ্ছুক কর্ণকুহরে ঢেলেছিলেন অনাদিমামা। কিছুই তার হৃদয়ঙ্গম করি নি, শুধু দুটি শব্দ মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে পেরেছিল সে হচ্ছে 'বল্‌শেভিক' আর 'লেনিন'। বোধ করি ও শব্দ দুটো বার বার শ্রবণেন্দ্রিয়কে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে মগজের কোটরে ঢুকে তবে ছেড়েছিল।

এখন বুঝি, বোঝাবার ক্ষমতা অনাদিমামারও তখন ছিল না। কতকগুলো ভারী-ভারী কথা শিখে ফেলে তার ভার সামলাতে পারছিলেন না বলেই, স্থান-কাল-পাত্রের মাত্রা-জ্ঞান হারিয়ে এই উচ্ছ্বসিত প্রকাশ।

আমার কিন্তু অত বিদ্বান অনাদিমামার বোকামীর জন্যে বেশ দুঃখ হয়েছিল।

যে কলকাতাকে দুচোখ দিয়ে গিলে খেলেও আশ মেটে না, সেখানের লোক কোন দুঃখে 'রাশিয়া' নামক একটা অজানা-অচেনা জায়গায় যেতে চাইবে, বোঝা দায় নয়? চাইলে—সেটা বোকামীই ধরে নিতে হবে।

'বিলেত' যাওয়ার মধ্যে তবু একটা সর্বজনমান্য স্বীকৃতি আছে, 'রাশিয়া' আবার কি? ছিঃ! জন্মেও শুনি নি কেউ রাশিয়া গিয়েছে।

তার পরে অবশ্য যথেষ্ট বুদ্ধিমানের মত ব্যবহার পেয়েছিলাম অনাদিমামার কাছ থেকে। চা চানাচুর, আইসক্রীম সন্দেশ, কি নয়?

এর পরে আমার কাজই হল অনাদিমামার ঘরে যখন-তখন হানা দেওয়া।

খাতা, পেন্সিল, রবার, পেন্সিল-কাটা কল, মার্বেল পেপার, জলছবি প্রভৃতি দুর্লভ বস্তুতে ভাঁড়ার ভরে উঠতে লাগল আমার। এগুলো যে কেবল মাত্র আমারই, সতুর কোন ন্যায্য দাবী নেই এদের ওপর, দয়া-ধর্মের বশে সামান্য কিছু ভাগ যদি দিই, সে আমার মহান উদারতারই পরিচায়ক—এ মনে করলেই পুলক-রোমাঞ্চ হত। সযত্নে লুকিয়ে রাখতাম জিনিসগুলি।

মামাতো ভাই-বোনদের দেখিয়েছিলাম প্রথম প্রথম, কিন্তু তারা যখন আমাকে হ্যাব্‌লা আখ্যা দিল তখন গোপনীয়তার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় কি? তা

হোক, লুকোন সম্পত্তিরও একটা মোহ আছে। সেই—সকলের অলক্ষ্যে একবার দেখে নেওয়া, মনে মনে হিসেব রাখা, অনেক দিব্যি-দিলেশার ফলে সতুকে একবার শুধু স্পর্শসুখ অনুভব করতে দেওয়া, এ সব মনে করলে এখনও বেশ ভাল লাগে।

তবে ওই—আগে যা বলেছি। 'কমলে কণ্টক' আছেই।

এই সব ভাল ভাল উপহার আমার উৎসুক হাতে গুঁজে দেবার ফাঁকে ফাঁকে, অনাদিমামা আমার অনিচ্ছুক মগজে যে সব বড়-বড় আর শক্ত শক্ত কথা গুঁজে দেবার চেষ্টা করতেন, সেইগুলো যদি না থাকত!

তবু কমলের লোভে কণ্টকের জ্বালা সয়ে যেত বৈ কি। অনিচ্ছুক মগজ হলেও—ঢুকেও যেত কিছুটা।

আমাদের দেশটা যে একটা হতচ্ছাড়া দেশ, এর যে কোনও কালেই উন্নতির আশা নেই—দেশের লোক সরকারের গোলামী করাকেই পরম পুরুষার্থ মনে করে, তাদের যে উচ্ছন্ন যাওয়াই উচিত—গলায় দিতে যাদের দড়ি জোটে না তারাই যায় চাকরগিরি করতে—এ সমস্ত ভাল ভাল কথা সবই শিখে ফেলেছিলাম অনাদি-মামার কাছে।

আর শিখেছিলাম রাশিয়া সম্বন্ধে নানা তথ্য।

সব কিছু আলোচনার শেষে উপসংহার করতেন প্রায়ই এই ভাষায়—রোস্ না আর কটা বছর যেতে দে, দেখবি—পাততাড়ি গুটিয়ে সোজা চলে গেছি রাশিয়া। এ দেশে আবার ভদ্রলোকে থাকে!

কয়েকদিন পরে—গরমের ছুটি এবং স্বর্গসুখ দুইয়েরই ইতি হল। করুণ নয়নে কলকাতার দিকে তাকাতে তাকাতে শেয়ালদা স্টেশন ত্যাগ করলাম। বাবা নিতে এসেছিলেন, বাবাকে খুব অবিবেচক মনে হতে লাগল।

তারপর—বহু দিনব্যাপী একঘেয়ে জীবন যাত্রা।

নানা পাকচক্রে প্রবেশিকা পরীক্ষার আগে পর্যন্ত আমার আর কলকাতা যাওয়া হয়ে উঠল না। মা পর পর দুবার গেলেন রাণীদি আর কল্যাণীদির বিয়ের নেমন্তন্নে, আমি আর সতু পড়ে থাকলাম।

স্কুল কামাই করে নেমন্তন্ন যাওয়া বাবার নীতিশাস্ত্রের বাইরে।

আজীবন স্কুল-মাষ্টারী করে করেই যে বাবার এ রকম হৃদয়হীন স্বভাব হয়ে গেছে, এ বিষয়ে মা, সতু, আমি—তিন জনে একমত হলেও উপায় কিছুই হল না।

পাহাড় টলানো যায় তো—টলানো যায় না বাবাকে।

পরীক্ষার পর বললাম—যাই কিছু দিন কলকাতায় ঘুরে আসি।

মা সাগ্রহে মত দিলেন।

বাবা অনাগ্রহে হলেও—দিলেন, বোধ হয় না দেবার যুক্তির অভাবে।

এত দীর্ঘ দিনে অবশ্য চিত্তাকাশ থেকে অনাদিমামার রং ফিকে হয়ে এসেছিল। তবু কথায় কথায় একদিন প্রশ্ন করলাম মাকে। মা বললেন—কল্যাণীর বিয়ের সময় তো শুনে এলাম—দুরকমে না কি এম. এ. পাশ করে এখন বসে আছে। ইংরেজি খবরের কাগজের লেখা লেখে। চাকরী করবে না নাকি। এত বিদ্যে শিখে কি যে হল!

গেলাম কলকাতায়।

তখন 'নন্‌-কো-অপারেশনের' ভরা যৌবন। বহু ছেলে ভেসে যাচ্ছে সে জল-তরঙ্গে।

ভেবেছিলাম অনাদিমামাও বোধ হয় আছেন ওই দলে।

দেখা হতে—দেখলাম—তা নয়!

আমাকে দেখে খুব খুশী হলেন। জলছবির প্রলোভন না দেখালেও যথেষ্ট আপ্যায়িত করে বসালেন। তার পরই শুরু হয়ে গেল স্বরাজ লাভের আলোচনা। এখন অবশ্য আমাকে সাবালক ধরে নিয়েই কথা চালান।

অনাদিমামার ভাষার ভঙ্গী একেবারে চাঁচা-ছোলা পরিষ্কার।···দূর দূর, কেঁদে-কেটে পায়ে ধরে আবার স্বরাজ হবে! রাবিশ। বিপ্লব চাই—বিপ্লব! এ এ হতচ্ছাড়া আপিঙ-খেগো দেশের লোকের দ্বারা সে হবেও না, তার কথাও নেই। স্বরাজের নামে ওই কাঁচকলাই খাক সব বসে বসে। দেখ না—এ দেশে আর নয় —এবার নিশ্চিত রাশিয়া।

বললাম—তা তুমি এখনও যাচ্ছ না কেন অনাদিমামা? টাকার তো অভাব নেই ছোট দাদুর?

এখন আর নিজেকে নেহাৎ নিম্নস্তরের জীব মনে হয় না বলেই হয়তো 'তুমি' সম্বোধনটা মুখে এসে গেল!

—টাকা? টাকার জন্যে থোড়াই কেয়ার করি, ইচ্ছে থাকলে টাকার অভাবে কোন কাজ আটকায় না। মুস্কিল হচ্ছে বাবাকে নিয়ে। হার্টের অসুখটা বেজায় বেড়ে গেছে।

ভেবে দেখলাম—সমস্যাই বটে। এবারে আবার দেখছি—মামাদের আর

এঁদের উভয় অংশের মাঝখানে বিরাট এক পাঁচিল। এ ব্যবধানের সৃষ্টিকর্তা নিশ্চিত আমারই মামারা।

কার ভরসায় অসুস্থ বাপ আর ভাল মানুষ মা-টিকে রেখে যাবেন ?

আলোচনা জমে উঠল !

'ধনতন্ত্র' 'গণতন্ত্র' 'সাম্যবাদ' ইত্যাদি গালভরা কথার ভারে আবহাওয়া বেশ ভারিক্কি হয়ে উঠল। "কমরেড্ডি"র দেশে রাশিয়া ভিন্ন ভদ্রলোকের উপযুক্ত বাসস্থান যে দ্বিতীয় নেই, এ বিষয়ে ভাল করে অবহিত হলাম এবার।

কথায় কথায় বলেন—তারপর, এবার করবি কি ?

মহোৎসাহে বলি—কেষ্টনগরে পিসিমার বাড়ি থেকে আই-এ পড়ব ঠিক হয়েছে !

উৎসাহে স্নিগ্ধ বারি সিঞ্চন করে নাক সিঁটকে উঠলেন অনাদিমামা—তার পর ? তার পর—বি. এ. তারপর একটি সরকারী চাকরী, অবশেষে—বিয়ে-থাওয়া, ঘর-সংসার, এই তো ? রাবিশ !

ভয়ে ভয়ে বললাম—চাকরীই যদি না করব—পাশ করার দরকার ?

—দূর দূর, সেই স্লেভ্ মেণ্টালিটি ! কেন চাকরী ছাড়া আর কিছু করবার নেই জগতে ? মুটেগিরি কর না, তাও ভাল।

শুনতে ভাল হলেও, নিজের মাথায় একটি দুমণ ওজনের বস্তা কল্পনা করে বেশ ভাল মনে হল না, কিন্তু সে কথা প্রকাশ করা চলে না, কাজেই চুপ করে গেলাম।

কদিন পরেই চলে এলাম বাড়ি, তার পরে কৃষ্ণনগরে।

এক দিন মার চিঠিতে জানলাম—ছোট দাদু মারা গেছেন, আর ছোট দিদি-মাকে দিয়ে গেছেন হার্টের অসুখটা। অনাদিমামা বিয়ে করতে চান না বলে অনেক নিন্দে করেছেন মা, আর চাকরী করে না বলে ঘেন্না দিয়েছেন।...

কিছু দিন পরে আবার শুনলাম—"অনাদির এত দিনে সুমতি হয়েছে, মানুষের মত চাকরী বাকরী করছে। ভাল চাকরী পেয়েছে।"

মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল।

আমরা বাজেমার্কারা না হয় পাশ করব—চাকরী করব লাইন-বাঁধা রাস্তা ধরে গুটি-গুটি চলতে চলতে, কোন এক দিন ফুরিয়ে যাব।—

কিন্তু অনাদিমামা !

নাঃ, মনটা সায় দিচ্ছে না।

জলের মত দিন যাচ্ছে…দেশের হাওয়া মুহুর্মুহু বদলাচ্ছে। স্বরাজের রঙীন অকাশ-কুসুম সামনে ঝুলিয়ে ধরে, জাতির জনক জাতিকে নাগরদোলায় চড়িয়ে চরকিপাক্ খাওয়াচ্ছেন।

কেউ ভাসল, কেউ ডুবল, কেউ কোথায় ছিটকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। যারা ভাল, যারা মহৎ, যারা ভাবুক, তাদের ভাগ্যে মহত্তের স্বর্গ।

কিন্তু আমাদের মত বাজে রাবিশের দল দেশের এত ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপাতের মধ্যে থেকেও দিব্যি পাশ কাটিয়ে গা বাঁচিয়ে খুঁজে নিই নিজের নিজের স্বর্গ।

বলা বাহুল্য, একটি বিলিতি বেনের দোকানে একটু হৃষ্টপুষ্ট মাইনের চাকরী জোগাড় করতে পেরে, লজ্জিত তো হইই-নি, বরং রীতিমত পুলকিতই হয়েছিলাম।

পৃথিবীর নিয়মে পৃথিবী চলছে—জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের অলঙ্ঘ্য চক্রে।…ছেলেবেলায় যাদের দেখেছি তাদের কেউ মরল, কেউ বুড়ো হল, কেউ-কেউ দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়ল…পরিবর্তন চলেইছে।…

এক সময় যারা ছিল নিকটতম আত্মীয়, তাদের শাখা-প্রশাখাকে দেখলে হয়তো এখন আর চিনতেই পারি নে।

কলকাতাতেই থাকি, তবু বছরে একবার বিজয়া দশমীর দিন ছাড়া মামার বাড়ি যাওয়া আর হয়ে ওঠে না। যাবই বা কার কাছে? পুরনো সবই প্রায় নিশ্চিহ্ন, এখন সব নতুনের দল! পুরনোর মধ্যে ছোট মামা, আর সেজ মাসীই যা টিঁকে আছেন। বছরে একবার আধ ঘণ্টার জন্যে গেলেও তার মধ্যেই শুরু করে দেন সারা সংসারের বিরুদ্ধে নালিশ! কেউ মানে না, কেউ দেখতে পারে না, অসুখ করলে গ্রাহ্য করে না। অথচ এই সেজ মাসীর ভয়েই থরহরি-কম্প ছিল সবাই!

আর 'ও-বাড়ি'তে আছেন অনাদিমামা!

ছোট দিদিমাও গত হয়েছেন। অবিবাহিত ছেলের ভাবনায় বোধ করি মরেও সুখ হয় নি ভদ্রমহিলার, কিন্তু ছেলের ছিল ভীষ্মের পণ! অনাদিমামার মতে জগতে যদি কিছু ওঁচা কাজ থাকে তো সে হচ্ছে বিয়ে!

এখন আছেন, একলা অনাদিমামা—আর পুরনো একটা চাকর। রান্নার কাজটাও বোধ হয় সে-ই চালায়।…

বছরে এক বার দেখা হয়, হয়তো তাও হয় না। বছরের পর বছর কাটে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখনও লাগে নি। লাগব লাগব করছে; হঠাৎ এক দিন কি একটা ছুটিতে খেয়াল হল—গেলাম মামার বাড়ি।…এখনকার মামার বাড়িতে আধ ঘণ্টার বেশি টেঁকা যায় না, দু-চার কথার পর বললাম—যাই 'ও-বাড়ি' ঘুরে আসি।

মাঝখানের পাঁচিলটায় যে দোর ছিল একটা, সেটা বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে, সদর দিয়ে ঘুরে যেতে হল।

দেখি ছুটির দুপুরে 'ফাইলের' পাহাড় নিয়ে বসে আছেন অনাদিমামা।

—এ কি অমাদিমামা, কি ব্যাপার!

অনাদিমামা কোন রকমে মাদুরে আমার জন্যে একটু জায়গা করে দিয়ে সমাদর করে বসালেন।

আবার বললাম—ছুটির দিনে এ জঞ্জাল কেন মামা?

আমরা বেনের দোকানের কেরাণী হলেও, ছুটিটার ঘাড়ে ফাইলের বোঝা চাপাবার দুর্যোগ কখনও ঘটে না। তাই অসহ্য মনে হল।

অনাদিমামা নির্বিকার!

অম্লান হাস্যে বলেন—আর বলিস কেন! কেউ কিছু করে না, সমস্ত কাজ পড়ে থাকে। ফাঁকি দেওয়া রোগ প্রত্যেকটা লোকের!

হেসে বললাম—দেখছি তো এক জন বাদে।

—ও হো হো। তা য়্যা বলেছিস। আমিই অফিসের যত জঞ্জাল সাফ্ করে মরি।

—মর কেন? তুমিও ফাঁকি দিলে পার। সরকার তো তোমার শত্রু! ওদের কাজ নিখুঁত ভাবে করবে কেন?

—দূর পাগল! আমার একটা দায়িত্ব আছে তো?

এটা-ওটা কথার শেষে বলি—কই অনাদিমামা, শেষ অবধি সেই—গোলামী করতে করতেই বুড়িয়ে গেলে—তোমার রাশিয়ার কি হল?

একটু ভোঁতা হাসি হাসলেন অনাদিমামা—যাব যাব, দেখ না! এদিকটা একটু গুছিয়ে নিই।

—যাচ্ছ তো আজীবন—আমি হেসে উঠি—এখন আর বাধাটা কিসের? টাকার তো অভাব নেই, চাকরীকে 'ডোণ্ট-কেয়ার' করে চলে যাও না?

—না, টাকার অভাব নেই! কি ভাবিস্ তোরা? কল্যাণী বিধবা হয়েছে, শ্বশুরবাড়ির অবস্থা খারাপ—

কল্যাণী আমারই বড় মামার মেয়ে।

বললাম—তাতে তোমার কি দায়? ছোট মামা রয়েছেন!

—থাকলেই সব হল? খোঁজই নেয় না ছোড়দা!

'দায়' যে নিজের নয়, সেটা স্বীকার করলেন না।

—তুমি কিন্তু রোগা হয়ে গেছ অনাদিমামা!

—গেছি না কি? অপরাধই বা কি? যা আমার হরিদাস বাবুর রান্না! দেখ না ঘর বাড়ির চেহারা!

তাকিয়ে দেখলাম চারিদিকে।

সত্যি কী শ্রীহীন ঘর-সংসার। ছোট দিদিমার হাতের ছাপ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, সর্বত্র স্পষ্ট প্রকট হয়ে উঠেছে—হরিদাসের হাতের স্থূল প্রলেপ!

অথচ আছে তো সবই। খাট-পালঙ্ক, আলনা আলমারী, টেবিল-চেয়ার! শৌখিন ব্যক্তি ছিলেন ছোট দাদামশাই।

অনাদিমামার চেহারাও কেমন যেন জোলো জোলো। সে দীপ্ত শ্রী নেই। মুখে নেই সেই দৃপ্ত ভাষণ! যা একদা আকৃষ্ট করেছিল অনভিজ্ঞ একটি শিশু-হৃদয়কে!

অথচ এ-বাড়ি এসে শুনলাম—অনাদিমামার না কি যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। সম্প্রতি অফিসার হয়েছেন।

অতঃপর বাধল যুদ্ধ।

তোলপাড় হল পৃথিবী। ঘুঁটেকুড়ুনি রাজরাণী হলো, রাজরাণী ঘুঁটেকুড়ুনি। ভাগ্যের নাগরদোলায় চড়ে মুহুর্মুহু চরকি-পাক খেতে লাগল লোকে। যাক, সে তত্ত্ব জানে সবাই। বিশদ আর কি বলব?

মোট কথা—বিলিতি বেনের দোকানের চাকরীটা ছাড়লাম। চাকরীহীন—আমি স্রোতের শেওলার মত এখান-ওখান ভাসতে ভাসতে হঠাৎ একদিন কূল পেলাম।

পরের ইতিহাস জটিল।

এক কথায়—একদিন নতুন-কেনা মোটর গাড়ি চড়ে দৈবাৎ গেলাম মামার বাড়ি বেড়াতে!

প্রথমেই মামার বাড়ি যাবার ইচ্ছে হল কেন কে জানে!

বাঁধানো-খাতা আর ফাউন্টেন পেনের প্রতিক্রিয়া?

হয়তো তাই।

গাড়ি দেখে সেজমাসী কেঁদে ফেললেন। খেদ করলেন আমার মার নাম করে।...ছোটমামা গাড়ি সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই করলেন না।...নীরেনদা ঠোঁট উল্টে বললে—খুব ব্ল্যাকমার্কেটিং চালাচ্ছিস—কেমন? কিসের? চালের? চিনির? না ওষুধের?

কল্যাণীদি ছিলেন, বললেন—গরীব দিদিকে একদিন গাড়ি করে গঙ্গা নাইয়ে আনবি না নিতাই? ছেলেবেলায় কত ভালবাসতিস!

হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমার সম্বন্ধে 'হ্যাব্‌লা' বিশেষণ। উনিই প্রথম আবিষ্কার করেন।...মনে পড়ে লজ্জিতই হয়ে গেলাম অবশ্য।

অতঃপর অনাদিমামার কাছে!

বাবাঃ! যেন ভূতের বাসা!

হরিদাসটা নাকি বুড়ো হয়ে দেশে চলে গেছে। নতুন চাকরের হাতে সংসার! এ আরও চমৎকার! বাড়িটাও যাচ্ছেতাই, পুরনো হয়ে গেছে!

মিস্ত্রীর হাত যে কত কাল পড়ে নি!

জানলার সার্শিগুলো ভাঙা-ফাটা, দেয়ালের প্লাস্টার খসে পড়েছে, মেজের বড় বড় ফাটল!

খাটের বিছানার উপর পূর্ব-আমলের পুরনো বিছানার ডাঁই। নির্লজ্জ নিরাবরণ!

মাটিতে শতরঞ্জি পেতেই বোধ হয় শোন অনাদিমামা, অন্তত তাই মনে হল। সেই বাসি বিছানার ওপর ফাইলের বন্যার মাঝখানে ডুবে বসে আছেন।

থাকতে পারলাম না, ঢুকেই বললাম—এ কি হল তোমার মামা?

অবাক হয়ে বললেন—কেন বল তো? কার?

—এই তোমার। তোমার—ঘর বাড়ির। এ যে ভূতের বাসা। চাকরটাকে বকতে পার না?

—কি দরকার? বেশ তো আছি!

—অর্থাৎ—অনাদিমামার বেশ থাকার স্ট্যাণ্ডার্ড এখন এই!

বলি—এখনও সেই ফাইলের গাদা?—আশ্চর্য।

সরিয়ে রেখে চশমাটা খুলতে খুলতে বলেন—আর বলিস কেন? সবাই

ফাঁকি দেয়! মরত্তে আছি আমি ব্যাটা!

সেই পুরনো ভাষা! ঠিক যেন বাড়ের বয়স শেষ হয়ে গেছে অনাদিমামার। যা শিখেছিলেন, তার বেশি আর কিছু শিখবেন না! শেখবার নেইও কিছু!

তবে আমার অবস্থা-ব্যবস্থা গাড়ি-বাড়ি সব বিষয়ে খুঁটিয়ে জিগ্যেস করলেন।

সাংঘাতিক বুড়িয়ে গেছেন অনাদিমামা।

মাথায় টাক, উদরে ভুঁড়ি, আ-ছাঁটা দাড়ি-গোঁফ।

—দাড়ি কামাও নি কেন?

—আজ তো রবিবার। সহজ ভাবেই বলেন। যেন রবিবারে দাড়ি কামানোয় নিষেধ আছে।

দু-চার কথাব পর—ইচ্ছে করেই তুলি কথাটা—তোমার রাশিয়া যাওয়া আর হল না।

—হবে না কেন? হবে হবে। তবে—এখন পাশপোর্ট পাওয়া শক্ত।

এমন ভাবে বললেন যেন—যেন যাওয়াটা হাতের মুঠোয়, শুধু পাশপোর্টের অভাবেই—

হাসলাম মনে মনে, পাশপোর্ট পেলেও তুমি আর গিয়েছ!

বললাম—অনাদিমামা, করলে কি সারা জীবনটা? না করলে ঘর-সংসার, না গেলে তোমার সাধেব রাশিয়ায়—

একটু উত্তেজিত হতে দেখলাম ভদ্রলোককে।—'গেলাম না' মানে কি? গেলেই যেতে পারি। এগারো মাস "ফুল পে" ছুটি পাওনা রয়েছে—

—এগারো—মাস! এগাবো মাস ছুটি পাওনা রয়েছে?

—আশ্চর্য লাগছে? অমন কত ছুটি পচে গেছে। এই তো ষোল বছর চাকরী হল—এক দিনও ছুটি নিই নি।

—সে কি অনাদিমামা? ছুটিগুলো পচিয়েছ? নাও নি কেন?

—দূর!···কি হবে ছুটি নিয়ে? কাজ না থাকলে ভালও লাগে না!

—বেড়াতে যেতেও পার তো?

—দূর, ভাবতবর্ষের মধ্যে বেড়াতে কোথায় যাব? আছে কি?

সে-ও হয়ে গেল বছর ছয়েক।

বিজয়া দশমীর দিন একবার করে যাওয়া—তাও আর হয়ে ওঠে না।

হঠাৎ আজ দেখা কলেজ স্ট্রীটের একটা দোকানের সামনে।

কারা না কি সস্তায় টুইল শার্ট বিক্রী করছে, তারই সন্ধানে এসেছেন। জোর করে তুলে নিলাম গাড়িতে।

উঠেই হঠাৎ নিজে থেকেই বললেন—শীগ্‌গিরই য়্যাসিটেণ্ট্ কণ্ট্রোলার হচ্ছি জানিস?

উক্ত পদমর্যাদা সম্বন্ধে বিশেষ কোন ধারণা সত্যিই নেই। কে জানে—কি স্বর্গলাভ হয় তাতে। কৌতূহলহীন চিত্তে আনন্দ প্রকাশ করলাম...!

আমার চিরদিনের বাতিক, অনাদিমামাকে দেখলেই রাশিয়ার কথা পাড়ব। বললাম—পর্বত আর মহম্মদের মতন ব্যাপারটা হল অনাদিমামা, তুমি গেলে না—রাশিয়াই এসে হাজির হল তোমার কাছে।

—তার মানে?

—মানে সোজা। আমাদের দেশই তো রাশিয়া হয়ে উঠল। স্বাধীন ভারতের নাগরিক আমরা, সবাই সমান। জজ-ম্যাজিস্ট্রেট মুটে-মজুর সকলের সমান দাবী। আমাদের নির্দেশ মেনে রাজ্য চলবে। একটা চাষারও ভোট দেওয়ার অধিকার থাকবে নতুন শাসন-তন্ত্রের খসড়ায় শুনেছ তো? আর তফাৎ কি রাশিয়ার সঙ্গে? তাই বলছি—পর্বতই মহম্মদের কাছে—

হঠাৎ অনাদিমামার চোখে একটু দীপ্ত ভাব দেখতে পেলাম, যা ইদানীং লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

—মহাভারত পড়েছিস তুই? মহাভারত?

—মহাভারত!

আমি তো অবাক!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, পড়িস নি মহাভারত—অশ্বত্থামার দুধ খাওয়ার গল্প? পিটুলি-গোলা জল খেয়ে, দুধ খেলাম বলে দুহাত তুলে 'নেত্য' করেছিল অশ্বত্থামা!

মহাভারত না পড়লেও গল্পটা জানা ছিল। তর্ক করবার কিছু ছিল না, বললাম—তুমি বুঝি মহাভারত পড়?

—পড়ছি এখন, বেশ সময় কাটে। যত দিন না এ হতচ্ছাড়া দেশ ছাড়ছি, করতে হবে তো কিছু?

একটু খোঁচা দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না—তা ছাড় না বাবা আমাদের হতচ্ছাড়া দেশকে। কে আটকেছে তোমাকে? ছোট দিদিমা ফিনিশ হবার পর থেকেই তো তুমি মুক্তপুরুষ?

—হুঁ—বলে একটা দম নিয়ে অনাদিমামা বললেন—যাব এবার, একেবারেই

যাব। আর কটা বছর পরেই তো রিটায়ার করছি?—ছোড়দাকে বাড়ির অংশটা বেচে দিয়ে—একেবারে চাটি-বাটি তুলে চলে যাব।…আরে—আরে—বাড়ি ছাড়িয়ে যাচ্ছিস যে?

তাই তো বটে।…নামিয়ে দিলাম অনাদিমামাকে বাড়ির দরজায়।

সস্তার টুইল শার্টের প্যাকেটটি সযত্নে হাতে করে ঢুকে গেলেন।

দেখলাম—দোতলার বারান্দার খানিকটা রেলিং গেছে খসে। সেই প্রকাণ্ড 'হাঁ'-টা বোজানো হয়েছে দু-খানা বাখারি আড় করে বেঁধে দিয়ে।

হয়তো—অদূর ভবিষ্যতে দেশত্যাগ করবেন বলেই ভাঙা বাড়ি মেরামত করাবার চাড় নেই অনাদিমামার।

কিন্তু আমি জানি দেশত্যাগ করা অনাদিমামার হবে না।

কোন কালেও না।

রিটায়ার করলেও না। হয়তো আবেদন নিবেদন করে এক্সটেনশন্ নেবেন। …আর এই জীর্ণ বাড়ির গহ্বরে বাস করতে করতেই জীর্ণ থেকে জীর্ণতর হতে থাকবেন।

বাড়বে ভুঁড়ি, বাড়বে টাক, বারান্দার রেলিঙের মতই খসে পড়তে থাকবে দাঁতের সারি!…

সকাল-সন্ধ্যার মনোরম অবকাশ মুহূর্তগুলি এমনি নিশ্ছিদ্র ভরাট করে রাখবেন অফিসের ফাইলের বোঝায়।…ছুটির দিনে নিঃসঙ্গ ঘরের "দাঁতু-খিঁচনো আক্রমণ" থেকে আত্মরক্ষা করতে, ঘুরে বেড়াবেন সস্তার টুইল শার্টের সন্ধানে!

কিন্তু কেন?

কেন সমস্ত সম্ভাবনা সত্ত্বেও জীবনটাকে এমন বাজে খরচ করে ফেললেন অনাদিমামা?…এ-ও কি নিছক প্রকৃতির খেয়াল? বিচিত্র মনুষ্য-প্রকৃতির? সুদূরপিয়াসী যাযাবর বলাকার গায়ে কচ্ছপের কঠিন খোলস এঁটে দিয়ে কৌতুক দেখা? মানুষকে নিয়ে অহরহই চলছে এই কৌতুক-লীলা!

চিঠিখানা হাতে করে অনুরাধা বরের কাছে এসে দাঁড়াল, বলল—নাও এখন কি উত্তর দেব বল ?

মৃগাঙ্ক খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে প্রশ্নটা সম্বন্ধে যেন একটু অবহিত হয়ে উত্তর দিল—তোমার খুশি।

—ওই দেখছ ত! ককখনো যদি একটি সোজা উত্তর পাওয়া যাবে! কেন, আমার খুশির ওপর নির্ভর কেন ? সবসময় বুঝি যা খুশি হচ্ছে তাই করছি ?

—আহা করছ কে বলছে ? কর না বলেই তো এত খেদ, তাই এবার থেকে যাতে নিজের খুশিতে চলতে পার, তারই হুকুমনামা দিয়ে দিচ্ছি।

অনুরাধা বলল—হয়েছে, খুব উদারতা দেখান হয়েছে, কিন্তু ঠাট্টা রেখে সত্যি বল—কিভাবে উত্তরটা দিলে ঠিক ইয়ে হবে ? মানে যাতে আর কি—মহাশ্বেতা মনঃক্ষুন্ন হবে না ?

—তোমার সখীকে মনঃক্ষুন্ন হওয়ার হাত থেকে অব্যাহতি দিতে চাও ত পরিষ্কার লিখে দাও—'অমুক তারিখে অমুক ট্রেণে রওনা দিচ্ছি। বয়স্ক অভিভাবক কেউ সঙ্গে নেই, অতএব স্টেশনে যেন অতি অবশ্য করে লোক থাকে। এ ছাড়া আর যা লিখবে, তাতেই তিনি মনঃক্ষুন্ন হবেন।'

—আহা আমি যেন যাব!

—আমি তো ভাবছি যাবে।

—হঠাৎ এত পরিষ্কার ধারণাটা হল কি করে ?

—এবারে আবেদনটা জোরালো, তাই!

অনুরাধা মুখটা কালো করে বলল—আমাকে এমনি নীচ ভাব তুমি, কেমন ?

মৃগাঙ্ক অবাকের ভান করে বলল—কি আশ্চর্য, এতে নীচ ভাবা হল কোথায় ? সখী তবু নিজের লোক, তার আবেদন-নিবেদন এড়িয়ে এসেছ এতদিন, কিন্তু এ হচ্ছে প্রায় কুটুম্বর ব্যাপার! সখীর স্বামী! সমীহর সম্পর্ক!

অনুরাধা কোনদিনই বুঝতে পারে না মৃগাঙ্ক সত্যি কি চায়।

সব কথাই বলে পরিহাসের ঢঙে, আর এই ঢঙের আবরণে নিজেকে সব সময় রাখে আচ্ছন্ন করে।

ব্যাপারটা এই—অনুরাধার সহপাঠিনী মহাশ্বেতা থাকে আসানসোলে, স্বাস্থ্যটা তার এমনই খারাপ যে, এইটুকু দূরত্বের ব্যবধান অতিক্রম করে কলকাতায় আসাও হয়ে ওঠে না। অথচ নিঃসন্তান জীবন তার মাঝে মাঝে যেন মানুষের অভাবে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তাই সে যে-যেখানে আত্মীয় বন্ধু আছে সবাইকে চিঠি লিখে

লিখে মিনতি জানায়—'এখানে এসে দু-চার দিন বেড়িয়ে যাও না!'…'এস' বলাটা খুব সহজ নয়, কিন্তু 'এস' কথাটার মান রাখাই কি খুব সহজ?

গেরস্ত লোকের পক্ষে চট করে কোথাও দু-চার দিনের জন্যে বেড়িয়ে আসা, প্রায় অসম্ভবেরই মত! আত্মীয়বর্গ কেউ কেউ ঘুরে এসেছে, আর কেউই বড় এ ডাকে সাড়া দিচ্ছে না, এখন সে বান্ধবীদের টানাটানি শুরু করেছে।

অনেকদিন থেকেই অনুরাধার কাছে 'মিনতি পত্র' আসছে, অনুরাধা সমানেই এড়িয়ে এসেছে, কিন্তু এবারে আর একটা নতুন চাল চেলেছে মহাশ্বেতা। স্বামীকে দিয়ে অনুরোধ পত্র লিখিয়েছে।

সে চিঠির ভাষা এই—'আপনার সখী জানাচ্ছেন এই শেষবাবের মত আবেদন পত্র যাচ্ছে, এবারেও যদি একবার অনুগ্রহ করে অধমের বাড়ি পায়ের ধুলো না দেন বুঝতে হবে আপনার হিসেবের খাতায় মহাশ্বেতার কোন স্থান ছিল না।

এই চিঠি নিয়েই ফাঁপরে পড়েছে অনুরাধা।

সত্যি কী অক্ষম সে!

বন্ধু কাতর অবেদনে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে দুদিনের জন্যে একটু বেড়িয়ে যেতে। সে অনুবোধটুকু বক্ষা করবার ক্ষমতাও তার নেই! কিন্তু কেন নেই? সত্যিই কি আর—একবারটির জন্যে যাওয়া যায় না? আসানসোল কত হাজার মাইল দূরে? কত ন-শ পঞ্চাশ টাকা ভাড়া?

অবিশ্যি সত্যিই যে মহাশ্বেতা অনুরাধার তেমন কিছু বন্ধু তা নয়, তার হিসেবের খাতায় মহাশ্বেতার নাম সত্যিই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এমন আত্মীয়তাকে ছেঁটে উড়িয়ে দেওয়াই কি ভদ্রতা? না মনুষ্য-ধর্ম?

গেলেই তো হয় একবার?

কিন্তু মৃগাঙ্ক এক অদ্ভুত জীব।

বলে না যে 'থাক্ যেও না', অথচ যাওয়ার কথায় মোটেই গা করে না? পাঁচ ছদিন হয়ে গেল চিঠিটার উত্তর দেওয়া হয় নি।

অনুরাধার আজ মেজাজটা খাপ্পা হয়ে গেল।—না হয় তুমি গরীব, না হয় স্ত্রীকে তার বডলোক সহপাঠিনীর বাড়ি পাঠাবার মত রেস্ত বার করা তোমার পক্ষে সহজ নয়, তাই বলে ভদ্রতা-জ্ঞানও থাকবে না?

'বড়লোক'রা যেন কি এক অধম জীব মৃগাঙ্কর কাছে। আর গরীব হওয়াটাই যেন মস্ত এক পৌরুষ! বসে বসে লম্বা লম্বা নাটকীয় উক্তি করব, আর হতভাগ্য বড়লোকদের প্রতি ব্যঙ্গদৃষ্টি হানব! ভারি এক কৌশল শিখেছ!

স্বামীর উপর রাগ করেই বন্ধুকে খস-খস করে একটা চিঠি লিখে ফেলল অনুরাধা। সেই মৃগাঙ্কর নির্দেশ মত ভাষা! 'অমুক তারিখে অমুক সময় রওনা হচ্ছি, সঙ্গে বড় কেউ থাকছে না, স্টেশনে কর্তাকে থাকতে বোল।'

চিঠিটা লিখে স্বামীর সামনে ফেলে দিয়ে চলে গেল নিজের কাজে।

মৃগাঙ্ক ওটা তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে ঈষৎ হেসে পকেটে রাখল। ডাকে দিতে হবে।

যে কোন ভাবেই হোক অনুরাধা যে এবার যাবেই এ যেন ও এঁচে রেখেছিল।

তো ডাকে গেল—মান খুইয়ে অনুরাধাকেই আবার এ প্রসঙ্গ তুলতে হয় রাতের বেলা—আমিও লিখলাম রাগভরে, তুমিও গট্‌গট্‌ করে গিয়ে পোস্ট করে এলে, হাতের ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেল, এখন কি হবে তাই ভাবছি?

—এত ভাববার কি আছে?

—বাঃ, ভাববার নেই, সাত জন্মে যাইও না কোথাও, পরণ-পরিচ্ছদের তেমনি ছিরি হয়ে থাকে, ছেলে-মেয়ে দুটোর তো জুতো পর্যন্ত পেন্সন নিয়েছে, যাই হোক কিছু বিছানাও নিতে হবে—

—যা হবে তা তো করতেই হবে। একটা ফর্দ করে রেখ কি চাই না চাই।

কথাটা বলে যেন বাকী কথার ওপর যবনিকা টেনে দিয়ে পাশ ফিরে শোয় মৃগাঙ্ক।

নিষ্ফল আবেগে মাথা কুটতে ইচ্ছে করে অনুরাধার।

এক কায়দা! চিরকাল এই এক কায়দা! ভারী যেন তালেবর একেবারে! ওর এখন ইচ্ছে হচ্ছে স্বামীর সঙ্গে এই যাওয়া নিয়ে খানিক আলোচনা করে মনের ভাবটা কিছু লাঘব করে নেয়, কারণ অদ্ভুত একটা অস্থিরতায় ওর বুক কাঁপছে।

পরের বাড়ি গিয়ে থাকা, বড়লোকের বাড়ি গিয়ে থাকা, স্বামীকে বাদ দিয়ে একা কোথাও যাওয়া, এ সবই যে অনুরাধার কাছে অভূতপূর্ব।

মহাশ্বেতা অবশ্য এদের সপরিবারেই যেতে বলেছে, কিন্তু মৃগাঙ্ক যাবে না জানা কথা। প্রথম দিনেই ও চিঠি দেখে বলেছিল—বটে? 'স্ব-স্বামীক' চলে আয়? ভদ্রমহিলার প্রাণে তো খুব শখ আছে দেখছি!

সে যাক এখন অনুরাধার কি হয়।

মৃগাঙ্কের অগ্রাহ্যভাব দেখে কথা বলতে রুচি হয় না, কিন্তু ওর যে এখন মরণ বাঁচনের দায়। তাই আবার কথা বলতে হয়—ফর্দ করে রাখার জন্যে তো লম্বা

হুকুম দেওয়া হল, আসবে কোথা থেকে শুনি ?

—সে ভাবনা ভেবে ব্রেণটাকে হালকা করবার দরকার কি ? পেলেই তো হল ?

লজ্জায় অপমানে চুপ করে গেল অনুরাধা।

ইচ্ছে করে অপমান করে মৃগাঙ্ক। বেশ বোঝা যায়—ইচ্ছে করে। এই ওর চিত্তবিলাস!

কিন্তু কেন ? কেন মৃগাঙ্কের এমন নীচতা ?

অনুরাধা তো জানে না এছাড়া আর কোন উপায় নেই মৃগাঙ্কর! নিজের অসমর্থতাকে ঢেকে রাখবার একটা আবরণ। এমন করে নিজেকে কঠিন আবরণের মধ্যে সুরক্ষিত না রাখলে যে অনুরাধার কাছে খেলো হয়ে যাবে। আর একবার যদি খেলো হয়ে গেল তাহলেই অনুরাধা পেয়ে বসবে।···তাহলেই সুযোগ পেলেই নিজের সংসারের দুঃখ-জ্বালা আর অন্যের সংসারের সুখসমৃদ্ধির আলোচনা করতে থাকবে। তুলনা করবে, খেদ করবে, স্বামীর অক্ষমতাকে ধিক্কার দেবে; কি নয় ? তার চাইতে এ ভাল।

এত উঁচু ডালে উঠে বসে থাকবে যে পেড়ে ফেলতে পারবে না অনুরাধা।

খুব রাগ করেই ফর্দ করে রাখল অনুরাধা। সুটকেস থেকে শুরু করে অনেক কিছু। ছেলেদের জামা জুতো, নিজের শাড়ি সেমিজ, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়ের জন্য লংক্লথ, তাছাড়া—সাবান, মাজন, তেল, চিরুণী এটা সেটা কত কি।

হ্যাঁ। সব এনে দিল মৃগাঙ্ক।

গুছিয়েও দিল সব। শুধু স্টেশনে গেল না।

অনুরাধা এ অবহেলাটা সত্যিই আশা করে নি। জীবনে কোথাও যায় না অনুরাধা, হাওড়া স্টেশনে কবে শেষ এসেছিল ভুলেই গেছে। আর সেই আসা এল কিনা সম্পর্কে এক ভাগ্নের সঙ্গে।

নাঃ, ফিরতে আর ইচ্ছে হয় না।

যদি এই যাওয়াই জন্মের শোধ যাওয়া হত। ঠিক জব্দ হত মৃগাঙ্ক!

কিন্তু বিধাতা তো কখনও উচিত লোককে জব্দ করেন না। জব্দ করেন তাকেই যে নিরপরাধ!

হ্যাঁ, বিধাতার ওই রকমই খামখেয়াল।

নইলে—মহাশ্বেতার স্বামী নলিনাক্ষের মত লোক, যাকে দেবতুল্য লোক

বললেই ঠিক বলা হয়, তাকে এত জব্দও করে রেখেছেন ?

প্রায় চিররুগ্না স্ত্রী নিয়ে যাকে সংসার করতে হয়, তার চাইতে জব্দ হয়ে আর কে আছে ?

বন্ধুর বাড়িতে এসে প্রথমটা যেন লজ্জায় মাথা কাটা গিয়েছিল অনুরাধার। এদের অবস্থা ভাল তা জানত, এত ভাল তা আন্দাজ ছিল না।

যখন কলকাতা থেকে প্রায় একশ টাকার মত জিনিসপত্র কাপড়-চোপড় কিনে নিয়ে এসেছিল তখন ভেবেছিল—বান্ধবীকে আর ধরতে ছুঁতে হবে না, অনুরাধার অবস্থাটা কোথায় দাঁড়িয়ে। বান্ধবীর সঙ্গে সমান তালেই মাথা তুলে চলতে পারবে। কিন্তু দেখে অবাক হয়ে গেল, এ বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই ওর সমস্ত সাজসজ্জা তার নতুনত্বের চাকচিক্য নিয়েও লজ্জায় যেন অধোবদন হয়ে পড়েছে।

এদের এই ঘাসছাঁটা সবুজ মখমলের মত 'লনে' অনুরাধার ছেলেমেয়ের সস্তা দামের 'কেডস্'-পরা পাগুলো যেন বিশ্রী দৃষ্টিকটু, অনুরাধার নতুন টিনের স্যুটকেসটা এদের বাড়িতে যেন ব্যঙ্গের প্রতিচ্ছবির মত জায়গা জুড়ে বসে রয়েছে, আর অনুরাধার সব চাইতে দামী শাড়িখানা পরে, মহাশ্বেতার গায়ে গা ঘেঁষে বসতে মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

বারোমাস এই রকম হাতীপাড় ধনেখালির শাড়ি পরে মহাশ্বেতা! যেমন শাড়ি অনুরাধার কাছে চিরদিনের স্বপ্ন হয়েই রইল। কেন, আটপৌরে শাড়ি এত দামী হবার কি দরকার? রাগে যেন গা জ্বলে যায় অনুরাধার। এই রকম ভাল ভাল শাড়ি জামা পরে শুধু পুতুলের মত ঘুরে বেড়ানো। স্বামীকে এক পেয়ালা চা পর্যন্ত করে খাওয়াবার ক্ষমতা নেই! অথচ এই স্ত্রীকে মাথার ওপর সিংহাসন পেতে বসিয়ে রেখেছে নলিনাক্ষ!

প্রথমটা এদের প্রেম দেখে যেন অভিভূত হয়ে পড়েছিল। অহরহ স্ত্রীর জন্য কী উৎকণ্ঠা কী সতর্কতা, কী আহা আহা, আর গেল-গেল ভাব নলিনাক্ষর।

এর কাছে মৃগাঙ্ক ?

তুলনা না করে পারে না অনুরাধা, প্রতিপদেই তুলনা আসে। উঠতে বসতে খেতে শুতে। মনে হত হ্যাঁ স্বামী যদি হতে হয়তো নলিনাক্ষর মত স্বভাবের লোকেরই হওয়া উচিত। যারা 'স্বামীত্ব'কে খালি প্রভুত্বের কোঠায় রাখে না।

কিন্তু দু-একদিন দেখার পরই ক্রমশ সব কিছু বাড়াবাড়ি লাগছে।

এখন মনে হচ্ছে—'আহা, ওইত খেঁদি বৌ, তায় আবার চিররুগ্না, কখনও

এক গেলাস জল পাবার পিত্যেশা নেই বৌয়ের কাছে, তার আবার এত আদর? আদিখ্যেতা!'

সত্যি, আদিখ্যেতার মতই দেখতে লাগে অনেক সময়। হৃদয়দৌর্বল্যের রোগিণী স্ত্রীর মৃত্যুর আশঙ্কায় সদা-সশঙ্কিত স্বামীর তটস্থভাব কি করে সহজ লাগবে অনুরাধার মত মেয়ের কাছে? যার স্বামী হৃদয়ের অভিব্যক্তিকে খেলোমি বলে ভাবে!

অনুরাধা এক এক সময় ভাবে, আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে করে।

সকালবেলা নলিনাক্ষ কাজে বেরিয়ে যায়, আসে দুপুরে। কাজেই সকালবেলার জলযোগটা তার রীতিমত ভারী।

অনুরাধা এখানে নতুন এসেছে, ছেলেমেয়ে দুটো কেন—তার নিজেরও চেষ্টা লেগে গেছে, কাজেই সেই টেবিলের অংশীদার তার কিন্তু এত লজ্জা করে মহাশ্বেতার ঢং দেখে। একখানির ওপর দুখানি বিস্কুট খেতে হলে উনি নাকি মারা যাবেন।

'মরে যাওয়াই উচিত তোমার' মনে মনে বলে অনুরাধা।

—তারপর, আজ তো রবিবার, একটু আধটু বেড়াতে যাওয়া হবে নাকি কোথাও? সকাল বেলা চা খেতে বসে বলল নলিনাক্ষ।

মোটরে করে একটু বেড়িয়ে আসাতেও অক্ষমতা মহাশ্বেতার।

একটু তাই চোখ তুলে হাসল সে। অর্থাৎ—'তুমি বল'।

নলিনাক্ষ বলে—তোমার বান্ধবীর 'অনারে' যে কিছুই করা যাচ্ছে না, ঠিক এই সময়ই তুমি শরীরটা বেশী খারাপ করলে—

—বেশি আর কম, আমার তো শালগ্রামের শোয়া-বসা—হেসে ওঠে মহাশ্বেতা। বলে—তা' চল আজ একটু বেড়িয়ে আসা যাক। দেখা যাক বাঁচি কি মরি।

ওই ঢঙের শুরু হল—মনে মনে ভাবে অনুরাধা। ওর একান্ত ইচ্ছে একটু বেড়ানো হয়। এসেছে যখন বিদেশে। কিন্তু মহাশ্বেতার ওই 'অসুখ অসুখ' ঢং সব তাতেই বাদ সাধছে।

—এই দেখুন আপনার বান্ধবীর কথা! অনুরাধার দিকে তাকায় নলিনাক্ষ। —ভয় লাগিয়ে দেন একেবারে! উঃ একবার সেই আমার ভাইঝি এসেছিল, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পাহাড়ে উঠতে গিয়ে সে কী বিপদ! ফিরিয়ে আনতে পারব তা আর ভাবিইনি!

—না আনলেই পারতে—মহাশ্বেতা মৃদু হাসে—ভালই হত—পাহাড়ের

কোলে এই পাহাড়ে-বোঝা নামিয়ে আসতে। কি বলিস অনু? আমার মত বৌ 'মাথার বোঝা' ছাড়া আর আর কি?

বলে বটে, কিন্তু বলার ধরনে মনে হয়—বেশ জানে, 'মাথার বোঝা' নয় গলার মালা।

নলিনাক্ষ বলে—তাহলে ঠিক করে ফেলুন কখন যাওয়া হবে। পরামর্শ করে ফেলুন আপনার বান্ধবীর সঙ্গে।

অনুরাধা কুণ্ঠিত হাস্যে বলে—আমি আর কি বলব?

সত্যিই তো, ও আর কি বল্‌বে!

যা কিছু ব্যবস্থা তো মহাশ্বেতার শরীর বিবেচনা করে?

ব্যবস্থা হয়ে যেতেই নলিনাক্ষ স্ত্রীকে নির্দেশ দেয়—বেশ তাহলে তুমি এখন দু ঘণ্টা শুয়ে নাও গে—বিকেলের ক্ষতিপূরণ হিসেবে।

—শুয়ে পড়ব? এখন? বা রে!

—পড়বে না মানে? তাহলে তোমায় নিয়ে যাওয়া হবে না। কি বলেন মিসেস সেন? আমরা বেশ মজা করে বেড়াতে যাব, ওনাকে বাড়িতে ফেলে রেখে।

'ন্যাকামি'—মনে মনে এই সভ্য শব্দটি উচ্চারণ করে মুখে বলে অনুরাধা—পারবেন প্রাণ-ধরে?

—ওই তো মুস্কিল, প্রাণ যে চায় না। না লক্ষীটি শ্বেতা, দু ঘণ্টা শুয়ে নেওয়া বিশেষ দরকার তোমার, একেবারে চুপচাপ।

অর্থাৎ অনুরাধাকেও জানান দেওয়া, বেশী গল্প টল্প করা চলবে না।

সত্যিই মহাশ্বেতা গিয়ে শুয়ে পড়ে।

এই বেলা আটটার সময়!

শুয়ে ঠিক পড়ে না, পড়ানো হয়। নলিনাক্ষ নিজে আদর করে শুইয়ে রেখে যায় ওকে।

মহাশ্বেতা কুণ্ঠিত হাস্যে বলে—দেখছিস ত ভাই কি জবরদস্তি?

অনুরাধা বলে—আচ্ছা তুই শুয়ে থাক, আমি তোর ঘর-সংসারটা একটু দেখে বেড়াই। এসে পর্যন্ত তোর রান্না ঘরটা তো দেখলাম না।

—এই মাটি করেছে! রান্নাঘরের আবার দেখবি কি?

—তা ভাই, মেছুনির আঁশ-চুপড়ির অভাবে প্রাণ হাঁফায়—জানিস ত?

অনুরাধা ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে ওর রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর। চাকর বামুনকে

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানা প্রশ্ন করে অবহিত হতে থাকে সব বিষয়ে।

এত প্রাচুর্য নলিনাক্ষর সংসারে!

এত ফেলা-ছড়া!

এই লক্ষ্মীর সংসার যদি অনুরাধা একবার পেত! হ্যাঁ দেখিয়ে দিতে পারত নলিনাক্ষকে 'সংসার করা' কাকে বলে। দেখিয়ে দিত কটা টাকায় চালানো যায়, আর কত টাকা জমানো যায়।

এই সোনার সংসারের বুকের ওপর চিরদিন 'পাহাড়' হয়ে চেপে বসে থাকবে মহাশ্বেতা?

ঘুরে ঘুরে যত না হোক বিরক্তিতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে অনুরাধা। দেখা যাক মহারাণী পড়ে আছেন এখনও অঙ্গ ঢেলে—না উঠেছেন। যতই ওর ওপর রাগ হোক, ওর বামুন চাকর কী পরিমাণ চুরি করছে সে সম্বন্ধে ওকে হুঁশ করিয়ে দেবার জন্যেও প্রাণ ছটফট করছিল।

ছি ছি! এই ভাবে প্রতিনিয়ত অপচয় হচ্ছে সংসারে?

যে টাকা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করে আনছে লোকটা!

মহাশ্বেতার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল।

ঘর অন্ধকার, জানলা দরজা সব বন্ধ, শুধু সান্‌সান্ করে পাখা ঘুরছে।

ডাকল—কি রে ঘুমিয়ে আছিস না কি?

সাড়া এল না।

ঢুকে পড়ে বলল—ওমা তুই তো বেশ যখন তখন ঘুমিয়ে নিতে পারিস? শ্বেতা শ্বেতা! কিরে কত ঘুমচ্ছিস?

শ্বেতা নিস্তব্ধ।

ভয় করে অনুরাধার। নলিনাক্ষ আড়ালে বলে 'ওর হার্টের অবস্থা তো জানেন না, ওকেও বলি না। ডাক্তার বলেছে যে কোন মুহূর্তে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হার্টফেল করতে পারে।'

—সেই 'মুহূর্তটা' কি তবে এসে গেল হঠাৎ?

মৃদু আর সন্তর্পণে ভয়ে ভয়ে ওর কপালের ওপর হাত রাখল একটু, ঠাণ্ডা কন্‌কনে।

শুধু পাখার হাওয়ায় এত ঠাণ্ডা হয়?

আশঙ্কায় বুক কাঁপে! কাউকে ডাকবে নাকি? চীৎকার করে উঠবে?

ভালবাসার নিদর্শন দেখাতে কেঁদে উঠবে ?

…কিন্তু অনুরাধার তো হার্টের অসুখ নেই। ওর বুকটা এত কাঁপছে কেন, শুধু আশঙ্কায় ?…আশঙ্কায় না আশায় ?

'কিছু একটা হোক, কিছু একটা,' এই ধ্বনি উঠছে যে মনের মধ্যে।

সে 'কিছুটা' কি ?

নলিনাক্ষর মুক্তি ? কিন্তু নলিনাক্ষর মুক্তি-চিন্তায় অনুরাধার এত মাথা-ব্যথা কেন ?

চীৎকার করে উঠল না অনুরাধা ! দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, নাঃ কোন সন্দেহ নেই। মুখে মৃত্যুর প্রশান্তি। বুকের কাপড়টা ওঠা নামা করছে, সে শুধু পাখার হাওয়ায়।

ভাবতে থাকে…সখীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কি অনুরাধা চলে যাবে ? যাওয়াটা ভাল দেখাবে ? নলিনাক্ষকে একটু শান্ত করে যাওয়াটাও কি কর্তব্য নয় ?… আশ্চর্য, অসুখটা তাহলে নিছক কাল্পনিক নয় ? এত সহজে মরে যেতে পারে মানুষ ? এমন নিঃশব্দ মহিমায় ?

কতক্ষণ যে তাকিয়েছিল অনুরাধা। কতবার মহাশ্বেতার বুকের কাপড়টা ওঠাপড়া দেখেছিল কে জানে।……

হঠাৎ আর একবার ডেকে উঠল—শ্বেতা।

নির্জন ঘরে শব্দটা যেন ঝনাৎ করে বেজে উঠল। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর হঠাৎ ডাকটা যেন নিজের কানেই অদ্ভুত বিকৃত শোনাল।…মনে হল —ঘরের জিনিস-পত্রগুলো সব যেন ধাক্কা খেল হঠাৎ !

আর—আর অনুরাধার সমস্ত দুশ্চিন্তাকে ব্যঙ্গ করে, সমস্ত কল্পনাকে বিদীর্ণ করে, সমস্ত আশা ভঙ্গ করে দিয়ে চোখ মেলে চাইল মহাশ্বেতা !

হার্টের রোগীর গভীর ঘুম এর আগে কখনও বুঝি দেখে নি অনুরাধা।

ভাল রাস্তা ছেড়ে গাড়িখানা এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় পড়ল।

সবিতা স্বামীর স্টীয়ারিং ধরা হাতের ওপর একটু আলতো হাতের স্পর্শ দিয়ে বলে—একটু আস্তে চালাও না!

অম্লানকুসুম মুখ ফিরিয়ে হেসে বলল—কেন, ভয় করছে।

—ভয় নয়, ভাল লাগছে! রাস্তাটা ফুরিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে না!

—রাস্তা ফুরোতে এখন দেরি আছে। যা পাণ্ডববর্জ্জিত দেশে নীড় বেঁধেছেন এঁরা! সত্যি চাকরি করতে আসার আর জায়গা পেল না সমরেশ।

সবিতা একটু থেমে বলে—কিন্তু জায়গাটার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতুলনীয়!

—আরে দূর মশাই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য! সভ্যতা থেকে যেন দূরে—বহু দূরে।...আশ্চর্য লাগছে কিন্তু!

—কি আশ্চর্য লাগছে?

—এই সবটাই! তোমার হতাশ প্রেমিক আর আমার হতাশ নায়িকার সঙ্গে এই যোগাযোগ! ঠিক যেন সাজানো গল্প।

সবিতা গম্ভীরভাবে বলে—বিধাতা নামক ভদ্রলোকটি রীতিমত একটি ঔপন্যাসিক! অথবা—নাট্যকার!

—তা বলে সকলের জীবনে এমন নাটক ঘটে না।...গোড়া থেকে ভেবে যাও—। আমি ছিলাম তোমার বান্ধবীর সঙ্গে প্রেমে পড়ে, ভাবছি ওকে পেলেই জীবন ধন্য, হঠাৎ তোমাকে দেখলাম, আর বদলে গেল মতটা। তুমি আমার পিসতুতো ভাইকে ভাল 'বাসব বাসব' করতে করতে দিয়ে বসলে আমার গলায় মালা...তারপর এখন আমরা দু জনে যাচ্ছি তাদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে! কোনটাই স্বাভাবিক নয়।

সবিতা শান্ত গলায় বলে—অথচ এত চমৎকার রকমের স্বাভাবিক দেখতে লাগছে যে মনেই হচ্ছে না এর মধ্যে কোন অযৌক্তিকতা আছে!

—ওরা আমাদের দেখে খুব খুশী হবে, কি বল?

—এত করে ডেকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে যখন, তখন তাই তো হওয়া উচিত।

অম্লানকুসুম আবার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে গাড়ি চালাতে থাকে।

—রাস্তা ঠিক করতে পারছ তো? বাড়ি খুঁজে পাবে?—বলল সবিতা স্তব্ধতা ভেঙে।

চলন্ত গাড়িতে যে গল্প, সে ঠিক গল্প করা হয় না, যেন বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কয়েকটি কথা।

অম্লান বলল—রাস্তার নির্ভুল মানচিত্র আছে সঙ্গে।

—আর কতক্ষণ লাগবে ?

—এই এসে পড়লাম আর কি।

কাছাকাছি এসে—হঠাৎ সবিতা এক অদ্ভুত প্রস্তাব করে বসে।

বলে কি—আচ্ছা, মজা করে ওদের বেশ একটু ঠকালে কেমন হয় ?

—ঠকালে ?—অম্লান অবাক হয়ে বলে—কি করে ?

—এই ধর আমাদের নিজেদের জীবন নিয়ে।

অম্লান মুখ ফিরিয়ে বলে—সেটা আবার কি রকম ?

সবিতা আরক্ত মুখে হেসে উঠে বলল—ধেৎ, সে থাক। এমনি বলছিলাম !

—বললে আর কই ? হঠাৎ ওদের ঠকাবার প্ল্যান মাথায় এল কেন ? কি সেই প্ল্যানগুলি ?

—সে কিছু না, একটা বাজে চালাকি। বলল সবিতা।

অম্লান হেসে ফেলে বলে—কী মুস্কিল, কথাটা বলবে তো ?

—বলছিলাম—ধর, ওদের যদি এইভাবে ঠকানো যায়—আমরা যেন সেই পুরনো প্রেমের বেদনায় কাবু হয়ে আছি, জীবনে কোনও রস নেই, দু জনে কিছু ভালবাসা নেই, তুমি আছ উত্তরে, তো আমি দক্ষিণে।······দুজনে দুজনকে যেন চিনিই না প্রায়। ······খুব ঠকানো হয় না ?

অম্লান হাতের চাকাটায় ঈষৎ মোড় দিতে দিতে বলে—দি আইডিয়া ! সত্যি তোমাদের মেয়েদের কল্পনা-শক্তি কত প্রখর ! আমাকে সাত দিন সাত রাত ধরে ভাবতে বললেও, এমন অপূর্ব ফন্দীটি আবিষ্কার করতে পারতাম না। বেশ মজা তো !

—মজা নয় ? তোমারও মজা লেগেছে ? ছেলেমানুষের মত হাততালি দিয়ে হেসে ওঠে সবিতা। তারপর হাসি থামিয়ে বলে—আমার তো হঠাৎ খেয়ালটা মাথায় এসে গিয়ে এত মজা লাগল !···শুধু ভাবছিলাম—তুমি আমার এই ছেলে-মানুষি শুনে কি না জানি বল। তাহলে রাজী ?

—মন্দ কি ?

—আচ্ছা, গাড়ি থেকে নেমেই প্রথম পাঠটা কি ? মানে আর কি—দু জনের 'ভাবে'র অভাবটা প্রমাণ করতে কি ভাব দেখানো দরকার ? বল না গো, কি ভাব হবে ? ধর—তুমি গম্ভীরভাবে বলবে—"সবিতা, এসে গেছি—" আমি ততোধিক

ভীবভাবে বলব—"সেটা না বললেও ক্ষতি ছিল না"—। তারপর পিসতুতো ভাইয়ের নির্দেশ-মত গুটি গুটি গিয়ে বাড়িতে ঢুকব।···কেমন পছন্দ হয়?

অম্লানকুসুম একটু হাসির মত করে বলল—রোস, ভূমিকা গ্রহণের আগে নাটকটা সম্বন্ধে একটু অবহিত হয়ে নিই।···এখন বাকী পথটুকু ভেবে ভেবে রপ্তস্থ করে নিতে হবে—আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে বটে, কিন্তু তুমি সুখী হতে পার নি, পার নি পূর্ব প্রণয়ীকে ভুলতে—

—এই খবরদার!—সবিতা ধমকে ওঠে,—আমি একা পারি নি মানে? বল —'আমরা পারি নি'।

—ওঃ তাও তো বটে! কাহিনীটা তোমার রচিত কি না, প্রথমটা একটু ভুল হবে যাওয়াই স্বাভাবিক!

সবিতা চোখ পাকিয়ে বলে—ভুল-টুল চলবে না বলে দিচ্ছি। তাহলে—মাইনে কাটা যাবে! বলি সিনেমা থিয়েটারের 'হতাশ প্রেমিক', 'ব্যর্থ প্রেমিক' ইত্যাদি করে দেখেছ তো ঢের, একটা পার্ট মনে কর?

—কিগো, তুমি কি আমার খেলাটা ধরতে পার নি ঠিক?

—আগে পারি নি, এখন পারছি।

সবিতা সন্দিগ্ধভাবে বলে—কি পারলে বল দেখি?

অম্লানকুসুম মৃদু হেসে বলে—মুখে বলে কি হবে? খেলে যাই, দেখ—ঠিক জায়গায় ঠিক তাস ফেলতে পারি কি না।

তা খেলাটা খুব ভালই বুঝেছিল বৈকি অম্লানকুসুম, যেখানে 'পিট' ধরবার, তুরুপ দেবার, নির্ভুল দিয়ে এসেছে কদিন ধরে। বরং সবিতারই মাঝে মাঝে খেলা ভেস্তে গেছে!

ফিরে আসবার দিন আড়ালে অন্তরালে সবিতার বান্ধবা সবিতার বরকে বলে —এ আমি ভাবতেই পারি নি অম্লান! সত্যি কথা স্বীকার করলে বলতে হয় এক রকম তোমার ওপর রাগ করেই তাড়াতাড়ি নিজেকে বেঁধে ফেলেছিলাম। তবু মনে স্বস্তি ছিল—তুমি তো সুখী হয়েছ। সে স্বস্তিও ঘুচিয়ে দিয়ে গেলে তুমি।,

অম্লানকুসুমের পিসতুতো ভাই সবিতাকে একা দাঁড় করিয়ে—লোকের সামনে বৌদিই বলি আর যাই বলি একথা আমি ভুলতে পারব না সবিতা, আমার কাছে তুমি সেই সবিতাই আছ। শুধু জীবনে একটা দুরন্ত জ্বালা থেকে গেল যে,

অম্লান বলল—রাস্তার নির্ভুল মানচিত্র আছে সঙ্গে।

—আর কতক্ষণ লাগবে?

—এই এসে পড়লাম আর কি।

কাছাকাছি এসে—হঠাৎ সবিতা এক অদ্ভুত প্রস্তাব করে বসে।

বলে কি—আচ্ছা, মজা করে ওদের বেশ একটু ঠকালে কেমন হয়?

—ঠকালে?—অম্লান অবাক হয়ে বলে—কি করে?

—এই ধর আমাদের নিজেদের জীবন নিয়ে।

অম্লান মুখ ফিরিয়ে বলে—সেটা আবার কি রকম?

সবিতা আরক্ত মুখে হেসে উঠে বলল—ধেৎ, সে থাক! এমনি বলছিলাম!

—বললে আর কই? হঠাৎ ওদের ঠকাবার প্ল্যান মাথায় এল কেন? কি সেই প্ল্যানগুলি?

—সে কিছু না, একটা বাজে চালাকি। বলল সবিতা।

অম্লান হেসে ফেলে বলে—কী মুস্কিল, কথাটা বলবে তো?

—বলছিলাম—ধর, ওদের যদি এইভাবে ঠকানো যায়—আমরা যেন সেই পুরনো প্রেমের বেদনায় কাবু হয়ে আছি, জীবনে কোনও রস নেই, দু জনে কিছু ভালবাসা নেই, তুমি আছ উত্তরে, তো আমি দক্ষিণে।......দুজনে দুজনকে যেন চিনিই না প্রায়। ......খুব ঠকানো হয় না?

অম্লান হাতের চাকাটায় ঈষৎ মোড় দিতে দিতে বলে—দি আইডিয়া! সত্যি তোমাদের মেয়েদের কল্পনা-শক্তি কত প্রখর! আমাকে সাত দিন সাত রাত ধরে ভাবতে বললেও, এমন অপূর্ব ফন্দীটি আবিষ্কার করতে পারতাম না। বেশ মজা তো!

—মজা নয়? তোমারও মজা লেগেছে? ছেলেমানুষের মত হাততালি দিয়ে হেসে ওঠে সবিতা। তারপর হাসি থামিয়ে বলে—আমার তো হঠাৎ খেয়ালটা মাথায় এসে গিয়ে এত মজা লাগল!...শুধু ভাবছিলাম—তুমি আমার এই ছেলেমানুষি শুনে কি না জানি বল। তাহলে রাজী?

—মন্দ কি?

—আচ্ছা, গাড়ি থেকে নেমেই প্রথম পার্টটা কি? মানে আর কি—দু জনের 'ভাবে'র অভাবটা প্রমাণ করতে কি ভাব দেখানো দরকার? বল না গো, কি ভাব হবে? ধর—তুমি গম্ভীরভাবে বলবে—"সবিতা, এসে গেছি—" আমি ততোধিক

গম্ভীরভাবে বলব—"সেটা না বললেও ক্ষতি ছিল না"—। তারপর পিসতুতো ভাইয়ের নির্দেশ-মত গুটি গুটি গিয়ে বাড়িতে ঢুকব।···কেমন পছন্দ হয়?

অম্লানকুসুম একটু হাসির মত করে বলল—রোস, ভূমিকা গ্রহণের আগে নাটকটা সম্বন্ধে একটু অবহিত হয়ে নিই।···এখন বাকী পথটুকু ভেবে ভেবে রপ্ত করে নিতে হবে—আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে বটে, কিন্তু তুমি সুখী হতে পার নি, পার নি পূর্ব প্রণয়ীকে ভুলতে—

—এই খবরদার!—সবিতা ধমকে ওঠে,—আমি একা পারি নি মানে? বল—'আমরা পারি নি'।

—ওঃ তাও তো বটে! কাহিনীটা তোমার রচিত কি না, প্রথমটা একটু ভুল হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক!

সবিতা চোখ পাকিয়ে বলে—ভুল-টুল চলবে না বলে দিচ্ছি। তাহলে—মাইনে কাটা যাবে! বলি সিনেমা থিয়েটারের 'হতাশ প্রেমিক', 'ব্যর্থ প্রেমিক' ইত্যাদি করে দেখেছ তো ঢের, একটা পার্ট মনে কর?

—আচ্ছা!

—কিগো, তুমি কি আমার খেলাটা ধরতে পার নি ঠিক?

—আগে পারি নি, এখন পারছি।

সবিতা সন্দিগ্ধভাবে বলে—কি পারলে বল দেখি?

অম্লানকুসুম মৃদু হেসে বলে—মুখে বলে কি হবে? খেলে যাই, দেখ—ঠিক জায়গায় ঠিক তাস ফেলতে পারি কি না।

তা খেলাটা খুব ভালই বুঝেছিল বৈকি অম্লানকুসুম, যেখানে 'পিট' ধরবার, তুরুপ দেবার, নির্ভুল দিয়ে এসেছে কদিন ধরে। বরং সবিতারই মাঝে মাঝে খেলা ভেস্তে গেছে!

ফিরে আসবার দিন আড়ালে অন্তরালে সবিতার বান্ধবী সবিতার বরকে বলে—এ আমি ভাবতেই পারি নি অম্লান! সত্যি কথা স্বীকার করলে বলতে হয় এক রকম তোমার ওপর রাগ করেই তাড়াতাড়ি নিজেকে বেঁধে ফেলেছিলাম। তবু মনে স্বস্তি ছিল—তুমি তো সুখী হয়েছ। সে স্বস্তিও ঘুচিয়ে দিয়ে গেলে তুমি।,

অম্লানকুসুমের পিসতুতো ভাই সবিতাকে একা দাঁড় করিয়ে—লোকের সামনে বৌদিই বলি আর যাই বলি একথা আমি ভুলতে পারব না সবিতা, আমার কাছে তুমি সেই সবিতাই আছ। শুধু জীবনে একটা দুরন্ত জ্বালা থেকে গেল যে,

অকারণে ইচ্ছা করে তোমার জীবনটা তুমি নষ্ট করলে।

সেই পথ দিয়েই আবার সেই গাড়িটা ছুটছিল, শুধু গতিটা বিপরীতমুখী।

অনেকটা পথ নিঃশব্দে পার হয়ে সবিতা বলল—খুব ঠকানো হল ওদের, কি বল?

অম্লানকুসুম একটু হেসে বলে—তা নিজেকে ঠকানোর চাইতে পরকে ঠকানোই তো ভাল।

সবিতা সন্দিগ্ধস্বরে বলে—একথাটার মানে কি হল?

অম্লান হেসে উঠে বলে—সব কথার যদি মানে পাওয়া যেত, তা হলে তো কোন ভাবনাই ছিল না গো! সব কথায় অর্থ মেলে না বলেই না জগতে এত অনর্থ!

আসামী

হেমদার 'স্বভাব'টা যতই ভাল হোক, 'চরিত্র'টা যে খারাপ এ কথা আড্ডার কারুরই অজানা নেই। সেই প্রসঙ্গ নিয়ে হেমদার আড়ালে যে রসাল আলোচনা আর হাসাহাসি চলে, সেটা কানে গেলে বোধ হয় ভদ্রলোক তাঁর এই সব সাবালক কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের মুখ দর্শন করতেন না।

তবে মুখোমুখী আক্রমণ কেউ করে না।

করবে কি, হেমদার সামনাসামনি থেকে যে কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না, লোকটার নৈতিক জীবনটা দুর্নৈতিক।

অথচ অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দেবারও উপায় নেই, প্রত্যক্ষ প্রমাণিত সত্য। অতএব ঘটনাটাকে "মানুষের দুর্বলতা"—বলে মেনে নিয়েছে সকলেই।

আড্ডার মধ্যে সকলের চেয়ে বয়সে বড়, এবং সকলের থেকে ওজনে ভারী, হেমদার ওই দুর্বলতাটুকু, কারুর রাগও বাড়ায় না, যোগান দেয় হাসাহাসির খোরাক।

বড় জোর কোন কোন দিন কেউ হয়তো ভারি ভাল মানুষের মত বলে—'হেমদা', কাল রাত্তিরে পাড়ায় কি মশার উপদ্রব, ভাল ঘুম হয়েছিল তো?

—ঘুম হবে না? হেমদা হাই তুলে বলেন—ঘুমের ব্যাঘাত শত্রুর হোক!

মশার জন্যে যাদের ঘুম বন্ধ হয়, তারা যে মশামাছিরও অধম রে! আন না একটা তাকিয়া আন, দেখিয়ে দিচ্ছি সাধা বিদ্যে কি বস্তু। মশা! হুঁ!

হয়তো—কোনদিন কেউ বলে—হেমদা, কী তোমার বাপরে-বাপ নাক ডাকা, উঃ! কাল রাত্তিরে কি জন্যে যেন তোমার বাড়ির কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম, কত রাত হবে—বোধ হয় পৌনে বারোটা। উঃ, সে কি শব্দ! দোতলার ঘর থেকে রাস্তা পর্যন্ত শব্দ আসছে। উঁচু নিচু সরু মোটা কত রকম। মনে হচ্ছিল যেন ঘরের মধ্যে দু দশ জন লোক কথা কইছে বুঝি।

হেমদা নস্যির ডাবরে হাত পুরে, এক মুঠো নস্যি নাকে ঠুসতে ঠুসতে বলেন—তবু ভাল যে 'দু দশ জন' মনে হচ্ছিল দু জন মনে হলেই হয়েছিল আর কি!

কথাটা যে তুলেছিল, সে মনে মনে বলে ঘুঘু লোক।...মুখে হাসে। নস্যির ডাবরটার জন্যে হাতও বাড়ায়।

তবে মজা এই, এই সব আজে বাজে কথা বললেও—'চওড়া পাড় শাড়ির' প্রসঙ্গটা স্পষ্টাস্পষ্টি কেউ তুলতে পারে না। ঠিক ওই জায়গাটাতেই যেন হেমদার একটা নীরব নিষেধ আছে। মুখের ওপরেই আঁকা আছে সেই নিষেধের নোটিস।

কাজে কাজেই "শাড়ি নিয়ে গবেষণা" আড়ালের জন্যে। চরিত্রহীন হেমদা, তাঁর স্বভাব-সুন্দর দরাজ হাসিটি নিয়ে সগৌরবে আড্ডাঘর উজ্জ্বল করে বসে থাকেন। আর তাস নিয়ে কাঁচা জোচ্চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে চেঁচামিচি করেন।

অবশ্য আরও একটা কাঁচামি আছে হেমদার, আড্ডাঘরের চায়ের চাহিদা মেটাবার ভার তাঁর স্কন্ধে। যথেষ্ট চা চালাও, আপত্তি নেই হেমদার।

ব্যবস্থাটা প্রথম কবে থেকে চালু হয়েছিল, কার প্ররোচনায় হয়েছিল মনে পড়ে না আর এখন। পাশের একটা চায়ের দোকানের সঙ্গে ব্যবস্থা করা আছে। তারা মাসিক বিল কাটে হেমদার নামে। তবে যে যখন চায়ের অর্ডার দেয়, তখনই তাকে একবার করে গঞ্জনা না দিয়ে ছাড়েন না হেমদা।

—আবার এক্খুনি? তা খাবি বৈকি, 'বামুনের ভাতে আছি, বালামের দর কে রাখে', কেমন? গাঁটের কড়ি খরচা করতে হলে বুঝতাম কেমন দণ্ডে দণ্ডে গলা শুকোত। নে গিলে নে যা পারিস! এই চলতি মাসটা পর্যন্ত—ব্যস! তার পরে আমার খাতা গুটিয়ে নিচ্ছি।

কমলকেষ্ট চা খায় না।

সে মাঝে মাঝে আমাদের দিকে বিরক্তি অবজ্ঞা আর ঘৃণার সংমিশ্রণে গঠিত একটি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। বোধ করি ভাবে—ধন্য নির্লজ্জ বটে! জিভে তোমাদের ছ্যাঁকা লাগে না? অমন চা খাওয়ার কপালে আগুন।

কমলকেষ্ট নতুন।

কবে যেন কাকে ডাকতে এসেছিল এখানে, বসে খানিকক্ষণ খেলা দেখে গেল। তারপর থেকে নিয়মিত সদস্য! বয়সে আমাদের অনেকের চাইতেই ছোট, তা ছাড়া নতুন। ঠিক করা হয়েছিল হেমদা এবং শাড়ি-সম্পর্কিত সরস আলোচনাটা ওর সামনে করা হবে না।

কিন্তু হাত দিয়ে কে আগুন ঢাকতে পাবে?

হেমদা যদি নিজের দুর্নীতির নজিব লোকের নাকেব সামনে ঝুলিয়ে রাখেন, আমরা আর কত সামলাব?

কমলকেষ্টই একদিন এসে বলল।

শুধু—'বলল' বললে ঠিক হয় না, রীতিমত নাটকীয় বীর রসেব ভঙ্গীতে উচ্চারণ করল—আপনাদের হেমদা না বিপত্নীক?

আমরা মুখ চাওয়া-চাওযি করে ঠাণ্ডা গলায় বললাম—হাঁ তাই তো জানি, মানে—বিধবা বেটাছেলেকে তো তাই বলে।

—রেখে দিন আপনাদের ইয়ার্কি। শুনতে পাই নাকি দ্বিতীয় আর কোন আত্মীয়া নেই হেমদার বাড়ি, একটা চাকব মাত্র ভরসা করে থাকেন?

আমি আরও শান্ত গলায় বলি—শুধু তাই? সে বেটা আবার বোবাকালা। হেমদাতে আর সেটাতে যখন হাঁতমুখ নাড়ানাড়ি চলে দেখলে—

কথার মাঝখানে ডাব-কাটা দায়ের কোপেব মত মন্তব্যের একটি সজোর কোপ মারে কমলকেষ্ট—থাক থাক শশাঙ্কবাবু, আব বলতে হবে না, এইবার বুঝেছি। জগতে আর লোক খুঁজে পান নি। বোবা-কালা চাকর! যার কাছ থেকে ঘুষ দিয়েও কথা আদায় করতে পারবে না কেউ। কিন্তু এই জবাবটা দিন দিকি আমায়, যার বাড়িতে দুটো মদ্দ ছাড়া আর তৃতীয় প্রাণী নেই, তার বাড়ির ছাতের আলসেয় হাতীপাড় শাড়ি শুকোয় কেন?

আমি ঈষৎ বিস্মিত ভাবে বলি—শাড়ি? ওঃ—হ্যাঁ দেখি বটে মাঝে মাঝে, কি জানি কেন?

—শাক দিয়ে আর মাছ ঢাকবেন না শশাঙ্কবাবু, খুব হয়েছে! ছিঃ ছিঃ, এই আপনাদের আদর্শ? এই আপনাদের নীতিজ্ঞান? 'হেমদা' 'হেমদা' 'করে তো

আপনারা সকলেই পাগল দেখি! অথচ হেমদার চরিত্র সম্বন্ধে কোন খোঁজই রাখেন না।

—চরিত্র? আমি আলগাভাবে বলি—না কই? তেমন করে খোঁজ কে রাখছে? তাস খেলেন ভাল, তাই জানি। চরিত্র ভাল কি না—

—তা জানেন না, কেমন? কমলকেষ্ট একটু ক্রূর হাসি হাসে—জানবেন কোথা থেকে? চায়ের দোকানের মান্থলি টিকিটটি বন্ধ হয়ে যাবে যে তাহলে! গোড়া থেকেই এইটা লক্ষ্য করেছি আর ভেবেছি—খামকা কেন লোকটা এই ঘুষটা দেয়! এখন পরিষ্কার হল! চা ঢেলে জিভ বন্ধ করে রাখা!···কিন্তু আমি এসব সহ্য করব না শশাঙ্কবাবু!

—কি করবেন? আমি সবিনয়ে প্রশ্ন করি—হেমদার ছাতের আলসেয় আপনার হাত পৌঁছবে কি করে বলুন যে শাড়ি শুকোতে দেওয়া আটকাবেন?

—কায়দার কথা আমি বুঝি না মশাই, আমি হচ্ছি সোজা কথার লোক।··· সোজা বলে দিচ্ছি—ওই আপনাদের হেমদার ক্লাবে আসা চলতে দেওয়া হবে না আর! আমার মতে ওসব লোককে প্রশ্রয় দেওয়া—সমাজের শত্রুতা করা।

হেসে বলি—সামান্য একখানি শাড়ির পাড় দেখে অত উতলা হচ্ছেন কেন কমলবাবু? হেমদার কোন আত্মীয়া বেড়াতে আসতেও তো পারেন?

—না স্যার! সে বিষয়ে অবহিত হয়েই বলতে এসেছি। প্রত্যেক দিন শুকোয়। ঠিক ওই দক্ষিণের কোণটায়। রাস্তার ও-ই মোড় থেকে চোখে পড়ে। আপনারা যদি বলেন—আপনাদের চোখে পড়ে নি কোনদিন, মুখের ওপর বলব মিথ্যে কথা বলছেন আপনারা। স্ত্রীলোকহীন বাড়িতে প্রত্যহ কেন শাড়ি শুকোয়? এ ধাঁধার মীমাংসা করবার চেষ্টা আপনারা করেন না কেন সেইটাই আশ্চর্য।···হেমদা সকলের চোখের মণি! হেমদা না থাকলে আড্ডা অন্ধকার! ধিক্! ধিক্ আপনাদের।

কেউ রাগলে ভারি মজা লাগে আমার, উদাসীন ভাব দেখিয়ে বলি—এমনও তো হতে পারে বাসনমাজার জন্যে কোন ঝি-টি আছে, আমরা ঠিক জানি না।

আর ঠেকানো যায় না কমলকেষ্টকে, রেগে তিনখানা হয়ে ওঠে একেবারে—ঝি! বাসনমাজা ঝি! বাসনমাজা ঝিয়ের মত কাপড়ই বটে!···জরিপাড়ের, কল্কাপাড়ের, হাতীপাড়ের ঢাকাই শান্তিপুরী সিমলে ফরাসডাঙ্গার শাড়ি ভিন্ন দেখলাম না কোনদিন। ও শাড়ি যদি ঝিয়ের হয়, তা হলে—সেই ঝিই গিন্নী!···

বলে দুম দুম করে চলে যায় কমলকেষ্ট।

কমলকেষ্টর রাগ দেখে কৌতুক বোধ করি। আমরা তো বরাবরই দেখি, কই রাগ হয় না তো? আগে কৌতূহল হত, এখন হয় কৌতুক।

বরাবর দেখে আসছি ছাতের আলসের বিশেষ ওই জায়গাটিতে শাড়ি শুকোয়। প্রত্যহই শুকোয়···রাস্তার মোড় থেকে দেখা যায়। কমলকেষ্ট বর্ণিত জরিপাড় কস্তাপাড় জাতীয় দামী দামী শাড়ি!

ওই নিয়েই, আমাদের হাসাহাসি। দলের কারুর সঙ্গে দেখা হলে প্রায়ই হয়তো প্রথম কথা হয় "আজ লাল কস্তাপাড়!"···"কস্তাপাড় উঠে গেছে, কালো কস্তাপাড় দেখছি রে?"

বেশি হাসি—হেমদার বুদ্ধির ঢিলেমি নিয়ে।···অপরাধ করছিস বাপু কর, মানুষের স্বধর্ম! কিন্তু অপরাধের জলন্ত প্রমাণটা পাড়াপড়শীর চোখের সামনে ঝুলিয়ে রাখা কেন!···

তবে শাড়ির মালিকানী যে বিশেষ সাবধানী তাতে আর সন্দেহ নেই। পড়শী মহিলাদের অনেক উঁকি-ঝুঁকি ব্যর্থ হয়েছে—তার সাবধানতার কাছে।···কোন-দিন দেখা যায় না তাকে।

আসলে অন্যমনস্কতা! তিন তলার ছাতের আলসেয় যে কারুর নজর পড়বে এটা খেয়াল হয় নি আর কি!

এরপর দিন তিন-চার কমলকেষ্ট আসে নি।

আজকে হঠাৎ হাঁস-ফাঁস করতে করতে এসে হাজির!

—মহাত্মা এখনও আসেন নি বুঝি?

মহাত্মা! আমরা সচকিত হয়ে উঠি।

—হ্যাঁ হ্যাঁ আপনাদের পরম পূজনীয় হেমদা।

—কই আসেন নি এখনও!

—আজ কিন্তু আমি মুখোমুখী ক্রস করব শশাঙ্কবাবু, আপনারা চটুন আর যাই করুন।···পরশু দিনে নিজের চক্ষে দেখলাম—"বসন্ত স্টোর্সে" কর্তা ভুঁড়ি নিয়ে বসে শাড়ি বাচছেন। আর চান কিছু?···তাও আপনারা 'কার জন্যে কিনছেন কি বিত্তান্ত' বলে উড়িয়ে দেবেন ভেবে চুপচাপ ছিলাম। হাতে হাতে প্রমাণ হয়ে গেল, সেই শাড়ি আজ ছাতে ঝুলছে!...এখন আমায় ধরে মারুন? প্রতিজ্ঞা করে এসেছি আজ একটা হেস্ত-নেস্ত করে ছাড়ব!

অস্বস্তিবোধ করে বলি—আচ্ছা কমলবাবু, আপনারই বা এত রাগ কেন?

কার বাড়িতে শাড়ি শুকোয়, কার বাড়িতে গামছা শুকোয়, তাতে আমাদের কি—? তাস খেলতে আসি, খেলি—চুকে গেল।

—আর কি! চুকে গেল! সামাজিক শৃঙ্খলা বলে কিছু থাকবে না, কেমন? কমলকেষ্ট তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে—পাড়ার মধ্যে বসে উনি যা খুশি করবেন, আর আমরা চোখ-বুজে থাকব!

আমি উত্তর দিতে গিয়ে থেমে যাই।

দরজায় স্বয়ং হেমদা!

কমলকে দেখেই তার ঘাড়ে একটা রদ্দা মেরে বলেন—কি হে হঠাৎ চুপ মেরে গেলে কেন? খুব তো তড়পাচ্ছিলে এতক্ষণ? কিসের কথা?

কমল ঘাড় সরিয়ে নিয়ে বুনো ঘোড়ার মত গোঁজ হয়ে থাকে।

—কি ব্যাপার হে শশাঙ্ক?

আমি হাসি চেপে বলি—কমলবাবু বলছিলেন আপনি নাকি "বসন্ত স্টোর্সে" ভুঁড়ি এলিয়ে বসে কাপড় কিনছিলেন, ওটা দুর্নীতি!

—থামুন শশাঙ্কবাবু! কমল হঠাৎ ছিটকে ওঠে—স্পষ্টই বলছি আমি, হেমবাবুর মুখের ওপরেই বলছি, স্ত্রীলোক-আত্মীয়হীন বাড়িতে শাড়ির আনাগোনা আমরা দুর্নীতি বলেই মনে করি।

শুনেই প্রথমটা হেমদার মুখটা একটু মলিন হয়ে যায়, তার পরেই হেসে উঠে বলেন—ও! তাই আজ কদিন দেখছি কমলকেষ্ট যখন-তখন আমার বাড়ির ধারে-কাছে ঘোরাঘুরি করছে?···তা আর কিছু আবিষ্কার করতে পারলে না বুঝি? বড় তো মনক্ষুণ্ন হলে কমলকেষ্ট?···আহা!

জ্বলন্ত একটা দৃষ্টি হেনে কমলকেষ্ট গম্ গম্ করে বেরিয়ে যায়। লোকটার স্বভাবই এই, চটে গেলে দাঁড়ায় না সেখানে।

কথাটা যখন এতদূর এগিয়ে এসেছে, আমাদেরও কৌতূহল দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে। একদিকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ, আর একদিকে হেমদার অপাপবিদ্ধ ভঙ্গী, আমাদের কম যন্ত্রণা দেয় না তো!

সহাস্য-মুখে যেন কিছুই নয় এইভাবে বলি, ব্যাপার কি হেমদা?

হেমদা গম্ভীর হাস্যে বলেন, শুনতে চাস্?

—বললে শুনি।

—ব্যাপারটা কি জানিস? ইয়ে অবিশ্যি আমার এক রকম পাগলামিই বলতে পারিস! কিম্বা নেশাই ধর—

হেমদা একটু থামেন।

সর্ব শরীর কণ্টকিত হয়ে আসে আমার। না জানি কি শুনতে হয়।

হেমদা ফিকেফিকে হেসে বলতে থাকেন,—হয়েছে কি জানিস তোদের বৌদির ছিল ভীষণ শাড়ির শখ! কেবল শাড়ি কিনবে আর সর্বদা সেই ভাল শাড়িগুলো আটপৌরে পরবে! কম বকুনি দিয়েছি তার জন্যে? শুনত না। মেয়েলী মুখ-নাড়ার বহর জানিস তো? হাত-মুখ নেড়ে বলত, "কবে আছি কবে নেই, শাড়িগুলো সতীনের জন্যে রেখে যাব না কি?"…সকলের মুখের ওপর একবার চোখটা বুলিয়ে নিয়ে কেমন একটা বোকা বোকা অপ্রতিভ হাসি হেসে বলতে থাকেন হেমদা—ছাতের ওইখানে একটা দড়ি টাঙিয়েছিল, শাড়িগুলো মেলে দিত আর বলত "পাড়ার লোকে দেখে চক্ষু সার্থক করুক"। বেজায় ফাজিল ছিল কি না? পাড়ার লোকের যেন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই! দেখতে আমিই দেখতাম! মানে আর কি দেখতে পেতাম। অফিস থেকে ফিরতে—মোড় ঘুরতেই চোখে পড়ত।…তা সত্যি বলতে কি শুনে হাসবি তোরা—শাড়িটা চোখে পড়তেই মনে হত যেন বাড়ি এসে গেছি। ইয়ে তোর বৌদির সঙ্গেই যেন দেখা হয়ে গেল। তারপর তো শাড়ি শুকোনো ঘুচে গেল! এদিকে—আমার ওই এক বদ-অভ্যেস হয়ে গেছে। মোড় ঘুরে ছাতের দিকে চাইলেই—প্রাণটা কি রকম যেন খাঁ-খাঁ করে—বুকটা এমন ধড়ফড়িয়ে ওঠে, বাড়ি এসে তার জের মিটতে ঘণ্টা কেটে যায়! অভ্যেস জিনিসটা বড় পাজি!—যত ভেবেছি তাকাব না—পড়বেই চোখ।—শেষে ওই বুদ্ধি খাটালাম, ভোরবেলা চুপিসাড়ে এক ফাঁকে ছাতে উঠে একখানা শাড়ি মেলে দিয়ে আসি। ঝুলতে থাকে সারাদিন—বাতাসে উড়ে এলোমেলো হয়ে কার্নিসে লুটোপুটি খেতে থাকে—ঠিক তেমনি—আগের দিনের মত, চোখে পড়লেই মনে হয় যেন সব ঠিক আছে। অফিস থেকে ফিরতে তাকাতে তাকাতে আসি!—লোক হাসানো আর কাকে বলে—য়্যাঁ?

মল্লিক লেনের সুবিখ্যাত 'জীবন-মা'য়ের বাড়ি আজ লোকে লোকারণ্য।

মল্লিক লেনের গলির মধ্যে হলেও বাড়িটা প্রাসাদতুল্য। সেই বাড়িতে তিল ধরবার জায়গা নেই। অগণিত লোক এবং যে সে লোক নয়, লোকের মত লোক।

জজ-ম্যাজিস্ট্রেট, উকিল-ব্যারিস্টার, ডাক্তার-মোক্তার, জমিদার-ব্যবসাদার—কি নেই? আছে বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী, স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ—সব। কাতারে কাতারে আসছে, জড়ো হচ্ছে। ঘরে বারান্দায়, ছাতে দালানে, সিঁড়িতে, সিঁড়ির তলায়, যে যেখানে পাচ্ছে দাঁড়াবার একটু ঠাঁই।

লোক হবেক রকমের হলেও অবস্থা বর্তমানে সকলের একই রকম। শুকনো মুখ, কম্পিত কণ্ঠ, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি।

ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করবার সময় ফুরিয়েছে, এখন কেবল অলঙ্ঘ্য নিয়তিকে নত মস্তকে মেনে নেওয়া, অপ্রতিরোধ্য ক্ষতিকে নীরবে বহন করা।

শুধু বাড়ির ভিতরে নয়, বাইরেও দস্তুর মত ভিড়।

সদর গেট থেকে শুরু করে—মল্লিক লেন ছাড়িয়ে বড় রাস্তা পর্যন্ত লোক। এরা অবশ্য নিতান্তই লোকমাত্র। দীন-দুঃখী ইতর সাধারণ। তবু এদের মধ্যেও বইছে একটা বিরাট ক্ষতির ক্ষুব্ধ ঝড়। সভ্যভব্য ভদ্রলোক নয় বলে আবেগ প্রকাশ করতে লজ্জা নেই এদের, অসঙ্কোচে কাঁদছে, কপাল চাপড়াচ্ছে, 'হায় হায়' করছে।

এদের মধ্যে আছে মুটে-মজুর, মুদি-দোকানী, গয়লা, রিক্সা-কুলি, আছে ঘুঁটেওয়ালী, মজুরনী, ঠিকে ঝি। প্রত্যেকের একই দুঃখ। আজকে হয়ত বা হাইকোর্টের জজের সঙ্গেও একই পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে এরা ক্ষতির সমতল ভূমিতে।

মল্লিক লেনের অনেক বাড়িতেই আজ হাঁড়ি চড়ে নি, দৈনন্দিন কাজের চাকা রয়েছে আটকে। খবর পেয়ে ছুটে এসেছে যে যেমন অবস্থায় ছিল। এসে আর ফিরতে পারছে না, হেস্তনেস্ত একটা দেখে যেতে চায়। কিন্তু বাড়ির মধ্যে ঢুকতে সাহস নেই। আগে এসেছে কত সহজে, যেন রীতিমত অধিকারের দাবিতে। আজ সে সাহস ফুরিয়েছে। গলির মোড় থেকে রাস্তার শেষ পর্যন্ত মোটর গাড়ির লম্বা লাইন তাদের সহজ ভরসা কেড়ে নিয়েছে।

দুঃসংবাদ তো আর শুধু এই পাড়াটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, দূর-দুরান্তর অবধি পৌঁছেছে।

আগে যারা খবর পেয়েছে, তারা খবর দিচ্ছে অন্যকে। বন্ধুগোষ্ঠীকে যথেচ্ছ

ব্যবহারের সুযোগ দিতে ছেড়ে দিয়েছে নিজস্ব মোটর, ছেড়ে দিয়েছে টেলিফোন যন্ত্র।

এ ক্ষতি তো একার নয়, সকলের। তাই উদার হয়ে গেছে সবাই।

বিশেষ একটি গোষ্ঠির আজ নিতান্তই দুর্দিন। 'জীবন-মা'র ভক্তগোষ্ঠী। 'জীবন-মা' আজ বিদায় নিচ্ছেন।

'জীবন-মা' বিদায় নিচ্ছেন,—এই একটিমাত্র লাইনে সংবাদটা পরিবেশন করা যায় মাত্র, কিন্তু ব্যক্ত করা যায় কতটুকু? 'জীবন-মা' যে এদের কতখানি, সে কি ভাষায় বোঝানো যাবে? সীমাবদ্ধ কয়েকটি অক্ষরে?

'জীবন-মা' এই অগণিত ভক্তের প্রাণস্বরূপ। তিনি ছিলেন, পাহাড়ের আড়ালে ছিল সবাই। পাহাড় ধ্বসে পড়েছে আজ, আশ্রয় হারাতে বসেছে এরা। মাথার ছাতা যাচ্ছে সরে।

'মা গেলেন, আর কি রইল।'

এই হাহাকার উঠেছে সকলের মনের মধ্যে।

সব পাওয়া যেত মায়ের কাছে,—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। মায়ের ভরসাতেই নির্ভয়ে ঘর করেছে ছেলেপুলে নিয়ে। বাঁধা ছিল বুক।

আর কি পারবে তাদের বাঁচিয়ে রাখতে?

বড় বড় ডাক্তারের হাত থেকে রোগী ছাড়িয়ে নিয়ে মায়ের দরবারে আর্জি করতে এসেছে ধনী মাড়োয়ারীর দল, টাকার থলি উপুড় করে ঢেলে দিয়ে গিয়েছে মার সেবার জন্যে। বিলাতী ডিপ্লোমাধারী বিচক্ষণ ডাক্তার নিয়ে এসে মৃতকল্প ছেলেকে নামিয়ে দিয়েছেন 'জীবন-মা'র পায়ের তলায়, এককণা জীবনের আশায়।

পেয়েছে—সবাই সব পেয়েছে। অগাধ শক্তিময়ী মার অপরিসীম করুণায় ধন্য হয়েছে সকলেই। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে কৃপাবর্ষণ করে গেছেন মা।

কি না ছিল মায়ের ভাঁড়ারে?

'জীবন-মা'য়ের আশীর্বাদ নিয়ে নামলে কর্মক্ষেত্রে নিশ্চিত উন্নতি।

বিত্তাস্থানে বৃহস্পতির যোগ ঘটাবার বিদ্যা ছিল মার আয়ত্তে। মেয়েরা নিশ্চিন্ত থাকত, স্বামীপুত্রের পরমায়ু মায়ের কাছে গচ্ছিত আছে ভেবে। চুরি যাবে না, যমে নিতে পারবে না, মায়ের কাছে থাকলে।

উঠতে, বসতে, এক পা বাড়াতে ছুটে এসেছে তারা, নির্দেশ নিয়ে গেছে মার কাছ থেকে। মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে সৎপরামর্শ দিয়েছেন মা, বিরক্ত হন নি, বেজার হন নি।

বিরাট শক্তিময়ীর ভিতরে লুকোনো ছিল কি কোমল স্নেহ!

সেই স্নেহময়ী ছেড়ে যাচ্ছেন আজ অসংখ্য ভক্তকে বিমূঢ় করে, শোকের পাথারে ভাসিয়ে দিয়ে।

জীবন-মায়ের জীবনদীপ নির্বাপিত হলে অবশ্যই রচিত হবে তাঁর জীবন-ইতিহাস। তিয়াত্তর বৎসরব্যাপী সুদীর্ঘ জীবনের অলৌকিক রহস্যময় কাহিনী।

শত শত ভক্তের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে আহরণ করে সাজানো হবে সেই ইতিহাস—কখন কি মহিমা দেখিয়েছেন মা, কবে কি কি বিভূতি। তাদের সৌভাগ্যের ভাগ দেবে তারা পরবর্তী ভাগ্যহীনদের।

শাখায়-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে মায়ের মহিমা যখন প্রচারিত হবে ঘরে ঘরে, তখন যারা দেখে নি, তারা ভাববে, আহা, অবহেলায় কি সুযোগ হারিয়েছি! যারা দেখল, তারা ভাববে,—হায় হায় আগে তো এতটা বুঝি নি।

কিন্তু এসব ভবিষ্যতের কথা,—দীপ নির্বাপিত হলে। কিন্তু দীপ এখনও জ্বলছে—তৈলহীন, নির্বাণোন্মুখ। এই অবসরে স্মরণ করে নিই অতীতের ক্ষীণ একটু ইতিহাস।

মল্লিক লেনের এই বাড়িখানার ইতিহাস।

হ্যাঁ, বাড়িরও ইতিহাস থাকে বৈকি। বাড়ি তো হঠাৎ একদিন আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ওঠে না। পৃথিবীর বুক বিদীর্ণ করে তৈরী হয় তার বনেদ, অনেক মানুষের রক্ত-জল করা পরিশ্রমে গাঁথা হয় পাকা দেওয়াল।

কিন্তু যা বলছিলাম—

অনেক বছর আগে—মল্লিক লেনের এই প্রাসাদতুল্য বাড়িটার পিছনে—এখন যে এবড়ো-খেবড়ো খানা-ডোবা-গোছের পড়ো এক টুকরো জমি পড়ে রয়েছে, ঐখানে ছিল একখানা চালা ঘর। একখানা ঘর আর এক টুকরো রোয়াক।

আশপাশের বস্তি থেকে একটু পৃথক।

এই একখানি ঘরের মধ্যে এক গাদা কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে যে দম্পতি বাস করত, তারা জাতে ব্রাহ্মণ হলেও হালচাল ছিল বস্তিবাসীদেরই মত।

অবশ্য হালচালের ভদ্রচাল আশা করাই অন্যায়। অখ্যাত প্রেসের কম্পোজিটরের পক্ষে সাত-আটটা ছেলেমেয়েকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারাই ।

তবে বৌটি ছিল ভারি শান্তশিষ্ট।

উদয়াস্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, পরনে ছেঁড়া ময়লা শাড়ি, জোটে না উপযুক্ত আহার, জোটে না মাথায় মাখবার একটু তেল, তার উপর অতগুলি বাচ্চার দৌরাত্ম্য। তবু হাসিমুখ ছাড়া নেই।

তুরন্ত ছেলেমেয়েকে সামলাতে না পারলে নিজে বরং কেঁদে ফেলেছে, পারে নি তুটো চড়চাপড় বসাতে।

অবিশ্যি স্কুল-পাঠশালার বালাইহীন সেই সৈন্যবাহিনী বাড়িতে উপস্থিত থাকত খুবই কম। তাদের সারাদিনের লীলাক্ষেত্র ছিল সামনের মাঠটা। যেখানে আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে 'জীবন-মা'র প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়িখানা।

মাঠে আরও কয়েকটি প্রাণীর আবির্ভাব হত, সে হচ্ছে পাড়ার গোয়ালাদের মহিষগুলি। মানুষে আর মহিষে দিব্যি একটা একাত্মবোধ হয়ে গিয়েছিল।

কাদায় নিমজ্জিত মহিষগুলি যখন প্রায় ধ্যানস্থ অবস্থায় চোখ বুজে শুয়ে থাকত তখন বড় তুটি ছেলে অবলীলাক্রমে তাদের পিঠে চড়ে 'ঘোড়া-ঘোড়া' খেলত। বোঝা যেত না যে, প্রাণীগুলো সত্যিই জীবন্ত প্রাণী, না ইট-পাথর! ওরা তুইভাই নিজেদের হিসেবে ভাগাভাগি করে নিয়েছিল মহিষগুলিকে, একজন অপরের সম্পত্তির পিঠে চড়ে বসবে, এমন বেআইনী ব্যাপার ঘটা সম্ভব ছিল না।

কিন্তু জানোয়ার জানোয়ারই।

হঠাৎ একদিন, কি কারণে বলা শক্ত, ক্ষেপে উঠল একটা, টগবগ করে ফুটে উঠল জানোয়ারের রক্ত। মল্লিক লেনের সরু গলির মধ্যে ঝড় উঠল যেন।

তুর্দান্ত বেগে ছুটোছুটি করল কালো পাহাড়টা, তোলপাড় করল পাড়া।

ভাঙ্গল বাঁশের খুঁটি, চালা ঘরের বেড়া, তার সঙ্গে ভাঙ্গল গরীবের কপাল।

যমরাজের বাহন গরীবের বড় ছেলেটিকে ধারালো শিঙের গুঁতোয় তাড়াতে তাড়াতে ঠেলে পাঠিয়ে দিল স্বয়ং যমরাজের খাস-তালুকে। সেই রক্তাক্ত বিদীর্ণ দেহের বিভীষিকাময় ছবির কোন ছায়া কি লুকিয়ে আছে এই মস্ত বড় বাড়ির কোন একটু কোণে?

এ বাড়ির সঙ্গে তার সংস্রব কি?

এরপর থেকে সেই শিশুবাহিনীকে আর মাঠে দেখা যেত না। শান্ত সহিষ্ণু মা কেমন যেন অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে, কেমন যেন অধৈর্য। সবাইকে আগলে রাখছে নিজের পক্ষপুটে। খেলতে দেবে না কাউকে, দেবে না বাইরে বেরোতে।

তবু ভাগ্য যেন ব্যঙ্গ করল—ভীরু জননীকে। এত আগলে রেখেও রাখতে পারল না আরও একজনকে।

প্রায় অচিকিৎসায় মারা গেল কোলের মেয়েটা। সাত মাসের একটা মেয়ের জন্যে ডাক্তার ডেকে আনবে, এত পয়সা কম্পোজিটরের নেই। মেয়েটা কয়েকদিন কাঁদল তারপর জানোয়ারের মত আর্তনাদ করতে লাগল, অবশেষে নিস্তব্ধ হল।

মা এবারেও চীৎকার করে শোক জানাল না, শুধু আরও একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠল; একটু বেশি প্রখর। কথা কয় পাড়ার যার তার সঙ্গে, ধিক্কার দেয় স্বামীকে।

এ পর্যায়েও কাটল একরকম। তারপর ঘটল একটা অভাবনীয় ঘটনা। করুণরস আমদানি করবার জন্যে বানিয়ে গল্প বলা নয়, বাধ্য হয়ে বলা—কাঁচা লেখকের লেখা উপন্যাসের মত একটা বিশ্রী ব্যাপারই ঘটে গেল। কম্পোজিটর যথারীতি কাজে বেরোল, কিন্তু যথারীতি ফিরে এলো না।

মরল কি রইল, কেই বা খোঁজ করবে?

রাত কাটল···কাটল দিন···কাটল সপ্তাহ-মাস-বছর। মল্লিক লেনের এই চালাঘরে আর ফিরে এল না সে। কেন গেল, কোথায় গেল, মরল কি রইল, কেই বা খোঁজ করবে?

তারপরের ইতিহাস প্রথমদিকে নিতান্তই বিশেষত্বহীন। উপবাস আর অর্ধাহারের ইতিহাস। গ্লানি আর অপমানের ইতিহাস। এই চালা ঘরটুকুর মাসিক আড়াই টাকা ভাড়া দেবার সামর্থ্যও নেই, বাড়িওয়ালা গঞ্জনা দিয়ে যায়, তাড়িয়ে দেবার ভয় দেখায়······মরে হেজেও পাঁচটি ছেলেমেয়ে—এতগুলির হাত ধরে কোথায় যাবে,—এ প্রশ্ন করলে কুৎসিত ইঙ্গিত করে।

এ পর্যন্ত যেন নেহাৎ বাজার-চলতি সস্তা ইতিহাস, প্রতিনিয়ত যা ঘটছে অসহায় দরিদ্রের জীবনে।

হঠাৎ একদিন এল বিপর্যয়, এল অদ্ভুত নূতনত্ব, ইতিহাসের মোড় গেল ঘুরে।

চালা ঘরের একটি কোণে ইট দিয়ে উঁচু করা একটা তেঠেঙো জলচৌকির ওপর সাজানো থাকত একটা লৌহমূর্তি তামার ঘটি, একটা মাটির গণেশ, আর বোধ করি—চালা ঘরের অধিবাসিনীর আঁকড়ে ধরবার আশ্রয়, সমুদ্রে তৃণখণ্ড—মা কালীর একখানি পট, যার তলার দিকের মার্জিনে আঁকাবাঁকা অস্পষ্ট অক্ষরে লেখা ছিল—"বিপদ-তারিণী মা" এবং তার তলায় আরও ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা "চিরদাসী অভাগিনী জীবনবালা।" এইখানে দু বেলা মাথা ঠুকত—ধরে নিন—যার নাম জীবনবালা। এমনি মাথা ঠুকতে ঠুকতে একদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ চৌকির

কাছ থেকে উঠে এল জীবনবালা, অসম্বৃত কেশ-বেশ, পাগলের মত চাহনি, মুখে অসংলগ্ন কথা।

মা কালীর 'ভর' হয়েছে জীবনবালার ওপর।

কেমন করে যে এ-খবর পাড়ায় প্রচার হয়ে গেল, সে তথ্য মা-কালীই জানেন। কিন্তু দেখা গেল, কৌতূহলের বশেই হোক, অথবা সভয় শ্রদ্ধা নিয়েই হোক, লোকের পর লোক আসছে জীবনবালার অভূতপূর্ব অবস্থা দেখতে।

কখনও হাসছে জীবনবালা, কখনও কাঁদছে। কখনও রুক্ষ এলোচুল সুদ্ধ মাথাটাকে 'চাল্লি' করতে করতে 'মা-মা' রব তুলে অচৈতন্য হয়ে পড়ছে। ফেনা উঠছে মুখে, চোখের তারা উঠছে কপালে!

'পাগলী মায়ের যে কখন কার ওপর কৃপা হয়, সে লীলা বোঝা ভার।' সকলের মুখে এই ভাবের কথা।

কথাটা মিথ্যা নয়, যথার্থই মায়ের লীলা বোঝা ভার। চিরদুঃখিনী জীবনবালার দিকে হঠাৎ তাকিয়ে বোধ করি, একটা অনুশোচনা এসেছিল তাঁর, তাই এই ত্রুটি-পূরণে মন দিলেন।

কোথা দিয়ে কি হতে থাকল—

জীবনবালার নূতন জীবনের বিজ্ঞাপন কি ভাবে প্রচার হয়ে গেল পাড়ায়, ভিন-পাড়ায়, দূর-পাড়ায়—কে জানে!

লোক আসতে লাগল দলে দলে। জীবনবালার মাধ্যমে মা-কালীর প্রত্যক্ষ দর্শন চায় তারা, চায় তাঁর কৃপা-কণা।

কণা কেন, মুঠো মুঠো বিতরণ করতে থাকেন জীবনবালা, কার্পণ্য নেই। যখন 'ভর' ছাড়ে, সুস্থভাবে কথাবার্তা বলেন, হেসে হেসে বলেন সকলকে: 'যার ধন তার পুণ্যি যে দেয় তার হাত ধন্যি। আমি তো মায়ের দাসী রে। মা হুকুম দিচ্ছেন, আমি তোদের পাতে পরিবেশন করছি মায়ের ভাঁড়ার থেকে নিয়ে—'

লোকে ক্রমশঃ মা-কালীকে ভুলল, চিনল শুধু 'জীবন-মাকে'। বলতে লাগল —আমরা ওসব তত্ত্বকথা বুঝি না মা, শুধু তোমাকেই বুঝি।'

জীবন-মা হেসে বলতেন, 'যেমন রাস্তার লোকে রাজাকে বোঝে না, বোঝে রাজবাড়ীর দারোয়ানটাকে।'

মা-কালীর অপার করুণায় আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভাল ভাল সব কথা

বলতে শিখলেন জীবনবালা, হাঁ করে শোনে লোকে। এই রকম সহজ অথচ রহস্যময়, সরল অথচ তত্ত্বপূর্ণ সুমিষ্ট কথা তারা শোনে নি কোথাও।

সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে সদুপদেশ আনা তো সুলভ ব্যাপার নয়, তাই কৃতকৃতার্থ ধন্য হয়ে যাচ্ছে সবাই। যা সকলের কাছে সুলভ, যা ঊর্ধ্বলোকের হলেও তাদের মাটির ঘরের।

বলেন, 'ওরে, তোরা আমাকে মা-ই বলিস আর মাসীই বলিস, আমি তো জানি, আমি তোদের চাকরানী। তোদের সেবা করবার জন্যেই আমার মা আমাকে মাইনে দিয়ে রেখেছেন, এ আমার বাহাদুরি নয়, চাকরি।'

অহরহ এমনি সাদাসিধে সরল কথা যার মুখে।

ইতর-ভদ্র সবাই আকৃষ্ট হয়।

গীতা, ভাগবত, বেদ-বেদান্তের কঠিন ব্যাখ্যা শুনতে হয় না, শুনতে হয় না শাস্ত্রের কচকচি। বিধিনিষেধের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জোড়হস্তে 'হুজুর, ধর্মাবতার' করতে হয় না। লোকে আকৃষ্ট হবে না তো কি?

এই তো চায় মানুষ, বিনা পরিশ্রমে চতুর্বর্গ-লাভ!

এইভাবে কাটতে থাকে দিন—মাস—বছর। কোথা দিয়ে কি হয়ে যায়। জীবনবালা আর রাঁধেন না—বাড়েন না। সংসারের তুচ্ছ কাজ করবেন তিনি, এ ভাবাও যায় না। তবু সবই হয়ে যায়।

ছেলেদেব খাওয়া-দাওয়ার ত্রুটি হয় না, কে কোন্ ফাঁকে দিয়েছে স্কুলে ভর্তি করে, দিয়েছে ভাল জুতো-জামা।

বাজার হালে রয়েছে তারা।...একে একে বিয়েও হয়ে গেল দুই মেয়ের।

কালীঘাটের পটকে বাঁধিয়ে আটকে ফেলা হয়েছে রূপোর বন্ধনীর মধ্যে। পটের গলায় সোনার মালা, পরনে জমকালো শাড়ি। ভক্তদের উপহারে চৌকি বোঝাই হচ্ছে মা-কালীর, ঘর ভরে যাচ্ছে জীবনবালার।

চালাঘরে আর মানায় না মাকে, কুলোয় না জীবনবালাকে।

বিরাটের জন্যে চাই বিরাট ব্যবস্থা!

তারপর একদিন দেখা যায়, সামনের মাঠে বোঝাই হচ্ছে ইট-পাটকেল, লোহা-লক্কড, কোদাল বসানো হচ্ছে পৃথিবীর বুকে।

হতভাগা কম্পোজিটর যদি কোনদিন ফিরে আসে, সে কি চিনতে পারবে কোথায় এসেছে? ভাববে, 'পথ ভুল করলাম!'

কিন্তু তাকে কে চায় ?

জীবনবালার জীবন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তার ছায়া, মুছে গেছে ছেলেমেয়েদের স্মৃতির জগৎ থেকে। মা-কালীর সংসারে সামান্য একটা প্রেসের কম্পোজিটারের ঠাঁই কোথায় ? সে অবান্তর, অবাঞ্ছিত।

কোথা থেকে টাকা এসে যায়, গড়ে ওঠে পাকা দেওয়াল, ধীরে ধীরে একদিন আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ওঠে বিরাট তিনতলা প্রাসাদ।

মল্লিক লেনের সরু গলির মধ্যে বলেই হয়তো আরও এত বড় দেখায়। বড় রাস্তায় জমি দেখা হয়েছিল, ভক্তরাই দেখেছিল, কিন্তু জীবন-মার নিষেধ, এইখানেই রাখতে হবে মা-কালীকে। এই মায়ের পীঠস্থান।

ধূলি-মলিন বিবর্ণ পটের অন্তর্বর্তিনী জাগ্রত মা চালাঘর থেকে উঠে এলেন তিনতলার উপরে, তেঠেঙো চৌকি থেকে মেহগ্‌নির কাঠরায়।

ঐশ্বর্য বাড়ল মার, বাড়ল মায়ের দাসীর।…আরও পরে ঘুচে গেল দেবত্ব আর দাসীত্বের বিভেদ। পূজার উপকরণে ফুল-বিল্বপত্রের স্তূপে ঢাকা পড়ে থাকে—আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা 'চিরদাসী জীবনবালা'র নাম। এখানে প্রণাম করতে আসে লোকে নেহাৎই নিয়ম-রক্ষার্থে।

সকলেই জানে, সব কিছুই 'জীবন-মা'।

তেত্রিশ বছর থেকে তিয়াত্তর বছর পর্যন্ত এই ইতিহাস। পাথরের নুড়ি জমে জমে গড়ে উঠেছে পাহাড়। ছোট ছোট অলৌকিক ঘটনা জমাট হয়ে গেছে অখণ্ড অলৌকিকত্বে। এখন জীবন-মার প্রত্যেকটি ব্যবহারের মধ্যে বৈশিষ্ট্য খুঁজে পায় ভক্তরা।

তেষ্টা পেয়েছে শুনলে ভক্তবৃন্দ হাসে, ভাবে—'লোকশিক্ষা দিতে ক্ষুধা-তৃষ্ণার ভান! কে না বোঝে, মা ক্ষুধা-তৃষ্ণার অতীত!' সংসারী লোকের মত সাধারণ কোন কথা বললে আরও অভিভূত হয় তারা। কী সরলতা! কী বিনয়। এমন নইলে মা।

সেই মা আজ ছেড়ে যাচ্ছেন—শত শত সন্তানকে শোকের পাথারে ভাসিয়ে যাচ্ছেন। কে কাকে সান্ত্বনা দেবে ?

সজ্ঞানে যাচ্ছেন মা, একে একে আসছে সবাই, প্রণাম করছে। ইশারায় আশীর্বাদ করছেন মা।

মাথার কাছে বসে পুত্রবধূ অভয়া!

আধাবয়সী ভদ্রমহিলা, ধর্মপ্রাণা, শান্ত-গম্ভীর-স্বভাবা। শাশুড়ীকে ভক্তি করেন দেবতার চেয়েও বেশি। ইদানীং শাশুড়ীর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পুজো-অর্চনা, দেব-সেবার অনেক কিছু ভারই নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন তিনি। ভক্তবৃন্দ সকলে অভয়াকেই চেনে। আরও যে দুই বৌ আছে, তারা আধুনিকা। মা-কালীর প্রসাদে রুচি আছে তাদের, রুচি নেই নামে। ঠাকুর-ঘরের দিকে ঘেঁষে না তারা। জীবন-মায়ের পরেই 'অভয়া দিদি।' শাশুড়ীর ডানহাত। শাশুড়ীর অসুখে সেই যে বসেছেন পাখা নিয়ে—পুরো দুটি দিন নড়েন-চড়েন নি।

এক সময় যখন ভক্তদের অনেকে গিয়েছে প্রসাদ গ্রহণ করতে, ঘর প্রায় খালি, জীবন-মা ঘুমন্ত চোখ মেলে কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠলেন: 'বৌমা, একটা কথা বলব তোমায়।'

—'বলুন মা!'

মাথা নিচু করে কান পাতলেন অভয়া। এগিয়ে এলেন, ঘরে যে দু-চারজন মহিলা ছিলেন। কি বলতে চান জীবন-মা, কোন অপূর্ব মন্ত্র! আগ্রহে ঔৎসুক্যে জ্বলজ্বল করে উঠল তাঁদের মুখ।

আহা, মা আমাদের দয়াময়ী। নিশ্চয় লোকহিতার্থে 'কিছু' দিয়ে যাবেন অভয়া দিদিকে। সুদীর্ঘ কালের সাধনালব্ধ শক্তির এক কণা। অন্ততঃ দুরারোগ্য জটিল ব্যাধি-নিরাময়ের অব্যর্থ ঔষধগুলো,—মাদুলি-কবচ-তাবিজের মূলমন্ত্র।

'শিখে নাও অভয়া দিদি, শুনে নাও ভাল করে, কি বলছেন মা—' মৃদু একটা গুঞ্জন উঠল ঘরে।

অভয়া দেবীও তাই অনুমান করছেন। শাশুড়ী কিছু দিয়ে যাবেন তাঁকে।

—'বলুন মা, কি বলতে চান।'

—'কত লোক'!—জীবন-মা চারদিকে তাকালেন—'সে বড় গোপন কথা, কপাটটা লাগিয়ে দাও মা।'

না, আর সংশয় নেই। নিশ্চয় মা চলে যাবার সময় উত্তরাধিকারিণী করে যাবেন অভয়াকে। যারা ঘরে ছিল, তারা অনিচ্ছামন্থর গমনে গুটি গুটি বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। মার হুকুম—থাকবার জো নেই। যাবার সময়ে আর একবার সাগ্রহ দৃষ্টিনিক্ষেপ করে যায় অভয়ার দিকে। যেন—'তোমার হাতেই এবার থেকে আমাদের জীবনমরণ!'

কপাট ভেজিয়ে দিয়ে কাছে এলেন অভয়া—'মা, বলুন এবারে। দোর দিয়েছি।'

জীবন-মা তাকিয়ে দেখে নিঃসংশয় হন।

তারপর কম্পিত কণ্ঠ ঝেড়ে ঝেড়ে স্বাভাবিকত্ব আনবার চেষ্টা করে ধীরভাবে বলেন, 'বৌমা, তুমি আমার পেটের মেয়ের মত, তাই আজ মরণকালে এ-কথা তোমাকেই বলে যাব—'

হাঁফ ধরছে জীবন-মার, রোগা পাত্‌লা দেহ কেঁপে উঠছে দীর্ঘনিশ্বাসের তালে তালে, কিন্তু অভয়া নিষেধ করতে পারলেন না কথা বলতে। শুনতেই হবে যে, শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেও যদি শেষ হয় সেকথা, তবু শোনবার চেষ্টা করতে হবে কান খাড়া করে।

স্বার্থ নিয়েই জগৎ যে।

—'মা জল খাবেন ?'

—'নাঃ। হ্যাঁ, যা বলতে চাইছি—বড় লজ্জার কথা, বড় গোপন কথা, বড় ভয়ঙ্কর কথা। বলতে মুখে আটকে যাচ্ছে। তবু সেকথা না বলে উপায় নেই। না বলে গেলে মরেও স্বস্তি হবে না আমার। আজ চল্লিশ বছর ধরে যে পাপ করে চলেছি—'

আবার থামেন জীবন-মা দম নিতে।

অভয়া অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন—এ কোন ধরনের কথা ? এরকম কোন কথার জন্যে তো প্রত্যাশী ছিলেন না তিনি।…মা ভগবতীর অংশস্বরূপা শাশুড়ী-ঠাকুরাণীর মুখে এ কি ভাষা ?

ভেবেছিলেন, সাধনমার্গের কোন গূঢ় রহস্য শিক্ষা দিয়ে যাবেন তিনি প্রিয়পাত্রী অভয়াকে। অথবা লোক-হিতার্থে কোন ঔষধপত্র, ঝাড়-ফুঁকের মন্ত্র, জলপড়া-তেলপড়ার ভিতরকার তত্ত্ব। এ কি ? তবে কি মৃত্যুকালে প্রলাপ শুরু হল মায়ের ?

—'মা, একি বলছেন আপনি ? ভাল করে ভেবে বলুন'—অভয়া কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলেন : 'আপনি যে মা আদ্যাশক্তির অংশ, সেকথা ভুলে যাচ্ছেন কেন ? ইষ্টমন্ত্র জপ করুন, মায়ের নাম করুন।'

—'ইষ্টমন্ত্র ?' জীবন-মা ম্লান হাসেন—'এই আজ আমার ইষ্টমন্ত্র—কবে এই ভয়ঙ্কর কথা প্রকাশ করে মুক্তি পাব, সেই আমার ধ্যান ধারণা, জপ-তপ ; কিন্তু প্রকাশ করে তো এ পোড়ামুখ আর দেখাবার জো নেই মা, তাই শেষের দিনের অপেক্ষায় ছিলাম। আজ আমার সেদিন এসেছে—'

—'মা মা'—অভয়া ব্যাকুল হয়ে ওঠেন : "মা চুপ করুন। এখন আপনার

মাথার ঠিক নেই। যা বলতে চান, তা বোধ হয় বোঝাতে পারছেন না—'

—'পারতেই যে হবে বৌমা'—জীবন-মা যেন শেষ চেষ্টায় সতেজ হয়ে ওঠেন 'আমি মরে গেলে একথা তুমি প্রকাশ করে দিও, এই আমার অনুরোধ। এখন—এখন সাহস হচ্ছে না, বড্ড ভয়! বড্ড ভয়! দুঃখের জ্বালায়, অভাবের জ্বালায় যে মহাপাপ করেছি, জীবনভোর তার জের টেনে চলেছি, ফেরবার পথ খুঁজে পাই নি। আমার সেদিনের নিরুপায় অবস্থার কথা মনে করে যদি ক্ষমা করতে পার কোর।'

'মা, আপনার কথা যে কিছুই বুঝতে পারছি না আমি—'

হতাশভাবে তাকান অভয়া এই মহীয়সী দেবী-মূর্তির পানে। হায়, অভয়ার আশঙ্কাই ঠিক, শেষ সময়ে ভুল এসে গেছে জীবন-মার, কি একটা খেয়াল ঢুকেছে মাথায়, সেই কথাই বলছেন। তারকব্রহ্ম নাম শোনালে ভাল হত।

কিন্তু জীবনমার ভুল হয় নি, নির্ভুলভাবে বলে চলেন তিনি: 'বুঝতে না পারারই কথা, কিন্তু তুমি বুদ্ধিমতী, বুঝবে। এই যে আমাকে তোমরা ভক্তি করছ, ভয় করছ, মান্য করছ, এ সব তোমাদের ভুল, সব বাজে খরচ। এর এক-তিলও আমার পাওনা নয়। আমার সব মিথ্যে, সব ফাঁকি, সব ভুয়ো।' থর থর করে কাঁপতে থাকে বার্ধক্য-জীর্ণ দেহ, কাঁপতে থাকে কণ্ঠস্বর—'সব জোচ্চুরি। এই চল্লিশ বছর ধরে ফাঁকি দিয়ে এসেছি আমি, জোচ্চুরি করে এসেছি সকলের সঙ্গে···আমায়—একটু জল দাও বৌমা—'

তাড়াতাড়ি মাথার কাছে রক্ষিত ঘটি থেকে একটু গঙ্গাজল দিয়ে অভয়া কাতরভাবে বলেন: 'মা, আপনার পায়ে পড়ি, চুপ করুন।'

—'না বৌমা, চুপ করতে বোল না আমায়, এ আমাকে বলতেই হবে, ফাঁকির ওপর যে মন্দির গড়ে তুলেছি, সে নিজ-হাতে ভেঙে দিয়ে না গেলে মরেও নিস্তার নেই আমার। তোমাদের এত ভক্তির, এত ভালবাসার, এত বিশ্বাসের যোগ্য আমি নই। আমার ঠাকুর মিথ্যে, সাধনা মিথ্যে, পূজো মিথ্যে। সব ছল!··· ঘেন্নায় শিউরে উঠছ?···ওঠ—কিন্তু আমার সেই দুর্দিনের কথা—নিরুপায় অবস্থার কথা মনে করে একটু দয়া কোর মা, ভেবে দেখ—পাঁচটি নাবালক ছেলেমেয়ে নিয়ে সধবা হয়েও বিধবা। গঞ্জনা করছে পাওনাদার, লাঞ্ছনা করছে বাড়িওলা, উপোসী ছেলেমেয়ের মুখের দিকে তাকালে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে ইচ্ছে করে, অথচ তারাই মরণের পথে বাধা।···আর একটু জল—'

—'মা—'

—'শোন শোন, বাধা দিও না, চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে, ফুরিয়ে আসছে ক্ষমতা···মৃত্যু নিকট হয়ে আসছে, টের পাচ্ছি। সেদিনও এমনি অন্ধকার হয়ে উঠেছিল দশদিক, যুদ্ধ করবার ক্ষমতা যাচ্ছিল ফুরিয়ে···কিন্তু মৃত্যুর দরজার কাছ পর্যন্ত পৌঁছে ফিরে এলাম পাপ মায়ার বন্ধনে। ওই হতভাগাগুলোর মুখ চেয়ে নিজেকে বিলিয়ে দিলাম মিথ্যের কাছে। মায়ের নাম নিয়ে করলাম ছলনা, করতে লাগলাম জোচ্চুরির ব্যবসা!···যেমন যাত্রা-থিয়েটার করে, এ তেমনি। পাগলের ভান করলাম—লোকে বললে—মা কালীর ভর হয়েছে। যা মুখে আসে, তাই বলি—তারা বলে—স্বপ্নাদেশ। লোভ বেড়ে গেল···বুদ্ধিভ্রংশ হল।···পাকা হয়ে উঠলাম ব্যবসাতে। ঘরে ধূপ-ধুনো জেলে খিল দিয়ে ঘুমোই, লোকে বলে—মা নিদ্রাজয়ী, সারারাত ধরে লক্ষ জপ করেন। খিদের জ্বালায় লুকিয়ে খাই, সবাই বলে—মা আহারত্যাগিনী, কলিযুগে এমন হয় না। বেড়ে গেল বুকের পাটা, ভাসিয়ে দিলাম নিজেকে। কোথা দিয়ে কি হতে থাকল—কুঁড়ে ভেঙে হল অট্টালিকা, হল মান, যশ, গৌরব। সব পেলাম, পেলাম না শুধু শান্তি। দিনে দিনে পাপের বোঝা ভারী হয়ে উঠেছে—'

'মা, মা এ কি কথা শোনালেন আমায়!' অভয়া আছড়ে পড়েন—'আমার প্রাণের আশ্রয় ভেঙে দিলেন!'

জীবন-মা আশীর্বাদের ভঙ্গীতে হাতটা ওঠাবার চেষ্টা করলেন—'ভেঙে যাওয়াই তো ভাল বৌমা, এ যে চোরাবালির আশ্রয়। ভাল হবে তোমার। আমি হরিপদর মা, সেই জোরটুকু নিয়েই বলছি, তোমার ভাল হবে। ওই পটখানা—আমার ব্যবসার সাইনবোর্ড, ওখানাকে ভাসিয়ে দিও গঙ্গার জলে। আর যাদের এতদিন ধরে ঠকিয়ে এসেছি, তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিও আমার হয়ে।'

—'মা, ও হুকুম আমায় করবেন না। বলুন, এতক্ষণ যা শুনলুম, সব মিথ্যে, বলুন, সব দুঃস্বপ্ন!'

জীবন-মার স্বর অস্পষ্ট হয়ে আসছে—'তা হয় না বৌমা, মিথ্যে নয়, বড় সত্যি। দিন-রাত্তির, চন্দর-সূয্যির মতন সত্যি; কিন্তু বড় নিষ্ঠুর, বড় সর্বনেশে। আমার সেই কুঁড়ে ঘর, সেই দুঃখের সংসার যদি না হারাতাম। সেই ছিল আমার স্বর্গ। আর—আর চল্লিশ বছর ধরে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে আসছি, তবু মুখোশ খুলে ফেলতে পারি নি। পারি নি—পারি নি যাদের ঠকাচ্ছি, তাদেরই মুখ চেয়ে। জল আর একটু—না না, গঙ্গাজল নয়। ঠাণ্ডা জল—ভাল জল একটু—'

অভয়া দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে আসেন ভাল জলের সন্ধানে।

গঙ্গাজল নয়, 'ভাল জল।'

কিন্তু বাইরে ভিড় করে আছে পেয়াদার দল। অভয়াকে আর ছাড়ে তারা?

'কি বললেন দিদি?' 'পেলে কিছু?' 'পেতেই হবে, নইলে আমরা কোথায় দাঁড়াব?' 'বুকের ব্যামোর সেই ওষুধটা অভয়াদিদি?' 'হাঁপানির মাদুলিটা?'

ওদের কবল এড়িয়ে জল নিয়ে আবার দরজা বন্ধ করে দেন অভয়া। জল খাইয়ে হাত-জোড় করে বলেন—'মা বলে যান, তবে কিসে এদের ভাল হয়? কেন, আপনি যা বলেন, তাই সফল হয়?'

—'কি জানি'—জীবন-মা চোখ মেলে চারিদিক চান—'সেই এক অদ্ভুত রহস্য! আমিও জানি না। হয়—হয়তো ওদেরই বিশ্বাসের জোরে। এবার তুমি বাইরে যাও বৌমা, একবার একলা থাকতে দাও। দেখি চেষ্টা করে আমার ইষ্টদেবের মুখ মনে আনতে পারি কি না।'

ধীরে ধীরে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে এলেন অভয়া।

কেমন একটা উদ্‌ভ্রান্ত ভাব।

—'দিদি—'

আবার এগিয়ে এসেছে সবাই।

অভয়া তাকিয়ে দেখছেন চারিদিকে···অসংখ্য মুখ দালানে, সিঁড়িতে, বারান্দায়,ঘরে। প্রত্যাশিত চোখে চেয়ে আছে সবাই অভয়ার দিকে···জীবন-মার ভাবী উত্তরাধিকারিণীর দিকে।

স্বীকারোক্তি? এদের সামনে?

অসম্ভব। মাতালের মত টলতে টলতে এগিয়ে যান তিনি তিনতলার দিকে—'ভয় নেই, তোমাদের ভয় নেই। মা আমাকে দিয়ে গেছেন তাঁর শক্তি, আজ থেকে তোমাদের ভার নিলাম আমি। এখন—পথ দাও—একটুখানি পথ—একবার ঠাকুরঘরে যাব।'

কারণটা তো যৎসামান্য।

ব্যক্তিকটা অসামান্য বলেই হয়তো ঘটনার চেহারা এমন মোড় নিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সে ঘটনা ঘটে গেল আমারই সামনে।

অথচ তারকদা এবং তারকবৌদির সুদীর্ঘ দাম্পত্য-জীবনের মধ্যে এমন কারণ কি সত্যই আর কখনও আসে নি? তাই কি সম্ভব? হয়তো এসেছে।

সমুদ্রের বুকে তরঙ্গের মত এসেছে, গর্জেছে, লয় পেয়েছে। এ হেন ঘূর্ণিঝড় উঠল, বোধ করি তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে। আর আগেই বলেছি, সেই হতভাগ্য তৃতীয় ব্যক্তি হলাম স্বয়ং আমি।

ব্যাপারটা এই—কোজাগরী রাত্রে গ্রামের বারোয়ারী তলায় বেশ একটি জমকালো রকমের আমোদ-প্রমোদের আয়োজন হয়েছিল। আর সেই আয়োজনেব মধ্যে আমারও কিছু অংশ ছিল।

গ্রামে অবশ্য বাস কবি না। অনেকদিন হল বাস তুলে দিয়েছি, মা মারা যাওয়াব পর থেকে মাঝে মাঝে আসা-যাওয়াও বন্ধ হয়ে গেছে। পূজোর সময় দেশে আসার আকর্ষণও কখনও অনুভব করি না।

কিন্তু এবাবে আসতে হয়েছে।

পূজোর আগে গ্রামের কয়েকটি অতি উৎসাহী ছেলে খুঁজে খুঁজে আমাব কলকাতার বাসা পর্যন্ত ধাওয়া করে মোটা টাকা চাঁদা আদায় করে এনেছিল, এবং সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে এসেছিল—'দেশ'কে যেন একেবারে ভুলে না যাই!... আমার মত কৃতী সন্তানরাই যদি দেশকে ত্যাগ করে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

গ্রামের বাস তুলে কলকাতায় বাসা কবলেই, সে ভাগ্যবানেব 'কৃতী'ত্ব সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না কারুর। নিশ্চিত স্থির করে রাখে 'লোকটা পয়সা করেছে'।

আবার সূক্ষ্ম কোন সেন্টিমেন্টেব দায়ে একটা মোটা অঙ্কের চাঁদা দিয়ে বসলে, তার ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্সের মোটাত্বটা আন্দাজ করতে বসে।

তখন অবশ্য—সেই, বয়সে হাল্কা কিন্তু কথায় ভারী ছেলেগুলোকে দাবড়ানি দিয়ে বলেছিলাম—আমার 'দেশ' ওই ছোট্ট গ্রামটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সমগ্র বাঙলাদেশই আমার দেশ—তবু ওদের অনুরোধ মনকে নাড়া দিয়েছিল।

তাই এবারে এই পূজোর ছুটিতে কলকাতার আমোদ-বৈচিত্র্যের আকর্ষণ ত্যাগ করে দেশের বাড়িতে আসা।

তা এসে দেখলাম—'বিচিত্রানুষ্ঠানের' আয়োজনে এরাও কলকাতার চাইতে খুব বেশী পিছনে নেই। আকারে কম হলেও প্রকারে কাছাকাছি। দুর্গাপূজো

থেকে লক্ষ্মীপূজো পর্যন্ত একটানা 'অনুষ্ঠানে'র ত্রুটি নেই

এলাম তো!

এসে পড়ে এক মুস্কিল।

কি গুণে যে এরা আমাকে একজন বিচক্ষণ মুরুব্বি ঠাউরেছে ভগবান জানেন। কিন্তু দেখছি—ফি-হাত পরামর্শ চাইতে আসছে। তা'হলেই —এতবড় একজন পৃষ্ঠপোষক হয়ে কিছু আর পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে থাকা যায় না? 'পোষকতা'র নমুনাস্বরূপ 'কিছু একটা করে দিই' গোছের মনোবৃত্তির বশে এদের একটা আইটেম বাড়িয়ে দিলাম। কিযৎ পরিমাণে খ্যাত একটি যাদুকরকে কলকাতা থেকে আনিয়ে তার বিদ্যা প্রদর্শনের আয়োজন করা গেল। যেটা এখানে এখনও নতুন।

বলাবাহুল্য গাঁটের কড়ি খরচা করে করি নি। যাদুকরটি আমার এক বন্ধু। আর বিনিপয়সায় খাটিয়ে নিতে না পারলে বন্ধুত্ব কিসের?

সে যাই হোক, যাদুকর বন্ধু আর তার চেলা-চামুণ্ডার খাওয়াদাওয়ার ভার নিজের বাড়ীতে রেখেছিলাম, এবং তারই তদ্বির করতে একবার বাড়ির মধ্যে এসে হঠাৎ কানে এল পিসীমার একটা খেদোক্তি।

…'আমাদের তারকের বৌয়ের কথা বলছি—আহা এত যে কাণ্ডকারখানা হচ্ছে সাত পাড়ার ঝি-বৌ ঝেঁটিয়ে আসছে, অথচ ছুঁড়ির কোনখানে পা বাড়াবার হুকুম নেই!"

শুনে প্রথমটা এত হাসি পেল!

স্নেহ এবং আক্ষেপ বশতঃ পিসীমা তারকদার বৌ সম্বন্ধে যে সভ্য বিশেষণটি প্রয়োগ করলেন, সেটি যে যোগ্য প্রয়োগ হয় নি সে কথা বলা আবশ্যক! প্রায় মধ্যবয়সী একজন মহিলা সম্বন্ধে এহেন উক্তি!

কিন্তু বাক্যার্থ শুনে চমকালাম।

ছেলেবেলায় জানতাম বটে সন্দেহ-বাতিকগ্রস্ত তারকদা বৌকে সহজে কোথাও যেতে টেতে দেন না। এমন কি মনে আছে—আমি যখন ম্যাট্রিক পরীক্ষান্তে পরমানন্দে আড্ডা দিয়ে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ একদিন মা ডেকে নিয়ে চুপি চুপি আদেশ দিলেন—দেখ বাপু, তুই ওই তোর জ্যেঠীমার বাড়ি বেশি যাওয়া আসা করিস্ নে আর। বড় হয়েছিস—তারক পছন্দ করে না।

'পছন্দ না করার' মত বড় হয়েছিলাম কি না, সেটা না বুঝলেও কথাটার মানে বোঝবার মত বড় হয়েছিলাম। কাজেই—বলা বাহুল্য একটু আহতই হয়েছিলাম।

এমন কি একবার এ সন্দেহও হয়েছিল, তারকদার নামাঙ্কিত পাঞ্জায় মা হয়ত নিজের ইচ্ছাটাই ঘোষণা করছেন।

পরে ভুল ভেঙেছিল।

পাড়ায় কাদের যেন ছেলের অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্নে তারকদার বৌয়ের 'মাথাধরা'র জন্য অনুপস্থিতি, জ্ঞাতিদের মেয়ের বিয়েতে 'পেটব্যথা'র জন্য অনুপস্থিতি, ইত্যাদি বেশ একটু আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল মহিলা সম্প্রদায়ের মধ্যে।

তখনই কানে আসত তারকদার 'বাতিক'।

তারপর—কত পারিপার্শ্বিকতার মধ্য দিয়ে এগোতে এগোতে পরমায়ুকে ছোট ছোট করে আনছি, কত পরিপক্ব হচ্ছি, কত অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটাচ্ছি—কত নতুন নতুন অভ্যাসের সৃষ্টি করছি। কে বা কাকে মনে রেখেছে। ম্যাট্রিক-পড়া সেই ছেলেটাকেই মনে করলে চিনতে পারি না আর, মনে হয় আর কেউ।...

এখন—এতকাল পরে—যদি সে যুগের ভাষা কানে আসে, সত্যিই চমকে যেতে হয় না কি ?

আমার চাইতেও বয়সে দু-চার বছরের বড় একজন ভদ্রমহিলার প্রতি যে এমন শাস্তি প্রয়োগ করা চলে, এই ভেবেই অবাক হলাম।

ডেকে বললাম—ব্যাপার কি পিসীমা? হঠাৎ কার জন্যে এত আক্ষেপ প্রকাশ ?

পিসীমা বললেন—আর কার! আমাদের তারকের বৌয়ের কথা বলছি। তারক হতভাগার বাতিকের জ্বালায় কোন চুলোয় যাবার জো আছে বৌটার?... সে বার চূড়ামণিযোগে গাঁ সুদ্ধু মেয়ে বাঁশবেড়ে গিয়ে গঙ্গাচ্ছ্যান করে এল—ও যেতে পেল না।... কত দুঃখু করল।

বিরক্ত হয়ে বললাম—দুঃখু করে বসে থাকলে তার দুঃখু ঘোচে না পিসীমা। তারকদার বাতিকটাকে অত সম্মান না দেখালেই হয়। জোর করতে হয়।

পিসীমা বোধ করি আমার এই পরিণত বয়সেও অপরিণত বুদ্ধির পরিচয়ে একটু সস্নেহ করুণার হাসি হেসে বলেন—তা আর নয়! তারক তাহলে রক্ষে রাখবে! ...এই যে—কি তোদের ম্যাজিক হচ্ছে, সকল বৌ-ঝি সংসারের কাজ 'নে থো' করে সেরে কোন কাল থেকে মাঠে গিয়ে বসে আছে, কই তারকের বৌ একটু উঁকি দিক দিকিনি? আস্ত রাখবে না।

বললাম—তোমরা সঙ্গে করে নিয়ে গেলেও না ?

—কে ভরসা করে নিয়ে যাবে বাবা।...কই এতদিন যে এত রকম হল, দিয়েছে আসতে? মায়ের চরণে একটু পুষ্পাঞ্জলি দিতে—নিজে সঙ্গে করে আসে, নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যায়।

বললাম—তা বেশ তো—এ সব ক্ষেত্রেও তাই করলে পারেন। বুড়ো বয়সে এখনও এমন অদ্ভুত বাতিক।

—বাতিক কি আর বুড়ো যুবো মানে রে?

শুনে আবার হাসি পেল। সত্যি, সব কিছু মেনে নেবার কি অসীম ক্ষমতা এঁদের! এঁদের অভিধানে বোধহয় 'অসহনীয়' বলে কোন শব্দ নেই।

ভাবলাম—রোস, আজ তারকদাকে জব্দ করব। যতই হোক, আমাকে অবিশ্যিই কিছু বলতে পারবেন না। তা ছাড়া যাব নেহাৎ অনভিজ্ঞের ভঙ্গীতে। দেখি কি ভাবে অনুরোধ এড়ান।

গেলামও তাই।

গিয়ে দেখি তারকদা বাড়ি নেই। বিশেষ কোন দরকারে কোথায় গেছেন বুঝি!

আমি ডাকহাঁক করতেই বৌদি বোধ করি নিতান্ত বাধ্য হয়েই বেরিয়ে এলেন। খুব সম্ভব গ্রামের ঠাকুরপোরা আমার মত দুঃসাহস প্রকাশ করে না কখনও, কাজেই এমন বিপদেরও সম্মুখীন হতে হয় না তাঁকে।

আমি দিব্য সপ্রতিভ ভাবে বলি—একি বৌদি, এখনও বাড়ি বসে? মাঠে যান নি?

অনেকদিন পরে আমাকে দেখে, এবং আমি বাড়ি বয়ে এসে তল্লাস করছি দেখে বোধ করি বেশ একটু খুশী হন বৌদি। তাই ফিক্ করে হেসে ফেলেন—বলেন—নাঃ মাঠে চরা অভ্যেস নেই।

—তা মাঠ আজ আর মাঠ নেই, চাঁদের হাট! চলুন চলুন, এর পরে আর জায়গা পাবেন না।

—হুঁ! চললাম! আমি নইলে আর যাবে কে? ছেলেমানুষ আর কাকে বলে!

খুব অবোধের ভানে বলি—তার মানে? আপনি কি মনে করছেন এ সব ছেলে-ভুলোনো ম্যাজিক? পি. সি. সরকারের চেলা ও। পি. সি. সরকার—জানেন তো? যে সারা পৃথিবী ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। তার কাছে গুরু

শিক্ষা। ওর ম্যাজিকও দেখবার মত—

—আরে ভাই, জীবনভোরই তো ম্যাজিক দেখছি।

হেসে ফেলে বলি—বেশ তো, একবার না হয় ম্যাজিক দেখাবারই ভূমিকা নিন না? আপনাদের বিধাতাপ্রদত্ত নামই তো যাদুকরী! তাই না? ম্যাজিসিয়ানরা লোকের পকেট থেকে ঘড়ি ওড়ায়, আঙুল থেকে আঙটি ওড়ায়, আপনি রান্নাঘরের মধ্যে থেকে তারকদার বৌটিকে উড়িয়ে ফেলুন না! তিনি এসে—স্তম্ভিত—বিস্মিত—হতচকিত—

বৌদি হেসে উঠে বলেন—বলে যাও—বলে যাও—'ক্ষিপ্ত' 'উন্মত্ত' 'প্রহারোন্মত্ত'...

—আর কি! হতভাগা পুরুষজাতিকে যতটা কালো তুলি দিয়ে আঁকতে পারেন! ধরুন, আপনি আমাব সঙ্গে গিয়ে নারীসমাজে মিশে বসে পড়লেন, সেখানে গিয়ে তো আর উনি ডাক হাঁক কবতে পারবেন না?

—হুঁ, তারপর?

—তারপর ঘরের ভাত বেশী খরচ!

—আহা বে অবোধ বালক! জগতের কিছুই জানলে না!

আমি কি একটা বলতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ পিছন থেকে কাঁধে তারকদার হাতের স্পর্শ পেলাম।...হ্যাঁ হ্যা কাঁধেই, ঘাড়ে নয়। সে কথা ভাবলে বড্ড অবিচার করা হবে তারকদার ওপর। ভালবেসেই কাঁধে হাত দিয়েছেন। তবে আশ্চর্য, কি রকম যে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এসেছেন।

কি ভাগ্যি গিন্নীটিকে আমার সঙ্গে নির্জনালাপে মগ্ন দেখেও খুব বেশী বিচলিত হন নি। বোধ করি পাড়ার ঠাকুরপোদের চাইতে আমার প্রতি একটু উচ্চ ধারণার বশেই এ উদারতা।

বললেন— কতক্ষণ?

—এই তো—! বৌদিকে তাড়া দিয়ে বাড়ি থেকে টেনে নিয়ে যেতে এসেছি। এখনও বাড়ি বসে! আর দেরি করলে কিন্তু জায়গা পাওয়া দায় হবে।

তারকদা একবার বৌদির দিকে কূটদৃষ্টি হেনে বল্লেন—যাওয়াটা কোথায়?

—কি আশ্চর্য! বারোয়ারীতলায়, আবার কোথায়!

তারকদা এক টুকরো উচ্চাঙ্গের হাসিতে আমাকে নস্যাৎ করে দিয়ে বল্লেন—দূর দূর, বারোয়ারীতলায় ভদ্রলোকের মেয়েরা যায়?

—কি সর্বনাশ! বল কি তারকদা? পাড়ার লোকের কানে উঠলে যে,

মানহানির দায়ে পুলিশে দেবে তোমাকে। কোন বিশিষ্ট ভদ্রকন্যাদেরই আর ওখানে আসতে বাকি নেই।…এলে কোন দিক দিয়ে?

—এলাম তো ওখেন দিয়েই। হাটের হট্টগোল হচ্ছে বটে!…

—একটিও ভদ্রমহিলাকে দেখলে না?

তারকদা উত্তর দেবার আগেই হঠাৎ বৌদি হেসে উঠে বলেন—তা হয়তো দেখে থাকতে পারেন, কিন্তু আমার মত সুন্দরী নিশ্চয়ই একটিও দেখেন নি! কি বল গো, দেখেছ?

তারকদা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলেন—ওই! ওই জন্যেই তো! বিজু, শুনলি তো অভব্যি কথা। সাধে কি আর আমি—বেশ তো যাও না। কে মাথার দিব্যি দিয়ে রেখেছে! যাও।

—পাগল হয়েছ!—বৌদি বেশ লহর তুলে হেসে ওঠেন—হ্যাঁ চললাম! আমার বুঝি আর ক্ষয়ে যাবার ভয় নেই? আমি গিয়ে দাঁড়ালে, ও তোমাদের ম্যাজিক-ফ্যাজিকের দিকে কি আর দৃষ্টি থাকবে কারুর? দেশসুদ্ধু বেটাছেলে যে আমার পানেই হাঁ করে চেয়ে থাকবে! তখন? অতগুলো দৃষ্টিবাণ সহ্য করে কি আর আস্ত দেহটা নিয়ে ফিরে আসতে পারব? হয়তো—ক্ষইতে ক্ষইতে কর্পূরের মতো উবেই যাব!

দেখলাম বৌদির কৌতুকপ্রিয়তাটি অক্ষুণ্ণ আছে এখনও।

নাঃ—পিসীমার বাক্যে বাহুল্য-দোষ আছে। যতটা বলেছেন ততটা নয় নিশ্চয়ই।

তারকদা অবশ্য তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তা এত কড়া কৌতুক হজম করা শক্তও। জ্বলে উঠে জ্বলন্ত স্বরেই বললেন–দেখ, তোমার ওই বিচ্ছিরি তামাশাগুলো একটু সামলে কোর। বিজু কলকাতায় বাস করে, সভ্যসমাজে ঘোরে-ফেরে, তোমার ওই সব গেঁয়ো কথাবার্তা শুনলে—

শুনলে কি হবে তারকদা নিজেই হয়তো বুঝে উঠতে পারছিলেন না, বৌদি পাদপূরণ করে দেন—শুনলে মূর্ছা যেতে পারে, কি বল? তা মন্দই বা কি? রূপের ছটায় হোক, বাক্যির ছটায় হোক, মূর্ছা যাওয়ানো নিয়ে কথা! কি বল ঠাকুরপো?

—উঃ! কথা, কথা! ঘরে বসে বসেই এত কথার চাষ! পথে ঘাটে চরতে দিলে যে কি হত! বুঝলি বিজু, ওর ওই কথার জ্বালায় হাড়মাস কালি হয়ে গেল আমার।

প্রায় স্ত্রীলোকের মতই খেদোক্তি করেন তারকদা।

এতে কি মনে হয় এঁর হুকুমের বিরুদ্ধে এক পা বেরোবার জো নেই বৌদির? যত সব বাজে কথা! হয়তো বৌদির কথার ধারটা দাদার বুদ্ধির পক্ষে একটু বেশী ধারালো।

বললাম—আচ্ছা, আমি তা হলে এগোচ্ছি। বৌদিকে নিয়ে তুমিও বেরিয়ে পড় তারকদা! এরপর সত্যিই ঢুকতে পারবে না। গাছের ওপর পর্যন্ত লোক উঠেছে।

তারকদা গম্ভীরভাবে বলেন—আমি যাচ্ছি-টাচ্ছি না! তোমার বৌদিকে নিয়ে যেতে পার।

বৌদি 'কৌতুককটাক্ষ' না কি, তাই করে বলেন—রক্ষে কর! কলকাতাবাসী সভ্য ভাইকে দেখে এখন নয় মস্ত উদারতা করে বসছ, কিন্তু এর পর? বাড়ি বসে যম-যন্ত্রণা ভোগ করবে তো? সে অবস্থা স্মরণ করে আমিই কি আর ধৈর্য ধরে বসে থাকতে পারব?

এতক্ষণে বুঝি বাধাটা কোন্ পক্ষে।

মুখে বলি—তবে থাক! কাল যখন সকলে 'ধন্যি ধন্যি' করবে তখন আপসোস করবেন।…চললাম তারকদা, ওদিকে ওরা হয়তো আমার অদর্শনে চোখে সরষের ফুল দেখছে।

তারকদা হঠাৎ কি ভাবে ভাবিত হয়ে বলে ওঠেন—আচ্ছা আচ্ছা দাঁড়া। তুই নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে মেয়েদের দিকে ঢুকিয়ে দিবি, বুঝলি?…পিসীমা-টিসিমা—ইয়ে—বৌমাটৌমা—সব আছেন তো?

—হাঁ, তাঁদের জিম্মে করে দেবে, যাতে পালিয়ে যাবার ভয়টা কম থাকে। কিন্তু আমার তো যাওয়া হয় না ঠাকুরপো! আমার যে রান্না বাকি।

—ধ্যেৎতারি নিকুচি করেছে রান্নার! কুঁড়ের সর্দার! এখনও রান্না হয় নি? দেখছিস তো বিজু? আর লোকে বলে আমি নাকি ওর পায়ে ছেকল পরিয়ে রেখে দিয়েছি, তোরাও তাই ভাবিস্।

বৌদি গালে হাত দিয়ে বলেন—ও মা সে কি! 'পায়ে' ছেকল? ছিঃ! কে বলেছে একথা?

—কেন এই তো—রাস্তায় নন্দখুড়ীর সঙ্গে দেখা। তোমার দুঃখে গলে গেলেন একেবারে। "আহা, বৌটা কিছু দেখতে পায় না—ওরও তো মনিষ্যির শরীর—সাধ ইচ্ছে কি হয় না?"…শোন!…এই আমারও তো মনিষ্যির শরীর,

কই থেই থেই করে হুজুগে মেতে বেড়াবার ইচ্ছে তো হয় না।···থাক্‌গে তুই নিয়ে যা বিজু।

প্রমাদ গণি। মনে হয় দরকার নেই বাবা!

—না বাপু, তোমাদের এ সবের মধ্যে আমি নেই। ইচ্ছে হয় তুমি নিজেই নিয়ে যেও। বলতে এসেছিলাম দেরি করে গেলে সুবিধে করতে পারবে না, তাই।···

বলে পালিয়ে আসি।

তারপর বহু ব্যাপারের মধ্যে পড়ে তলিয়ে যাই একেবারে! মনেও থাকে না এসব কথা।

রাত্তির দেড়টা পর্যন্ত এদের অনুষ্ঠান চলল।

ম্যাজিকের পর গান, গানেব পর 'হরবোলা' ইত্যাদি ইত্যাদি। ভাঙতে ভাঙতেই—জলস্রোতের মত জনতার স্রোত!

যখন ভিড় একেবারে পাতলা হয়ে গেছে, উদ্যোক্তারা জাল গোটাবার তালে হান্‌ফান্ করে বেড়াচ্ছে, তখন একটি ছেলে এসে বললে—একজন বৌ আপনাকে খুঁজছেন!

বৌ!

শুনে তো অবাক! নিজের বৌকে তো অনেকক্ষণ আগে পার করে রেখে এসেছি। এতক্ষণে বোধ করি এক ঘুম হয়ে গেল তাঁর। আবার কার বৌ আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে?

গিয়ে দেখে আরও অবাক! আর কেউ নয়, তারকদার বৌ!

স্টেজের পিছন দিকে একটা বাঁশের খুঁটির কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। কি সর্বনাশ! ইনি এখানে এ সময় একা?

বলি—কি ব্যাপার বৌদি?

বৌদি উদ্বিগ্ন মুখে বলেন—তোমার দাদাকে ওর মধ্যে দেখলে?

—কে? তারকদা? কই না তো? এসেছিলেন নাকি?

—এসেছিলেন বৈকি! কি মতি হল, তুমি চলে আসার পর একরকম জোর করেই নিয়ে এলেন আমায়। বললেন—শেষ হয়ে গেলে এই দিকে দাঁড়িয়ে থাকতে। ঘুরে এসে কাঁটালতলা দিয়ে নিয়ে যাবেন। সেই হিসেবে দাঁড়িয়ে আছি। তা কই? তুমি ভিড় ভাঙার সময় দেখেছ ভাল করে? কোনখানে

বসে ঢুলছেন না তো?

—না না। শতরঞ্চি-টঞ্চি তো গুটিয়ে ফেলা হল। ভুলে চলে যান নি তো?

—ভুলে? বৌদি একটু হাসলেন। বললেন—চলেই গেছেন দেখছি। তবে ভুল নয়, বোধ হয় ইচ্ছাকৃত। খুব সম্ভব আমাকে বসিয়ে দিয়েই চলে গেছেন। আর ইচ্ছে করে এতক্ষণ যমযন্ত্রণা ভুগছেন। যাক, তুমি একটু কষ্ট কর ভাই, পৌঁছে দেবে চল।

সত্যি বলতে, এ অনুরোধে একটু দ্বিধায় পড়ে গেলাম। এত রাত্রে একা আমার সঙ্গে বৌকে ফিরতে দেখে খুব যে খুশী হয়ে উঠবেন তারকদা, এমন তো মনে হয় না।

বললাম—তার চেয়ে এক কাজ করুন না? পাড়ার কোন গিন্নী-টিন্নীকে এখনও বোধহয় রাস্তায় পাব, তাঁদেরই কাউকে বলে দিই—তাঁর সঙ্গে—

বৌদি দুই হাত জোড় করে বলেন—মাপ কর ভাই, পাড়ার গিন্নীদের সামনে আর অপদস্থ হতে চাই না। তা ছাড়া তাঁরা তো আগুনে কাঠ জোগাবার সুযোগই খুঁজে বেড়ান। তুমিই চল। তোমারই ওপরই বরং একটু ছেদ্দা আছে 'ওনার' দেখতে পাই।

—তবে চলুন—বলে পা চালাতে শুরু করে কৌতূহলের বশে বলি—আচ্ছা তারকদা এ রকম করলেন কেন?

—কি জানি ভাই! নির্বোধ লোকেরা যে কি ভেবে কী করে!

স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

সারা পথ আর কোন কথা হল না।

নির্বোধ লোকেরা 'যে কি ভেবে কি করে', জানতে পারলাম তারকদার দরজায় এসে।

কড়া নেড়ে নেড়ে ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে যখন দরজায় দমাদ্দম ধাক্কা দিতে শুরু করেছি, এবং আশপাশের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীরা উৎকর্ণ হয়ে উঠেছেন অনুমান করছি, তখন সহসা দোতলার জানলা খুলে গেল এবং কটু তিক্ত কর্কশ প্রশ্ন কানে এল—কে?

—নেমে এস না। দরকার আছে—দোরটা খোল।

ভাবছি দোর খুললেই তাঁর প্রচণ্ড ঘুমের সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেব। কি না তখন উত্তর এল—'আমার কোন দরকার নেই। যা দরকার সকালে এসে বোল।'

রাগে আপাদমস্তক জলে গেল। কড়া কড়া কথা মুখে এল।

তবু রাত-দুপুরে আর দৃশ্যের অবতারণা না করে বললাম—সকালে আমি কলকাতার পথে, দরকার আমার নয়, তোমারই। বৌদিকে ফেলে রেখে চলে এলে—

বোধ করি এই সূত্রটুকুই খুঁজছিলেন। সেই দোতালার জানলা থেকেই চীৎকার শুরু হল—বৌদি? কার বৌদি? কার কথা হচ্ছে? এ বাড়ির বৌরা রাত্তির দুটো পর্যন্ত রাস্তায়-ঘাটে ঘুরে ইয়ার বন্ধু নিয়ে বাড়ি ঢোকে না। এ বাড়ি থেকে কেউ কোথাও যায় নি।

এ রকম ইতর কথায় রক্তটা যতটা গরম হবার তা হল। তবু মাথা ঠাণ্ডা করে বৌদিকে বললাম—আর লোক হাসাবেন না বৌদি, চলুন আপাতত আমাদের বাড়িতেই গিয়ে শুয়ে পড়বেন চলুন। সকালে যা হয় করবেন।

বৌদি ধীরে ধীরে বলেন—সে হয় না ভাই, তোমার সামনে এ মুখ দেখাচ্ছি। কিন্তু তোমার বৌয়ের সামনে পারব না।

—কিন্তু উনি তো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আছেন, দোর খুলবেন না, করবেন কি?

—খোলাতেই হবে ভাই। আচ্ছা তুমি যাও। এবার যা হবে আমার ভাগ্যে!

—যাব কি বলুন? আপনাকে এইভাবে রেখে?

—ভয় নেই ঠাকুরপো, মনের ঘেন্নায় ডুবে মরতে যাব না। কতক্ষণ দাঁড়াবে তুমি? শুনলাম—পাঁচটার গাড়িতে যেতে হবে তোমাকে।

—তা হয় না। আপনাকে বাড়ি না ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়ে—আমার যাওয়া অসম্ভব।...দেখি অধ্যবসায়ের পরীক্ষা।

শুরু হয় পরীক্ষা। তারকদাকে গুলি করে মারবার সাধু ইচ্ছে দমন করে আবার দোর ঠেলি। আবার কড়া নাড়ি, অনুনয়-বিনয় করতে থাকি।

অবশেষে দরজা খোলে।

খোলা দরজার দুই কপাটে হাত রেখে তারকদা বজ্রনিনাদে যে প্রতিজ্ঞা-বাক্য উচ্চারণ করেন, সে কথা উচ্চারণ করা অপর কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। মোট কথাটার ভাবার্থ এই—যে স্ত্রী রাত দুটো পর্যন্ত বাইরে ঘুরে বেড়ায়—লজ্জার মাথা খেয়ে পরপুরুষের সঙ্গে বাড়ি ফেরবার সাহস করে, সে রকম স্বেচ্ছাচারিণী স্ত্রীর সঙ্গে তারকদার কোন সম্পর্ক নেই।...ইচ্ছে হলে গোয়ালে পড়ে থাকতে পারে,

উঠোন ঝাঁট দিয়ে ছুটো ভাত পেতে পারে, কিন্তু রান্নাঘরের ছায়া যেন না মাড়ায় সে।...তার হাতে জল খাবার প্রবৃত্তি তারকদার নেই। সে স্ত্রীকে ত্যাগ করলেন তারকদা। তাকে যদি গ্রহণ করেন তো...ভয়ঙ্কর একটা শপথ-বাক্য উচ্চারণ করে হাঁপাতে থাকেন তারকদা।

বৌদি যে তারকদার হাতের তলা দিয়ে সুড়ুৎ করে অন্ধকারের মধ্যে কোথায় ঢুকে পড়লেন বুঝতে পারলাম না, আমি প্রায় টলতে টলতে ফিরে এলাম।

নিজেকেই সমস্ত কারণটার জন্য দায়ী করতে থাকি। এতদিন পরে দেশে এসে যে এমন এমন একটা কুৎসিত নাটকের নায়কের ভূমিকা নিতে হবে, তা কে ভেবেছিল!

আমাকে যতই আশ্বাস দিন, বৌদির শেষ গতি যে দীঘির জল, সে বিষয়ে আর সন্দেহমাত্র রইল না। অথচ তার কি প্রতিকারই বা আমি করতে পারি?

একটা দিনও যে দেখে যাব তার জো নেই।—আজই ছুটির শেষ দিন। ভোরের গাড়িতে রওনা হতে হবে। তা ছাড়া যদিই বা থাকতে চাই, স্ত্রীর কাছে কৈফিয়ৎ কি দেব?

নাঃ, তার কাছে এ গল্প করা যায় না।

মেয়েদের কাছে মেয়েদের এতখানি পরাজয়ের কাহিনী প্রকাশ করতে পৌরুষে ঘা লাগে।

তারকদার মনস্তত্ত্বও বুঝি। নির্বোধের মনস্তত্ত্ব।

নিতান্ত নির্বুদ্ধিতার বশেই লোকটা এই কৌশলে লোক-সমাজে প্রচার করতে চেয়েছে—স্ত্রীকে যে শাসন করে থাকে সে, সেটা নিতান্ত অকারণ নয়। ছাড়া পেলেই মেয়েছেলে যে এমনি বেচাল হয়ে ওঠে এ তথ্য তার জানা বলেই সে দৃষ্টি রাখে, এখন সত্যি মিথ্যে দেখুক লোকে? কিন্তু নার্ভাস লোকটা শেষ পর্যন্ত নিজেকে আয়ত্তে রাখতে পারল না। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বার করে বসল।

কেবলমাত্র বৌদির আত্মহত্যার সংবাদটি ছাড়া এ কাহিনীর আর কোন উপসংহার থাকার কথা নয়। কিন্তু বিধাতাপুরুষ নামক ঔপন্যাসিকটি বহু রসের রসিক, তাঁর রচিত কাহিনীর প্লট আমাদের কলমের সঙ্গে মেলে না।

মেলে না—সে প্রমাণ পেলাম আবার মাস আষ্টেক পরে দেশে এসে। দেশে আসার স্পৃহামাত্র ছিল না, আনিয়ে ছাড়লেন পিসীমা বাড়াবাড়ি রোগ করে।

আবার চিঠির মারফৎ এমন ইচ্ছেও ব্যক্ত করলেন যে আমার চাঁদমুখখানি একবার না দেখে তাঁর মরেও শান্তি নেই।

অগত্যাই আসতে হল।

কি ভাগ্যি, মরে আর আমার শান্তি ঘোচালেন না, বরং যতটা দোদুল্যমান মনে এসেছিলাম, দেখে তেমন কিছু মনে হল না।···তাঁর মুখেই এ কাহিনীর শেষাংশ শুনলাম।

সেই বিরক্তিকর ঘটনার পর অনেকটা তারকদার ওপর নৃশংস প্রতিশোধের বশেই একান্ত কামনা করেছিলাম আত্মহত্যাটা যেন অবশ্যই ঘটে। এবং সেই অপঘাত মৃত্যুর সংবাদটার প্রতীক্ষা করতে করতে হতাশ হয়ে এক সময় ভুলেই গিয়েছিলাম সমস্ত ব্যাপারটাকে।

এখানে এসে কথায় কথায় ওঁদের কথা উঠল।

শুনলাম—বৌদি যতই সাবধান হতে চেষ্টা করুন, লোক জানাজানি হতে কিছু বাকি ছিল না সেদিন।

বারোয়ারীতলার কল্যাণে পাড়ার কোন বাড়িতেই কেউ তখন নাকি নিদ্রাভিভূত ছিলেন না। কেউ সবে এসে শুয়েছেন, কেউ হাত পা ধুয়ে শোবার উদ্যোগ করছেন। কাজেই তারকদার উদাত্তকণ্ঠ শোনবার সুযোগ হারান নি কেউ।··· গভীর রাত্রির স্তব্ধতার উপর প্রত্যেকটি শব্দ কেটে কেটে বসেছে, এবং তাঁদের মনের প্রস্তরফলকেও কেটে বসে পড়েছে। হাত দিয়ে মুছে ফেলবার উপায় রাখে নি।

কাজেই পাড়ার বয়োজ্যেষ্ঠারা রায় দিয়েছেন—"তারক যখন 'মা' ডেকে দিব্যি গেলে বৌকে ত্যাগ করেছে, তখন কোন ছলেই আর সে বৌকে গ্রহণ করা চলে না!"

অতএব তদবধি ঘরে আর ওঠেন নি বৌদি। গোয়ালেই অবস্থান করছেন। তারকদার সঙ্গে বাক্যালাপ নেই। থাকবেই বা কি করে? সম্বোধন সমস্যাটা যে ঘোচবার নয়!

গোয়ালে উনুন পেতেছেন, রান্নাবান্না সেখানেই চলে। ধর্মের সাক্ষী একটা নাকি বামুনদের ছোঁড়াকে রেখেছেন রাঁধতে, সে শুধু তারকদাকে ঠকানো।···রান্নার 'রা'ও জানে না ছোঁড়া, প্রথম দিন ভাতের ফ্যান গালতে গিয়েই নাকি হাত পুড়িয়েছিল।···তা ছাড়া চিরদিনের 'খাউভুলে' মানুষ তারকদা, তিনি কি আর সে রান্না মুখে তুলতে পারেন? কাজেই বৌদিই পরিপাটি করে রেঁধে বেড়ে সেই ছোঁড়াকে দিয়ে পরিবেশন করান। ঘরের কাজ-টাজ ছোঁড়াই করে, বাইরের

কাজের ঝিটাকে ছাড়িয়ে দিয়ে সে কাজগুলো বৌদি করেন। হুঁ দুটো লোক রাখবার মত অবস্থা তো সত্যিই নেই তারকদার।

ধিক্কারে সমস্ত মন 'ছি ছি' করে উঠল।

সত্যি, মানুষের প্রাণের মমতা কী অসীম! সেই ধিক্কার প্রকাশ না করে পারলাম না। বললাম—তোমাদের দীঘির জল কি একেবারেই শুকিয়ে গেছে পিসীমা?

পিসীমা হাসলেন। বললেন—তোরা বেটাছেলে, বুঝবি না। কিন্তু একটু গলা খাটো কর, ঝাঁপের শব্দ পেলাম, বোধহয় বৌমা এল।

—কে এল?—তীক্ষ্ণ হয়ে উঠি আমি।

—বৌমা, তারকের বৌ। আমার অসুখ হয়ে পর্যন্ত এই দুপুরবেলাটি রোজ আসে। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

আমি টিটকিরি দিয়ে বলি—বৌকে ত্যাগ করে তারকদা তা হলে তাঁকে বন্ধনমুক্ত করে দিয়েছেন বল?

পিসীমা আমাকে চোখের ইশারা করেন। ফিরে দেখি বৌদি! নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে হাসছেন। কে জানে মুখের রেখায় কেমন একটা বার্ধক্যের ছাপ দেখলাম কি না, হাসিটা কিন্তু অম্লান!

অপ্রতিভ পিসীমা আর কিছু না পেয়ে বলে বসলেন—এই তোমার কথাই হচ্ছিল! বিজু তো শুনে রেগে অস্থির!

বৌদি হেসে ওঠেন—শুধু অস্থির? তবু ভাল ঠাকুরপো! আমি ভাবছিলাম আমার জন্যে বিষের অর্ডার দিতেই যাচ্ছিলে বুঝি বা!

কথা যখন একেবারেই এমন ভাবে এসে দাঁড়ায় তখন আর চক্ষুলজ্জা থাকে না, ক্রুদ্ধভাবে বলি—তাই উচিত ছিল! বেঁচে থাকতে আপনার লজ্জা অনুভব করা উচিত।

—কি মুস্কিল! বৌদি দুই হাত উল্টে বলেন—শুনুন পিসীমা, আপনার ভাইপোর কথা। পৃথিবীতে দু চারটে পাগল আছে বলে সুস্থ মানুষদের বেঁচে থাকতে লজ্জা করবে?

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি, এ শক্তি কি সত্যিই ভিতরের, না চেষ্টাকৃত? যদি সত্যি হয়, কে এই শক্তির যোগানদার?

মিনিটখানেক চুপ করে থেকে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলি—অহরহ এই যন্ত্রণা সয়ে টিকে থাকা বোধ করি আপনাদের পক্ষেই সম্ভব!

বৌদি সহাস্তমুখে বলেন—তুমিও যেমন ঠাকুরপো, যন্ত্রণা মনে করলেই যন্ত্রণা! ও জিনিসটা অনেকটা বেলগাছের বেম্মদত্যির মত! মনে করতে শুরু করলে, পায়ে খড়ম গলায় পৈতের গোছা নিয়ে সশরীরে আছে, না করলে নেই। তবে হ্যাঁ, মুশকিলের একশেষ ওই রান্নাবান্নার সময়টা! বামুনদের ছোঁড়াটাকে দোরে পাহারা বসিয়ে লুকিয়ে-চুরিয়ে করা তো? পাছে তোমার দাদা টের পান!

আমি তাচ্ছিল্যভরে বলি—বাঙালকে আর হাইকোর্ট দেখাবেন না বৌদি, রান্না খেয়ে টের পান না?

বৌদি প্রসন্নহাস্যে বলেন—তা কি জানি! হয়তো পান, তবু একটা আবডাল তো রইল? প্রকাশ হয়ে পড়লে যে খাওয়া ঘুচে যাবে, মান্যে বাধবে বাবুর।

বিস্ময়ে প্রায় বাক্‌রোধ হয়ে যায় আমার। বলি—ওঁর সেই মান্য বজায় রাখবার জন্যে আপনার এই কৃচ্ছ্রসাধন? অথচ যে আপনার মান-মর্যাদা কিছুই —কিন্তু থাক সে কথা। তবে দিব্যি-টিব্যি সবই যদি এত মানেন, এই লুকোচুরিতে পাপ হচ্ছে না আপনার?

বৌদি পিসীমার পাশে স্বচ্ছন্দ হয়ে বসে পড়ে অবলীলাক্রমে উত্তর দেন—পাপ আবার হচ্ছে না? খুব হচ্ছে। কত জন্মের মহাপাতকের ফলে ওর হাতে পড়েছি, আবার এ জন্মে এই পাপ কুড়োচ্ছি। কিন্তু কি করব বল? খাওয়ার কষ্ট যে তোমার দাদা মোটে সহ্য করতে পারেন না, রান্না পছন্দ না হলে খাওয়াই হয় না সেদিন। অন্য কারুর হাতে পড়লে কি আর ওঁর শরীর টিকবে?

অসাবধান

এইমাত্র লীলা মাসীমা বিদায় নিলেন।

বিগত তিনটি দিন তিনি এখানে অবস্থান করেছেন এবং চির প্রথানুযায়ী ভগিনীপুত্রের পকেট-শোষণ ও তস্য বধূর 'অস্থিদাহন'রূপ মহৎ কর্মটি পরিপাটিভাবে সমাধা করেই বিদায় নিয়েছেন। তবু—বিদায়পর্ব মিটিয়ে এসেই গৃহিণী যখন প্রায় ফেটে পড়ে বলে উঠলেন, 'উঃ গত জন্মে কত ধার ছিল তোমার লীলা মাসীর কাছে তাই ভাবছি—' তখন কিন্তু হাতের ইশারায় তাঁকে নিবৃত্ত হবারই অনুরোধ জানালাম।

অর্থাৎ থাক—কোন মন্তব্য নয়।

হ্যাঁ, সংকল্প করেছি কারও বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার সম্বন্ধে কোন মন্তব্য আর করব না। কেন সংকল্প করেছিলাম, সেটাও নতুন করে মনে পড়ে গেল।

গৃহিণী অবশ্য আমার এই ভাব পরিবর্তনে সুখী হলেন না, বেশ কিছুক্ষণের আলোচনার মধ্য দিয়ে এই তিন দিনের পুঞ্জীভূত হৃদয়-উত্তাপ কিছুটা শীতল করে নেবার ইচ্ছে তাঁর ছিল, কিন্তু এ-হেন স্পষ্ট নিষেধে আহত হয়ে গেলেন। অবশ্য আহত হয়ে চুপ করে গেলেন, এ মনে করলে ভুল হবে, তিক্ত হাসির আমেজ মাখানো একটি প্রশ্নবাণ সঙ্গে সঙ্গেই ছুঁড়লেন।—'কেন, লীলা মাসীর জন্য মন কেমন করছে না কি ?'

হেসে বললাম—'অসম্ভব কি ? করতে পারে না ?'

'পারবে না কেন ? মহাপুরুষদের পক্ষে কী না সম্ভব !' বলে খর খর করে উঠে গেলেন।

ফিরে আর ডাকা হল না। বসে বসে ভাবতে লাগলাম ও-সংকল্পটা কেন করেছিলাম। কেন করেছিলাম তাই বলছি—তবে সে-গল্প লীলা মাসীর নয়, জগমামার।

*

অনেক দিনের পর হঠাৎ একদিন একটু সময় হাতে পেয়েছিলাম। ভাবছিলাম এই দুর্লভ বস্তুটি নিয়ে কী করা যায়। মানে কী করলে সত্যিকার সদ্ব্যয় হয় সময়টার।

কাজের চাপে তো আত্মীয়-স্বজনের নাম ভুলে যেতে বসেছি। যে সব আত্মীয়ের বাড়িতে আগে প্রায়ই যেতাম, এবং এখন আর মোটেই যাই না, তাঁদের কারও বাড়ি ঘুরে আসব ? একে একে অনেকগুলো বাড়ি মনে করলাম, পছন্দ হল না কোনটাই।

রমেনদার বাড়ি সব থেকে বেশি যেতাম। সে বাড়ির কথা মনে হতেই শেষ যেদিন গিয়েছিলাম, মনে পড়ে গেল সে দিনের কথা। বৌদি এমন বিশ্রী রকমের বুড়িয়ে গেছেন, কথা কয়ে কোন সুখ হয় নি, ছেলেমেয়েগুলো বড় হয়ে গেছে, কথাই কওয়া গেল না, আর রমেনদা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা প্রশ্নের টোপ ফেলে ফেলে ক্রমাগত জানতে চেষ্টা করলেন আজকাল কত রোজগার করছি আমি। এ ছাড়া যেন আমার সম্বন্ধে প্রশ্ন করবার আর কিছুই নেই।

ছেলেবেলা থেকে ক্যামেরার শখ ছিল। সেই শখের সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে আর অনেক ঘাটের জল খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত পরিণত হয়েছি ক্যামেরাম্যানে। কাজ কখনও থাকে, কখনও থাকে না, অবশ্য যখন কাজ থাকে না তখনই ব্যস্ত থাকি বেশি।

সে যাই হোক, ক্যামেরাম্যানের পদ পাওয়া পর্যন্ত আত্মীয়বর্গের ধারণা জন্মেছে—আমি বোধ হয় 'লাল' হয়ে গেছি। কারণ সিনেমা লাইন সম্বন্ধে ওঁরা আর কিছু জানুন আর না জানুন, ও লাইনে যে পয়সা জিনিসটা ছড়ানো থাকে এটা সকলেই জানেন। কাজেই আমার ব্যাপারে কৌতূহলের আর শেষ নেই ওঁদের। দেখা হলে সাধারণ কুশল-বার্তা, অথবা আমার স্ত্রীপুত্রের খবর জানতে কেউ চান না, প্রথম প্রশ্ন আসে—'নতুন কি তুলছ ?' পরবর্তী প্রশ্ন—'কত পাবে এতে ?'

দূর ছাই, রমেনদার বাড়ি আর যায় না।

বীণা মাসীমা, নতুন কাকী, বসন্ত মামা, সত্যহরি, অবনী—সবাইকে মনে করলাম! নাঃ! ওঁরা আবার সিনেমার পাশ পান না বলে তেমন প্রাণ খুলে কথাই বলেন না। কলকাতা শহরে যত ছবি উঠছে, তার সব ছবিই বিনি পয়সায় দেখানো আমার পক্ষে সম্ভব কি না, সে তাঁদের বোঝানো যায় নি।

হঠাৎ মনে হল আত্মীয়দের যে নাম ভুলে যেতে বসেছি সে কি শুধুই সময়ের অভাবে ? না মানসিক অসদ্ভাবে ?

তা হলে কি দক্ষিণেশ্বর ঘুরে আসব ? কিংবা বেলুড় ? অথবা—

হঠাৎ সীতানাথ এসে জানান দিল, 'বাবু, একটা বুড়ো মতন বাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।'

মাথায় হাত দিয়ে পড়লাম!

বাস! হয়ে গেল!

হঠাৎ-পাওয়া সময়টুকুকে হত্যা করবার জন্যে পয়সা খরচ করে আর যেতে হবে না কোথাও! সময়ের যমদূত এসেই গেছে! সিনেমা লাইনে ঢুকে পর্যন্ত দেখা করতে আসার লোকের অপ্রতুল ঘটে নি। মাঝে মাঝে ওই দেখা করতে আসার জ্বালায় তো পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে ইচ্ছে করে। এসব যে উদ্দেশ্যমূলক দেখা করা! তার উপর আছে তাড়া তাড়া চিঠি! সে চিঠির ভাষা দেখলে অনেক বড় বড় সাহিত্যিকও ঈর্ষান্বিত হতে পারেন।—'জীবনে একবারের জন্যেও যদি

পর্দায় আত্মপ্রকাশ করতে পাই, তাহলে হাসতে হাসতে আত্মহত্যা করতে পারি'—এমন চিঠিরও অভাব নেই। আবার অনেকে—'অন্ততঃ একটা চান্স না দিলে' আত্মহত্যার ভয়ও দেখান।

তা ছাড়া বাড়িতে এসে হত্যে-দেওয়া, সে তো আছেই।

অনেক দুঃখের মূল্যে এই অভিজ্ঞতাটি সঞ্চয় করেছি,—বাংলা দেশের তরুণ-তরুণীর হৃদয়ে কাম্য স্বর্গ যদি কিছু থাকে তো সে হচ্ছে সিনেমার পর্দা। সে ভাবটা কেউ প্রকাশ করে, কেউ বা করে না।

বুড়ো-হাবড়াও আসে অবিশ্যি।

দুঃস্থ, অভাবগ্রস্ত, জীবনে অসফল অনেক বুড়ো লোক আসেন। এবং আমার যে যত ইচ্ছে চাকরি দেবার ক্ষমতা নেই সে-কথা বিশ্বাস না করে কাকুতি-মিনতি করে অস্থির করে তোলেন।

সীতানাথের সংবাদ-পরিবেশনে বুঝলাম, তেমনি কেউ এসে হাজির হয়েছেন। গলা খাটো করে বললাম,—বললি না কেন বাবু বাড়ি নেই?

—আজ্ঞে বাবু মিথ্যে কথাটা কেমন মুখে আসে না।

—ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির! ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললাম, বলগে যা কী চাই?

—বলেছিলাম বাবু। বলল আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

—কেতার্থ হলাম! শুনে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে গেল একেবারে!...যা, নিয়ে আয় এখানে।

বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের মধ্যে উচ্চারিত হল, ডাকার অপেক্ষা আর রাখলাম না বাবা, এসেই পড়লাম।

এ যে রীতিমত আত্মীয়তার সুর। চমকে উঠে বুড়ো ভদ্রলোকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে সবিস্ময়ে বলি—জগমামা নাকি?

—চিনতে পেরেছ তা হলে? তোমার চাকর ব্যাটা যা সওয়াল করছিল, ভাবলাম দোর থেকেই ফিরতে হয় বুঝি, তোমার চাকরবাকরগুলো—বুঝলে বাবা অত্যন্ত বদ্।

বললাম,—"বাকর" আর কই জগমামা, ওই একটাই তো।

—আহা তাই না হয় হল, তবে শিক্ষা ভাল দিতে পার নি বাপু।...যাক্ বাড়িটা তা হলে খুঁজে বার করা গেছে।

বললাম,—তাই বটে। ঠিকানা পেলেন কোথা?

—আরে বাবা, তুমি এখন একটা নামজাদা লোক, চেষ্টা করলে তোমার খোঁজ

পাওয়া যাবে না—এ কি হয় ?···ওরে এই, তোর নাম কি ? এক গেলাস জল খাওয়া দিকিন !

নিজেকে নামজাদা লোক বলে গণ্য হতে শুনলে পুলকিত হওয়াই স্বাভাবিক। মিথ্যে জানলেও খুশী না হয়ে উপায় নেই। সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে জগমামাকে যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা করা হয় নি। দূর সম্পর্কের হলেও মামা তো বটে। বিশেষ করে যে-মামা এখনও আমার সম্বন্ধে সচেতন। আর কম দিন পরে দেখা ? প্রায় তো চিনতেই পারছিলাম না।

বললাম—মামা দাঁড়িয়েই রইলেন ? বসুন। বসুন। তার পর ? আছেন কেমন ?

—আর থাকা থাকি ! তুমি কেমন আছ তাই বল ?

—চলে যাচ্ছে একরকম। কতদিন পরে দেখা বলুন তো মামা ?

—তা হল গিয়ে তোমার—বছব বাইশ !

—বা-ই-শ !

সত্যিই চমকে উঠলাম। এতটা আবার ভাবি নি।

জগমামা বললেন—তা হবে না কেন ? তোর মা মারা গেল উনিশ শ' তেত্রিশে, তার পর একবার মাত্র এসেছিলাম তোদের সেই সিগদেরবাগানের বাড়িতে। ব্যস, আর দেখা হল কবে ?

দেখলাম জগমামার পুরনো সেই অভ্যাসটি ঠিক আছে। কথা কইলেই সাল-তারিখ, মনেও থাকে।

আপ্যায়নের ত্রুটি রাখি না,—একথা সেকথার পর ঘোষণা করি, না খেয়ে যেতে পারবেন না মামা, দুটো ঝোল-ভাত এখানেই খেয়ে নিন।

জগমামা হাঁ হাঁ করে ওঠেন,—থাক্ থাক্, আজ থাক। সে আর একদিন হবে অমল, আজ বরং, ইয়ে—মানে আজ আমি অন্য একটা দরকারে এসেছিলাম।

দরকার !

'দরকার' শুনেই মনটা বিগড়ে গেল।

মহৎ মহৎ ব্যক্তিদের যায় কিনা জানি না, আমার কিন্তু যায়। কেউ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে বেড়াতে এসেছে দেখলেই আমার মেজাজ বিগড়ে যায়। কিন্তু সাধারণত যে 'দরকারে'র দরকারে লোকে বাইশ বছর পরে ঠিকানা খুঁজে খুঁজে দূর সম্পর্কের 'নামজাদা' আত্মীয়ের বাড়ি আসে, জগমামার তো সে দরকার থাকার কথা নয় ! দেখা সাক্ষাৎ না থাকলেও খবর জানি কিছু কিছু, দুই ছেলে ওঁর বেশ

কৃতী হয়েছে, শিবপুরে না কোথায় যেন বাড়িও করেছে একখানা।

কোন প্রশ্ন না করে তাকিয়ে থাকলাম। জগমামা একটু উসখুস ইতস্তত করে হঠাৎ বলে উঠলেন,—আমার একটা জীবনী লিখেছি।

—জীবনী!

তিন অক্ষরের এই কথাটুকু মাত্র উচ্চারণ করে আরও নিশ্চল হয়ে তাকিয়ে থাকি।

জগমামা এবার যেন বেশ একটু দৃঢ় হয়ে বসেন এবং একটু ক্ষুব্ধ হাসির সঙ্গে বলেন,—হ্যাঁ কথাটা শুনতে পাগলের মতই বটে, কিন্তু লিখেছি আমি! নভেলের ছাঁচে লিখেছি।

মনে হল স্বপ্ন-ভাষণ শুনছি।

তাকিয়ে দেখলাম জগমামার দিকে। পরনে খাটো মোটা খোলের থান, গায়ে গলাবন্ধ একটি কোট, তার উপর ক্লাইভের আমলের একখানা রোঁয়া-ওঠা জরাজীর্ণ মটকার চাদর! মাথার সঙ্গে শক্ত হয়ে গেঁথে বসা প্রায় সম্পূর্ণ পাকা, ঘন, ছোট ছোট চুল, খোঁচা খোঁচা পাকা গোঁফ-দাড়ি!

এই জগমামা!

পুরনো আমলের কথাও মনে পড়ল। পাড়ের রং-ওঠা আধ ইঞ্চি পাড়ের মোটা ধুতি আর মোটা লংক্লথের খেটে পাঞ্জাবি পরা, তার সঙ্গে বেদম বাজে বক্ বক্, আর প্রচুর খাওয়া!

হ্যাঁ, সাংঘাতিক রকমের খেতে পারতেন জগমামা! আস্ত কাঁঠাল খেতেন, খেতেন আস্ত ছাগল। কুম্ভকর্ণের সঙ্গে তুলনা করা হত জগমামার।

'সেই' জগমামা!

'সেই' আর 'এই'! দুটোর যোগ করলাম, কোন রকমেই যোগফল মেলাতে পারলাম না।

আত্মজীবনী লেখার ব্যাধিটা কি তা হলে কলেরা বসন্তর মত সংক্রামক হয়ে উঠেছে? পাত্রাপাত্র মানছে না? আচ্ছা না-ই মানুক, জগমামাও আত্মজীবনী লিখুন, কিন্তু সেই মূল্যবান খবরটি বাইশ বছরের অ-দেখা ভাগ্নের বাড়ি খুঁজে খুঁজে এসে জানাবার তাৎপর্য কি?

প্রশ্ন করব না প্রতিজ্ঞা করে খালি জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকিয়ে থাকি। ক্রমশ তাৎপর্য পাই। পেয়ে—'হাঁ' হয়ে যাই। হাঁ করে থাকি।

খানিকক্ষণ কি কতকগুলো কথা আউড়ে জগমামা বললেন,—এই জন্যেই তোমার কাছে আসা বাবা। আমার এই জীবনীখানা নিয়ে তুমি সিনেমা কর।

—অ্যাঁ!

—চমকাচ্ছ বটে, কিন্তু পড়ে দেখো তুমি, কেউ ধরতে পারবে না সত্যিকার কাহিনী বলে। লিখেছি যে সদ্য নভেলের মত করে কি না। পড়লে বুঝবে। আমার এই জীবনটাই বুঝলে অমল, একখানা বিরাট উপন্যাস।

জগমামার জীবনটা একটা উপন্যাস! কালে কালে আরও কত দেখতে হবে তাই ভাবছি।

এতক্ষণ ধরে শুনলাম, তবু যেন নতুন করে হতাশ হয়ে বললাম,—জীবনীখানাকে সিনেমা করতে বলছেন?

—হ্যাঁ বাবা! এতক্ষণ তাই তো বোঝালাম। আমি তোমার মামীকে আর তাঁর সুপুত্তুর দুটিকে বুঝিয়ে দিতে চাই তাদের ব্যাভারটা কী! নিজের চোখে প্রত্যক্ষ দেখুক। দেখে চৈতন্য হোক।

মুখে আসছিল—চৈতন্য অত সস্তা নয়—কিন্তু বললাম না। বললাম,—কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে?

—হবে না মানে? জগমামা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন,—ঠিক না হল তো বয়েই গেল আমার! বুঝুক না সবাই! তাই তো চাই।···কাউকে রেয়াত করি নি আমি। সবাইয়ের চরিত্র রেখেছি এতে। আমার গুণধর ভাইদের পাজীর পাঝাড়া শালা দুটোর, বিচ্ছুর অবতার নাতিটার। এক ধার থেকে সব্বাইয়ের গর্দান নিয়েছি। বুঝলে অমল, কাউকে ছেড়ে কথা কই নি! সিনেমার পর্দায় যখন বাছাধনরা সব নিজেদের দেখতে পাবেন, তখন মাথা হেঁট হয়ে যাবে। বুঝবেন বুড়ো চুপ করে থাকে বলেই হাবা বোকা নয়। মুখের ওপর কাউকে কিছু বলতে পারি না, বুঝলে? তাই বোকা হয়ে থাকি। কিন্তু কত সহ্য করা যায়? রক্ত-মাংসের শরীর তো বটে! ভেবে দেখলাম এই হচ্ছে উচিত প্রতিশোধ! তোরা জীবন ভোর আমাকে হেয় করে এলি, এইবার দেখ আমি তোদের কী ভাবে হেয় করি! জগতের কাছে হেয় করে ছাড়ব। দশে ধর্মে দেখবে হিন্দু নারীর মহিমা, দেখবে কলিকালের পিতৃভক্তি!"

শুনতে শুনতে একটু মায়াও হল।

মনস্তত্ত্বটা বুঝতে পারছি। কিন্তু প্রতিশোধ-স্পৃহায় মৌলিকত্ব আছে বটে। যাই হোক, কাতর বচনে আবার সেই 'কিন্তু' দিয়েই বলি, কিন্তু মামা, এসব বই-

টই নির্বাচন তো আমার কাজ নয়। ওসব পরিচালকের ব্যাপার। আমি কে? কিছুই না! দৃশ্যটা ভাল উঠল কি না এইটুকু বোঝা হচ্ছে আমার কাজ।

নিজেকে কীটস্য কীট বলে ঘোষণা করতেও রাজী হই।

হায়! চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।

জগমামা বীরবিক্রমে বলতে থাকেন—সে তুমি বিনয়-ভবে যাই বল বাবা, আমি তো আর কাঁচা ছেলে নই। বলি—ছবির মাথাটা কে? পরিচালক না তুমি? পরিচালক একদিন না থাকলে চলে, তুমি না থাকলে চলবে? কত বড় একটা মান্যগণ্য লোক হয়েছ তুমি, একি আর না জেনেই এসেছি। এটুকু তোমাকে করতেই হবে অমল। না হলে—মরে আমি শান্তি পাব না। জীবন-ভোর কত দুঃখ পেলাম আর কী নীরবে সহ্য করে এলাম, সে-কথা জগৎকে জানিয়ে তবে মরতে চাই।

হাল ছেড়ে দিয়ে শুনতেই থাকি।

জগমামা বলেন,—কালকে তা হলে ওটা নিয়ে আসব বুঝলে অমল! আজ উঠি।

আজকে নিষ্কৃতি পেতে নিশ্বাস ফেলে বলি,—আচ্ছা আনবেন। কিন্তু খেয়ে গেলেন না—

—তাতে কি? তার জন্য কিছু দুঃখ করিস নে বাবা। খাওয়া কি পালাচ্ছে? খেলেই হবে। তুই যে আজ আমাকে কী তৃপ্তি দিলি! উঃ, লিখে পর্যন্ত কেবল ভেবেছি কাকে দিয়ে কাজটা হয়! হঠাৎ মনে পড়ে গেল তোর কথা, মাথায় খেলে গেল—ঠিক হয়েছে! মোক্ষম জায়গাটিই ধরা গেছে! জানি তো অমল আমার কথা ঠেলতে পারবে না।

অনর্গল বলে চলেন, যেন হয়েই গেছে।

চলে যেতেই গিন্নী এসে শুধোলেন—ও বুড়োটা কে এসেছিল? গল্প আর ফুরোয় না।

—ছিঃ! বুড়ো বলতে নেই, মামাশ্বশুর।

—মামাশ্বশুর! মামাশ্বশুর আবার কে?

—জগমামা! গল্প করেছি—মনে নেই?

—হুঁ! তা উনি এসেছিলেন কি করতে?

—প্রতিশোধ নিতে।

গিন্নীর চোখ লাল হয়ে ওঠে।

পরদিন ঠিকই এলেন জগমামা।

কোণে দড়িবাঁধা বিরাট এক কাগজের বোঝা নিয়ে।

এই গন্ধমাদন পর্বত আমার ঘাড়ে চাপাতে এসেছেন! এ প্রতিশোধ কার উপর? কার পাপে কার দণ্ড!

—এই আনলাম!

না বলে পারলাম না, এ যে বিরাট জগমামা!

—বিরাট!

জগমামা কেমন একরকম কাতর চোখে চেয়ে বলেন, তবু তো তিন ভাগই বাকি রয়ে গেছে অমল! এই এতকালের বিরাট জীবনটা, তার কতটুকুই বা লেখা যায়? চরিত্রগুলি যেন একটু এদিক-ওদিক হয় না বাপু, সেদিকে দৃষ্টি রাখবে।

—তা তো বুঝলাম। তবে ভাবছি কাকে ধরব!

—সে তুমি ঠিক লোককেই ধরবে। এই যেমন আমি ধরলাম।

বলে নির্দন্তমুখে হেসে উঠলেন জগমামা।

কিন্তু কে জানত শিবপুর থেকে ভবানীপুরে রোজ একবার করে ধর্না দিতে আসবেন জগমামা।

—ওটার ব্যবস্থা হয়ে গেছে না কি অমল?

কুণ্ঠিতভাবে বলি, না মামা, এখনও কিছু করে উঠতে পারি নি।

বলা বাহুল্য কিছু করার চেষ্টাও করি নি।

সত্যি আমি তো আর পাগল নই।

জগমামা যেন আমাকেই সান্ত্বনা দেন, হবে, হয়ে যাবে ঠিকই। তুমি যখন লেগে পড়ে রয়েছ। কিন্তু পড়ে তোমার কেমন লাগল তাই বল! রোজই ভাবি জিজ্ঞেস করব। কেমন লজ্জা লজ্জা করে। মন্দ হয় নি, কি বল?

সত্যি বলতে কি, এক বর্ণও পড়ি নি। পড়ার কথা ভাবিও নি, এত জেরার মুখে দাঁড়াতে হবে সে খেয়াল ছিল না। কিন্তু সত্যি কথাও সবসময় বলা চলে না। তাই সোৎসাহে বলি, আমার তো খুবই ভাল লাগল। কিন্তু—মানে, ভাবছি—একেবারে ঘর-সংসারের ব্যাপার, ছবিতে ঠিক—"

আন্দাজী ভাঁওতা মারি।

জগমামা হেসে বলেন, এই দেখ! আজকাল যে ঘরসংসারী গল্পই চলছে হে। একবার নামিয়ে দাও না, দেখো কী কাণ্ডটা হয়। এ তো আর টেনে বুনে বানানো গল্প নয় অমল, এ যে একেবারে বুকের রক্ত দিয়ে লেখা।"

জগমামার বুকেও যে এমন রক্ত ছিল, যাতে সের-তুত্তিন কাগজ ভেজানো যায় সে কথা কবে ভেবেছিলাম।

ভাঁওতা দিয়ে কদিন চালানো যায়?

মরীয়া হয়ে একদিন বসলাম খাতাগুলো নিয়ে। হাতের লেখাটা কিন্তু চমৎকার, ছাড়া ছাড়া মুক্তোর মত অক্ষর! বোধ করি কেবলমাত্র অক্ষরের গুণেই খুব খানিকটা পড়ে ফেললাম।

হায়! পড়ে হাসব না কাঁদব! কী ভাব! কী ভাষা! অত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে একই কথা!

জগমামী যে কত হৃদয়হীন, কত নির্মম, কত ভয়ঙ্করী, তার বিশদ বর্ণনায় পাতার পর পাতা উঠেছে ভরে। একে একে ছেলেদের, ভাইদের, আরও কার কার চরিত্র-বর্ণনাই চলছে। পাতা উল্টে চলে গেলাম শেষের দিকে। সেখানে দৃশ্য।

বাড়ির কর্তাকে যে সপরিবারে মিলে কী নির্যাতন করছে তারই দিনলিপি। সবচেয়ে শোচনীয় হচ্ছে—খেতে দিচ্ছে না।...ছেলে বলছে, 'বাড়িসুদ্ধ সকলে যা খাই বাবা একলা তাই খান।' গিন্নী বলছেন, 'তোমার ওই রাক্ষসের পেট ভরাতে গেলে আমার বাছাদের আর কিছু থাকবে না।'

পড়ে দুঃখও হল!

আহা খেতে কী ভালই না বাসতেন। তা ছাড়া অপমানের জালাও তো কম নয়।

৪

জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছেন, তবু মুখের ওপর রূঢ় হতে পারি না। অবিরত মিথ্যের জাল বুনে চলি। যথা—

—ওটা তা হলে দিয়ে দিয়েছ?

—ক—বে!

—আচ্ছা এতটা দেরি হচ্ছে কেন বল দেখি?

—চিত্রনাট্য লেখার যে কত ফ্যাচাং মামা। আজ সবটা লিখল তো কালই ছিঁড়ে ফেলে নতুন করে লিখতে বসল!

—তুমি অবিশ্যিই তাগাদা দিচ্ছ, কেমন ?

—সে আর বলতে ! দু বেলা !

—দীর্ঘজীবী হও বাবা। আমার একটা ছেলেও যদি তোমার মতন হত।

লজ্জায় মাথা হেঁট করি। আর সেই লজ্জাতেই আবার পরদিন নতুন মিথ্যে কথা বলি। বলি, কিছু আশা পাচ্ছি—

—স্যুটিং আরম্ভ হল নাকি অমল ?

অভ্যস্ত ভঙ্গীতে বলি, না স্যুটিং আরম্ভ হতে একটু দেরি আছে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পাওয়াই মুশকিল যে।

জগমামা গুছিয়ে বসেন।

বলেন, ভালো অ্যাকটার অ্যাকট্রেসই দেবে, কি বল ?

—তা তো নিশ্চয়।

—যাতে ভাব-টাবগুলো ভাল করে ফোটে সেদিকে তুমিও একটু লক্ষ্য রেখ। রাখবেই অবিশ্যি, বলাটাই বাহুল্য। আর ওই মাতঙ্গিনীর—মানে আর কি গিন্নীর পার্টটা যে নেবে তাকে—আচ্ছা থাক এখন থাক, আরম্ভ হোক।…আচ্ছা অমল, ওরা একেবারে ঘাবড়ে যাবে কি বল ?

চমকে বলি, কারা ?

—আহা তোমাব মামী-টামীদের কথা বলছি।

—বুঝতে পারলে যাবেন বৈ কি !

—বুঝতে পারবে না ? লাইনে লাইনে মিলে যাবে, বুঝতে পারবে না ?

জগমামা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

—তা হলে ঘাবড়ে একটু যাবেনই।

—একটু ?…এখনও যদি ওদের শরীরে ছিটে-বিন্দু মনুষ্যত্ব থাকে তাহলে লজ্জায় মরমে মরে যাওয়া উচিত।

দাঁড়িয়ে উঠে পায়চারি করতে থাকেন জগমামা, অনেকটা চিড়িয়াখানার বন্দী বাঘের মত।

শিবপুর থেকে ভবানীপুরে আসার বিরাম নেই।

—এইটা হলেই আমি শান্তিতে মরতে পারি অমল।

—কী যে বলেন মামা ! আপনি এখনও অনেকদিন বাঁচবেন।

—থাক বাবা, তুমি আমায় ভালবাস, ও প্রার্থনা আর কোর না। কিন্তু—বজ্জ

যে গড়িয়ে যাচ্ছে অমল। কি হল বল তো ?

নতুন মিথ্যের অবতারণা করি।

বলি, 'কোম্পানির সঙ্গে পরিচালকের মনান্তর চলছে।' ভাবি তবু খানিকটা সময় পাওয়া যাবে। ততদিনেও কি ধৈর্যের বাঁধ ভাঙবে না জগমামার ?

ক্রমশ যেন একটু হতাশ হতে থাকেন জগমামা। ছবি দেখে 'ওরা' কী হয়ে যাবে সে আলোচনাটাও ফিকে মেরে যায়! তবু নিত্যনিয়মে এসে নির্দিষ্ট আসনটিতে বসে থাকেন চুপ করে। আর আমি ঘরে ঢুকলেই প্রশ্ন করেন, কি অমল, ওদের ঝগড়া মিটল ?

আজ কিন্তু সে কথা বললেন না। আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, অমল, আমি বলি কি ওটা ছাড়িয়ে নিয়ে অন্য কোম্পানির হাতে দিয়ে দাও। আমাব শরীরের অবস্থা আর তেমন ভাল বুঝছি না। তাই ভাবছি—সেই হবেই শেষ পর্যন্ত, অথচ আমি দেখতে না পেলে তোমার আর আপসোসের শেষ থাকবে না। এবার একটু উঠে পড়ে লাগ অমল।

কি ভাবে স্তোক দিয়েছিলাম, আর কি ভাবে বিদায় করেছিলাম মনে পড়ছে না, মনে পড়ছে—জগমামা চলে যেতেই গিন্নী এসে উঁকি দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, বলি ব্যাপার কি ?—বুড়ো যে আমার বাড়ির মাটি নিল!

—আর বোল না! দরাজ গলায় বলে উঠি, পাগল করে ছাড়লেন। উঃ মিথ্যে কথা কয়ে কয়ে জেরবার হয়ে গেলাম! ওঁর জীবনী তো ওই আমার আলমারির মাথায় পড়ে কাঁদছে। উনি এখন স্যাটিঙের স্বপ্ন দেখছেন! উঃ মানুষ যে কি করে এত বোকা হয়!

কথাটা শেষ করেছিলাম কি সম্পূর্ণ শেষ করি নি, মনে নেই। শুধু মনে আছে হঠাৎ ভূত দেখার মত চমকে উঠে দেখেছিলাম দরজায় দাঁড়িয়ে জগমামা!

ঘরের কোণে যে জগমামার ছাতাটা দাঁড় করানো ছিল তা দেখি নি।

সর্পাহতের মত তাকিয়ে থাকলাম।

নাঃ, সেই অবধি আর আসেন নি জগমামা। কিন্তু সে চোখ আর আজ পর্যন্ত ভুলতে পারলাম না। তাকেই কি আলঙ্কারিক ভাষায় "শরাহত হরিণের দৃষ্টি" বলে ? সেই চোখের কোল দিয়ে গড়িয়ে পড়েছিল দু ফোঁটা জল, আড়ষ্ট হয়ে দেখেছিলাম তাকিয়ে তাকিয়ে।

ছাতাটা তুলে নিয়ে জগমামা ঘরের মাঝখানে একবার দাঁড়ালেন। যেন শূন্যকে উদ্দেশ করে রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, "ভালোই করলে ভগবান! দুনিয়াটাকে

চেনবার যেটুকু বাকী ছিল সম্পূর্ণ হল !"

সেই থেকে সাবধান হবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু মজ্জাগত অভ্যাস কতটুকুই বা যায় ? অহরহই আমরা কত অসতর্ক মন্তব্য করি—কে হিসেব রাখে সে মন্তব্য কোথায় গিয়ে পৌছয়। হয়তো—জগমামীও সত্যিই পিশাচী নয়, হয়তো শুধুই অসতর্ক ! কিন্তু সেকথা কে বোঝাবে জগমামাকে !

অভিমত

এইমাত্র ছেলেগুলি চলে গেল।

ভারি খুশী মনেই গেল। যাবে না কেন—খুব পিঠ চাপড়ে দিয়েছি যে ! নির্জলা মিথ্যে কথাগুলো বলে যেতে এখন আর বাধে না। জলের মতই বলি।

বিবেকের দংশন ?

কই, তেমন কিছু অনুভব করি না। নির্ভেজাল সত্য বললেই বা এমন কি হাতী-ঘোড়া লাভ হত ? ··সত্যভাষণের আত্মপ্রসাদ, এই তো ?···

এতগুলি হাসিমুখের বিনিময়ে কিনতে হ'ত সেটুকু—তাই না ?···তবে ?

তা ছাড়া, কেবলমাত্র আজকের এই মিথ্যেটুকুর জন্যই যদি 'নরক-দর্শন' আশঙ্কা থাকত, তা হলেও বা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করবার ছিল।

সকাল বেলা—শরতের চমৎকার সকাল।

গুটি চার পাঁচ ছেলে এসে একগাল হেসে প্রশ্ন করল—এ সময় এসে আপনাকে জ্বালাতন করলাম না তো ?

বলল বটে—মুখের ভাবে খুব বেশি কুণ্ঠা প্রকাশ পেল না। নেহাৎ বিনয় করেই বলছে এইভাবে।

শরতের সকালে যে হাওয়া বয়—তাতে কিছুটা দাক্ষিণ্য, কিছুটা উদারতা মাখানো আছে না কি ? প্রকৃতির ছোঁয়াচ মানুষের মনেও লাগে।···

তা ছাড়া—নিতান্ত পাষণ্ড না হলে কিছু আর কেউ বলতে পারে না—'হ্যাঁ করলে জ্বালাতন।' কাজেই কিছুটা প্রশ্রয়ের সুরেই বলতে হয়—না না এমন কিছু নয়। তার পর—চাই কি ?

একটি ছেলে প্রধান অংশ গ্রহণ করে বলে—আজ্ঞে আপনার একটু অভিমত।

মনে মনে আকাশ থেকে পড়ি। জীবনে এদের চোখে দেখেছি কিনা সন্দেহ। বলে কি না 'অভিমত চাই।'...আচ্ছা দেখেছি কি? কোথায় দেখলাম?... কোন স্কুলে কলেজে? সভা সমিতিতে? হয়তো হতে পারে, খুব লক্ষ্য করে দেখে মনে হচ্ছে কোথায় যেন দেখেছি।

কিন্তু দেখেই থাকি যদি, অভিমতটা কিসের?

মুখের ভাব লক্ষ্য করেই বোধ করি—প্রধান বক্তাটি ঈষৎ বিপন্নভাবে বলে—আমাদের চিনতে পারছেন না স্যার? সেই যে সেদিনকে সন্ধ্যাবেলা এসেছিলাম আমরা—একখানা কাগজ নিয়ে?

এইবার বিপন্ন হবার পালা আমার।

'সেদিনকে সন্ধ্যাবেলা'র ঘটনা এমন বেমালুম বিস্মৃত হয়ে যাওয়াটা খুব বেশী প্রশংসার যোগ্য নয় নিশ্চয়ই? কিন্তু প্রত্যক্ষ বিপন্ন হই না।

যেন এইমাত্র খেয়াল হল—এইভাবে বলি—ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই যে সেদিন—আগের সোমবারে না?

ঈশ্বরের অনুগ্রহ, ধাপ্পাটা লেগে গেল খাঁ করে। 'সোমবারে'র উল্লেখে ছেলেটি পরম হৃষ্টচিত্তে বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।...ইয়ে—পড়েছিলেন তো আমাদের কাগজটা? 'পায়ে চলা পথ'?

ওঃ এতক্ষণে সত্যিই মনে পড়ে। নামটার ঈষৎ বিশেষত্বর জন্যেই মনে পড়ে। তা নইলে আজকাল আর মাসিক সাপ্তাহিক পাক্ষিক বার্ষিক ইত্যাদি সকলের নাম মনে রাখা সোজা নয়।

কবে যেন একদিন "পায়ে চলা" না কি ওই নামের একখানা চটি কাগজ দিয়ে গিয়েছিল কারা। এরাই তবে? তার সম্বন্ধে অভিমত দিতে হবে? হা ঈশ্বর!

অপরপক্ষের ওদিকে সঙ্কোচের বাঁধ ভেঙে দেখা দিয়েছে উৎসাহের প্লাবন।

—পড়েছেন তো? কি রকম হয়েছে—সেই সম্বন্ধে একটা—

অর্থাৎ 'পড়েছি'—সে বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ।

হতেই পারে।...নতুন 'মা,' তার প্রথম শিশুটিকে যখন সাজিয়ে গুজিয়ে বেড়াতে পাঠায়, সে কি স্বপ্নেও ভাবে পথের লোক তাকিয়েও দেখে নি ভাল করে? কাজলের রেখার বিশেষ ভঙ্গিটি, তিলের অনুকরণে আঁকা চিবুকের টিপটি, অনেক পরিশ্রমরচিত চুলের কেয়ারিটি মাঠেই মারা গেছে?

'জলস্পর্শহীন মৎস্য শিকারে'র ধরনে বলি—তা আমার 'অভিমত' নিয়ে কি করবে হে ?

—কি করব ? বলেন কি ? বাঃ—

প্রধান অপ্রধান প্রত্যেকেই নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করে—

—কী যে বলেন ! আপনার অভিমতটাই যে একান্ত দরকার।…আপনাদের কাছ থেকে উৎসাহ না পেলে আমরা কোথায় দাঁড়াই স্যার ? 'না' বললে চলবে না—সে দিন আশা দিলেন।

বোঝা যাচ্ছে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আশাও দিয়েছি এদের। আশ্চর্য নয়, অমন তো দিতেই হয় কত সময়। অতএব মুখে হার মানা চলে না। বলি—আরে তা তো জানি, পড়ে ভালও লেগেছে, কিন্তু ঘটা করে একটা অভিমত দেবার বিশেষ কি দরকার আছে ?

—দরকার আছে বই কি, খুব দরকার আছে স্যার। আমরা ঠিক করেছি পূজো-সংখ্যায় যত সব বড় বড় লেখকদের অভিমত সংগ্রহ করে ছাপাব।…ওইটেই 'কভার' হবে। মানে শারদীয়া সংখ্যার বিশেষ কভার।

—ওইটেই 'কভার' হবে মানে ?

—ইয়ে আর কি—কভারের ওটা একটা নূতন পরিকল্পনা করেছি আমরা। প্লেন কাগজের ওপর এলোমেলো ভাবে কয়েকখানা কার্ড ছড়ানো রয়েছে—এক একটা কার্ডে এক একজনের অভিমত।…ইয়ে কি বলে—হাতের লেখার অনুকৃতি দিয়ে ছাপা হবে কার্ডগুলো।…খুব নতুন একটা পরিকল্পনা নয় স্যার ?

আশায় আর গর্বে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ছেলেটির মুখ।…

—মন্দ নয়। বেশ নতুন আইডিয়াই মনে হচ্ছে।…গম্ভীরভাবে বলি।

—সকলেই তাই বলছে—(আরও উজ্জ্বল)…আইডিয়াটা স্যার—এর। এই যে—এর নাম মুরারি। এ আবার ছবিও আঁকে-টাঁকে। বর্ডার-লেটারিং ওই করবে।…

—তাই নাকি ? বেশ বেশ।

ওদের এই পরিকল্পনার গল্প আমি কতটা অভিনিবেশ সহকারে শুনছি, সেটা লক্ষ্য করবার অবস্থা এদের নয়। ওদের বই আমি পড়েছি ভাল লেগেছে—মলাটের ছবি সম্বন্ধে উৎসাহ দিচ্ছি—এ-ই যথেষ্ট।…এই বিশ্বাসেই সুখী।

—তা হলে—আপনি ভালই বলছেন ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমার তো মনে হচ্ছে—ভালই হবে—

—আচ্ছা স্যার, ওই 'মাটি দিয়ে গড়া' গল্পটা আপনার কি রকম লাগল ?

সসঙ্কোচে এ পাশের 'এ পর্যন্ত নীরব' ছেলেটি উপরোক্ত প্রশ্ন করে।

বোধ করি সেই 'মাটি'টুকু ইনিই মেখেছেন।

আমি তো ঠকবই না প্রতিজ্ঞা! কিছুতেই আর তাই ঘাবড়াই না। অক্লেশেই বলি—পিঠ-চাপড়ানো মুরুব্বিয়ানার সুরে বলি—ভালই হয়েছে হে। নতুন লেখকের পক্ষে বেশ প্রশংসার যোগ্যই হয়েছে।

এত বেপরোয়া বলি—ওরা ওইটেই বিশেষ করে উল্লেখ করল বলে। খুব সম্ভব ওইটাই ওনাদের কাগজের মাস্টারপীস্।

—আর "রাত্রির ঝড়" কবিতাটা ?

সেরেছে! আবার কবিতাও!

চালিয়ে যাব ? না বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে ?

—দেখ বাপু, সত্যি কথা বলতে—ও তোমাদের কবিতা-টবিতা—আমি কমই পড়ি। খুব সম্ভব ওটা পড়া হয় নি।...

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—সত্যিই তো স্যার। আপনার কত কাজ। তার মধ্যে সময় করে যে গল্পগুলোও পড়েছেন এই ঢের।..."অবোধ সান্যাল" তো উড়িয়েই দিলেন। বললেন—"দিয়েছিলে না কি বই ? তা হবে—কিন্তু পড়ছে কে ? মনেও নেই সে কথা।" "সৌমেন মিত্তির" বললেন—"ব্যাঙের ছাতার মত কাগজ গজাচ্ছে—সব যদি পড়তে হয় আর অভিমত দিতে হয় তা হলে তো আমাদের ব্যবসা তুলে দিতে হয় হে।"...দেখুন দিকি স্যার, শুনে মনটা কি রকম হয় ?...অথচ এই তো আপনি—

বাধা দিয়ে বলি—আমার কথা থাক, তোমাদের কি চাই তাই বল।

—আজ্ঞে ওই তো বললাম—আপনার একটা ওপিনিয়ান।...আমরা ঠিক করেছি—গল্প-টল্প চেয়ে আপনাদের—অর্থাৎ বড় লেখকদের বিরক্ত করব না, যা পারি নিজেরাই চালিয়ে যাব।...শুধু মাঝে মাঝে আপনাদের একটু মতামত। কিছুটা উৎসাহ, এই আর কি।

অর্থাৎ অনেক কিছুই ঠিক করে ফেলেছে ওরা, স্বাবলম্বন স্পৃহাটা আছে। ভাল বুদ্ধি—'গল্প গল্প' করে শূন্য পকেটে গল্প-ব্যবসায়ীদের দোরে দোরে ধর্ণা দেওয়ার চাইতে অনেক ভাল।...অবিশ্যি থাকবে না। হয়তো লোকসান খাবে, দলাদলি করবে, প্রত্যেকে আলাদা আলাদা একখানা করে কাগজ বার করবে, পরস্পরকে গালমন্দ করবে, আজকের স্বপ্নের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। সবই হচ্ছে

পারে। হবেই ক্রমশ।

কিন্তু আজকের স্বপ্ন ভেঙে দিই কেন ?

লিখে পয়সা পাওয়া যায় বটে—কিন্তু লিখতে তো আর পয়সা লাগে না ? খস্‌খস্‌ করে আধপাতা লিখে দিই—

ঝুঁকে পড়ে দেখতে দেখতে উজ্জ্বল মুখগুলি উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে দেখতে পাচ্ছি। কয়েক লাইন মিথ্যার মূল্যে যদি এটুকু লাভ করা যায়, দোষ কি ? এই তো সেদিন এক ডজন কালির দোয়াত উপহার (ঘুষ না বলে যদি উপহারই বলেন) দিয়ে পরিপাটি একটি অভিমত নিয়ে গেল 'লিপিলেখা'র প্রোপ্রাইটার। 'লিপি-লেখা'র ছিপি খোলবার আগেই 'ক্লীপ্‌' ভর্তি পেন্‌টা দিয়েই লিখে দিলাম—"লিপি-লেখা ব্যবহারের পর আর কোন কালি ব্যবহার করা কঠিন—"

সবটা যে মিথ্যা তা নয়, পরে দেখেছি, একটুখানি খাঁটিই লিখেছি—"ব্যবহার করাই কঠিন।" ভাইপো-ভাইঝিদের ভাগ করে দিয়েছি দোয়াতগুলো।

আর—এই 'শ্যামলী টী' ? চিরেতা-মার্কা যে চাগুলো মাস দেড়েক ধরে খাচ্ছি আর রোজ ভাবছি 'কবে ফুরোবে'—তার সম্বন্ধেই কি লিখি নি—"শ্যামলীই একমাত্র পানীয় যা মস্তিষ্কের জড়তা দূর করে—লেখার প্রেরণা যোগায় ?"

হবেই তো লিখতে।

এরপর ক্রমশই যত বিখ্যাত হতে থাকব, না লিখে উপায় থাকবে কেন ? স্নো পাউডার থেকে শুরু করে—শোন্‌পাপড়ি পর্যন্ত, সকলের জন্য প্রশংসাপত্র দিতে হবে। বিখ্যাত হওয়া তো অমনি নয় ?

তবে ?

এদেরই বা বঞ্চিত করব কেন ?

ঈর্ষায় ?

মিথ্যা বলব না, নামগোত্রহীন তরুণ লেখকদেরও অজ্ঞাতসারে হিংসে করি না কি ? ওদের লেখনীকে নয়—তারুণ্যকে ! উৎসাহের ঔজ্জ্বল্যকে !

বিরাট সভার সভাপতিত্ব করে—ফুলের মালা গলায় বাড়ি ফিরে এসে মুখ দেখেছি, ক্লান্তি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাই নি সে মুখে। কিন্তু ওরা বড় মুখ করে এসেছে, ওদের কাছে সে দৈন্য প্রকাশ করব কেন ? কেন দেখাব না উদারতা ? একটি পয়সা খরচও নেই যাতে।

আর—আর—একটা চাপা আশঙ্কাও কি নেই ?

শুঁয়োপোকাই তো একদিন প্রজাপতি হয়? ভবিষ্যতে যখন আজকের এই শুঁয়োপোকার দল রঙিন পাখা মেলে উড়তে শিখবে, তখন আমাদের মত গতিবেগহীন অতিকায় জীব সম্বন্ধে হয়তো এমন সব অভিমত প্রকাশ করবে, যেটা বিশেষ হৃদয়গ্রাহী না হওয়াই সম্ভব।

অতএব—

হাতে রাখতে দোষ কি?

ফুলঠাকরুণ

ফুলঠাকরুণের আসল নাম ফুলেশ্বরী কি ফুলকুমারী অথবা আর কিছু, সে কথা কেউ জানে না, সে নিয়ে মাথাও ঘামায় না। ফুলঠাকরুণ, যাঁর নামে বাঘে গোরুতে একঘাটে জল খায়। যাঁকে ঘাটে পথে আসতে দেখলে পাড়ার অতি দুর্দান্ত ছেলেরাও একটু সরে দাঁড়ায়। চণ্ডীমণ্ডপের আড্ডাধারী কর্তারা নড়ে চড়ে কোমরের কষি টাইট্ করে পা উঠিয়ে বসেন। আর বৌ-ঝিরা রান্নাঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়েও তাঁর চেহারাটা দেখতে পেলে অজান্তে ঘোমটাটা টেনে লম্বা করে নেয়।

এই ফুলঠাকরুণ! দশবছরে বিয়ে—এগারোয় বিধবা। তদবধি ঠাকুমা পিসীর সঙ্গে নির্জলা একাদশী করে এসেছেন, তাঁদের চালেই চলে এসেছেন। এক কথায় সে কালের একটি ডাকসাইটে শুচিবায়ুগ্রস্তা দুর্দান্ত বিধবার নিখুঁত টাইপ।

শুচিতার জন্য ফুলঠাকরুণ সাতখানা গ্রামের মধ্যে বিখ্যাত। বাইরে তাঁর পুকুর আলাদা, বাড়িতে তাঁর মহল আলাদা। ঠাকরুণের বাপ বেঁচে থাকতেই মেয়ের এই আলাদা মহলের ব্যবস্থা করে দিয়ে গেছেন। ফুলঠাকরুণ কখনও সুতি থান পরেন না, সর্বদাই মটকা তসর কেটে!...সেগুলো ফুটো ফাটা হয়ে গেলে, রাত্রে শোবার ব্যবহারে লাগে।...সে সব কাপড় জীবনে সাবান মাখতে পায় না, রিঠে আর সাজিমাটিই তাদের শেষ প্রসাধন।

এক বেলা এক বার হবিষ্যান্ন, রাত্রে একটু ফল আর মধু। চিনি গুড়ের মত অশুচি জিনিস ফুলঠাকরুণের ভোগে লাগে না। অশুচি নয় তো কি? 'সত্যিক' জাতে পাক করে না?

ফুলঠাকরুণের কাছে একটি মাত্র লোকের প্রশ্রয় আছে, সে হচ্ছে তাঁর ছোট

ভাইঝি দুগ্‌গা।...দুর্গার বয়সের পক্ষে অবশ্য তার নামটা সেকেলে, নামকরণের সময় দুর্গার মায়ের ছিল সকরুণ আপত্তি। কিন্তু ফুলঠাকরুণ রায় দিয়েছিলেন 'আমার বাপের ভিটেয় আমার দেওয়া নামই বাহাল থাকবে। যে তাতে বাজী নয় সে মেয়ে নিয়ে নিজেব বাপের ঘরে থাকুক গে।' অগত্যা দুর্গা নামই বাহাল।

দুর্গা ইদানিং বড় হয়ে তর্ক তোলে পিসীর সঙ্গে, বলে, "আচ্ছা পিসী, ঠাকুর যে চিনির সন্দেশ খান গুড়ের বাতাসা খান?' পিসী তাচ্ছিল্যভরে বলেন "থাক গে! লুভিষ্টে দশা, যে যা দেয় খেয়ে মরেন!"

"আর এই যে তুমি ঠাকুরের পেসাদ খেলে না, তাতে তোমার পাপ হল না?"

"পাপ আবাব কিসেব লা? চরণ-তুলসী খাই না দুবেলা? মণ্ডা মেঠাই দিয়ে ঠাকুবের ভোগ সাজানো তো শুধু মানুষের জিভের লালস মেটাতে। ঠাকুর কি বলেছে—সকাল থেকে উঠে খালি আমার বাহান্ন ভোগের যোগাড় কর?"

দুর্গাও ছাডবাব পাত্রী নয়, সে ফুলঠাকরুণেবই ভাইঝি। সে বলে, "পিথিবীসুদ্ধু লোক তবে কবছে কেন?"

"পৃথিবী সুদ্ধু লোক কি না কবছে? হাতে কবে বিষ খাচ্ছে, হাতে করে আগুন খাচ্ছে। আমাকেও খেতে হবে তাই?"

নিবক্ষব ফুলঠাকরুণ, ওঁর নামে বাখা "কোম্পানীর কাগজ"-এর সুদের টাকা মনিঅর্ডাব এলে টিপ্‌-সই করে টাকা নেন, তিনি সাবা পৃথিবীর সমগ্র মানব-সমাজেব বেকুবিব উদাহবণ দিয়ে, নস্যাৎ কবে দেন তাদেব।...মনিঅর্ডাবের ওই টাকার ব্যাপাবেও একটা মজা আছে। তিনমাস অন্তর বাবোটা কবে টাকা, পিয়ন রামেশ্বর জানে—যে কোন উপায়ে ও টাকাটা তাকে কাগজের নোট থেকে বৌপ্য মুদ্রায় পরিণত কবে তবে ফুলঠাকরুণেব কাছে নিয়ে যেতে হবে। কাগজের নোট ফুলঠাকরুণ কডে আঙুল দিয়েও ছোঁন না। রুপোর টাকা দাওয়ায় ফেলিয়ে গঙ্গাজল দিয়ে তুলে নেন।...কিন্তু সে যাক—ফুলঠাকরুণের সমস্ত আচরণের ফিরিস্তি দিতে গেলে তো অষ্টাদশ পর্বেও কুলোবে না।

তবে আন্দাজ করা যাচ্ছে—ফুলঠাকরুণ এই!

সেই ফুলঠাকরুণেব বাড়িতে এক বিপত্তি। রাতে গেছে দারুণ জলঝড়। ঘরের ছাত নেমে আসে এমন অবস্থা! কত গাছ পড়ল, কত গোরু ছাগল মরল তার ইয়ত্তা নেই।...ভোরের দিকে একটু ছেড়েছে। ফুলঠাকরুণ ঘুম থেকে উঠে বাড়ির কোথায় কি ক্ষতি অপচয় হয়েছে, তারই তদারক করতে বাগানের দিকে যাবার দরজার কাছে এসে থমকে দাঁডালেন। ফুলঠাকরুণেব সারা বছরের কাঠ ঘুঁটে

রাখতে ছোট-মতন একটা চালা আছে,—বিশুদ্ধ ঘুঁটে কাঠ—সেখানে কারও হাত চলে না। তারই কপাটের আগলটা পড়েছে ভেঙে আর সেই দোরের ভেতরে গুটি-সুটি মেরে শুয়ে আছে একটা ছোট-লোক মাগী, কোলের কাছে কেন্নোর মত একটা ছেলে। একেবারে ছোট্ট ছেলে। ঘর-দোর অপরিষ্কার করেছে তাতে আর সন্দেহ কি! দোরের কাছে যে জল থই থই করছে, সেটা বৃষ্টির জল না আর কিছু তাই বা কে জানে!

রাগে আপাদমস্তক জ্বলে গেল ফুলঠাকরুণের।

এ কী স্পর্দ্ধা! মরতে আর জায়গা পেল না? ক্রুদ্ধস্বরে হাঁক দিলেন, "এই, এই মাগী। কে তুই?"

ধড়ফড় করে উঠে বসে মেয়েলোকটা। ছেঁড়া আঁচলের কোণটুকু টেনে ছেলের গায়ে ঢাকা দিতে দিতে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়।

"হয়েছে! আর গুছিয়ে গাছিয়ে ছেলেকে শোয়াতে হবে না, বলি কে তুই?"

মেয়েটা কেঁদে ফেলে দেহাতী টানে যা বলে, তার অর্থ—সে নিতান্ত দুঃখিনী, তিন কুলে কেউ নেই, ক্ষেত-খামারে উঞ্ছবৃত্তি করে পেটটা চালায়! কাল দলের সঙ্গে বেরিয়েছিল, হঠাৎ ঝড় ওঠায় এলোমেলো হয়ে ছিটকে পথ হারিয়ে ফেলেছে। বড় দুঃখিনী সে। নাম খুদুর মা।

ফুলঠাকরুণ বিরক্তস্বরে বলে, "দুঃখী, সে কথা কি আবার ঢেঁড়া পিটিয়ে জানাবি নাকি? চোখে দেখতে পাচ্ছি না? বলি তিন কুলে কেউ নেই তো— ওই ছেলে কার লা হারামজাদি?"

খুদুর মা আবার একচোট কাঁদে, "ওই আমার খুদুর চেম মা ঠাউন! এই চৈত্তিরে জ্বর-বেকারে গেল খুদু, ছেলেটাকে আমিই বুকে করে—"

ফুলঠাকরুণের ভুরুর কুঞ্চনটি কিঞ্চিৎ মসৃণ হয়, কিন্তু কণ্ঠস্বর মসৃণ হয় না! বিকৃত কণ্ঠে বলেন, "কেন ওর বাপ নেই? জামাই?"

"এই বোশেকে আবার বে করেছে মা ঠাউন।"

"মাথা কিনেছে! বলে আপনি খেতে ভাত পায় না, শঙ্করাকে ডাকে। ...এখানে থাকা-টাকা চলবে না বাপু! পথ দেখ গে।"

"এই বাদল বিষ্টিতে কোথায় যাই মা ঠাউন? আকাশ-ত্থাবতার চ্যাহারাখানা দেখতেছ? আজকের দিনমানটা এক ফোঁটা আশ্রয় ত্থাও।"

"দিনমানটা দেব আর 'আত্তির কালটা' কোথায় যাবি রে মাগী? তখন নড়তে চাইবি?...যা যা ওসব আদিখ্যেতা চলবে না। পাড়ায় আরও ঢের মেলেচ্ছবাড়ি

আছে, সেখানে যা। আর ঠাঁই পায় নি, মরতে এসেছে আমার বাড়ি! আর কিনা আমারই মাথা খেতে এর ভেতরে ঢুকেছে গা! এই বর্ষায় সারা বছরের ঘুঁটে কাঠ মজুত ছিল—ছিষ্টি গেল!"

খুতুর মা শঙ্কিতভাবে বলে, "আমি তো উদিকে যাই নি মা ঠাউন। সুদ্দু এই দুয়োরের খোলটুকুনের মধ্যি—"

"থাম! থাম! ওই চৌকাঠ ডিঙোলেই আমার সব যায়! এ কি তোদের মত ছোটলোকের ঘর? শোন—ভাল চাস তো বিদেয় হ। আর কোথাও থাকগে যা, দুপুরে বরং এখানে এসে দু মুঠো ভাত গিলে যাস! গিলে আর যেতে হবে না; একখানা মাটির শানকি ফানকিতে দেব, বাইরে কোন চুলোয় নিয়ে গিয়ে খাবি। কোথাকার পাপ কোথায় মরতে এসেছে!"

হ্যাঁ, এই রকমই সভ্য মার্জিত ভাষা ফুলঠাকরুণের। আজীবন এই ভাষাতেই কথা কইতে অভ্যস্ত তিনি।

খুতুর মা আর ভরসা পায় না।

ছেলেটাকে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। তবু আবার বিনীতকণ্ঠে শেষ আবেদন জানায়—"একটা বেলাও যদি আচ্ছুয় দেন! ঘরে ঢুকব নি, এই—ছ্যাঁচের কোলে পড়ে থাকব। জ্বরে কাঠ ফাটতেছে ছোঁড়াটা!"

ফুলঠাকরুণ এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে তিক্তস্বরে বলেন—"আচ্ছা 'নেই-আঁকড়া' মাগী তো! সক্কালবেলা কি পাপ! থাকবি তো এই একটা বেলাই থাকবি। সন্ধ্যের আগে বিদেয় হবি। রাতে-ফাতে থাকা চলবে না।"

"তাই তাই! কোথায় তা হলে ছাওয়ালটাকে শোওয়া করাব মা ঠাউন?"

"কোথায় আর! আমার মাথায়! ঘরটার দফা তো খেয়েইছিস, থাক ওখানেই থাক।"

ইত্যবসরে ছোট ভাজ উঠে এসে পিছনে দাঁড়িয়েছে। এবং ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করে কাঠ হয়ে চুপ করে আছে। ফুলঠাকরুণ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন, "শুনলি তো ছোট বৌ? আবদার দেখছিস? নাও, এখন ওর গুষ্টির পিণ্ডি রাঁধ। বলে—ছোঁড়াটার নাকি আবার জ্বর হয়েছে। মিছে কথা! মায়া কাড়ানোর ছল। মরুক গে—দুধ যখন জ্বাল দিবি মাটির ভাঁড়ে করে এক ফোঁটা দিয়ে যাস। দুগ্‌গা দুগ্‌গা!"

এ দুগ্‌গা, ভাইঝি দুগগা নয়, দেবী দুর্গা।

এক বেলা বলে তিন বেলা! বৃষ্টির বিরাম নেই! নিচু চালা, ধারটা হাত

দেড়েক বাড়ানো, তবু দরজার কাছে জলের ছাট ঢোকে। নিরুপায় খুদুর মা ফুলঠাকরুণের অসাক্ষাতে, দুগ্‌গার কাছে চারটি খড় চেয়ে নিয়ে নাতির বিছানার সাধ মিটিয়েছে। ঢুকেও যেতে হয়েছে একটু ভিতর দিকে।

ঘাট থেকে স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে আসতে ঘরের দরজায় উঁকি দিলেন ফুলঠাকরুণ। দেখেই দাঁড়িয়ে পড়লেন। জলে থই থই করছে দোরের সামনেটা, একটা কাদার গর্ত সৃষ্টি হয়েছে বললেই হয়। ডিঙোনোর চেষ্টা বৃথা। ছেলেটাকে একলা ফেলে গেছে কোথায় মাগী, ঘাটে মাঠে নিশ্চয়! কোন্ কালে আসবে কে জানে! আক্কেল দেখ। আদিখ্যেতা করে বলা হচ্ছে আজ তিনদিন ছেলে জরে কাঠ ফাটছে! সত্যিই বটে···ঘুমোচ্ছে যেন মড়া! অথচ শোওয়ানোর কি ছিবি! ভিজে ঢোল চারটি খড়ের ওপর একটু ময়লা কানি পেতে শুইয়েছে, গায়ের ঢাকাও তদ্রূপ। একখানা কাঁথাও জোটে না গা! তবু এসব ঘরে মা ষষ্ঠীর দয়ার বিরাম নেই! গলায় দড়ি! নিঃশব্দে সরে এলেন ফুলঠাকরুণ, এসে চুপি চুপি ঢুকলেন নিজের শোবার ঘরে। ছেঁড়া-ছেঁড়া-মত কেটে কাপড একখানা রয়েছে, আধখানা র‍্যাপারের টুকরোও রয়েছে তোরঙ্গর ওপর ঢাকা দেওয়া। বালিশ? বালিশ না কচু, ভারি রাজপুত্তুর এসেছেন! মরুক গে এই 'পাটালী যেন' পাতলা বালিশটা, প্রায় ছিঁড়েই এসেছে—বদলাব বদলাবই করছিলেন—দিয়ে দেওয়া যাক আপদকে। জিনিস কটা তুলে নিয়ে চুপি চুপি উঠোনে নামেন ফুলঠাকরুণ। এগিয়ে যান ঘুঁটের ঘরের দিকে।

ধীরে ধীরে সন্তর্পণে ছেলেটাকে তোলেন, পাছে কেঁদে উঠে পাড়া রাষ্ট্র করে। গুছিয়ে শুইয়ে দিয়ে বেরিয়ে এসে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এদিক ওদিক তাকান—কেউ দেখে ফেলে নি তো? নাঃ, ভগবানের দয়া।

আর একবার স্নান করতে ঘাটে যেতে হবে। দ্বিতীয়বারের স্নানের কারণ কেউ জিজ্ঞেসা করলে উত্তরটা কি দেবেন, তাই ভাঁজতে ভাঁজতে এগোতে থাকেন ফুলঠাকরুণ।

আজ-কাল আর শনিবারে শনিবারে অফিস থেকেই সোজা স্টেশনে দৌড়য় না কমলেশ, একবার বাড়ি এসে তবে যায়। পর পর গাড়ি আছে দু তিনটে, জানে পাবেই একখানা।

এতে অবিশ্যি ছুটোছুটির কষ্টটা বেশি হয়, কিন্তু এইটুকু না হলে বিদিশা বড্ড অভিমান করে। আর সত্যি বলতে—খোকাটা হয়ে ইস্তক কমলেশের নিজেরও যেন মনে হয় ঠিক বেরোবার মুখেই একবার ওদের দেখেশুনে যাওয়া ভাল। খোকাকে আর খোকার মাকে।

অবিশ্যি কমলেশের এ সদ্বিবেচনাতেও বিদিশা বিশেষ কৃতজ্ঞ নয়। প্রত্যেক সপ্তাহেই ওর দেশের বাড়িতে "ছোটা"র বিরুদ্ধে ঢের বক্তৃতা সে করে, কিন্তু কমলেশকে টলাতে পারে না। অথচ রবিবার মাত্রেই কমলেশ অনুপস্থিত—এটা বিদিশার রীতিমত অসহ্য হয়ে উঠেছে।

আজও অভিমানে মুখ ভার করে কমলেশের হাত-ব্যাগটাকে গুছিয়ে দিতে দিতে বলে ওঠে বিদিশা—চন্দ্র-সূর্যের নিয়মের মত অমোঘ অলঙ্ঘ্য নিয়ম। এর আর ব্যতিক্রম নেই! আশ্চর্য!

বিদিশার দু কাঁধে এলিয়ে পড়ে থাকা দুটি সুপুষ্ট বেণীর একটাতে টান দিয়ে বলে কমলেশ—খুব রাগ হয় কেমন?

বিদিশা মুখ ফিরিয়ে বলে—রাগ ছাড়া বুঝি চিত্ত-জগতে আর কোন বৃত্তি নেই?

—ওঃ তাই বল, অনুরাগ?

—বাজে লোকের জন্যে অত দামী জিনিস আমি খরচ করি না।

—তা হলে বোধ হয় বীতরাগ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই। হল? সত্যি সত্যি তুমিই বল তো, আমার বুঝি ইচ্ছে হতে পারে না, একটা ছুটিতেও অন্তত বাড়ি থাক! তা নয়—দেশের ভাঙা-বাড়ির টানে—

কমলেশ বলে—তা বলে একদিনও থাকি না তা নয়। এই তো ফার্স্ট জুলাইয়ের ছুটিটায় থাকলাম, পনেরই আগস্টেও থেকেছি—

—হয়েছে হয়েছে, অত নিখুঁত হিসেবটি আর নাকের সামনে ধরে দিতে হবে না। থাকলে তো,—একটু বেড়াতে বেরুনো হল? দেশে না গিয়ে মনের দুঃখে তোমার এমন মাথা ধরল যে শুয়েই রইলে। জগৎ সুদ্ধ লোক বৌ নিয়ে বেড়াতে যায়, তোমার যে কী লজ্জা বুঝি না!

—কী মুস্কিল ! লজ্জা আবার কোথা ? ছুটি-ছাটায় তো থাকি না !

—থাক না সেইটাই তো প্রধান অভিযোগ। উঃ, পিসী যেন কারুর হয় না। মা মরে গেলে পিসী-মাসীতেই মানুষ করে থাকে। তোমার মতন এমন—

—আহা বুঝছ না, আমি যে গুণের সাগর !

—গুণের সাগর না হাতী ! কথার সাগর ! নাও, আবার এখুনি আমায় দোষ দেবে তো—তোমার জন্যে আমাব ট্রেন ফেল হল।

—হলই তো ! কমলেশ হাত-ঘড়িটায় চোখ বুলিয়ে বলে—চারটে আঠারোর গাড়ি তো এখানেই খতম হয়ে বসে আছে, এখন পাঁচটা পঁচিশেরটা ধরতে পারলে হয়। ঝি বুঝি খোকাকে নিয়ে বেড়াতে গেল ?

—হুঁ।

—এত রোদে বেরোয় কেন ? এটা ঠিক নয়।

—অন্য দিন বেরোয় না, আজ সকাল সকাল যেতে বললাম।

—কেন ?

—না বললে, গুণের সাগরের গুণেব জাহাজ ছেলে আমায় কিছু করতে দেবে ?

—আহা তাই বলে—ইয়ে, এ দু দিন ওকে একটু সাবধানে রেখ।

—এ দু দিন একলা নিজের এক্তারে পেয়ে ওকে আমি এন্তার পেটাব।

—তা ভাল ! এ পরিকল্পনাটি মন্দ নয়। ও কী করছ ? ব্যাগটা ফেঁসে যাবে যে ! কী এত ঢোকাচ্ছ ?

বিদিশা গম্ভীর ভাবে বলে—কী নয় ? জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব।

—দুটো কপিই দিয়ে দিচ্ছ কেন, একটা এখানের জন্যে রাখ ?

—এখানের সদস্যর মধ্যে তো আমি ? বিরহ-যন্ত্রণার মাঝখানে নতুন ফুলকপির ডালনা বিষবৎ !

—আহা হা, একা তুমি কেন, তোমার পাচিকা ঠাকুবাণীও তো রয়েছেন।

—ঠাকুরাণী ও-সব সভ্য জিনিসের ধার ধারেন না। এক কাঁসি চচ্চড়ি হলেই ওঁর হল। নাও নাও জুতো পর !—এর পর আবার একটু হেসে কথা সাঙ্গ করে বিদিশা—যেতে তো প্রাণ চায় না, তবু যাওয়া চাই।

—ওই তো মজা ! বলে হাসতে হাসতে বেরিয়ে পড়ে কমলেশ।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে ঘরের জানলা। জানলা দিয়েও আর একবার দৃষ্টি-বিনিময় বিদায়-পর্বের অঙ্গ। বিদিশা এসে দাঁড়াল।

—এসে আবার ঝগড়া—বলে হেসে চলে গেল কমলেশ জিনিসে-ঠাসা ব্যাগটা

নিয়ে। পিসীর জন্যে কমলেশ নিয়ে যাবে না, এমন জিনিস নেই। যে-সব নতুন ফল-তরকারি কলকাতায় থেকেও লোকে চোখে দেখতে পায় না, কমলেশের পিসীর তা পুরনো হয়ে যায়।

কমলেশ চলে গেলেও জানলায় দাঁড়িয়ে থাকল বিদিশা। কমলেশের চলে-যাওয়া পথটার মতই শূন্য খাঁ খাঁ করতে থাকে মনটা।

শনিবার আসার আগে থেকেই যেন দমে যায় বেচারা। মা নেই, বাপ নেই, বাপের বাড়ি বলতেই কিছু নেই যে দুটো দিন কাটিয়ে আসবে। দয়ালু কমলেশ নেহাতই দয়াপরবশ হয়ে বিয়ে করেছিল বিদিশাকে। সে এক ইতিহাস। কিন্তু সে যাই হোক, কমলেশের উদাব স্নেহের প্লাবনে দয়ার কথা ভেবে সঙ্কুচিত হয়ে থাকার প্রশ্নই ওঠে নি কোন দিন। আদরে-আবদারে, সুরে-ঝঙ্কারে, বিদিশা বিচিত্ররূপিণী।

বিদিশা ভাবে, এত স্নেহশীল, এমন প্রেমময় স্বামী, কিন্তু এই একটা বিষয়ে কেন এমন মমতাহীন? বিদিশার আবদারের মর্যাদা রাখতেও একটি বারের জন্যে কোন দিন দেশে যাওয়া বন্ধ করবে না! অথচ আজ পর্যন্ত বিদিশার দেখা হল না সে-দেশ কেমন, কেমন বা পিসী।

বাঙলা বিভাগের ফলে পুব থেকে পশ্চিমে ছিটকে আসা বিদিশার দুঃস্থ মামার মৃত্যুকালের অনুরোধে পড়ে বিদিশাকে বিয়ে করে বসেছিল কমলেশ, পিসীমাকে না জানিয়ে। মায়ের বাড়া পিসীমা, সাহস করে নি তাঁর কাছে এই হঠাৎ-ঘটে-যাওয়া ব্যাপারটাকে প্রকাশ করতে। সেকেলে মানুষ—'পূব-পশ্চিমের' বাধা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেন নি ওঁরা।

পিসীমা এখনও জানেন, কমলেশ কলকাতায় মেসে থাকে। আর আগে যারা এক মেসে থাকত, তারা জানে কমলেশ মেস ছেড়ে এক বন্ধুর বাড়ি পেয়িংগেস্ট হয়ে আছে।

বিদিশাকে বিয়ে করার ঠিক আগেই, অর্থাৎ মেস ছাড়বার প্রাক্কালে কমলেশ পুরনো চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল। অপ্রত্যাশিত ভাবে বিখ্যাত একটি তৈল কোম্পানীতে কাজ পেয়ে গিয়েছিল মোটা মাইনেয়। পুরনো বন্ধুরা তাই কেউ-ই আর তেমন সুনজরে দেখছিল না কমলেশকে। চলে আসায় বিচলিত হয়ে খুঁজে বার করে বেড়াতে আসে নি কেউ।

চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে পরে বিদিশাকে বলেছিল কমলেশ,—দেখ দিশা,

প্রত্যেকটি বিষয়ে নিজের দায়িত্ব ভেবে আমরা দিশাহারা হই, কিন্তু দেখ এই ব্যাপারে জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি, এ সত্য নতুন করে প্রমাণিত হল।

বিদিশা হেসে বলেছিল—ইস! প্রমাণিত হল—'স্ত্রী ভাগ্যে ধন' এই শাস্ত্র-বাক্যটি।

যাক, সে তো আজ প্রায় তিন বছরের কথা।

এখন আমহার্স্ট স্ট্রীটের এই চার-তলা অট্টালিকার নিচের তলায় দুখানি ঘরের ছোট্ট এই ফ্ল্যাটটুকু, আর সুখী সুন্দর জীবন। শুধু আজ পর্যন্ত স্ত্রী-পুত্রকে দেশের বাড়িতে নিয়ে যাবার ভরসা কমলেশের হল না।

বিদিশার মনে এজন্য অভিমানের অন্ত নেই।

কমলেশ সেটা টের পেয়ে বলে—আহা বুঝছ না, এক জনকে শুধু শুধু মনঃক্ষুণ্ণ করে লাভ কি?

—চিরকালই তা হলে লুকিয়ে রাখবে আমাকে?

—যত দিন পারা যায়। পিসীমাই বা আর ক দিন!

বিদিশা মুখ ভার করে বলে—থাক্ আমার জন্যে আর তোমার পিসীমার পরমায়ু গুণতে হবে না। তবে নিশ্চিত জেন খোকাকে কোলে নিয়ে আমি যদি সামনে গিয়ে দাঁড়াই, তোমার পিসীমা কক্ষনও দূর করে দিতে পারবেন না।

—তা হয়তো পারবেন না, কিন্তু ভীষণ আহত হয়ে পড়বেন। সে দুঃখ থেকে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই বলেই তোমাকে—

অগত্যাই বিদিশাকে লজ্জিত হতে হয়।

শূন্য মনে জানলায় দাঁড়িয়েছিল বিদিশা, চমক ভাঙল রাঁধুনীর ডাকে। এতটুকু সংসারে রাঁধুনী রাখার কথা নয়। আর সত্যি এত বড়লোকও কমলেশ নয়, কিন্তু ছাড়াতে পারে না। খোকা হবার সময় রাখা হয়েছিল, তদবধি রয়েই গেছে।

বিদিশা অনেক সময় বলে—আর ওকে কেন? আমি কি এতই অকর্মা? না পয়সা এতই সস্তা?

কমলেশ বলে—পয়সাও ভীষণ দামী, তুমিও সাংঘাতিক কর্মিষ্ঠি, কিন্তু মায়া-মমতা বলে তো একটা কথা আছে? বেচারা তোমায় কত যত্ন করেছে, তা ছাড়া বরাবর এমন ভাল সার্ভিস দিচ্ছে,—ছাড়াব কি বলে? আমার ক্ষমতায় কুলোবে না, অথবা তোমার ক্ষমতায় কুলোবে, এটা ওর অপরাধ নয়।

বিদিশা হেসে কুটি-কুটি হয় ওর অভিনব মতবাদে।

কমলেশ বলে—পরের চাকরি তো কর না। চাকরির মর্ম বুঝবে কি?

তখন আবার কথার মোড় ঘুরে যায়। বিদিশা স্বামীর গলা ধরে ঝুলে বলে 'প' আর 'ব'য়ে তফাৎ তো মাঝখানের একটা অক্ষরে। চাকরি তো করছিই।

কমলেশও সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছে সদুত্তর।

এমনি করেই দিন উড়ে চলেছে খুশির পাখায় ভর করে। তিন বছর? না তিন দিন?

অদ্ভুত আনন্দময় স্বভাবের মেয়ে এই বিদিশা।

কে বলবে ওর অতীত কালটা ছিল শুধু কুয়াশাচ্ছন্ন স্যাঁৎসেঁতে? ও যেন রঙিন প্রজাপতি। অথবা এইটাই স্বাভাবিক। গুটিপোকা যখন সুযোগ পায়, তখনই পাখা মেলে উড়ে নিজের চলৎশক্তিহীন অবস্থাকে ভুলে মুছে ফেলতে চায়।

বয়স নেহাৎ কম নয়, ছাব্বিশ-সাতাশ তো হবেই, তবু বিদিশা খোঁপা বাঁধবে না, স্কুল-গার্লের মত দু পাশে ঝুলিয়ে রাখবে দুটো বেণী। শাড়ি রঙিন ছাড়া পরবেই না। আর অনেক কিছু করবে, যা কিশোরীরই উপযুক্ত। অস্থির চঞ্চল দুরন্ত! নইলে মা হয়ে কেউ ঘুমন্ত ছেলেকে চিমটি কেটে জাগায়?

কমলেশ বকলে বলে—দিনের আলোয় কেউ ঘুমুচ্ছে দেখলে আমার প্রাণ হাঁপায়।

—ওই ভয়েই তো ছুটির দিনে থাকি না। কারও হাঁপানোর কারণ হয়ে লাভ কি?

—ইঃ! থাকলে ঘুমোতে দিতাম যে! টেনে বাইরে নিয়ে গিয়ে পথে পথে ঘুরিয়ে মারতাম।

কথা তো নয়; যেন গানের ঢেউ!

মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে কমলেশ এই খুশির জোয়ারের পানে। 'রূপসী' বলবে না কেউ বিদিশাকে, তবু যেন কত রূপ! বিদিশাকে পেয়ে কমলেশ পেয়েছে এক নতুন রাজ্যের সন্ধান।

সব কথাকেই যে পরিহাসের সুর লাগিয়ে সুন্দরের পর্যায়ে তোলা যায়, প্রতিটি কাজই যে খুশির আমেজ লাগিয়ে হালকা করে ফেলা যায়, এ অভিজ্ঞতা আগে কখনও ছিল না কমলেশের।

বত্রিশ বছর বয়েসে নিজেই যে কমলেশ বাইশ বছরের তারুণ্য অনুভব করে, বিদিশাকে আর ছেলেমানুষির জন্যে বকবে কি!

পুরোনো মেসের কারও কারও সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয় কদাচ, তারা ঈর্ষার নিশ্বাস ফেলে বলে—বেশ আছেন দাদা! চেহারায় যা চেক্‌নাই ফুটেছে, মনে হচ্ছে পাঁচ-সাত বছর বয়েস কমে গেছে। বন্ধু-পত্নীর হাত-যশ আছে।

কমলেশ বলে—মাথা নেই, তার মাথাব্যথা! 'বন্ধু-পত্নী', কোথায়? উড়ে ঠাকুর মাত্র! বন্ধু তো ব্যাচিলাব।—যাই হোক, খাওয়া-দাওয়াটি ভাল।

এ গল্প কমলেশ বিদিশার কাছে করে।

বিদিশা অবাক হয়ে বলে—ও মা! ওদেব কাছে লুকোবার কি আছে? ওবা কি তোমার পিসীমার চর?

কমলেশ বলে—তা কেন? ওদের জানাতে চাই না যে, খবচের খাতায় নাম উঠিয়েছি।

—খরচেব খাতায়? তার মানে? চোখ গোল হয়ে ওঠে বিদিশার।

—মানে অতি প্রাঞ্জল। বিয়ে হওয়া মানেই ফুরিয়ে যাওয়া। কি মেয়েদের, কি ছেলেদের। বিয়ে হল কি, পৃথিবীর জনারণ্যে মিশিয়ে গেল সে। আর কেউ ফিরে তাকাবে না তার দিকে। আমার তো মনে হয় এই যে, বিয়ের এত অনুষ্ঠানের ঘটা, এ এক রকম অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াব নামান্তর।

বিদিশা বেগে বলেছে—তোমার মত দুর্দশা তো কারুর হয় না? ফেরারী আসামীর ধুক্‌পুকুনি নিয়ে বিয়ে!

জানালায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কথাটা মনে করে হাসি পেল বিদিশাব। বিয়ে হওয়া মানে ফুবিয়ে যাওয়া? না পূর্ণ হওয়া? অন্ততঃ কমলেশের মত স্বামী পেয়ে কোন মেয়ে বলবে না, 'আমি ফুবিয়ে গেলাম!'

চমক ভাঙল বামুন-মেয়ের ডাকে।

—অ বৌমা! কি রান্না হবে এ বেলা?

—জানি না! কিছু রাঁধতে হবে না। ভাল লাগছে না।

বামুন-মেয়ে বলে—তা ভাল অবিশ্যি লাগে না, কিন্তু এও বলি বাছা, ছেলেব আমার বড় মায়াব শরীর! নইলে এখনকার ছেলেপুলে মাসী-পিসীকে পোঁছে কে?

বিদিশার অভিমান-ক্ষুব্ধ মন সহসা যেন বামুন-মেয়ের প্রচারিত সত্যে পথ দেখতে পায়। 'মায়ার শবীর!' তাই বটে! কমলেশ নিতান্ত মমতাশীল বলেই কাউকে মনঃক্ষুন্ন করতে পারে না। 'মায়ার শরীব' না হলে বিদিশা এই সিংহাসনের অধিকার পায়?

মন প্রসন্ন হয়ে যায়।

বলে—ও বামুন মাসী, শোন শোন। তোমার যা খুশি হয় রাঁধ। তোমার জন্যে চচ্চড়িটি কিন্তু কোর বাপু!

পাগলী মেয়ে। বুড়ী বলে। খুশিমতই রাঁধবার স্বাধীনতা আছে তার। জিজ্ঞেস করাটা নিয়ম রক্ষা।

চলে যেতে যেতে বামুন-মেয়ে সান্ত্বনা দেয়—পিসী আর কদিন মা? তার পর রাজ্যপাট সবই তোমার। তখন আর ঠেকায় কে?

ট্রেনে বসে সেই কথাই ভাবতে ভাবতে চলে কমলেশ, পিসী আর কদিন? তারপর? তারপর আর কাকে কি দিয়ে ঠেকাবে?

বাড়ি পৌঁছতে রাত হয়ে যায়।

অভ্যস্ত নিয়মে কৌশলে বেড়ার দরজাটা খুলে উঠোনে পা দিয়েই কমলেশ হাঁক পাড়ে—পিসীমা!

পিসীমা পুজোর ঘর থেকে সাড়া দেন—কমল এলি? কোন গাড়িতে এলি বাপু, ছটফট করে মরছি সেই থেকে।

কমলেশ বোঝে ছটফটানি নিবারণার্থেই পিসীমার এটি ঠাকুরঘরে পুনঃপ্রবেশ।

—আর ছটফট!

হাতের থলি থেকে ভিতরের জিনিসগুলো নামিয়ে দাওয়ায় রাখতে রাখতে কমলেশ দরাজ গলায় বলে—এখন যা মনিবের কবলে পড়েছি, এর পর হপ্তায় হপ্তায় বাড়ি আসাই দায় হবে মনে হচ্ছে।

—বাড়ি আর কদিন আসবি?…পিসীমা গঙ্গাজলের ঘটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসেন, বলেন—বাড়ি আসা তো—যে কদিন এই বুড়ী আছে। বুড়ী মরলেই চাটি-বাটি উঠিয়ে চলে যাবি, সে কি আর জানি না?…গঙ্গা গঙ্গা গঙ্গা! আবার এই রাশীকৃত জিনিস বয়ে এনেছিস?…নাঃ, তোর বাপু এই এক ছিষ্টিছাড়া বাতিক।…পয়সা কি খোলামকুচি? নাসপাতি, কলা, খেজুর, মিছরী, ফি বারেই এসব আনতে হবে? অসময়ের কপি, একটা আনলেই হত, আবার দুটো!…গঙ্গা গঙ্গা গঙ্গা! বৌমা কোথায় গেলে? এই নাও তোমার কলকাতার নৈনিতাল আলু এসেছে! এই বেলা সব তুলে ফেল। পড়ে থাকলেই কি ছোঁয়াছুঁৎ হয়ে যাবে।…গঙ্গা গঙ্গা…অ বৌমা—

ঘটির জলটুকু সবই ব্যয় করে ফেলেন পিসীমা, ফল-তরকারিগুলির শুচিতা কল্পে।

এতক্ষণে একটি অর্ধাবগুণ্ঠিতা বধূ নীরবে কোন ঘর থেকে যেন বেরিয়ে আসে। এত রাত্রে কিসের স্পর্শদোষ ঘটা সম্ভব সে প্রশ্ন করে না, দালানের দেয়াল থেকে একটা ডালা পেড়ে নিয়ে সব গুছিয়ে তুলতে থাকে।

পিসীমা আবার অনুযোগ করেন—কী যে তোর নতুন চাকরী, তুই-ই জানিস বাছা! এক বার আর সময়ের গাড়িতে আসতে পারিস না? ফি দিন দেরি! নে, মুখ-হাত ধুয়ে নে।

—এই যাই। আচ্ছা পিসীমা, এবার থেকে আর লেট করব না, বলে অবগুণ্ঠিতার প্রতি একটা কটাক্ষপাত করে কুয়োর পাড়ে নামে কমলেশ হাত-মুখ ধুতে।

খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে থাকে গৌরী দাওয়ার ধারে, অভিমান-অভিমান মুখ। সত্যি, আজকাল প্রত্যেক শনিবারেই দ্বিতীয় গাড়িটায় আসে কমলেশ। বলে, ওভারটাইম খাটে। কিন্তু কি দরকার ওভারটাইম খাটবার? এই তো সংসার তাদের। দশ বছর বিয়ে হয়েছে, একটা ছেলে মেয়েও হল না এখনও। পিসীমার কাছে তো অপরাধীই হয়ে আছে গৌরী।

কমলেশ দূর থেকে ওর মুখ দেখতে পায় না, দেখতে পায় সমস্ত অবয়বের বাইরের লাইনটা। দুধে ধোওয়া ধবধবে একখানা শাড়ি পরনে কালো ফুলপাড়টা শুধু কালো ফিতের মত দেখতে লাগছে।

রঙিন শাড়ি গৌরীর দু চোখের বিষ। ভাল ভাল পাড়ের ফরসা শাড়ি পরবার তার শখ। ও বলে, গায়ে খানিকটা রচ্ চঙ্ লাগিয়ে সঙ্ সাজতে ভাল লাগে না বাপু।

ওর দিকে তাকিয়ে দেখে কমলেশের হঠাৎ মনে হল—সত্যিই বটে, সাদা-শাড়ির মত শাড়ি আর নেই। এমন শাড়ি পরে এমন শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে দূর থেকে যেন দেবীর মত দেখতে লাগে!

পিসীমার সামনে মুখোমুখী স্বামীর সঙ্গে কথা বলে না গৌরী। ওর ভারি লজ্জা। আর লজ্জা ভাঙবার অবসরই বা পেল কবে? নিজের বাড়িতে কমলেশ অতিথিই রয়ে গেল। আদরের অতিথি, যার জন্যে দু খানি হৃদয় উন্মুখ হয়ে থাকে।

যদিও পিসীমার ভালবাসাকে গৌরী মাঝে মাঝে নিন্দাবাদ না করে পারে না। আর করে কমলেশের কাছেই। বলে—নিজের খুঁটিটি বজায় রেখে তবে ভালবাসা, ওর মর্ম বোঝবার সাধ্যি আমার নেই। এতই যদি ভালবাসেন ভাইপোকে,

তো চলুন না তার কাছে। হুঁ:! তোমার চেয়ে পিসীমার ঢের বেশি প্রিয় হচ্ছে গরু বাছুর, সজনে গাছ, আমবাগান বুঝলে? তোমায় ছেড়ে তো দিব্যি থাকেন, ওদের ছেড়ে যাবার নাম কর দিকি? চোখে অন্ধকার দেখবেন।

কমলেশ বলে—ও তুমি বুঝবে না।

—বুঝতে চাইও না—গৌরী বলে—মোটের মাথায় এইটি বুঝেছি, তোমার পিসীমাকে আগলেই জীবন কেটে যাবে আমার। সংসার করা আর হবে না।

—পিসীমা আর ক দিন?

—অনেক দিন! সেকেলে হাড়!

এমনি অভিমান করে গৌরী, আবার সোমবার থেকে দিন গুনতে থাকে শনিবারের জন্যে। অবিশ্যি পিসীমাকে সে-ই কি আর ভালবাসে না? বাসে। যতটা বলে ততটা বিরক্ত হলে কি আর এমন সুখে-দুঃখে এক হয়ে থাকতে পারত? বলে শুধু কমলেশের ওপর ঝাল ঝাড়তে।

কমলেশ মুখ ধুয়ে এলে পিসীমা ডাক দেন—ও বৌমা, কমলেশের জলখাবারটা দাও না।

কমলেশ তাড়াতাড়ি বলে—এত রাত্তে আবার জলখাবার কেন পিসীমা? একটু পরে একেবারে খেয়ে নিলেই তো হত।

—বকিস নে বাছা! মুখের সামিগ্রী ফেলে রাখতে আছে? তুই ভালবাসিস বলে সারা দুপুর ধরে বৌমা পাটিসাপ্টা তৈরি করেছে।

—'বৌমা'! কমলেশ বাঁকা কটাক্ষে এক বার অদূরবর্তিনীর পানে তাকিয়ে হতাশের ভান করে বলে—তোমার বৌমা করেছেন পাটিসাপটা? তাহলে আর সে 'পাটি'কে মুখের মধ্যে সাপটানো গিয়েছে! কেন আর ওই ক্ষীর-টিরগুলো নষ্ট করা পিসীমা?

পিসীমা তৃপ্ত স্বরে বলেন—জানি, তুই আমার হাতের খাবার ছাড়া খেতে পারিস না, তবে বৌমার রান্নাবান্নার হাতটিও মন্দ নয়। সময়ে আমার মতন হবে।

কমলেশ মুক্ত কণ্ঠে মন্তব্য করে—কিসে আর কিসে! তোমার মতন রান্নার হাত হতে সাত জন্ম ঘুরে আসতে হবে, বুঝলে পিসীমা, সাতটি জন্ম!

ওদিকে কালোপাড়ে ঘেরা ফরসা মুখের রেখায় রেখায় অসহিষ্ণুতার আভাস। সে জানে, পিসী ভাইপোর এই গল্প গড়াতে গড়াতে রাত বারোটায় পৌঁছবে। অতএব খাবার সে আনে না, পিসশাশুড়ীর কাছে এসে কি যেন বলে।

কি বলে শোনা যায় না, শোনা যায় উত্তর।

—থাম বাছা, একাদশী বলে আর ক্ষয়ে যাচ্ছি না আমি। আজ বাহান্ন বছর একাদশী করছি! ছেলেটা বাড়ি এল—

ছেলেটা কিন্তু হাঁ হাঁ করে ওঠে—অ্যাঁ একাদশী? যাও যাও শুয়ে পড় গে। আহা তা কি জানি? তাহলে আর কিছু ফল-টল আনতাম!

পিসীমা প্রসন্ন-বিরক্তিতে বলেন—বকিস নে বাপু। আবার কত আনবি? রাজার মা যে-সব সামিগ্রী চক্ষে দেখতে পায় না, সেই সব সামিগ্রী এনে এনে তো পিসীকে খাওয়াচ্ছিস।

ভাইপো গরবে গরবিনী পিসীমা একাদশীকে গ্রাহ্যও করেন না। যতক্ষণ না কমলেশের খাওয়া হয়, সঙ্গ ছাড়েন না তার।

গৌরীর কাজের সাহায্য করতে গিয়ে তাকে জ্বালিয়ে, কমলেশকে অনুরোধের তাড়নায় দু জনের খাদ্যবস্তু গিলিয়ে, আগামীকাল কি কি রান্না হবে তার সবিশেষ আলোচনান্তে তবে শুতে যান।

এতক্ষণে ঘর।

বড় দালানওলা ছোট বাড়ি। ঘর বলতে এই একটিই। পাড়ার সব বৌ-ঝির মধ্যে গৌরীর ঘরটিই ফিট্‌ফাট পরিপাটি। কমলেশের শৌখিন বলে খ্যাতি আছে পাড়ায়, আর গোছালো বৌ বলে সুনাম আছে গৌরীর।

খাওয়ার পরও জের মিটতে বাকি থাকে।

রান্নাঘর ধুয়ে রেখে তবে আসতে পাবে গৌরী। পিসীমা ঝিকে রান্নাঘরে ঢুকতে দেন না। কমলেশ ওঁকে একটু তাড়া দিয়ে ঘরে এসে টেবল ল্যাম্পটা বাড়িয়ে দিয়ে বিছানায় বসে একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখলো।

ঘরকে তখনি দেখতে পাওয়া যায়, যখন ঘরের অধিকারিণী থাকে অনুপস্থিত। এখন কমলেশের চোখে পড়ছে টেবিলটা আর ছুঁচের কাজ-করা টেবিলঢাকাটা, বাতাসে যার একটা কোণ অনবরত উড়ছে। দেখত পাচ্ছে—টেবিলের ওপর টাইমপীসটা আর কাচের এই টেবল-ল্যাম্পটা।···হ্যাঁ সবই দেখতে পাচ্ছে কমলেশ; দেয়ালে দেয়ালে নানা দেবদেবীর পট, বেঞ্চের উপর সারি করে সাজানো ট্রাঙ্ক বাক্স গায়ে ছিটের ঘেরাটোপ, জানলা দরজার মাথার তক্তায় তক্তায় নানা মাটির পুতুল, বিছানাটা গৌরীর শাড়ির মতই ধবধবে।

আশ্চর্য! কোন পরিবর্তন নেই!

যেন যুগ-যুগান্তর ধরে রাত্রে শুতে এসে অবিকল এই দৃশ্যই দেখে আসছে

কমলেশ।...কে জানে প্রথম কবে এ ঘরে বসে গৌরীর পদধ্বনির আশায় মিনিট গুণেছিল সে! কতদিন হয়ে গেল? আট বছর? দশ বছর? তাই হবে। কমলেশ তখনো লাজুক ঘাড়গোঁজা একটি কিশোর বললেই হয়।

কলকাতার মেসে থেকে কমলেশ তখন কলেজে পড়ত।

আরও একবার চারিদিকটা তাকিয়ে দেখল কমলেশ।...এখানের পৃথিবী যেন থেমে আছে। কত কাণ্ড ঘটে গেল পৃথিবীতে, কত কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে, এ ঘরে তার ছায়া পড়ে নি কোনদিন। যা পড়ে শুধু একটু ধুলো। মাঝে মাঝে তাই কোমরে কাপড জড়িয়ে ঝাড়তে লেগে যায় গৌরী, কমলেশের মায়ের শখ করে কেনা ছবি আর আর্শি, কমলেশের ছেলেবেলার পুতুল আর খেলনা।

রান্নাঘরের শিকল লাগানোর পরিচিত শব্দ!

আশা হচ্ছে ঘণ্টা কয়েকেব জন্যে ও-দিকের দৃশ্যপটের উপর যবনিকা পড়ল।

এখন যবনিকা উঠবে এখানে।

কমলেশ ভাবে, বাইরের দৃশ্যে তো কোন পরিবর্তন হয় নি, ভিতরের দৃশ্যেই কি হয়েছে? আজও তো সেই প্রথম দিনের মতই উৎকর্ণ হয়ে রয়েছে কমলেশ গৌরীর পদধ্বনি নিকটবর্তী হবার আশায়। তেমনি সাদরেই তো আহ্বান করতে পারবে তাকে, যেমন পারত বিদিশা আসার আগে। আরও আগে!

তবে?

কলকাতাব সেই বিরাট চারতলা অট্টালিকার অসংখ্য খোপের প্রান্তবর্তী একটি খোপে অবস্থিত, আর বিদিশায় আত্মসমর্পিত যে কমলেশ, সে কি আর কেউ?

এখানে—এই পাঁচ পুরুষের ভিটেয়, এই প্রত্যেকটি কড়ি-বরগা খিল-ছিটকিনি মুখস্থ হয়ে যাওয়া ঘরের মালিক যে কমলেশ, তার ভূমিকা তো অবিকলই আছে।

আইন, ধর্ম, সমাজ, লোকরসনা—সবাই তো কমলেশকে ধিক্কার দেবার জন্যে উদ্যত হয়ে আছে, শুধু ধরে ফেলতে যা দেরি। কিন্তু কই? নিজের ভিতবে কমলেশ তেমন কোন গ্লানি খুঁজে পাচ্ছে না তো?

জমে যা আছে, সে হচ্ছে অস্বস্তি।

প্রকাশ পেয়ে গেলে কী হবে? কী করে সহ্য করবে এরা কমলেশের এই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা? গৌরী, বিদিশা, আর পিসীমাও।

সহ্য করতে পারবে এত বড় আঘাত?

শুনলে হয়তো পিসীমা চীৎকার করে কেঁদে উঠবেন, গৌরী পাথর হয়ে যাবে, আর বিদিশা হয়তো বা মরেই যাবে।

তার চাইতে এই ভাল।

এই মধুর মিথ্যা। এই দুই ব্যক্তির ভূমিকা অভিনয় করে যাওয়া। যতদিন চলে চলুক। ঈশ্বর যদি পিসীমাকে অমর বর দিতেন!

গৌরী এল পান হাতে করে।

টেবল-ল্যাম্পের উজ্জল আলোয় ওকে এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এখন দেখা যাচ্ছে ওর নিটোল একটি ডাঁসা ফলের মত লাবণ্য-পিছলে-পড়া মুখটি ঘিরে শাড়ির পাড়ের কালো যে রেখাটি সেটি শুধুই একরঙা একটা রেখা মাত্র নয়, তার মাঝে রয়েছে সুচারু একটি নক্সা।

এখন ওর হাস্যোজ্জ্বল চোখের পল্লব-কম্পনটুকুও দেখা যাচ্ছে।

না দেবীপ্রতিমার দূরত্ব আর নেই, এই প্রাণচঞ্চল মানবী মূর্তিকে সহজেই এখন কাছে টানা যায়।

বিদিশা যদি বিচিত্ররূপিণী তো, গৌরী রহস্যময়ী!

বিদিশা যেন পড়া-হয়ে-যাওয়া কাব্যগ্রন্থ। গৌরী যেন না-পড়া উপন্যাস।

ডিবেটা টেবিলে ঠুকে বসিয়ে নিজে বিছানায় বসে গৌরী বলে—উঃ!

—'উঃ?' উঃ মানে?

—উঃ মানে উঃ! ওর আর দুরকম মানে হয় না। শোন—আমায় একটা জিনিস এনে দেবে?

—দাসকে আজ্ঞা করুন মহারাণী! কি চাই?

—একটু ঘুমের ওষুধ!

—ঘুমের ওষুধ! কমলেশ অবাক হয়ে বলে—কার দরকার? তোমার? ঘুম হচ্ছে না?

—আমার? অগাধ ঘুম হচ্ছে। অবশ্য আজকে বাদে।...মুখের প্রত্যেকটি রেখায় চাপাহাসির ব্যঞ্জনা।

—ব্যাপারটা কি বল তো? কি করবে ঘুমের ওষুধ?

—শনিবারে শনিবারে বিকেলবেলা পিসীমাকে খাইয়ে রাখব। উঃ!

কমলেশ হেসে উঠে বলে—আহা হিংসে কোর না। আমায় ভালবাসেন বলেই না—

গৌরী স্বামীর কাছে আর একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে মুচকে হেসে বলে—পিসীমাকে হিংসে করে আর কি হবে? সে তো বুড়ো মেরে খুনের দায়! হিংসে

করবার লোক তো আমার হয়েছে গো!

বুকটা ধড়াস করে ওঠে কমলেশের। নড়ে-চড়ে বসে বলে—কি রকম?

—কেন, জান না তুমি? শোন নি? আমার যে একটি সতীন হয়েছে।

বুকটা ধড় ধড় করতে থাকে কমলেশের। ওঃ! উড়ো খবর আসতে শুরু হয়েছে—তাহলে!

হিম-হিম বুকটাকে তাজা করবার চেষ্টা করতে করতে কমলেশ হতাশের ভান করে বলে—হা ঈশ্বর!

গৌরী হেসে উঠে বলে—মাথায় হাত দিয়ে পড়লে যে? তোমার তো আর সতীন হয় নি? হয়েছে আমার।

কমলেশ সে কথার উত্তর না দিয়ে একই ভঙ্গীতে বলে—হা ঈশ্বর! সব ফাঁস হয়ে গেল?

গৌরী ওর কাঁধটা নাড়া দিয়ে উচ্ছ্বসিত হাস্যে বলে—শোন না মজার কথা। ও-বাড়ির অনিল ঠাকুরপো "বিশ্বস্ত সূত্রে" খবর পেয়ে ছুটে এসেছিল—সে খবরটি আমাকে প্রেজেণ্ট করতে!

—ভাল জিনিসই উপহার দিতে এসেছিল। 'তুতো ঠাকুরপো' হয়, প্রাণে দরদ আছে।

গৌরী নিশ্চিন্ত শান্ত গলায় বলে—আচ্ছা ওরা কী বল তো?

—কারা?

—এই অনিল ঠাকুরপোরা! শত্রুতা সাধবার চেষ্টায় কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত থাকে না।

হঠাৎ একটা 'মরীয়া খেয়াল' মাথায় চাপে কমলেশের। স্বীকার করলে কি হয়? একটা হেস্ত-নেস্ত করে ফেললে কি হয়?

এই আলোচনার মুখে, অনিলের তৈরী রাস্তায় এগিয়ে গেলে কি হয়? শুধু মাথাটা হেঁট করে একবার বলা—গৌরী তুমি যা শুনেছ, তা মিথ্যা নয়।'

তারপর যা থাকে কপালে। এত লুকোচুরি, এত মিথ্যার জাল বোনা, সব শেষ হয়ে যায় তাহলে।

হ্যাঁ, বলেই ফেলবে কমলেশ। তাই গম্ভীর মুখে বলে—অনিল যা বলেছে ঠিকই বলেছে।

কিন্তু স্বীকার করবে কার কাছে? এগোবে কোন পথ দিয়ে?

কমলেশের পরিহাসের এ এক নতুন চাল মনে করে গৌরীও গম্ভীর মুখে চোখ

টান্ টান্ করে বলে—হাঁ আমিও তাই বলে দিলাম অনিল ঠাকুরপোকে—তোমাদের দাদা যে এত শয়তান, তা কি এত দিন জেনেছি ভাই ? ভাগ্যিস তুমি ওর স্বরূপ চিনিয়ে দিলে !

কমলেশ নিষ্পলক দৃষ্টিতে গৌরীর কৃত্রিম গম্ভীর অথচ হাসির বিদ্যুৎ-ছিটকানো মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে।

টেবল-ল্যাম্পের আলোটা সরাসরি সেই মুখের উপর এসে পড়েছে। মুখটা যেন কাচের মত স্বচ্ছ দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে ভিতরটাও বুঝি দেখা যাবে।

গৌরীর রং বিদিশার সঙ্গে আকাশ-পাতাল তফাৎ। সত্যিকার পাকা রং ! এত দিনের পল্লীবাসেও ম্লান হয়ে যায় নি। হ্যাঁ পাকা রং ! উপরের আর ভিতরের দুটো রংই সমান পাকা।

নাঃ, অসম্ভব ! স্বীকার করা অসম্ভব।

হেস্ত-নেস্ত করা যাবে না।

আজ নয়, কাল নয়, হয়তো বা কোন দিনই নয়। কমলেশ তো আর পাষাণ নয় ! শুধু কমলেশই বা কেন ? কেউ পারত ? রজনীগন্ধার-ঝাড়ে আগুন লাগাতে পেরেছে কেউ কখনও ?

আরও একদিন এমনি মরীয়া খেয়াল চেপেছিল কমলেশের ! বিদিশাকে বলেছিল—শুধুই কি আর পিসীমার টানে এমন করে ছুটে যাই গো ? অন্য কারণ আছে। সেখানে আমার প্রথম পক্ষের পরিণীতা পত্নী আছে।

শুনে এমন ভয়-ভয় চোখে তাকাল বিদিশা, যে দেখে ভয়ে ভয়ে আবার হো-হো করে হাসতে হল কমলেশকে !

না সেদিনও হয় নি হেস্ত-নেস্ত করা !

আজও হবে না।

অতএব বালিশটাকে কোলের উপর বাগিয়ে ধরে তার উপর কনুই রেখে বেশ আত্মস্থ ভাবেই বলতে দেখা গেল কমলেশকে—অতটা দমিয়ে দেওয়া ঠিক হয় নি ছেলেটাকে। বেচারা হয়তো কত কষ্ট করে সত্য সংবাদ সংগ্রহ করে এনেছিল। তা পাড়ায় বলে নি ?

—বোধ হয় বলত ! যদি না ওর উৎসাহের আগুনে একেবারে বরফজল ঢালা হত। আহা বেচারা ! যা এককানা প্যাঁচামুখ করে চলে গেল সেদিন !

কমলেশ বলে—অথচ ওর খবরটা নির্ভেজাল ! তবু তো সবটা সংগ্রহ করে

উঠতে পারে নি। শুধু সতীন! সতীনের ছেলে, রাঁধুনি, চাকরানী, আলো, পাখা, রেডিও! বড রাস্তার ওপর বিরাট চার তলা বাড়ি! সে কী বোলবোলাও ব্যাপার! বল তো এক দিন নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আনি।

—তাই যাব ভাবছি—বলে আর এক দফা হেসে ওঠে গৌরী।

—হাসছ? এর পর কিন্তু টের পাবে মজা!

—মজাই তো টের পাচ্ছি!

বলে বালিশটাকে কমলেশের কোল থেকে টেনে সরিয়ে দিয়ে শূন্যস্থানটা পূর্ণ করে নিজেকে দিয়ে।

অনেকক্ষণ পরে দেখা যায়, চাঁদের আলোয় ঘব উঠেছে ভরে। বোধ হয় কৃষ্ণপক্ষ চলছে, তাই বেশি রাতে জ্যোৎস্না!

সারা দিনের কর্মক্লান্ত তুটি মানুষ জেগে থাকবার শত ইচ্ছা সত্বেও ঘুমে অচেতন হয়ে গেছে। পাশাপাশি তুখানি ঘুমন্ত মুখের উপব স্থিব হয়ে আছে সেই চাঁদের আলো!

কিন্তু তুজনেব মুখই সমান পবিত্র দেখাচ্ছে কেন?

ঘুমোলে নাকি মানুষের স্বরূপ ধরা পডে। কই, কমলেশের মুখ দেখে তো ধরে ফেলা যাচ্ছে না, সে কত বড পাষণ্ড! এত বড একটা বিশ্বাস-ঘাতকের মুখ, স্ত্রীর প্রতি নিতান্ত বিশ্বস্ত, মমতাময় স্বামীর মুখের মতই দেখাচ্ছে তো!

আশ্চর্য নয় কি?

আবার কালই যখন চারতলা সেই অট্টালিকার একতলার ঘরখানায়, প্রায় শ্যাম-বর্ণ গোলগাল একখানি নিশ্চিন্ত নির্ভরতাময় মুখেব পাশাপাশি দেখতে পাওয়া যাবে এই কমলেশেরই ঘুমন্ত মুখ, সে মুখও হয়তো এমনি পবিত্র এমনি মমতাময় দেখাবে।

চাঁদই দেখবে উঁকি মেবে।

কিন্তু সে কি ভাববে, এর সমস্তই মিথ্যা দিয়ে গডা? না কি বিশ্বাসের প্রসন্নতা নিয়েই তাকিয়ে থাকবে ওদের দিকে?

কে জানে হয়তো বা চাঁদেব দেখাই ঠিক হবে!

হয়তো আমরা যাদের যা দেখি তারা ঠিক তা নয়। যাদের নিতান্ত পাষণ্ড বলে মনে হয় তাবা কেবল মাত্র তুর্বল, কেবল মাত্র বোধহীন।

তাই—মানুষের অন্তহীন অনাচাবের বোঝা বহন করেও পৃথিবী নির্ভুল নিয়মে ঘুরে চলে। ক্লান্ত হয়ে থেমে যায় না।

অনুরাধার আচরণটা সত্যিই বড় বিসদৃশ দেখাল।

বিয়েবাড়ি ভর্তি আত্মীয়-কুটুম্ব—মায় ঝি চাকরগুলো পর্যন্ত প্রত্যক্ষে পরোক্ষে সকলেই 'ছি ছি' করছে!

কেন না করবে? যে শুনবে সে-ই করবে। কেউ ভাল বলবে না।

সত্যি কাজটা তো মোটেই ভাল হয় নি।

ভাইঝির বিয়েতে এসে পিসী তুই, কিনা সামান্য একখানা ঘরের ছুতো তুলে বিয়েটা না হতেই চলে গেলি মান করে? নেহাৎ কচিখুকিও নয়, ত্রিশ বত্রিশ বছর বয়স হল, লোকলজ্জা বলেও তো একটা বস্তু আছে? অন্তত থাকা উচিত নয় কি?

আর পাঁচজনে তো বটেই, অনুরাধার নিজের মা? তিনিই কি মেয়ের উদ্দেশে কম গাল পাড়ছেন? গাল-মন্দের ভাষাটা তাঁরই বরং বেশী তীব্র। কারণ তিনি তো আর লোক-লজ্জা হারান নি! তাঁকে তো দেখতে হবে—কেউ না ভেবে বসে মেয়ের ব্যবহারের মধ্যে মায়েরও ভিতরে ভিতরে সূক্ষ্ম সায় আছে।

মনটা কেউ দেখতে পায় না এই রক্ষে।

নইলে—মেয়ের অভিমানাহত মুখখানার ছবি কি বুকের মধ্যে কেটে নেই তাঁর? ওই একটিমাত্র মেয়ে মনোরমার, তার অনুপস্থিতির শূন্যতা কি কোন কিছুতেই পূরণ হবে?

অনুরাধা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এতগুলো লোক-বোঝাই কোলাহল-মুখর উৎসব বাড়িটা কি ফাঁকা ফাঁকা ঝাপ্সা ঝাপ্সাই না লাগছে! এত সমস্ত লোকের সমস্ত গালগল্প হাসি-গান যেন কেবলমাত্র একটা অর্থহীন রূঢ়-শব্দস্রোত!

ছেলে-বৌয়ের সদ্বিবেচনার অভাব, আসন্ন বিবাহোন্মুখ নাতনীর স্বার্থপরতা মনের মধ্যে ছুঁচের মত বিঁধছে। তবু—অনুরাধাকেই দুষতে হবে। তা নইলে নিজের তাঁর মান থাকে না, থাকে না সংসারের উপর প্রতিষ্ঠা।

অনুরাধার পক্ষ নিতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত মহিমা ধূলিসাৎ হয়ে গিয়ে একটা হাস্যকর কেলেঙ্কারির সৃষ্টি হবে। তাই তাঁর গালমন্দের ভাষাটা সব চেয়ে তীব্র, সব থেকে ঝাঁঝালো।

তিনি জানেন যখন যেমন। যেখানে দাবি নেই, সেখানে অভিমানটা খেলোমি।

অনুরাধাই বা সেটা মেনে নেবে না কেন? এইজন্যেই তো তার ওপরে সত্যকার রাগও যথেষ্ট হচ্ছে। কুটুম্বর মত নেমন্তন্নে এসেছিল, তাই ভাল। তাদের

মতই 'খা মাথ্', আমোদ-আহ্লাদ কর্; তার বেশি আশা করাই বা কেন? এই এত ঘটা পটা ছেড়ে চলে গিয়েই বা কি লাভ হল তোর?

মায়ের প্রাণটার দিকেও তো তাকাতে হয়!

কত কাণ্ড করে এই সাত আট বছর পরে কলকাতায় আসা। ছুটিই পায় না জামাই। সেই ছুটিগুলো সব হাতে নিয়ে গট্ গট্ করে চলে গেলি! ছি ছি!

ব্যাপারটা আসলে এই।

তিনতলার দক্ষিণের বারান্দামুখি যে ঘরখানি এখন 'বেবির ঘর' নামে পরিচিত, একদা নাকি সেটা বেবিব পিসী 'অনুরাধার ঘর' বলেই চিহ্নিত ছিল। বাড়ি তৈরির সময় অনুরাধার বাবা ওই আখ্যাই দিয়েছিলেন ঘরটার। যদিও তখন অনুরাধা বালিকামাত্র। তবু এই পড়া-পাগল মেয়েটির জন্য তিনি টেবিল-চেয়ার, শেল্‌ফ, বুককেশ দিয়ে দিব্বি সাজিয়ে দিয়েছিলেন ঘরখানিকে।

ছেলেবেলা থেকেই অনুরাধা বইমুখো কুনো। নিজস্ব একখানা ঘর হয়ে সুবিধেই হল। মেয়েকে তিনতলা থেকে টেনে নিচে নামিয়ে সময়-মত স্নান আহার করানো দুরূহ একটা কাজ ছিল মনোরমার।

স্কুল-কলেজের পরীক্ষার সময় কতদিন মনোরমা রাগ করে মেয়ের খাবার বয়ে ওপরে দিয়ে আসতেন।

বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরও অনুরাধা যখনই এসেছে নিজের ঘরেই থেকেছে। বাকী সময় ঘরখানা ওরই কুমারীবেলার খেলনা-পুতুল শখের জিনিসের টুকিটাকি আর রাশীকৃত বই সমেত বন্ধই পড়ে থাকত।

কিন্তু পরবর্তী ইতিহাস স্বতন্ত্র!

স্বামীর ছুটির অভাবে এবং এপক্ষের উৎসাহের অভাবে প্রায় বছর আষ্টেক হল কলকাতায় আসা হয় নি অনুরাধার। ইত্যবসরে—ভাইঝি 'বেবি' তরুণী পদবাচ্য হয়ে উঠেছে, এবং অলক্ষ্যে কখন সেই ঘরখানাই 'বেবির ঘর' নামে অভিহিত হতে শুরু হয়েছে।

অবশ্য ঝি-চাকররা তখনও বলত 'দিদিমণির ঘর,' এখনও তাই বলে।

তবে বর্তমানের এরা প্রায় সকলেই নতুন।

আগেকার লোকেরা মনোরমাকে বলত মা, উষাবতীকে বলত 'বৌদি'? বেবি বেবিই ছিল।

এখনকার এরা উষাবতীকে 'মা' বলে, মনোরমাকে বলে ঠাকুমা। বেবি হয়ে উঠেছে 'দিদিমণি' নামের অধিকারিণী। অনুরাধাকে দেখে একগাল হেসে পিসীমা বলে প্রণাম করল এসে ঝি দুটো।

কিন্তু সম্বোধন-সমস্যা যাই হোক, গোলমাল বাধল ওই ঘর নিয়ে।

অনুরাধার চাকর যে অনুরাধার সুটকেস বাক্সগুলো সোজা টেনে নিয়ে গিয়ে তিনতলায় তুলবে, একথা কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি। উষাবতী জানেন মনোরমার ঘরেই অনুরাধা আস্তানা গাড়বে।

আলাদা আর কোন ঘর তো সত্যি একলা ননদকে দেওয়া যায় না আদর করে? বাড়িতে আমন্ত্রিত আত্মীয়ের সংখ্যা বড় কম হয় নি। তবু উষাবতীর তিনটি ভাজের মধ্যে দুটি এখনও এসে উঠতে পারেন নি। আসবেন সেই বিয়ের দিন। ছোট বোন আসবে আগামীকাল।

তাই কি বাপের বাড়ির সব্বাইকে আনতে পেরেছে উষাবতী? নেহাৎ যাদের না বললে নয়! এরপর মাসী-পিসী, জেঠী-খুড়ীদের সঙ্গে দেখা হলে যে কি করে মুখ দেখাবে সেই ভাবনা।

এই তার প্রথম কাজ।

ভগবানের ইচ্ছেয় পয়সার অভাবও নেই। ইচ্ছে কি হয় না যে বাপের বাড়ির সবাই আসুক? কিন্তু এদিকে যে আবার এপক্ষে 'রাবণের গুষ্টি!'

প্রভাসের পিতৃকুল মাতৃকুল দুইই সমান জমজমাট। খুঁটিয়ে সবাইকে ডেকে আনলে ঠাঁই দেওয়া দুরূহ হবে। তবুও এমনিতেই এক একখানা ঘরে কজনকে ভরে ফেলতে পারলে কোন মতে ম্যানেজ করা যাবে, সেই অঙ্ক কষতে কষতেই কাহিল হয়ে যাচ্ছেন উষাবতী।

শুধু বেবির ঘরখানাই রাখতে হয়েছে নিরুপদ্রব।

কড়া করে শাসিয়ে রেখেছে বেবি। তার কোন এক নিতান্ত অন্তরঙ্গ বান্ধবী নাকি এসে বিয়ের কদিন থাকতে চায়, অতএব তার জন্যে বেবির ঘর রিজার্ভড্। তাছাড়া সব ঘরেই গোলমাল, নতুন কনের জন্য কেনা যত মূল্যবান বস্তু সাবধানে রাখতেও তিনতলার নির্জন এই ঘরখানাই সেরা।

এই ঘরের মাঝখানে দুমদুম করে অনুরাধার সুটকেসগুলো বসিয়ে দিয়ে গেল অনুরাধার সঙ্গে আসা খোট্টা চাকরটা। কর্ত্রীর নির্দেশমতই বোধ হয়।

দেখে তো বেবির আক্কেল গুড়ুম!

রাগে বিরক্তিতে আগুন হয়ে ওঠে সে মনে মনে।

একেই তো বাপ-মায়ের কন্যাসন্তান বলতে সে একাই বলে, আদরের সীমা ছিল না তার। দাদা ভাই সকলের চাইতে তার আদর আবদার বেশী। তার উপর আবার বিয়ে হচ্ছে! মেয়ে চাঁদ চাইলে, মা-বাপ বোধ হয় চাঁদ পেড়ে এনে হাতে দিতে প্রস্তুত।

এ যাবৎ মেয়ে যখন যে-কোন সময় যত রকমেব শাড়ি গহনা, প্রসাধনবস্তু, শৌখিন জিনিসের আব্দার করেছে, সব কিছু এসে জমা হচ্ছে ক্রমাগত। এছাড়া উষাবতীর নিজেব সাধ তো আছেই।

'বেবির বিয়ে!'

যেন এর চেয়ে বিশেষ ঘটনা জগতে আর কখনও ঘটে নি, হয়তো বা ঘটবেও না।

'বাপরে। ওটা না হলে চলে? বেবি চেয়েছে—'

'না না, ও চলবে না, বেবির পছন্দ নয়!'

'রোস রোস, আগে বেবির ইচ্ছে জানো—'

'রক্ষে করো বাবা, বেবির মত নেই—'

বেবিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে সমাবোহ-চক্র! বেবিকে মধ্যমণি করে গাঁথা হচ্ছে উৎসব-মালিকা।

সেই বেবি মুখ রাঙা কবে এসে বললে—মা, পিসীমাকে তাহলে আমার ঘরে চালান কবে দেবার মতলব করেছ?

উষাবতী চমকিত বিস্ময়ে বলেন—সে আবার কি? কে বললে?

—বলবাব অপেক্ষা কোথায়! মোটমাট্‌রি মালপত্র সব কিছু তো ঠেলে ওপবে তুলে দেওয়া হল দেখছি! এখন তিনি তাঁর 'চ্যাঁ ভ্যাঁ' দুটি নিয়ে গিয়ে অধিষ্ঠান হলেই হয়।

উষাবতী ক্রুদ্ধভাবে বলেন—হয় বললেই হয়? কোথায় কি তুলল দেখি গে। বাবাঃ, জিগ্যেসপড়ার পাট নেই একেবারে! ধন্যি বটে!

বেবি অনমনীয় স্বরে বলে—আমি কিন্তু এই বলে রাখছি মা, উনি যদি আমার ঘরে থাকবার চেষ্টা করেন, আমি দীপ্তিকে বারণ করে পাঠাব আসতে। দরকার নেই আমার—

উষাবতী মেয়েকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গীতে বলেন—পাগল! কেন মনখারাপ করছিস? যাচ্ছি আমি, সব ঠিক করে দিচ্ছি। তোর ঠাকুমার ঘরেই থাকবে পিসি।

ওদিকেও আবার রাঙামুখের পালা।

উষাবতীর প্রস্তাব শুনে মুখরাঙা হয়ে উঠল অনুরাধার।

—মার ঘরে নেবে আসতে বলছ? ও ঘরে জায়গা কোথায়? সারা বাড়ির জঞ্জাল তো মার ঘরে ঠাসা! আমার জিনিসপত্রগুলোই তো ধরবে না!

উষাবতীর শরীরে সদ্বিবেচনার অভাব আছে, একথা যে বলে সে নিতান্তই মিথ্যাবাদী।

মধুঢালা অমায়িক স্বরে তিনি ননদিনীকে সুপরামর্শ দেন—বাড়িখানা তো মন্তর পড়ে দু-চার গুণ বাড়িয়ে ফেলা যাবে না ভাই, পাঁচ সাত দিন সবাই মিলে একটু কষ্ট করেই থাকতে হবে। উপায় কি? তা এক কাজ কর না, আমার ঘরের খাটের তলায় বরং তোমার ট্রাঙ্ক সুটকেসগুলো রেখে দাও। সবগুলো তো আর সত্যি এক সঙ্গে দরকার হবে না? মাত্র কটা দিনের জন্যে এনেছও যে দেদার!

—ভুল হয়ে গেছে দেখছি—বলে চলে যায় অনুরাধা। তার দিক থেকে তখনকার মত আর কোন আপত্তি ওঠে নি।

উঠল কিছুক্ষণ পরে গৃহকর্তার মুখ থেকে।

কি একটা ছুতো করে গৃহিণীকে ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে তিনি কিছুটা বিব্রতভাবে নিম্নগ্রামে বলেন—অনুকে কোথায় জায়গা দিয়েছ! সে শুনলাম ওর পছন্দ হয় নি। বাক্স-বিছানা খোলে নি, কাপড়-চোপড় পর্যন্ত বদলায় নি, বসে আছে চুপ করে!

—ধন্যবাদ!

উষাবতী গালে হাত দিয়ে বলেন—বাবার কালে শুনিনি এমন কথা! বিয়ে-থা কাজকর্মের বাড়িতে কে কবে আলাদা আলাদা পছন্দমাফিক ঘর পায় তা তো জানি না! বেশ হুকুম কর কোথায় তোমার আদরিণী বোনকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে! হুকুম তামিল করছি।

—আহা তা নয়—গৃহকর্তা মাথাচুলকে বলেন—আমার কথা হচ্ছে না। অনু নিজে কি বলেছে? মানে কোন ঘরে—

—উনি বেবির ঘরখানি দখল করতে চান! মোটঘাট নিয়ে তুলিয়েছেন সেইখানে।

—বেবির ঘরে? সে তো হতেই পারে না। তাছাড়া অন্য আর যদি কোথাও হয়ে—দোতলার ওই দক্ষিণ দিকের ঘরটায়?

—সেটায় তো আমার স্বগোষ্ঠীকে পুরেছি! তাঁদের তো আর তোমার বোনের

মত মানমর্যাদা নয়! যেখানে ঠাঁই দিয়েছি, বর্তে গিয়ে নিয়েছে। বল তো তাদের তাড়িয়ে দিই।

—আঃ, কী মুস্কিল! উল্টো বোঝাটাই এক রোগ তোমাদের! বলছিলাম কি—

—বলতে কিছু হবে না, সব বুঝি। যাই দেখি গলবস্ত্র হয়ে জিগ্যেস করি গে তোমার মহামান্য অতিথিকে! না হয়তো আমিই বরং দালানে বেরিয়ে শুই, আমার ঘরটা—

—থাক্ থাক্, ও সব গোলমাল করবার দরকার নেই। আমি গিয়ে বলে দিচ্ছি ওকে।

বোনের দরবারে গিয়ে হাজির হন প্রভাসবাবু।

—কি রে অনু, হাতমুখ ধুস নি এখনো?

—এই যাই।

—ছেলেরা কোথায় গেল? দেখছি না যে?

—ছোটটা চাকরের কোলে আছে, বডটা কোথায় গেল কে জানে।

—এই দেখ পড়ে টডে যাবে না তো? কোন দিকে গেল?

—না পডে যাবে কেন? চার বছর বয়েস হল।

আন্তরিকতার স্পর্শহীন ফিকে ফিকে কথা। কথার জন্যই কথা। দুজনেরই চিন্তাস্রোত ভিন্নমুখী।

অবশেষে আসল কথা পাড়েন প্রভাসবাবু।

—কই তোর জিনিসপত্র দেখছি না যে? নিচে থেকে আনিয়ে নিস নি বুঝি এখনও? কী মুস্কিল!···ওরে হরিপদ, ওরে সুধীর, কোথায় গেলি ব্যাটারা? পিসীমার মোটঘাটগুলো তুলে দিতে পারো নি নবাবের জামাইরা!···রোস দেখি—

অনুরাধা ম্লান হাসির সঙ্গে বলে—ব্যস্ত হতে হবে না দাদা, জিনিসগুলো নিচে পড়ে নেই, একটু বেশী ওপরে উঠে গেছে! নাবিয়ে নিচ্ছি।

প্রভাসবাবু যেন বুঝতে পারেন না, অকারণ ব্যস্ততায় মাত্রাতিরিক্ত দ্রুততালে বলেন—তাই নে তাহলে! ইয়ে—মুখ-হাত ধুয়ে ঠিকঠাক হয়ে নে। বরের বাড়ির ওরা নাকি বলেছে মেয়েরা কাল 'পাকা দেখা'য় আসতে পায় নি, আজ বেড়াতে আসবে। কী মুস্কিল দেখ!

অনুরাধা সামান্য হেসে বলে—মুস্কিল আর কি? ওরা তো আর থাকতে আসবে না? যারা এসে থাকতে চাওয়ার আব্দার করে, মুস্কিল তাদের নিয়েই।

প্রভাসবাবু আর কথা বাড়ান না, পালিয়ে যান।

এটা সকালের কথা।

সন্ধ্যাবেলা শোনা গেল রাত্রের ট্রেনে ফিরে যাচ্ছে অনুরাধা।

তার নাকি হঠাৎ ভীষণ শরীর খারাপ লাগছে। কে জানে যদি ভারী অসুখ হয়ে পড়ে! কাজের বাড়িতে সকলকে বিপদে ফেলবে?

এ শুনে—

এরপর লোকে 'ছি ছি' করবে না তো কি 'ধন্যি ধন্যি' করবে?

তবু প্রভাসবাবু এসে অনেক চেষ্টা করেছিলেন।

বোনের অসুখের খবরে বহুবিধ উদ্বেগ প্রকাশ করে ডাক্তার ডেকে আনতে চেয়েছিলেন, ফিরে যেতে হলে আবার গাড়ির কষ্টে শরীর বেশী খারাপ হবে এ আশঙ্কা প্রকাশ করে নিবৃত্ত হবার পক্ষেও অনেক যুক্তি দেখিয়েছিলেন, কিন্তু অনুরাধা অনমনীয়।

ওর যুক্তির মধ্যে একটাই যুক্তি। না দাদা, শেষে হয়তো আমায় নিয়ে মুস্কিলে পড়বে।

শেষ পর্যন্ত রাগ করে চলে গিয়েছিলেন প্রভাসবাবু। সত্যিই ভারি চটে গিয়েছিলেন তিনি বোনের উপর। এ কি লোক-হাসানো!

অতঃপর ওরা চলে যেতেই নিন্দের ঢেউ বইতে লাগল বাড়িতে।

উষাবতী হাঁস-ফাঁস করতে করতে পিতৃগোষ্ঠীর সকলকে ধরে ধরে অবহিত করতে লাগলেন—'দেখ কি চমৎকার শ্বশুরবাড়ি উষাবতীর! এই রকম শাশুড়ী-ননদ নিয়ে ঘর করতে হয় তাকে। সে যেই অশেষ সহিষ্ণু সহ্যশালিনী মেয়ে তাই এখনও এমনভাবে চলছে।

শাশুড়ী অবশ্য নিজেই এই সুরে সুর মিলিয়েছেন— তবু রেহাই কোথায়?

ঘুমের ক্ষতি করে প্রায় অর্ধেক রাত পর্যন্ত উষাবতীর বোনেরা প্রভাসের বোনের সমালোচনা করতে লাগল।

পরদিন সকালে অবশ্য কেউ আর অনুরাধার কথা তুলল না।

মনে থাকলে তো তুলবে?

গায়ে-হলুদের হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেছে। তত্ত্ব এসে গেছে ভারে ভরে। 'এয়ো'র সংখ্যা প্রয়োজনাতিরিক্ত হয়ে উঠেছে, এর মাঝখানে মাত্র একজন পিসীর অভাব মনে পড়বার কথাও নয়।

খেবির বান্ধবী এসেছে, সাজগোজের পালা চলেছে তিন-তলার ঘরে।

একখানা দামী ফ্রেমে বাঁধানো মাঝারি সাইজের এনলার্জড্ ফটো হাতে নিয়ে প্রভাসবাবু ব্যস্তভাবে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়লেন।...

ঢুকবেন? ডাকবেন?

অতঃপর ডাকই দেন—বেবি আছিস নাকি?

—বাবা! কি বলছ?

রঙে রসে সৌরভে উজ্জ্বল উচ্ছল বেবি বেরিয়ে এল—ছবিটা হয়ে গেছে বাবা? দেখি দেখি।

প্রভাসবাবু হাস্যোৎফুল্ল মুখে তুলে ধরলেন ছবিখানা।

—চমৎকার হয়েছে, কি বলিস?

—সত্যি খুব চমৎকার!...দীপ্তি দেখ্।...

বান্ধবী দীপ্তি অবশ্য উঁকি-ঝুঁকি মারছিলই। এবার ভালো করে দেখতে থাকে।

আর কারও নয়, বেবিরই ফটো!

বেবির শখেই তোলা।

বসেছে দক্ষিণের বারান্দায় কার্পেট পেতে। হাতে সেতার, খোলা চুল ছড়িয়ে আছে কাঁধে বুকে, আনতমুখের এক পাশে পড়েছে আলোর আভা। বোধ করি নিজের কন্যাকুমারী মূর্তিকে অক্ষয় করে রাখবার গোপন বাসনা ছিল মনে, তাই এই ছবিকে এন্‌লার্জ করিয়ে আনবার বায়না।

—দাঁড়া, আমিই টাঙিয়ে দিয়ে যাই—ব্যস্ত ভঙ্গীতে ঘরে ঢুকে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন প্রভাসবাবু—কোন দেয়ালটায় দেব?...

বেবি ঈষৎ লজ্জিত ভাবে বলে—দাও না যেখানে হোক, তুমি আবার এত কাজের মধ্যে—

—তা বললে কি হবে? এ কাজটিই বা কার?...কি বল দীপ্তি মা?...

—সামনের এই দেয়ালটায় ছাড়া এত বড় ফ্রেম মানাবে না, রোস কি একখানা ঝুলছে, নাবিয়ে নিই ওটা।

বহুদিনের ধুমধূলি-ধূসরিত একখানা ফটো ঝুলছিল বাঁকা হয়ে, টেনে নামাতেই দড়িটা ছিঁড়ল।

—ভাগ্যিস্! আর দু দিন থাকলে পড়ে কাঁচ ভেঙে বিপদ বাধাত। প্রভাসবাবু ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিয়ে খসে-পড়া ছবিখানা তাড়াতাড়ি দেয়ালের গায়ে ঠেশিয়ে রেখে সেই পেরেকে সযত্নে টাঙিয়ে দিয়ে গেলেন বেবির নতুন ছবিখানি।

—এটা কার রে?...এতদিন আসি, লক্ষ্য করি নি তো—কৌতূহলী দীপ্তি

নামানো ছবিটা তুলে নিল সাবধানে ধুলো বাঁচিয়ে।...

কাঁচ পরিষ্কার করবার প্রচলিত পদ্ধতিতে একটু 'হাই' দিয়ে মুছে নিয়েই বলে ওঠে—ওমা এটা তো দেখছি তোরই। কবে তুলিয়েছিস যে এমন দুরবস্থায় ঠেকেছে?

—দূর, আমার ছবি কি রে? ও তো পিসির ছবি। ওই যে—যাঁর কথা বলছিলাম তোকে, এসেই চলে গেলেন 'শরীর খারাপ' বলে।

দীপ্তি জানলার ধারে সরে এসে আরও নিরীক্ষণ করে বলে—আশ্চর্য, অবিকল তোর মত লাগছে, পোজ্‌টা পর্যন্ত এক। শুধু একটু কম বয়স মনে হচ্ছে।

নিজের রূপলাবণ্যের ওজন সম্বন্ধে বেবি বরাবরই একটু বেশি সচেতন, কাজেই পিসীর চেহারার সঙ্গে এহেন তুলনায় প্রসন্ন হয় না, সেটা বলাই বাহুল্য। কণ্ঠে একটু ঝাঁজ মিশিয়ে বলে—সবাই বলে বটে আমার সঙ্গে পিসীর কিছুটা আদল আছে, একেবারে 'অবিকল' তা তো জানতাম না। কই দেখি—

ছবিটা অবিশ্যি বেবির ছবির চাইতে অনেক ছোট।

নেহাৎই ছোট! কিন্তু কি আশ্চর্য, এ ছবি কি আগে কোনদিন দেখে নি বেবি? হয়তো দেখে নি। দৃষ্টির এলাকার কিছুটা ওপরেই বরাবর ঝুলে আছে। ধুলোয় ধোঁয়ায় ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে কাঁচখানা। ভিতরের ছবিখানা গেছে বিবর্ণ হয়ে। টেনে নামিয়ে আলোয় ধরে নিরীক্ষণ করে দেখবে, এত গরজ পড়ে নি কোনদিন।

তাকিয়ে দেখতে দেখতে অবাক হয়ে যায় যেন।

সত্যি সত্যি এত সাদৃশ্য আছে পিসীর সঙ্গে তার? বেবির বসবার ভঙ্গীটাই বা কে নকল করতে বলেছিল অনুরাধাকে? ঠিক তেমনি হাঁটু মুড়ে বসেছে বারান্দায়, খোলা-চুল কাঁধে বুকে ছড়ানো, আনত মুখের এক পাশে পড়েছে এসে আকাশের আভা। শুধু প্রভেদের মধ্যে কোলের উপর বাদ্যযন্ত্র নয়, একখানি বই।

এই ঘর, এই বারান্দা, এই জানালা। হয়তো সাদৃশ্যটা এত স্পষ্ট হয়ে ওঠার সেও একটা কারণ।

নিচের তলায় ঘন ঘন হুলুধ্বনি ওঠে।...

নিশ্চয় নিয়ম কর্মের নতুন কোন হুজুগ।

দীপ্তি ছুটে নিচে নেমে যায়। বন্ধুর বিয়ের আনন্দউৎসবটা পুরোমাত্রায় উপভোগ করে নেবে এই তার প্রতিজ্ঞা।

বেবি 'কনে'।

ছুটোছুটি করে উৎসব উপভোগ করবে, সমাজে এ আইন নেই। তাছাড়া দীপ্তি নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ কি যে হয় ওর, কোথা থেকে যেন একটা পাষাণভার এসে চেপে বসে ক্ষণপূর্বের সোনালি হাওয়ায় ভাসা হালকা মনের উপর।

সেই অকারণ ভারে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে কেমন যেন নির্জীবের মত বিছানাটার উপর বসে পড়ে রেবি, হাতে পায়ে কোথাও কিছু জোর খুঁজে পায় না যেন।

হঠাৎ কি আকাশে পড়ল মেঘের ছায়া? তা নয়তো ঘরের আলো এমন ম্লান হয়ে আসে কেন? নিজের ছবিখানা যেন স্পষ্ট দেখতে পায় না আর, ঝাপ্সা ঠেকে।

কে জানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটল নাকি বেবির! না হলে অত বড় ছবিখানা কেন তার চোখের সামনে ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে…ছোট আরও ছোট্ট…বিবর্ণ হয়ে গেছে ফ্রেমখানা…ছোট্ট হয়ে যাওয়ার স্বল্প পরিসর কাঁচটুকু ধোঁয়া আর ধূলোর পুরু প্রলেপে ঢাকা পড়ে গেছে…তার নিচে থেকে আব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বেবিকে!

একটা শিথিল কল্পনায় নিজেকে ছেড়ে দেয় বেবি!

কল্পনা করতে থাকে…চলমান কালের কোন অলক্ষ্য অবসরে ছবি-ঝোলানো ওই রঙিন দড়িটা উৎসব-শেষের বাসি-মালার মত বিবর্ণ জীর্ণ হতে হতে ঢিলে হয়ে গেছে, ছবিখানা—সদ্য-ঘুম-ভাঙা তরুণীর শিথিল গ্রীবার উপর এলিয়ে থাকা বাসি-খোঁপার মত বাঁকা হয়ে ঝুলছে দেয়ালের গায়ে!

সেই অনাগত কালের যে মানুষগুলো ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের কোন কৌতূহল নেই ওর দিকে তাকিয়ে দেখবার! কে জানে কোন অসতর্ক মুহূর্তে ওটা আপনিই ছিঁড়ে পড়ে যাবে, না নতুন কোন প্রয়োজনের তাগিদে নামিয়ে নিয়ে ফেলে দেওয়া হবে উদাসীন অবহেলায়!

খানিক পরে নিচের তলায় কলগুঞ্জন ওঠে—"বড় যে সব বলা হচ্ছিল—বেবি খুব শক্ত মেয়ে!…ওই দেখগে, একলা হয়েছে কি আপন মনে কেঁদে বালিশ ভিজোচ্ছে—"

একটা হাতে কব্জির উপর থেকে কাটা। তবু বাকী হাতখানাতেই ভেল্কি খেলে। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ। না পারে এমন কাজ নেই। অবশ্য না করে উপায়ই বা কী? বাড়িতে তো মেয়েছেলে বলতে কেউ নেই। বাইরের লোকজন রাখবে এমন পয়সা কোথায়? আগে তবু যা হোক একটা চাকরি করত, এখন তো আবার পেনশন হয়ে গিয়েছে।

যেমন দান তেমন দক্ষিণা। যেমন চাকরি তেমনি পেনসন। রান্না থেকে গুলিপাকানো পর্যন্ত সব কিছু পারে বলেই কারও কাছে হাত পাততে হয় না সাধন দত্তকে, কি অর্থে, কি সামর্থ্যে! অনেকদিন আগে একবার সাধন দত্তর পিসী ওর কাছে এসে থাকবার জন্যে ঝুলোঝুলি করেছিল; বলেছিল, "বেটাছেলে, দুটো রাঁধা-ভাত পাবি না? তার ওপর এই ভগবান মেরেছে—"

সাধন দত্ত মনে মনে বলেছিল, 'ভগবান মেরেছে বলে সবাই মিলে মারবে? রক্ষে কর বাবা, রাঁধা-ভাতের চরণে দণ্ডবৎ। সুখের চাইতে স্বস্তি ভাল।' মুখে বলেছিল, "বল কি পিসীমা, তুমি বুড়ো হয়েছ, তোমারই কোথায় এখন সেবা খাবার বয়েস, তা নয় আমি বুড়ো-মদ্দ তোমার সেবা খাব? আমার যাই হোক একখানা হাত রয়েছে, পা রয়েছে দুটো, পেট খুব চালিয়ে নিতে পারব। তুমি কাশী গঙ্গা সেরে দেশে ফিরে যাও।"

বলা বাহুল্য, এত বড় অপমানের পর আর থাকতে পারেন নি পিসীমা। সেই অবধি সাধন দত্ত একখানা হাতেই ভেল্কি খেলিয়ে আসছে।

এখন তো শুধু ঘরের কাজ, অফিসে থাকতে সহকর্মীরা অবাক হয়ে প্রশংসা করত, "মাইরি দত্ত, তুমি এক হাতেই কেল্লা মারতে পার। আমরা এই সন্ধ্যে অবধি খেটেও টেবিলে পাহাড় জমিয়ে বসে আছি, আর তোমার বেলা চারটে না বাজতেই টেবিল ফর্সা? অতগুলো ফাইল মেটাতে পারলে এরই মধ্যে?"

তা পারত সাধন দত্ত।

তবে বেশী কথা বলত না, শুধু হাসত। বড়জোর বলত, "ডান হাতটা আছে, তাই রক্ষে।"

বেশী কথা কখনও বলে না সাধন দত্ত। যখন শুধু 'সাধন' ছিল, যখন রক্তে ছিল চাঞ্চল্য, চোখের দৃষ্টিতে ছিল চুলবুলুনি, তখনও মুখে কথা কমই ছিল।

এখনও তাই আড্ডা দেবার বন্ধু জোটাতে পারে না, কাজ-কমা ফাঁকা ফাঁকা দিনগুলোয় একা একা এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়। হয়তো বা কখনও বালিগঞ্জের রেলে চেপে ঢাকুরে, যাদবপুরে, কখনও শেয়ালদার স্টেশন থেকে সোদপুর-খড়দা-

শ্যামনগর। সকাল সকাল খাওয়াদাওয়া সেরে বেরোয়, সারাদিন কাটিয়ে রাতের দিকের ট্রেনে ফেরে। সব সময়ে টিকিট ·কেনেই, এমন অপবাদ দেওয়া যায় না সাধন দত্তকে। তবে তার জন্যে অপমানিত হয় নি আজ পর্যন্ত। যতই হোক, বেটাছেলের বুদ্ধি আর কৌশল।

কৌশল খেলাতে গিয়ে হেমাঙ্গিনী হাতে-নাতে ধবা পড়ল। অবিশ্যি সেও যে আজ সদ্য নতুন তা নয়, বিনা টিকিটে যাতায়াত করছে সেই আকালের বছর থেকে। তা তখন একটা দলও ছিল। পুঁটি, কালোব মা, নলিনী, হরিদাসী, আর এই হিমি চাল-চালানের ব্যবসা করে ফেঁপে উঠেছিল তখন। এখন আর ব্যবসার সে বোলবোলাও নেই। তাছাড়া এখন হিমিকে রোগে ধরেছে। জ্বরে জ্বরে দেহ জবজব, তাই কলকাতায় আসছিল হিমি হাসপাতালে দেখাতে। তাদের জগদ্দলেও হাসপাতাল আছে, কিন্তু সেখানকাব আইন বড কড়াই। কারখানার কুলি-কামিন ছাড়া কেউ ওষুধ পাবে না।

পরনে ফর্সা ধবধবে নরুনপাড ধুতি, সরুগলা সেমিজ গায়ে, সাদা উড়্নি জড়ানো। ভদ্র বিধবার মত শান্তভাবেই বসেছিল হেমাঙ্গিনী, তবু আশ্চর্য, পাশের আরোহী অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল, "এই সব হচ্ছে বে-টিকিট প্যাসেঞ্জার। অথচ বসেছে দেখ গ্যাঁট হয়ে।" পার্শ্ববর্তীর পার্শ্ববর্তী আরও অস্ফুট কি প্রশ্ন করলেন, পূর্ববর্তী বক্তা অতঃপব শ্রুতিগোচর স্বরে বললেন, "ওই পেশা। ও কি আজ এ-লাইনে যাওয়া-আসা করছে ? অনেককাল করছে। কখনও তো দেখলাম না—"

সাধন দত্ত হাঁ করে তাকিয়ে ছিল এদিকে। ওর নিজেরও যে টিকিট নেই, সে-খেয়াল ছিল না ; অবাক হয়ে ভাবছিল, মানুষটা তো আগাগোড়া চাদরমুড়ি মাথাতেও আডঘোমটা, এতকাল তাকিয়ে থেকে থেকেও তো আবিষ্কার করতে পাবে নি সাধন দত্ত ওর পুরোপুবি মুখটা কেমন। অথচ লোক দুটো কী করে ধরে ফেলেছে, ওর আঁচলে টিকিট আছে কি না!

মূর্তিটির ধরনধারণ দেখে মনে হয় না এদের আলোচনা তার কানে গিয়েছে। রক্ষণশীল ভদ্রঘরের বিধবা মহিলার মতই চুপ করে বসে থাকে জানলার দিকে দিকে তাকিয়ে। কিন্তু পার্শ্ববর্তীর পার্শ্ববর্তী সহসা নডেচড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সরে এসে বলে, "আপনার টিকিট আছে ?"

পার্শ্ববর্তী ওর শার্টের কোণ ধরে উদার স্বরে বলে ওঠে, "যেতে দাও না দাদা। তোমারই বা কি, আমারই বা কি ? কোম্পানী কা মাল, দরিয়া মে ডাল।"

ভদ্রলোক জামার কোণ ছাড়িয়ে নিয়ে বলে উঠলেন, "উঁহু, এটা ঠিক নয়, এ হচ্ছে কাপুরুষতা। দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া। আমরা প্রত্যেকেই এ-বিষয়ে উদাসীন বলেই না দেশে এত দুর্নীতি! শুনছেন, টিকিট আছে আপনার?"

অর্ধাবগুণ্ঠিতার অবগুণ্ঠন ঈষৎ উন্মুক্ত হল। মনে হল কী বলবে, কিন্তু বলল না, ঘোমটাটা আবার টেনে দিয়ে আরও ঘুরে বসল।

দুর্নীতি-দমনকারী কিন্তু নাছোড়বান্দা।

তিনি এবারে প্রায় ধমকের সুরেই বলে ওঠেন, "কথা বলতে জান না? বোবা?" বলা বাহুল্য, হেমাঙ্গিনীকে বার বার আপনি বলা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। কারণ ইত্যবসরে তার চালচলনের ইতিহাস তিনি শুনে নিয়েছেন।

ধমকের সুর শুনেই হেমাঙ্গিনী ঝটকা মেরে ঘুরে বসল। তীব্রস্বরে বলে উঠল, "তুমি জিজ্ঞেসাবাদ করবার কে বাছা? চেকারবাবু তুমি?"

"আমি কে?" বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত হয়, "জানতে পারবে আমি কে, চল না কলকাতায়!"

সাধন দত্ত যাকে বলে বিস্ফারিত লোচনে এই অভিনয় দেখছিল। তার দেহের প্রতিটি লোমকূপ যেন দৃষ্টিপ্রদীপ হয়ে জ্বলে উঠেছে। এ কী! এ কী! গাড়ির আর পাঁচজনে অবশ্য এই ফাঁকা আওয়াজের নেহাত ফাঁকামিটা সহজেই ধরতে পারল, কিন্তু হেমাঙ্গিনী কেমন ঘাবড়ে গেল। হয়তো শারীরিক অশক্ততার জন্যেই, হয়তো বা একে-বারে এমন একা আসার অভ্যাস নেই বলেই। ও অসহায়ের মত একবার গাড়ির আরোহীদের মুখের দিকে চেয়ে দেখল, তারপর সহসা সাধন দত্তর দিকে তাকিয়েই বলে উঠল, "দেখছ ঠাকুরপো, লোকটা আমাকে না-হক কী রকম অপমান করছে!"

ঠাকুরপো!

এই আকস্মিক সম্বোধনের কৌতুক-রহস্যে গাড়ির এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি একটা হাসির ঢেউ বয়ে গেল। যাঁরা রীতিমত ভদ্র, তাঁরাও কাশতে শুরু করলেন। সাধন দত্ত কিন্তু নির্বিকার। ও উঠে এল গম্ভীরভাবে। গম্ভীরভাবেই বলল, "দেখছি বৈকি সেজবৌদি। শুধু চুপ করে আছি ভদ্রলোকের ধৃষ্টতার বহরটা শেষ অবধি দেখবার জন্যে।" নীতিবাগীশটির দিকে তাচ্ছিল্যের একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সাধন দত্ত।

এবারে ভদ্রলোক একটু আম্‌সি মেরে গেলেন। তবু মচকালেন না। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে তিক্ত ব্যঙ্গের স্বরে বলে উঠলেন, "বেশ ত ঠাকুরপো,

আপনিই না হয় বলুন না সেজবৌদিকে, দয়া করে টিকিটটা দেখাতে।"

এবারে আর চাপা-হাসির ঢেউ নয়, রীতিমত হাস্যরোল। অবাধ উন্মুক্ত, অনেক রকমের হাসি। ভদ্র, সভ্য, পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে ভিতরের ইতর উঁকি না মেরে পারে না এই অপরূপ কৌতুকে।

সাধন দত্ত বেশী কথা বলে না। তবু এখন বলল। দাঁড়িয়ে উঠে ভদ্রলোকের দিকে সোজা তাকিয়ে বলল, "যে-প্রশ্ন উনি করেছিলেন, সেইটাই আমিও করছি। টিকিট চাইবার অধিকার আপনার আছে? আপনি রেলকোম্পানির প্রতিনিধি?"

"যেতে দিন দাদা, যেতে দিন—" বলে অপর এক ভদ্রলোক সাধন দত্তর জামার হাতটা ধরে টেনে বসাতে গিয়ে চমকে ওঠেন।

"কী দাদা! হাত কই?"

লম্বা-হাতা মোটা লংক্লথের পাঞ্জাবিটা এতক্ষণ যে-সত্যকে আড়াল করে রেখেছিল, হিতকামীর হিত-চেষ্টার ফলে সে-সত্য প্রকাশ হয়ে পড়ল।

হাত নেই।

অস্ফুট একটা আর্তনাদের মত সমস্ত আরোহীর মুখ থেকে উচ্চারিত হল কথাটা।

সাধন দত্ত সোজা দাঁড়িয়ে গম্ভীরভাবে বলে, "নেই দাদা! ভগবান মেরেছে। আপনাদের দু-দুখানা আস্ত হাতের সঙ্গে নখ, দাঁত, শিঙ—এতগুলো সম্পত্তি দিয়েছে ভগবান, আর আমার মাত্র দুখানা হাতের থেকেও আবার একখানা কেটে নিয়েছে। এস, সেজবৌদি, নাম। দরকার হয় রেল-অফিসে গিয়েই টিকিট জমা দেব।"

স্টেশন ছুঁই-ছুঁই। মন্দীভূতগতি ট্রেন থেকে নেমে পড়ে সাধন দত্ত। আশ্চর্য হেমাঙ্গিনীও বিনা প্রতিবাদে নিঃশব্দে নেমে পড়ে পিছন পিছন।

অতঃপর গাড়িতে কী ঘটল সে-কথা থাক, এদের কথাই হোক।

প্রথম কথা হেমাঙ্গিনীই কইল। বেদনা আর বিস্ময়মেশা স্বরে বলল, "হাত কাটা গেল কিসে?"

"ডাক্তারের ছুরিতে।" বলল সাধন দত্ত।

"আহা তা যেন বুঝলাম, কিন্তু হয়েছিল কি?"

সাধন দত্ত এক সেকেণ্ড থেমে মিটি-মিটি হেসে বলল, "সে একটা ইতিহাস! পরে হবে সে-সব কথা। কিন্তু কথা হচ্ছে এ লাইনে নাকি তুমি প্রায়ই আস?"

'প্রায় আসার মধ্যে চাল চালানের ইতিহাস আছে, তাই হেমাঙ্গিনী অপরূপ ভঙ্গিতে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলে, "প্রায় আবার কোথা? কালেভদ্রে।"

সাধন দত্ত আবার হাঁ করে তাকায়।

এখনও এইভাবে হাসে হেমাঙ্গিনী? হাসতে পারে? মেয়েমানুষের কি বয়স বাড়ে না? কত বয়স হল হেমাঙ্গিনীর? চল্লিশ? বেয়াল্লিশ? পাগল! বেয়াল্লিশ পার হয়ে এসেছে কোন না দশ বছর আগে। মনে মনে নিজের বয়সের হিসেবটা একবার করে নিয়ে নিশ্চিত হল সাধন দত্ত। অথচ এখনও বাইশ বছরের মত মুখ টিপে হাসতে পারে হেমাঙ্গিনী। যে-হাসির আগুনে সাধন দত্ত—! চমকে উঠল সাধন হেমাঙ্গিনীর কথার ধাক্কায়। "তুমি যে দেখছি একেবারে বুড়ো হয়ে গেছ! বৌ যত্ন করে না বুঝি?"

"কই আর?"

সাধন দত্তও হাসতে চেষ্টা করল মুখ টিপে। তাতে শুধু মুখের পেশীগুলো একটু কুঁচকে উঠল। আর মুখের চেহারাটা একটু বিকৃত দেখাল।

"আচ্ছা, আমি গিয়ে দুকথা শুনিয়ে দিচ্ছি। পুরুষের শরীর কখনও অযত্নে টেঁকে? ছেলেপুলে কি?"

"কিছু না।"

"য়্যাঁ! ছেলেপুলে হয় নি?"

"না।"

"আ কপাল!"

"কপাল ত ভালই।" সাধন বলল।

"দূর, পাঁচটা কাচ্চা-বাচ্চা না হলে কখনও মন টেঁকে? এই আমারই দেখ না, শুধু একটি ওই বস্তুর অভাবে জীবনটাই"—থেমে গেল হেমাঙ্গিনী। তাড়াতাড়ি কথা ফিরিয়ে বলল, "বেলঘোরেতেই থাক বুঝি এখন?"

"রামো! কলকাতা ছাড়া মানুষে বাঁচে?"

হেমাঙ্গিনী অবাক হয়ে বলে, "তাহলে এখানে নামলে যে?"

"দায়ে পড়ে। তুমি যে কাণ্ডটি বাধিয়েছিলে।"

হেমাঙ্গিনী লজ্জা পেল, কিন্তু চুপ করে থাকল না। তাড়াতাড়ি বলল, "তাড়াতাড়িতে টিকিট কেনা হয় নি।"

"একাই যাওয়া-আসা কর?"

আর একবার তেমনি বাইশ বছরে হাসি হাসল হেমাঙ্গিনী। হেসে বলল,

"দোকলা আর পাচ্ছি কোথায় ?"

"আশ্চর্য !" সাধন দত্ত নিশ্বাস ফেলে বলে, "তুমি বারমাস এই পথে যাওয়া-আসা কর, আমিও নিত্যি আসি ; অথচ একদিনও কি দেখা হতে নেই ?"

হেমাঙ্গিনীও নিশ্বাস ফেলল একটা।

এতক্ষণে যেন ওর চৈতন্য হল কার সঙ্গে কথা বলছে। উদাস স্বরে বলল, "দেখা হলেই বা কি লাভ হত।"

"নাঃ, লাভ আর কি ?"

কিছুক্ষণ দুজন চুপচাপ।

আবার হেমাঙ্গিনীই আগে কথা কওয়ার ভার নেয়। "এখানে যদি থাক না, তো যাচ্ছ কোথায় ?"

সাধন দত্ত চমকে উঠে বলে, "কই ? যাচ্ছি না তো কোথাও।"

"যাচ্ছ না কোথাও ?" হেমাঙ্গিনী অবাকের অবাক, তস্য অবাক ! "যাচ্ছ না তো হাঁটছ যে ?"

"কি জানি ! এমনি !" বলেই হেসে উঠে বলে বসে সাধন দত্ত, "অনেকদিন পরে তোমায় দেখে বুঝলে সেজবৌ--মানে খেয়াল নেই কেন হাঁটছি। তা তুমি যাচ্ছিলে কোথায় ?"

"কলকাতায়, আবার কোথায় ?"

"তাহলে—আমিও তো—মানে, আমিই বা এখানে তোমাকে নিয়ে কোথায় —বেশ তাহলে আবার স্টেশনেই ফেরা যাক, কি বল ? গাড়ি অনেক আছে, পেয়ে যাব যা হোক একটা।"

এবারে পুরো পয়সা দিয়ে দুখানা টিকিট কিনল সাধন, জুত করে গাড়িতে উঠে বসল দুজনে। সন্ধ্যে হয়ে গেছে তখন।

"এতদিন পরে তুমি আমায় চিনলে কি করে বল তো সেজবৌ ? আশ্চর্য তো !"

ধড়িবাজ হেমাঙ্গিনী গম্ভীর উদাস স্বর আমদানি করল কণ্ঠে। বলল, "প্রাণের চেনা থাকলে পরজন্মেও চেনা যায়, তা এ তো কেবল কটা বছর মাত্র। বিপদে মধুসূদনকে খুঁজতে গিয়ে তোমার খোঁজ পেলাম।"

ত্রিশ বছর ধরে একখানা হাতে ভাত রেঁধে খাচ্ছে সাধন দত্ত, উনুনে আগুন দিচ্ছে, বাটনা বাটছে, গুল পাকাচ্ছে, তবু সেই হাতের ভিতর কি অদ্ভুত চাঞ্চল্য জাগে হেমাঙ্গিনীর ওই কোলের উপর পড়ে থাকা হাতখানা চেপে ধরবার জন্যে।

কষ্টে সে-ইচ্ছে সংবরণ করে সে বলল, "স্বপ্নেও কখনও ভাবি নি যে, তোমার সঙ্গে আবার কোনদিন দেখা হবে।"

"দুঃস্বপ্নে বল।" বলে মুচকি হেসে হেমাঙ্গিনী সেমিজের ভিতর থেকে পান-দোক্তার কৌটো বার করল। একটু বাড়িয়ে ধরে বলল, "চলে ?"

সাধন দত্ত মাথাটা নাড়ল। "নাঃ! জানই তো দোক্তার গন্ধেই আমার মাথা ঘোরে।"

"ও বাবা, এখনও সেই খোকাটি আছ? বৌ বুঝি মানুষ করে তুলতে পারে নি ?"

সাধন দত্ত এবার মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলে ওঠে, "মাথা নেই তার মাথা-ব্যথা। বিয়েই করি নি তার বৌ।"

"বিয়ে কর নি ?" হেমাঙ্গিনী প্রথমটা চমকে উঠল, তারপর সেই অবাক-অবাক চোখের কোণে জলে উঠল লোভের আগুন। বিয়ে-থা করে নি। তাহলে হয়তো তেমন গুছিয়ে দুটো দুঃখের কথা বলতে পারলে কিছু আদায় করা যাবে। হুঁ, বিয়েই করে নি, তাই এখনও তেমনি হ্যাকা-বোকা রয়ে গিয়েছে।

পান-দোক্তার কৌটোকে আবার যথাস্থানে রেখে হেমাঙ্গিনী নড়ে-চড়ে বসে বলল, "বিয়ে কর নি কেন গো ঠাকুরপো ? মেয়েমানুষের ওপর ঘেন্নায় ?"

বাইশ বছর থেকে বাহান্ন বছরের দরজায় এসেছে হেমাঙ্গিনী, আর এই দীর্ঘ পথটা অতিক্রম করতে কত না ঘাটের জলই খেতে হয়েছে তাকে। কত ঘাট ঘুরল, কত সিঁড়ি নামল, কত চাল চালতে চালতে শেষ অবধি চাল চালানের ব্যবসা ধরল, আবার সে-ব্যবসা ছেড়ে এখন জরে জরজর, তবু কি তার মধ্যে থেকে আজও মল্লিকদের বাড়ির সেজ-বৌ কথা কয়ে ওঠে? যার কথায় ছিল ছুরির ধার ?

সাধন দত্ত কথা কইতে জানে না।

আগেও ভোঁতা ছিল, আজও তাই। শুধু নিজে ভোঁতা বলেই হয়তো তীক্ষ্ণ-ধার ছুরির প্রতি ওর বরাবর লোভ।

"ঘেন্না আবার কি? কার ওপর ঘেন্না? ও-না-না। সে আর তোমার দোষ কি! হিঁদুর ঘরের বিধবা, ও ছাড়া আর—না না ওসব কিছু না। বিয়ে করবার সময় পেলাম কবে? তাছাড়া—হাত-কাটা পাত্তরের হাতে মেয়ে দিতই বা কে ?"

হাতকাটা!

হেমাঙ্গিনী চোখ গোল করে বলে উঠল, "হাত গেছে কতদিন?"

"সেই ততদিন।" আবার মিটিমিটি হাসে সাধন।

হেমাঙ্গিনী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

কি যেন ভাবতে চাইছে। কিসের যেন হিসেব করছে। সাল, তারিখ, মাস, বছরের হিসেবই হয়তো।

হিসেবের ফাঁকে ফাঁকে ও কি কোন ছবি দেখতে পাচ্ছে? মল্লিকদের সেই বিরাট বাড়িখানার ছবি?

সামনে পিছনে দর-দালান দেওয়া, চক-মিলানো সেই বাড়িখানার চৌকো চকের খাঁজে খাঁজে আরও কত শাখা-প্রশাখা। ক্ষুদে ক্ষুদে কুঠরি, কত ছোট ছোট দরজা, কত টুকরো টুকরো ঘেরা বারান্দা।

লুকিয়ে প্রেম করবার পক্ষে আদর্শ গড়নের বাড়ি।

কে জানে সে-বাড়ির আদি পুরুষের আমল থেকে আনাচে-কানাচে কত আদি-রসাত্মক লীলা ঘটে এসেছে। পূর্বকালে মল্লিকদের ইজারা নেওয়া ঘাটে না কি আর্মানীদের জাহাজ ভিড়ত। সে-সব কথা হেমাঙ্গিনীর জানার নয়। হেমাঙ্গিনী শুধু এ-যুগের কথাই জানে। যখন মল্লিকবংশের পুরুষরা লক্ষ্মীকে সিন্দুকে পুরে নিশ্চিন্ত গৃহলক্ষ্মীদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে শিখেছে। হেমাঙ্গিনী জানে শুধু বাড়ির সেজবৌকে।

সেজবৌ!

ফর্সা ধবধবে মিহি আদ্দির সেমিজ, কালো নরুনপাড় সিমলের ধুতি। হাতে ছগাছা করে প্লেন চুড়ি, গলায় সরু গোট হার। এই সাজ!

পাখির মত হালকা শরীর, ছুরির মত ধারালো কথা। বিয়ের বছর না ঘুরতেই বিধবা।

শ্বশুর থাকতে স্বামী গিয়েছে, তাই বিষয়ের ভাগিদার নয়। শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারিণী।

যারা পাঁচ-শরিকের এক শরিক, সেই বড়, মেজ, ন, ছোট বৌরা সকলের দিব্যি ভার-ভারিক্কি। সেজ-বৌয়ের গতিবিধিতে উড়ন্ত মৌমাছির চাপল্য।

নন্দাইরা এলে ননদের ঘরে ঢুকে তার খোঁপায় বেলফুলের মালা জড়িয়ে দিয়ে আসে সেজ-বৌ, ছড়া কাটে, নন্দাইয়ের গায়ে পানের খিলি ছুঁড়ে মারে। দূর-সম্পর্কের দেওররা এলে তাদের সুবিধে-স্বাচ্ছন্দ্যের ভার স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়ে

রাঁধুনির সঙ্গে ঝগড়া করে, বড়-গিন্নীর কৃপণতার প্রতি কটাক্ষ করে। আর বয়সে একটু বড়-সড় ভাগ্নে আর ভাসুরপোগুলোকে শুধু তাস খেলার প্রলোভনে ভুলিয়ে একেবারে অনুগত করে রাখে।

প্রখরা প্রগল্‌ভা তরুণী বিধবার মত বিপজ্জনক বস্তু সংসারে অল্পই আছে। তাই বড-মেজ গিন্নীরা যেন হিস্‌হিসিয়ে বেড়ায়। কিন্তু এঁটে উঠতে পারে না। ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে পড়ে সেজ-বৌ। বেরিয়ে পড়ে আড্ডা দিয়ে বেড়ায় ঘরে ঘরে।

হয়তো রাত-দুপুরেই গিয়ে আসন্ন-পরীক্ষার্থী পিসতুতো দেওরের ঘরে হানা দেয়, বেপরোয়া তার পড়ার বইগুলো উল্টে-পাল্টে দিয়ে বলে, "চব্বিশ ঘণ্টা বই মুখে, এ ভাল ছেলের জ্বালায় কি হবে গো! দুটো কথা কইতে এলাম, বুঝলে?"

ছেলেটা ভয়ে কাঠ হয়ে যেত। আড়ষ্ট হয়ে তাকিয়ে থাকত খোলা দরজার দিকে, আর সেজ-বৌ দিব্যি খাটের ধারে বসে পা দোলাতে দোলাতে বলত, "অত ভয় কিসের? তোমায় তো আর খারাপ করে দিচ্ছি না? চব্বিশ ঘণ্টা বুড়ি-গুলোর সঙ্গে থেকে থেকে প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে, দুটো আড্ডা না দিয়ে বাঁচা যায়? ভয় নেই, ভয় নেই। গিন্নীরা এখন কর্তার ঘরে।"

নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর ছেলেগুলো ব্যাঙের পায়ে দড়ি বেঁধে তার গায়ে ছুঁচ ফুটিয়ে যে আমোদ পায়, সেই আমোদের আস্বাদ বুঝি পেতে চাইত হেমাঙ্গিনী।

কিন্তু বারুদের বাক্সে আগুনের ছিটে মারলে কি সে-বারুদ শুধুই ফুল্‌কি কেটে থেমে থাকে? এক সময় সবটা জ্বলে উঠে আধারটা ফাটিয়ে বেরিয়ে আসে না সে-আগুন? মুখচোরা মাথা-নিচু পরান্নগৃহীত জীবটাও হঠাৎ একদিন ফেটে পড়ল! ফণা তুলে উঠল! বই খাতা উল্‌টে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফস্‌ করে পলতে ঘুরিয়ে নিভিয়ে দিল টেব্‌ল ল্যাম্পটা। খপ করে চেপে ধরল টেবিলের উপর রাখা ফর্সা পাতলা হাতখানা। চাপা নিষ্ঠুর গলায় বলে উঠল, "কে কাকে খারাপ করতে পারে জান কিছু?"

অপ্রত্যাশিত এই আক্রমণে আচমকা কি একটা চিৎকার করে উঠেছিল মল্লিকদের বিধবা সেজ-বৌ? হয়তো করেছিল। নইলে সঙ্গে সঙ্গে ভিড় জমে উঠেছিল কি করে বিরাট বাড়ির নিচের-তলার এক টুকরো অবহেলিত খুপরিতে লুকিয়ে থাকা ছোট্ট সেই কুঠুরিটার সামনে?

পাখির পালকের মত হাল্‌কা দেহখানা ছাড়িয়ে নিয়ে ঘর থেকে পিছলে বেরিয়ে পড়তে পেরেছিল সেজ-বৌ, কিন্তু ছেলেটা পালাতে পারে নি।

"পালালে চলবে না! মরি তো এক সঙ্গেই মরব—" বলে গোঁয়াতুঁমি করে কপাটে খিল লাগাতে গিয়ে, নিজের হাতটাকেই শুধু পিষে মেরেছিল ছুটো কপাটের মাঝখানে। পিষে তো যাবেই, বেরিয়ে পড়েই বাইরে থেকে কপাট টেনে শিকল তুলে দিয়েছিল কিনা বুদ্ধিমতী সেজবৌ।

না দিলে, সেই ভিড়ের সামনে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে কেঁদে কেঁদে বলতো কি করে, "ওর মনে যে এত কাণ্ড, জানব কি করে? তখন আমায় বললে, 'শুতে যাবার আগে ছুটো লবঙ্গ দিয়ে যেও তো সেজবৌ, লবঙ্গ খেলে চোখের ঘুম ছাড়ে।' আমি সরল মনে তাই দিতে গেছি। কি করে জানব যে, লক্ষ্মীছাড়া আমাকে একলা পেয়ে—" কেঁদে ভেঙে পড়ে বাকী কথাটা শেষ করতে পারে নি সেজবৌ।

কিন্তু এত চেষ্টাতেও সেদিন সেজবৌয়ের সরলতাকে বিশ্বাস করে নি কেউ। বিশ্বাস করে নি যে, আগুন জেলে পুড়ে মরবার দুঃসাহস তার ছিল না, শুধু এক-আধটা দেশলাই কাঠি জেলে জেলে গভীর অন্ধকারের দুঃসহতাটাকে সহনীয় করবার বোকামি ছিল।

না, অত অদ্ভুত কথা বিশ্বাস করে না কেউ। সংসার-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা সেই রাত্রেই গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়েছিল হতভাগা ছেলেটাকে, আর রাত পোহাতেই ভোরের গাড়িতে সেজবৌকে চালান করে এসেছিল নবদ্বীপে।

সেই নবদ্বীপের ঘাট থেকে, কত ঘাটেই ঘোরাঘুরি।

সামনের পথের হিসেব আছে, পিছনের ইতিহাস অজানা! কে জানে কি হয়েছিল সেই পায়ে-দড়ি-বাঁধা ব্যাঙটার!

এবারে প্রথম বক্তা সাধন দত্তই।

"কি, চুপ মেরে গেলে যে?"

হেমাঙ্গিনী একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "না, চুপ নয়, নিজের পাপের হিসেব কষছি।"

সাধন দত্ত জোর দিয়ে হেসে ওঠে, হুঁঃ! খেয়ে-দেয়ে আর কাজ নেই, পাপের হিসেব করছে! আরে বাপু, দোষ আমারও ছিল। সঙ্গে সঙ্গে চিকিচ্ছে-পত্তর করলাম না, কিছু না; পড়ে পড়ে পচল, পচে পচে গ্যাংগ্রীন হল, বাদ দিতে হল শেষটা। দোষ কার?"

"তোমার জীবনটা আমিই নষ্ট করলাম!" কথা কইল চালচোর হিমি নয়, কইল মল্লিক-বাড়ির সেজবৌ! যে-মেয়ে প্রগল্ভা বাচাল হিতাহিতজ্ঞানশূন্য

হলেও একটা মানুষ ছিল। কিন্তু এই দীর্ঘকাল পুঁটি, হরিদাসী, কালোর-মাদের সঙ্গে কথা কয়ে কয়েও তার সেই মানুষ-জীবনের ভাষা কি আজও মনে আছে হেমাঙ্গিনীর ?

সাধন দত্ত চকিত হয়ে উঠল। "কি মুস্কিল! জীবনটা কি মাছ-দুধ? যে এক কথাতেই নষ্ট হয়ে যাবে? দিব্যিই তো কাটিয়ে এলাম! রাঁধি-বাড়ি খাই-দাই, তোফা থাকি! যাচ্ছই তো, দেখতে পাবে আমার সংসার!"

"যাচ্ছি মানে?" হেমাঙ্গিনী বলে ওঠে, "আমি কোথায় যাব?"

"কেন, আমার বাড়িতে।

"পাগল নাকি!"

"পাগল মানে? সেখানে কে তোমাকে মারতে আসবে?"

"মারতে আসার কথা নয়। যাব কোন মুখে? আমি যাচ্ছি মারোয়াড়ী হাসপাতালে ভর্তি হবার চেষ্টায়।"

"হাসপাতালে?" সাধন দত্ত চমকে উঠল, "কেন, হাসপাতালে কেন?"

"কেন আর! রোগে ধরেছে! মরণে আপদ চোকে, কিন্তু মরছি কই? নিত্যি জ্বর, নিত্যি জ্বর।"

সাধন দত্ত ঈষৎ গাঢ় স্বরে বলে, "ওঃ তাই! তাই চেহারা এমন খারাপ হয়ে গেছে? আমি ভাবছিলাম দুঃখে ধান্ধায়!"

"সেটাও মিথ্যে নয়। জীবনের ওপর দিয়ে কত ঝড়ই বয়ে গেল! তোমাকেও মারলাম, নিজেকেও বাঁচাতে পারলাম না। এখন সত্যি মরতে পারলেই জুড়িয়ে যাই।"

"মরতে তোমায় দিচ্ছে কে?" সাধন দত্ত হঠাৎ উৎফুল্ল স্বরে বলে ওঠে, "হাসপাতালেই বা যেতে দিচ্ছে কে? দেখ না, এই একখানা হাতের সেবাতেই তোমায় ভাল করে তুলতে পারি কিনা।"

আর কথা বাড়ায় না সাধন দত্ত, তোড়জোড় করে নেমে পড়ে।

স্টেশন থেকে বাড়ি যেতে বাসে উঠল না, একখানা ট্যাক্সিই করে বসল।

হেমাঙ্গিনী কেমন চুপচাপ! যে-হেমাঙ্গিনী খানিক আগেও ভেবেছে জুত করে দুটো দুঃখের কাহিনী শোনাতে পারলে হাবাগোবা লোকটার কাছ থেকে কিছু হাতাতে পারা যাবে, সে হেমাঙ্গিনী যেন কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে।

চাবি খুলে ঘরের আলো জ্বালল সাধন দত্ত। "এই দেখ! বৌ নেই বলে ঘরের

কিছু অগোছালো দেখছ নাকি সেজবৌ ? নাও এখন মুখ হাত ধুয়ে নাও। শরীর তো ভাল নয়, রাত্তিরে খাও কী ?"

"ছাই খাই !" হঠাৎ ঝঙ্কার দিয়ে উঠল হেমাঙ্গিনী, "অনেক কুটুম্বিতা হয়েছে ; থাক, এবার যেতে দাও দিকি।"

সাধন দত্ত থতমত খেয়ে বলে, "কোথায় যাবে এখন এই রাত্তিরে ?"

"চুলোয় !" ঝাঁঝিয়ে ওঠে হেমাঙ্গিনী, "তোমার পিত্যেশে বেরিয়েছিলাম নাকি ?"

প্রৌঢ় সাধন দত্তর পেশীবহুল মুখ ফুটে ওঠে এক বিচিত্র হাসি—"তুমি আমার পিত্যেশে বেরোও নি জানি, কিন্তু আমি তো তোমার পিত্যেশেই বেরিয়েছিলাম সেজবৌ।"

"তার মানে ?" হেমাঙ্গিনীর ভুরু কুঁচকে ওঠে, "তুমি জানতে আমি আসব ?"

মাথা নাড়ল সাধন দত্ত, "জানতাম না, ভাবতাম ! ভাবতাম, যদি দৈবাৎ কোনদিন দেখা পেয়ে যাই, "সেই পিত্যেশেই প্রায়ই—"

হেমাঙ্গিনী গম্ভীর মুখে বলে, "দেখা পাওয়ার জন্যে এত আকিঞ্চন কেন ? প্রতিশোধ নেবার বাসনায় ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ—" খুশিতে ঝলমলিয়ে ওঠে সাধন দত্তর ভোঁতা চোখ দুটো, "সেই-জন্যেই তো। আজ হাতে পেয়ে গেছি, আর ছাড়ি ?"

"হাতে পেয়ে ?" জোচ্চোর ফাঁকিবাজ অর্থলোলুপ হিমির মুখেও এবার আরও বিচিত্র অপরূপ এক হাসি ফুটে ওঠে, "হুঁ ! তবু যদি পুরো দুখানা হাত থাকত !"

হা হা করে হেসে উঠল সাধন দত্ত। স্বভাবছাড়া অভ্যাসছাড়া জোর হাসি। "নেই—সে তো আমার পক্ষে ভাল গো ! এখন আর চেঁচিয়ে লোক জড় করে নালিশ করতে পারবে না—'একলা পেয়ে লক্ষ্মীছাড়াটা আমায় জড়িয়ে ধরে'—"

শিবানীর প্রশ্নে দস্তুরমত শব্দ তুলে হেসে উঠেছিল প্রাণতোষ। বলেছিল—"করব না, এমন কথা তো বলি নি কোনদিন! অবশ্যই করব। বিয়ের প্রতি আমার বীতরাগ আছে, এ কথা ভাবলে ভুল করবেন। বরং গভীরতম হৃদয়ের কথা যদি শুনতে চান বৌদি, তো বলব বিয়ে বা বৌ জিনিসটার ওপর রীতিমত লোভই আছে আমার। কিন্তু—"

শিবানী চোখ বড় বড় করে বলছিল—"ওমা এ ভদ্দরলোক বলে কি! 'ইচ্ছে' নয়, 'বাসনা' নয়, একেবারে 'লোভ'! তবু বলছ এখন নয়, এখন নয়।"

"তবু বলছি"—মুচকে হেসে প্রাণতোষ বলেছিল। "তার কারণ আমার মতে আগে ঘর তবে ঘরণী।"

শুনে শিবানী থতমত খেয়ে গিয়েছিল।

বোকাসোকা—ভাল মানুষ, তার পক্ষে এটা অবাক হবার মতই কথা। তিন তলার ছাদের ওপর টালির শেড দেওয়া যে লম্বা ঘরখানা প্রাণতোষের দ্বারা দখলীকৃত, সেই ঘরখানা তো শিবানীর কাছে রীতিমত লোভের বস্তু। চারিদিক খোলামেলা, বাতাসে যেন উড়িয়ে নিয়ে যায়। সর্বোপরি নির্জনতায় মধুর। সংসার যন্ত্রের ঘর্ঘর শব্দটা ওখানে পৌঁছয় না। শিবানী যখনই কোন দরকারে ওঘরে যায়, মনে মনে ভাবে, 'আমার ঘরটার সঙ্গে ঠাকুরপোর ঘরটা যদি বদলে নেওয়া যেত!' কাজেই প্রাণতোষের ঘরের প্রসঙ্গে এহেন মন্তব্যে থতমত না খেয়ে করবে কি! বলেছিল বোকার মত—"ওমা! সে কি কথা ভাই, ঘর কি তোমার নেই?"

"ঘর!"

এবার এক প্রচণ্ড হাসির পাল্লা।

এ হাসিতে কৌতুক ঝরে নি, ঝরেছিল ব্যঙ্গ আর তাচ্ছিল্য।

"ঘর? মানে, ছাদের ওই টালিঢাকা ঘরটার কথা বলছেন?"

শিবানী বোকা হলেও মেয়েমানুষ। কিছু না বুঝুক তাচ্ছিল্যটা বোঝে! তাই সে-ও ব্যঙ্গের হাসি হেসে পাল্টা জবাব দিয়েছিল—"তা ভাই, ওই বা কম কি? ওইটুকুই বা ক-জনের ভাগ্যে জোটে? ছাদ যা দিয়েই ঢাকা হোক, চারখানা দেয়ালের ঘের তো আছে? সে দেয়ালে দরজাও আছে, আর দরজায় একটা ছিটকিনিও আছে। আর কি চাই?"

"মাপ করবেন বৌদি, চারখানা দেয়াল ঘেরা একটুকরো জায়গা আর ছিটকিনি লাগানো একটি দরজা হলেই যাদের সমস্ত চাহিদা মিটে যায়, দুঃখের বিষয় আমি তাদের দলে নই।"

এবারে আর হাসির সঙ্গে তাচ্ছিল্য ঝরে নি, মুখের সমস্ত রেখায় রেখায় সেটা ফুটে বেরিয়েছিল প্রাণতোষের।

শিবানী তবুও বলেছিল মুচকে হেসে, "আচ্ছা একবার পরীক্ষা করতে দিয়েই দেখ না, মত বদলায় কি না দেখি।"

"এবারেও মাপ চাইতে হল বৌদি, অবিশ্যি এ ছাড়া আর কিছু যে আপনি বলতে পারবেন না তা জানতাম। কারণ মাপকাঠি আপনাদের কাছে একটাই আছে, আর সেটা নিজেদেরকে মাপতেই অভ্যস্ত।"

অতঃপর মুখ কালো করে উঠে গিয়েছিল শিবানী।

আর তার দিকে তাকিয়ে প্রাণতোষ আর একবার নিজের মনে ব্যঙ্গের হাসি হেসেছিল।

সত্যি বলতে—দাদা বৌদির দাম্পত্য জীবন দেখে দেখেই আরও প্রাণতোষের মেরুদণ্ড দৃঢ়তর হয়েছে। ছিঃ! এই কি জীবন! ছি! ছি! এরা কীট-পতঙ্গ পশু-পক্ষীর চাইতে কতটুকু উন্নত? খাওয়া ঘুমোনো ইত্যাদি গোটা কয়েক বিশেষ জৈব প্রয়োজন সাধন ছাড়া আর কোন লক্ষ্য আছে ওদের? কিছু না। চাহিদার শেষ কথা তো এইমাত্র নিজে মুখেই ব্যক্ত করে গেল শিবানী। কী লজ্জা! নাঃ! বিয়ে, বৌ, আর দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে যতই লোভ থাকুক প্রাণতোষের, সে লোভকে দমন করবার মত সংযমও তার আছে।

প্রাণতোষ মানুষের মত করে বাঁচতে চায়, দাদার মত করে নয়। আরও একবার হাসির একটা সূক্ষ্ম রেখা ফুটে উঠেছিল প্রাণতোষের মুখে। দৈবে সৈবে কোনদিন যদি শিবানী একখানা ভাল শাড়ি পরে কি একটু প্রসাধন করে, মনোতোষের মুখে কি হ্যাংলা হাসিই ফুটে ওঠে! আর কালে-কস্মিনে সংসারের জুতো সেলাই চণ্ডীপাঠ সব সেরে ছেলেগুলোকে ঘুম পাড়িয়ে শিবানী যদি রাত্ত নটার শোতে মনোতোষের সঙ্গে সিনেমায় যায় তো কেমন কৃতার্থমন্যের ভাব ফুটে ওঠে শিবানীর মুখে চোখে! সে সময়, মানে ঘন্টি-ঠুন-ঠুন রিকশা গাড়িখানার ওপর চড়ে বসার সময় যেন মহিমময়ী মহারাণীর ভঙ্গী তার!

দেখলে করুণা হয়, ঘৃণা হয়।

ক-বছরেরই বা বড় মনোতোষ প্রাণতোষের চাইতে, তবু যেন বুড়োর বেহদ্দ। আর হবে না-ই বা কেন, দাদার ছেলেটাই তো ক্লাস ফাইভে উঠে পড়ল। কোন-কালে বিয়ে হয়েছে, যৌবন শব্দটার মানেই বেচারারা জানল না কোনদিন।

জানে খালি চাল ডাল মাছ আলুর দর কষতে, আর যা পেলাম তাতেই কৃতার্থ হয়ে থাকতে।

মাঝে মাঝে আবার মাঝ রাত্রে শিবানীর ঘরে ধূপ জ্বলে। যে ঘরের মধ্যে আধখানা মেঝে জুড়ে ময়লা বিছানা বিছিয়ে তিনটে ছেলে ঘুমিয়ে আছে। ধূপের গন্ধে গা ঘিন ঘিন করে ওঠে প্রাণতোষের। একদিন তো স্পষ্টাস্পষ্টি মুখের ওপর হেসেই উঠেছিল প্রাণতোষ, সকালবেলায় দাদা বৌদির ঘরে তাদের বিয়ের রাতে তোলা টোপর চেলিআঁটা যুগল ফটোর গায়ে একগাছা রজনীগন্ধার মালা দুলতে দেখে। উঁচু দেয়ালে টাঙানো ধোঁয়া ধোঁয়া ছবিখানার দিকে দৃষ্টি পড়বার কথা নয়, পড়েও না কোনদিন, সেদিন ওই রজনীগন্ধার গন্ধটাই বুঝি দৃষ্টিকে হাত ধরে ডেকে নিয়েছিল, আর দেখে প্রাণতোষ না হেসে কিছুতেই পারে নি। শিবানীর হাত থেকে চায়ের পেয়ালাটা নিতে নিতে হেসে বলেছিল, "ব্যাপার কি বৌদি, ওটা আবার কি বস্তু?"

প্রাণতোষের হাসির ধরণটাই কেমন যেন 'বিশ্ব নস্যাৎ করা'। তাই শিবানীর মুখে লজ্জার বদলে রাগের অভিব্যক্তিই প্রকাশ পেয়েছিল। সে গম্ভীর মুখে বলেছিল—"দেখতেই তো পাচ্ছ, মালা!"

"আহা, তা তো পাচ্ছিই, কিন্তু হঠাৎ? বিবাহ বার্ষিকী-টার্ষিকী নয় তো?"

"ধরে নাও তাই। আরশোলারও মাঝে মাঝে পাখী হতে ইচ্ছে যায় বৈ কি ঠাকুরপো"—বলে ঘর থেকে চলে গিয়েছিল শিবানী। আর প্রাণতোষ মনে মনে হেসে বলেছিল—'আরশোলাই বা কোথা? বরং বল যে 'গুব্‌রে পোকা।'

হাসির মধ্যে সেদিন দুঃখও হয়েছিল প্রাণতোষের, এরাই তার নিকটতম আত্মীয় বলে। কী ক্ষুদ্র এরা, কী ক্ষুদ্র! আর সবচেয়ে শোচনীয় যে, সেই ক্ষুদ্রত্ব সম্বন্ধে কোন বোধই নেই এদের।

ক্লাস ফাইভে পড়া ছেলেটা সন্ধ্যাবেলা যখন দুলে দুলে পড়া মুখস্থ করে আর মনোতোষ একখানি মাদুর পেতে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে চোখ বুজে বুজেই ওর পড়ার ভুল ধরে, আর মানে বলে দেয়, নির্ঘাৎ তখন মনোতোষ রঙিন আশার স্বপ্ন দেখে যে, ছেলেটা কোন রকমে ম্যাট্রিক পাশ করে ফেলে একটা চাকরী-বাকরীতে ঢুকে পড়লেই মনোতোষের সকল দুঃখের লাঘব হবে। আর তার পরই যা হয়ে থাকে, ছেলের বিয়ে! শিবানী তো একদিন বলেই ফেলেছিল, "বাবা! বাবা! খোকা রে! কবে যে তোর বৌ এসে সকালবেলা ভাতের হাঁড়িটা চড়াবে, আর আমি ঘুম থেকে উঠে আর একবার পাশ ফিরে শোব, সেই আশায় দিন গুণছি।"

এই আশা! এই আশায় দিন গুণছে।

অবস্থার উন্নতির আশাটুকু করবারও ক্ষমতা নেই! ছি! ছি!

প্রাণতোষের মনের গড়ন আলাদা।

তার ন্যূনতম চাহিদা হচ্ছে—অন্ততঃ ছবির মত সাজানো গোছানো ছোট-খাটো একটি বাড়ি, অন্ততঃ একখানা টু-সীটার গাড়ি, অন্ততঃ জনাতিনেক চাকর-বাকর, অন্ততঃ স্ত্রীকে মাসে দু-চারখানা দামী শাড়ি কিনে দেবার এবং বছরে একবার দামী টিকিটে এখান ওখান বেড়িয়ে আনবার সামর্থ্য।

"অন্ততঃ এটুকু না হলে বিয়ে করা চলে না।"

বলেছিল প্রাণতোষ বন্ধু জগদীশের কাছে।

"সত্যি ভাই যা বললে—" বলেছিল জগদীশ, "তোমার 'অন্ততঃ'গুলো ভারি হৃদয়গ্রাহী। আমরা অন্ততঃ অহরহই এগুলোব অভাব অনুভব করে থাকি, কিন্তু কথা হচ্ছে—"

"এর মধ্যে আর কিন্তু নেই জগদীশ, এ একেবারে কিন্তুবিহীন শেষ কথা।"

"তবুও যাই বল, কিন্তু—" কুটিল হাসি হেসে জগদীশ বলেছিল—"তোমার অন্তর পুরুষটিকে তো ঠিক ব্রহ্মচারী বলে মনে হয় না, অত অপেক্ষা সইবে তো?"

প্রাণতোষ আত্মস্থের হাসি হেসেছিল—"আমার অন্তরপুরুষ হচ্ছে 'পুরুষ সিংহ' বুঝলে হে। আমার ওই কথা, আগে রাজ্যপাট, তবে রাণী।"

তা খুব মিথ্যে অহঙ্কার করে নি প্রাণতোষ।

রাজ্যপাটের সাধনাতে উঠে পড়ে লেগেছে সে সেই তখন থেকে। আর সিদ্ধির দরজার সন্ধানও পেয়েছে।

আর পুরুষ-সিংহের অহঙ্কারটা?

সেটাও মিথ্যে নয়। শিবানী যে লোভ শুনে হেসেছিল, সেই লোভটা যে প্রাণতোষের জীবনে চরম সত্য, এতে তো ভুল নেই। তবু সেই লোভকে দাবড়ানি দিয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা করে রেখেছে তার অন্তরের ওই পুরুষ সিংহটিই তো! সে লোভ ভিতরে ভিতরে দুঃসহ জ্বালা ধরিয়েছে, কাঁটার চাবুক মেরে মেরে পাগল করে তোলবার চেষ্টা করেছে, তবু হার মানে নি প্রাণতোষ। চরম যন্ত্রণার মুহূর্তে স্মরণ করেছে সেই পুরুষ সিংহটিকে।

নইলে রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে যখন জোড়ায় জোড়ায় তরুণ-তরুণী গায়ের কাছ দিয়ে হাসতে হাসতে আর কথা বলতে বলতে যেন হাওয়ায় ভেসে চলে যায়—

রুমালের 'সেণ্ট' আর খোঁপার বেলফুলের গন্ধের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের হৃদয়-রহস্যকেও ছড়িয়ে দিয়ে, তখন প্রাণতোষের সমস্ত প্রাণটাও কি ওদের সঙ্গে সঙ্গে অভিসারে যেতে চায় না? যখন এই শহর কলকাতার উন্মত্ত কলকোলাহলের মাঝখানেও এতটুকু নিভৃতে কোন প্রেমিক-যুগলের কলগুঞ্জনরত মূর্তি চোখে পড়ে, তখন প্রাণ-তোষের প্রাণটা কি অসীম শূন্যতায় হাহাকার করে ওঠে না? আর তখনও—যখন ওর সেই খোলামেলা ছাদের ঘরেও হঠাৎ কোন রাতে দম বন্ধ হয়ে আসা অনু-ভূতিতে ঘুম আসে নি, তখন ছাদে পায়চারি করতে করতে সহসা আল্সের ধারে দাঁড়িয়ে পড়ে প্রাণতোষ কি পাথরের পুতুলের মত স্তব্ধ হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয় নি অগ্নিগোলক দুটো চক্ষু নিয়ে?

আশ-পাশের বাড়িগুলো সবই তো প্রায় একতলা দোতলা। তাছাড়া মধ্য-রাত্রির অসতর্কতায় কে-ই বা খেয়াল করবে এই নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে কোথা-কার কোন তিন-তলার ছাদে দুটো অগ্নিগোলক জ্বলে জ্বলে নিজেকেই পুড়িয়ে ছাই করছে!

হ্যাঁ, অহঙ্কার করা তার সাজে। নিজেকে পুড়িয়ে ছাই করেছে প্রাণতোষ, তবু হার মানে নি। পায়ে মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢেলে আবার ঘুমের আরাধনা করে করে শেষ রাতে স্বপ্ন দেখেছে—দামী স্যুট, দামী সিগারেট, অবহেলায় নোটের গোছা উড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গী, সাজানো বাড়ি, সুন্দর গাড়ি, সুসজ্জিতা স্ত্রী। শুধু সুসজ্জিতা কেন, সুন্দরীও।

সুন্দরী স্ত্রী আহরণ করবার উপযুক্ত রেস্ত হাতে নিয়ে তবে তো স্ত্রীর কথা। হ্যাঁ সেই স্ত্রীকে পাশে নিয়ে উধাও হয়ে ছুটেছে প্রাণতোষ পথচারীদের গায়ে গাড়ির চাকার কাদা ছিটিয়ে, এ না হলে স্বপ্ন!

উপকরণহীন ভোগ?

ছিঃ!

পশুদের সঙ্গে প্রভেদ কোথায় তাহলে?

বাঁচতে হয়তো মানুষের মত ভোগ করতে হবে। দাঁতে ঠোঁট চেপে এখন শুধু টাকার সাধনা! তা সে সাধনা ব্যর্থ হয় নি প্রাণতোষের। ধীরে ধীরে স্বপ্নকে সত্যের রূপ দিয়েছে সে। হয়তো বা তারও বেশি। অন্ততঃ ওর সেই "অন্ততঃ"কে ছাপিয়ে উঠেছে ওর কৃতিত্বের জৌলুস। সরে গিয়েছে প্রাণতোষ পুরনো কেন্দ্র, পুরনো পরিবেশ থেকে। মনোতোষকে দেখলে এখন আর প্রাণতোষ চিনতে

পারবে কি না সন্দেহ, মনোতোষও হয়তো ভাইকে চিনতে ভয় পাবে।

এ ছাড়া উপায়ও ছিল না।

মায়ার গণ্ডির মধ্যে পাক খেলে, আর যাই হোক জীবনে উন্নতি হয় না।

এবার বিয়ে করা চলে।

হ্যাঁ, এবার বিয়ে না করলে চলছে না।

প্রাণতোষ এবার যেন মৃগয়ান্তে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "এবার চড়াও মাংস।" অবিশ্যি ভাষাটা একটু অন্য, বলল, "এবার খোঁজ পাত্রী।"

জন্মসূত্রে পাওয়া আত্মীয়দের থেকে দূরে সরে এলেও অর্থসূত্রে পাওয়া আত্মীয়ের অপ্রতুল ছিল না। তারা বলল—"আজ্ঞে কি যে বলেন! আপনার জন্যে পাত্রী খুঁজতে হবে? কতজনা এসে মেয়ে নিয়ে ধর্ণা দেবে।"

প্রাণতোষ কথাটা মেনে নিয়ে সহাস্যে বলল—"আহা, তবু পাত্রীর বাজারে একবার খবরটা পৌঁছনোও তো দরকার?"

"আজ্ঞে স্যার, সে ধরুন পৌঁছেই গেছে, আপনি যখন ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন।" বলল, প্রাণতোষের ডান-হাত হরিপদ গুঁই। আর হরিপদর কথা প্রমাণিত হতেও দেরি হল না। মেয়ে নিয়ে ধর্ণা দিতে এল অনেক মেয়ের বাপ। মেয়ের বিয়ের আশায় হাল ছেড়ে দেওয়া বাপ, শিক্ষিতা মেয়ের বাপ, শিক্ষিকা মেয়ের বাপ।

কিন্তু তার মধ্যে একটা মেয়েও কি প্রাণতোষের প্রাণতোষণের উপযুক্ত? প্রাণতোষের আযৌবন ধ্যানের সঙ্গে সামান্যতমও মিল আছে, এমন একটা মেয়েও যে মেলে না।

'চোখে কেন লাগছে না কো নেশা'—

প্রাণতোষ বলল—"হরিপদ ওদের ভাগাও, আর সহ্য হচ্ছে না। এতটুকু চোখে ধরে এমন একটাও মেয়ে দেখলাম না এ পর্যন্ত, ব্যাপার কি বল তো?"

হরিপদ মাথা চুলকে বলল—"আজ্ঞে তাই তো ভাবছি।"

"ভেবে তো সবই করবে! কাগজে বিজ্ঞাপন দাও।"

"তাই তো! তাই বটে! বেশ কথা মনে করলেন স্যার—" দাঁতে জিভ কাটল হরিপদ, এ পরামর্শ সে দিতে ভুলে গেছে বলে।

পরের সপ্তাহেই ইংরিজি বাংলা সমস্ত দৈনিক কাগজের 'পাত্র-পাত্রী' বিভাগে প্রাণতোষের রূপ গুণ বয়স বিদ্যাবত্তা অর্থ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির বিশদ বর্ণনার সঙ্গে "সুন্দরী শিক্ষিতা সংস্কৃতি-সম্পন্না বয়স্থা" পাত্রীর জন্য ফটোসহ আবেদনের নির্দেশ ছাপা হল।

হরিপদ দাঁত বার করে বলল, "দেখে নেবেন স্যার, দরখাস্তয় বাড়ি ভরে যাবে।"

তা হরিপদ খুব ভুলও বলে নি, দরখাস্তয় বাড়ি না হোক, টেবিল ভরে উঠতে লাগল। প্রতিদিন এ এক অদ্ভুত কাজ হয়েছে প্রাণতোষের। সেই প্রার্থিনীর স্তূপ থেকে পাত্রী অনুসন্ধান। প্রথম কদিন ভারি উন্মাদনা বোধ হয়েছিল, কিন্তু ক্রমাগত হতাশায় হতাশায় কেমন যেন ক্ষিপ্ত ভাব এসে যাচ্ছে।

টেবিল জুড়ে, ড্রয়ার ভরে নানান বয়সের, নানান মাপের, নানান চেহারার পাত্রী যেন প্রাণতোষের কৃপার আশায় মৌন আবেদনে চেয়ে থাকে আর প্রাণতোষ অধীর অসন্তোষে নতুন আবেদনের আবরণ উন্মোচন করে চলে। কিন্তু এ কি? ভাল মেয়েরা কি যুক্তি করে বাংলাদেশ থেকে হারিয়ে গেছে? কোথায় সেই অ-ধরা রূপসী, যে মেয়ে পাত্রী নয় "কনে?" যে প্রার্থিনী হবে না, হতে পারবে বিজয়িনী?

কোথায়? কোথায় সেই লাবণ্যে ঢল-ঢল স্বাস্থ্য, জ্বল-জ্বল মুখ? কোথায় সেই মদির স্বপ্নময় চোখ? যে মুখ দেখে প্রাণতোষের আহ্লাদে চোখে জল এসে যাবে, যে চোখ দেখলে প্রাণতোষের প্রাণ আছড়ে মরতে চাইবে।

প্রাণতোষ চিরকাল ভেবে এসেছে লাবণ্যের খনি তো ঘরের পাশেই আছে, ওর জন্যে ভাববার কি আছে? সময় হলেই ফিরে তাকালে হবে। অভিযান চাই স্বর্ণখনির উদ্দেশে। কিন্তু স্বর্ণমৃগয়া শেষ করে ঘরের দিকে চোখ ফিরিয়ে এখন আর লাবণ্য-খনির সন্ধান পাচ্ছে না। হিসেবে যেন গরমিল হয়ে যাচ্ছে। এটা কি হচ্ছে?

কিন্তু আর যে সবুরও সইছে না।

যতক্ষণ রান্না হতে দেরি থাকে সবুর সয়, ভাত বাড়তে দেরি হলে সবুর সয় না।

আজকের ডাকে-আসা দরখাস্তগুলোর 'কভার' ছিঁড়ে ছিঁড়ে এক পাশে ঠেলে রাখতে রাখতে প্রাণতোষ হতাশ ভাবে বলে, "ব্যাপারটা যথার্থ কি বল তো হরিপদ! বাংলাদেশটা কি শুধু পেঁচা আর হাড়গিলের রাজ্য হয়ে উঠল?"

"আজ্ঞে, কি বলছেন স্যার?" অবহিত হয়ে প্রশ্ন করল হরিপদ।

"বলছি ফটোগুলো দেখে যাচ্ছ? আশ্চর্য! একটা ছবিও কি চলনসই পর্যন্ত হতে নেই? শ্রী নেই, লাবণ্য নেই, এ সব কি মেয়ে?"

হরিপদ উঁকি মেরে দেখল।

প্রাণতোষের আক্ষেপ মিথ্যে নয়। অনেকগুলো ছবি ছড়ানো রয়েছে টেবিলের

ওপর। রোগা, রগটেপা, গাল-বসা, ক্লিষ্ট-ক্লান্ত, কোল কুঁজো, আবার মোটা হাতী, গাল-ফুলো, চোখ-পিটপিটে, অথবা পেন্ট্ লিপ্স্টিক আর আঁকা ভুরু কাজলে ভাবশূন্য পুতুল-মুখ, নানা রকমের নানা বয়সের নানা ভঙ্গীর মেয়ে। হরিপদর পছন্দ লাগে এমন মেয়েও নেই। তবু হরিপদ মাথাটা চুলকে বলল, "আজ্ঞে স্যার, সুবিধে-মতন তো দেখছি না, কিন্তু এ যাবৎ দেখাও তো হল ঢের, তাই বলছিলাম কি ওর মধ্যে থেকেই যদি বেছে-গুছে একজনাকে সিলেক্টো করে ফেলেন—"

"ওর মধ্যে থেকে ?" বাঘের মত গর্জন করে ওঠে প্রাণতোষ, "ওর মধ্যে থেকেই সিলেক্ট করতে হবে ? তোমরা কি বলতে চাও হরিপদ, গাঙ্গুলী কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রাণতোষ গাঙ্গুলীর বিয়ে করবার সাধ জাগলে, ওর চাইতে ভাল পাত্রীর আশা করা চলবে না ?"

"আজ্ঞে—আজ্ঞে সে কি সে কি ?" আধ-হাত জিভ বার করে ফেলে হরিপদ। ফের মাথা চুলকে বলে, "সবই দৈবের বিড়ম্বনা স্যার, মিলছে না যখন ! তাছাড়া —স্যার আমাদের বায়নাটাও যে অনেক স্যার ! শিক্ষিতা সংস্কৃতি-সম্পন্না ইয়ে—' অনেক কিছু চাহিদা থাকায়—"

প্রাণতোষ খানিকক্ষণ গুম্ হয়ে থেকে, হঠাৎ কেশর-ফোলানো সিংহের ভঙ্গীতে মাথা উঁচু করে ঘাড় বাঁকিয়ে বলে, "আচ্ছা ঠিক আছে। এবার অন্যভাবে বিজ্ঞাপন দাও, ও সব কিছু লেখবার দরকার নেই, লেখ 'কেবলমাত্র প্রকৃত সুন্দরী ব্যয়স্থা পাত্রী আবশ্যক। পাত্রীপক্ষ পাত্রীর অভিভাবককে নগদ পাঁচ হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত'।"

হরিপদ চমকে বলল—"কি বললেন স্যার ?"

প্রাণতোষ অন্যমনস্কভাবে—একখানা ফটোর মুখের ওপর কালির আঁচড় টানতে টানতে নির্লিপ্ত স্বরে বলে, "ওই তো বললাম, প্রকৃত সুন্দরী পেলে পাত্র-পক্ষ পাত্রীর পিতাকে পাঁচ হাজার টাকা যৌতুক দিতে প্রস্তুত।"

হরিপদর চোখে একবার যেন এক টুকরো বিদ্যুৎ খেলে গেল, কিন্তু মুখখানা সে যথাসম্ভব কাঁচু-মাচু করে বলল, "সেটা কি ঠিক হবে স্যার ?"

"কেন ?"

আরও নির্লিপ্ত হচ্ছে প্রাণতোষ। আরও কায়দায় নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে স্প্রীঙের গদি-আঁটা চেয়ারের কোলে।

হরিপদ আর একবার মাথা চুলকাল, "তাতে ও-পক্ষ অন্য রকম সন্দেহ করতে পারে স্যার।"

"সন্দেহ! সন্দেহ মানে? কিসের সন্দেহ?"

কায়দা ছেড়ে সোজা হয়ে বসল প্রাণতোষ।

"মানে আর কি—ওরা ভাবতে পারে পাত্র-পক্ষের আবার যৌতুক দেওয়ার গরজ কেন? মানে আর কি, বুঝতেই তো পারছেন স্যার, এটা উল্‌টো হয়ে যাচ্ছে কিনা! পণ বলুন, যৌতুক বলুন, আমাদের বাঙালী সমাজে সবই কন্যা-পক্ষের দেয়, কাজে কাজেই ধরুন না কেন, তারা মনে করতে পারে পাত্তরের কিছু খুঁৎ আছে, নইলে—"

"বটে!"

প্রাণতোষ আর একটু চুপচাপ বসে থেকে ঝাঁজালো গলায় বলল, "হুঁ, তাহলে তুমি কি বলতে চাও একটা শাঁকচুন্নি কি ঢাকাই জালাকেই বিয়ে করে ফেলি?"

"আ ছি ছি! সে কি কথা স্যার। তবে বলছিলাম কি—"

"ভনিতা রেখে স্পষ্ট বল—" প্রাণতোষ প্রচণ্ড ধমকে উঠল, "মনে হচ্ছে তুমি যেন মজা দেখছ! তোমার মনের কথাটা খুলে বলবে?"

হরিপদ চোখ মিটমিটিয়ে বলল, "আজ্ঞে মনের কথা-টথা কিছু নয়, তবে কথা হচ্ছে প্রকৃত সুন্দরী মেয়ে পাওয়া একটু দুর্ঘট বটে।"

"কেন বল দেখি? বাংলাদেশের এত দুর্দশা কবে থেকে হল? হাজারটা মেয়ে থেকে বাছাই করে একটা সুন্দরী মেয়ে জুটবে না?"

"আজ্ঞে ব্যাপারটা কি জানেন স্যার, জুটবে না কেন, জুটবে।—হাজারটাই জুটতে পারে। কিন্তু কথাটা যে আলাদা। ওই যে একটি প্যাঁচ কষে রেখেছি আমরা "বয়স্থা!" ওইখানেই স্যার খেয়ে দিয়েছে। মানে আপনাকে আর বোঝাব কি স্যার, সবই তো বোঝেন? সুন্দরী মেয়েরা আর "বয়স্থা" হতে যাবে কোন্ দুঃখে? তারা তো স্যার—ইয়ে—হট্ কেকের মত কোনকালে উঠেই গেছে বিয়ের বাজার থেকে—। ওই চালুনির নিচে ঝড়তি পড়তি যারা পড়ে থাকে, তারাই স্যার 'বয়স্থা' হতে থাকে। আর যদিও বা লেখাপড়ার ঝোঁকে দু-একটা রূপসী মেয়ে টিঁকে থাকে স্যার, তারা আর থাকে না।"

"থাকে না! থাকে না মানে?"

প্রাণতোষ যেন গর্জন করে ওঠে।

হরিপদ থতমত খেয়ে বলে, "মানে আর কি তারা আর রূপসী থাকে না স্যার, সেই কথাই বলছি। ওই কেমন যেন কোলকুঁজো মেরে বুড়িয়ে গুটিয়ে যায়। দেখছি কি না সর্বদাই। তাই বলছি—"

"কিছু বলতে হবে না, থাম তুমি।"

প্রাণতোষ বিরক্তিতে চোখমুখ কুঁচকে আরও যে কটা দরখাস্ত বাকি ছিল থাম ছিঁড়ে ছিঁড়ে টেনে টেনে বার করতে থাকে। এখুনি একটা লাবণ্য-ভরা দৃপ্ত মুখ ঝলসে ওঠে, তো ব্যাটাচ্ছেলে হরিপদ গুঁইয়ের মুখের মত জবাব হয়।

কিন্তু কোথায়?

কোথায় সেই জবাব?

ফটোগুলো ফ্যাস্ ফ্যাস্ করে ছিঁড়ে ফেলে দেবার দুরন্ত ইচ্ছে কষ্টে সংবরণ করতে হয়।

কিন্তু রাণী চাইই চাই। রাণী।

শূন্য রাজ্যপাটের মাঝখানে আর টিকতে পারছে না প্রাণতোষ।

"আচ্ছা তুমি এখন যাও—" বলে নিজেই চেয়ার ঠেলে উঠতে গেল প্রাণতোষ, হাঁটুটা ককিয়ে উঠল। কদিন বেশ একটা যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে—হাঁটুটার মধ্যে। বললে, "থাম, যাবার সময় ডাক্তার নন্দীকে একবার কল দিয়ে যেও দিকি—। হাঁটুটা দেখানো দরকার।"

"যে আজ্ঞে"—বলে চলে গেল হরিপদ। আজ আর বিজ্ঞের মত বলতে গেল না, "আমার বিশ্বাস স্যার, এটা গেঁটে বাতের পূর্বলক্ষণ—"। সেদিন বলে মার খেতে খেতে রয়ে গিছলো।

একটু পরেই কিন্তু যে এল সে ডাক্তার নয়। যে এল সে একেবারে অপ্রত্যাশিত। এল মনোতোষ।

প্রাণতোষের লেক প্লেসের বাড়িতে মনোতোষের এই প্রথম পদার্পণ।

দাদা!

অবাক হল প্রাণতোষ, হয়তো বা একটু লজ্জিতও।

সম্পর্কে রাখবার গরজ প্রাণতোষ কোনদিন অনুভব করে নি, অথচ মনোতোষ আজ নিজেই এল।

মনোতোষের মুখে কিন্তু সে অভিমানের চিহ্নমাত্র নেই।

কাঁচাপাকা চুলের নিচে বয়সের রেখাঙ্কিত মুখটা যেন খুশিতে জ্বল জ্বল করছে।

"তারপর ভাল আছ তো? আসাটাসা হয়ে ওঠে না ভাই, নানান ঝামেলা জানই তো? তার ওপর তোমার বৌদির সাধে ইচ্ছে করেই আর এক ঝামেলা বাধাচ্ছি—" ছোটখাটো এই ভূমিকাটুকু করে মনোতোষ সন্তর্পণে পকেট থেকে

একখানি হলদে কাগজের নিমন্ত্রণ-পত্র বার করে। কুণ্ঠিত হাসি-হাসি মুখে বলে "তোমাকে আর পত্তর দিয়ে কি বলব, সে সব কিছু না, চিঠিটা দেখানোর জন্যেই দেওয়া, সামনের বুধবার খোকার বিয়ে, যেতে হবে, করা কর্মা—সবই করতে হবে বুঝলে তো ?" বড় হাসি হাসি ভরা মুখে তাকিয়ে থাকে মনোতোষ।

প্রাণতোষের প্রাণ থেকে কিন্তু এই হৃদয়োত্তাপের সাড়া ওঠে না, সে কেমন যেন অসাড় দৃষ্টি মেলে অবাক হয়ে বলে, "খোকার বিয়ে! আমাদের খোকার!"

"হ্যাঁ ভাই, দিয়েই ফেলছি। তোমার বৌদির সাধ! তাছাড়া—আমিও ভাবলাম একটা কর্তব্য তো বটে ও যত মিটিয়ে ফেলা যায় ততই মঙ্গল। চাকরি-বাকরি যাহোক একটা করছেও যখন।"

অনেকদিন আগের সেই কথাটা মনে পড়ল প্রাণতোষের।

সেই যখন ক্লাস ফাইভে পড়ত খোকা, মাদুরে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে শুয়ে পড়া বলে দিত মনোতোষ, আর প্রাণতোষ—ওদের দিকে চেয়ে ঘৃণার হাসি হেসে ভাবত—

কিন্তু আজ আর সেই ঘৃণাটা খুঁজে পেল না প্রাণতোষ। চিরদিনের অবজ্ঞাত—চিরদিনের হেয়, ক্ষুদ্রপ্রাণ দাদার ওই খোঁচা খোঁচা দাড়িসম্বলিত মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন ঈর্ষা বোধ করল—গাঙ্গুলী কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রাণতোষ গাঙ্গুলী। আর বোধ করি কি বলবে ভেবে না পেয়েই হঠাৎ একটা অবান্তর কথা বলে বসল, "দাড়ি কামাওনি কেন ?"

"দাড়ি।" গালে একবার হাতটা বুলিয়ে হেসে উঠল মনোতোষ, "আর দাড়ি কামানো। তোদের বৌদি কদিন থেকে যা নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে! উঃ! জগতে যেন আর কারুর ছেলের বিয়ে হয় না। কিন্তু যেতে হবে ভাই—" মনোতোষ যেন ভাইকে তুই বলবে কি তুমি বলবে বুঝে উঠতে পারছে না। তাই মনের ভুলে একবাব তুই বলে ফেলেই সন্তর্পণে 'তুই তুমি' বাঁচিয়ে কথা চালায়। "যেতে হবে করতে হবে, না বললে চলবে না। ।মনে থাকে যেন। তাহলে উঠি ? আরও অনেক জায়গায় যেতে হবে।"

মনোতোষ চলে যাবার পর প্রণেতোষ অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে চেষ্টা করল—মনোতোষ তার চাইতে ক-বছরের বড়।

চার ? পাঁচ ? তাব বেশি আর কোথা থেকে হবে, প্রাণতোষ যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে তখনই না দাদার বিয়ে হল ? তখন ? তবে কখন ? নাঃ, কিছুতেই আর হিসেব ঠিক হল না।

বিয়ের দিন যাওয়ার সময় হয় নি প্রাণতোষের, সেদিন সন্ধ্যায় কোম্পানীর একটা জরুরী মীটিং ছিল।

গেল ফুলশয্যার দিন, যেদিন বৌভাতের ভোজ।

স্যুট পরেই বয়েসটা কাটল।

তবু পোশাকী হিসেবে খানকতক শান্তিপুরী ধুতি আছে বাহান্ন ইঞ্চি ঝুল, আছে কড়া আদ্দি আর মোলায়েম গরদের কটা পাঞ্জাবী। কনে দেখতে যাবে বলে করিয়েছিল—সম্প্রতি আর দুটো।

পরিপাটি করে সেই ধুতি পাঞ্জাবী পরে নিল প্রাণতোষ। মাখল আতর।

হঠাৎ ভারি স্ফূর্তি আর কৌতূহল বোধ করছে, যেন বন্ধুর বিয়ের নেমন্তন্নে যাচ্ছে! কেন কে জানে!

সাড়ে তিন শো টাকা দিয়ে একটা নেকলেস কিনে নিল, দামী জুয়েলারের দোকান থেকে, খোকার জন্যে একটা আংটি কিনল এক শো তিরিশ টাকায়। গুছিয়ে গাছিয়ে গাড়িতে উঠল প্রাণতোষ।

টু-সীটারে নয়, প্রকাণ্ড স্টুডিবেকারে।

পৈত্রিক বাড়ির সেই গলির মধ্যে গাড়ি ঢুকল না, সাবধানে কোঁচা বাঁচিয়ে—পায়ে পায়ে ঢুকে পড়ল প্রাণতোষ বাড়ির মধ্যে। আর সহসা যেন বিয়ে বাড়ির সমস্ত হৈ চৈ মন্ত্রবলে ঠাণ্ডা হয়ে এল।

"প্রাণতোষ এসেছে, প্রাণতোষ।"

অস্ফুট সেই মন্ত্র-গুঞ্জরণ।

শুধু পিসতুতো ভাই কানাই সহাস্য-কলরবে এগিয়ে এল "আরে পানুদা যে! মনুদা, মনুদা, বৌদি,—পানুদা এসেছে। তারপর? বেশ আছ পানুদা, দিব্যি একখানা দেখিয়ে দিলে যা হোক।"

চিরদিনের বক্তা কানাই, স্বভাব বদলায় নি। চেহারাটাও যে বিশেষ বদলেছে তাও নয়। দেখা গেল কানাই-ই আপাতত কর্মকর্তা। লুঙ্গির ওপর গেঞ্জি পরে সে একেবারে হৈ চৈ করে বেড়াচ্ছে।

ওকে দেখে নিজেকে কেমন আড়ষ্ট লাগছে প্রাণতোষের।

কিন্তু আড়ষ্টতা নেই শিবানীর মধ্যে। সে এসে সস্নেহে আহ্বান জানাল—"এস ঠাকুরপো, বৌ দেখবে চল।"

কই কারও তো কোন অভিযোগ নেই প্রাণতোষের ওপর, যেন ও এসেছে, এই ঢের। কিন্তু প্রাণতোষের এত লজ্জা করছে কেন?

ভোজের আয়োজন পাশের প্রতিবেশীর বাড়িতে। বৌ বসানো হয়েছে তিন তলার ছাদে চাঁদোয়া টাঙিয়ে। বাড়িতে আর জায়গা কোথা? শিবানীর এই প্রথম কাজ, সাধ্যের অতিরিক্ত লোক জড়ো করেছে, মহিলার দল ছাদেই চাঁদের হাট বাজার বসিয়েছেন।

সিঁড়িতে উঠতে হাঁটুটা খচ্ খচ্ করছে, আস্তে আস্তে উঠতে হচ্ছে প্রাণতোষকে অথচ শিবানী অভ্যস্ত ভঙ্গীতে চটপট করে উঠছে কটা সিঁড়ি, আবার ভদ্রতা দেখাতে একটু দাঁড়াচ্ছে। কতদিন আগে বুড়ো হয়ে গিয়েছিল শিবানী, এখনও এই রকম সিঁড়ি ভাঙতে পারে?

"এই যে বৌমা মুখ তোল! তোমাদের কাকাবাবু। সেই যাঁর কথা গল্প করছিলাম—"

বৌয়ের মুখটা একটু তুলে ধরল শিবানী। আর—আর সেই মুহূর্তে প্রাণতোষ যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। এ কী! এ কে!

এই তো সেই মুখ—লাবণ্যে ঢল-ঢল, স্বাস্থ্যে জ্বল-জ্বল!

এই তো সেই চোখ! মদির স্বপ্নময়!

এই তো কনে!

এমনি একখানি কনেরই তো ধ্যান করে এসেছে প্রাণতোষ, সমস্ত বয়সটা ধরে! শিবানী এ 'কনে' কোথায় পেল?

এ রকম তো ভাবে নি প্রাণতোষ? যখন পৈত্রিক বাড়ির গলির মধ্যে এঁটো কলাপাতা আর ভাঙা গেলাস খুরির স্তূপ ডিঙিয়ে পা বাঁচিয়ে আসছিল, তখন ভেবেছিল 'যেমন দান তেমন দক্ষিণা! যেমন বিয়ে, তার তেমনি আলতা।' নির্ঘাৎ কালো-কোলো গোলগাল—চোখে কাজল একটা খুকি জুটিয়েছে শিবানী, খোকা ছেলের জন্যে।

কনে দেখে হঠাৎ মনে হল, শিবানী যেন এতদিন পরে প্রাণতোষের ব্যঙ্গের শোধ নিয়েছে।

কিন্তু শিবানীর মুখে শুধুই নির্মল খুশির আলো।

ঘাম-ঘাম তেল-তেল মুখ, সিঁদুরের টিপটা লম্বা হয়ে কপালে ছড়িয়ে পড়েছে, রগের কাছে ক-গাছা চুলে রূপোলি আভা, খস্-খসে একখানা নতুন গরদের শাড়ি জড়িয়ে-সড়িয়ে পরা, সেই আঁচলেই মুখের ঘাম মুছতে মুছতে উচ্ছ্বসিত প্রশ্ন করছে শিবানী—

"বৌমা পছন্দ হয়েছে তো ঠাকুরপো? আমি ভাই নাম করে ডাকব না,

বৌমাই বলব, আমার বৌমা বলার বড় সাধ। এখন বল দিকি আমার পছন্দকে নিন্দে করতে পারবে ?"

প্রাণতোষ এতক্ষণে যেন চৈতন্যের রাজ্যে এসে পৌঁছয়। তাড়াতাড়ি কেস সুদ্ধই গহনাটা নতুন বৌয়ের হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, "বেশ বৌ হয়েছে, বেশ বৌ হয়েছে। ইয়ে খোকার জন্যে একটা আংটি এনেছিলাম।"

"ওমা! কী কাণ্ড! আবার খোকার জন্যেও গয়না! তা সে কি আর এ মুল্লুকে আছে? বোধ হয় ও বাড়িতে পরিবেশন করছে। দাও, আমার কাছেই দাও।"

পরিবেশন! আ ছি ছি ছি!

গা টা গুলিয়ে উঠল প্রাণতোষের। জীবনের পরম কাব্য আর চরম সৌন্দর্যের দিনে ছ্যাঁচড়া আর ছোলার ডালের বালতি নিয়ে ছুটোছুটি!

ঠিক আছে! ঠিক আছে! আজও এদের অনায়াসেই করুণা করতে পারে প্রাণতোষ।

নিমন্ত্রিত মহিলাদের ভীড়কে পাশ কাটিয়ে ছাদের এদিকে আসতে গিয়েই কিন্তু আর একবার চমকে শুব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হল প্রাণতোষকে। এ আবার কি! এখানে এ পরীর রাজ্য তৈরি করল কে? এ কোন ঘর? সেই টালির ছাদ দেওয়া ঘরটা? বিদ্যুৎ বাতির ব্যবস্থাপনায় ঘরের মধ্যে উজ্জল জ্যোৎস্নার মত স্নিগ্ধ সুষমাময় আলো, জানলা-দরজায় হাল্‌কা নীল পাতলা ছিটের পর্দা, সামনের দেওয়ালে ড্রেসিং আয়নার ওপর থরে থরে প্রসাধন দ্রব্য সাজানো, মাঝখানে ধূপদানীতে ধূপ জ্বলছে। পাশের দেওয়াল ঘেঁষে শৌখিন বেডকভার বিছানো নতুন খাট-বিছানা, আর সমস্ত খাট আর খাটের ছত্রি ঘিরে শুধু ফুল আর ফুল, শুধু মালা আর মালা!

ফুলের গন্ধ ধূপের গন্ধ, আর এসেন্সের গন্ধ, সব মিলিয়ে ঘরটাও যেন নববধূর মত মৌন-প্রতীক্ষায় মন্থর!

'এই ঘরে নাকি?'

অস্ফুট একটা জিজ্ঞাসা যেন অশরীরী প্রেতের মত দগ্ধ নিশ্বাস ফেলল।

শিবানীর লক্ষ্য কম, সে বকে চলেছে, "হ্যাঁ ভাই! তোমার সেই ঘরটি। এই ঘরটুকু ছাড়া ছেলে বৌকে দেবার মত ঘর আর কই বাড়িতে? মেজেটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, বদলে নিলাম। এই খাট বিছানা খোকার শ্বশুর দিয়েছে, আর ওই ড্রেসিং আয়নাটা। আলমারি চেয়ার কিছু দিতে পারে নি, যাক্‌গে, আমিই বা রাখতাম কোথায়! তত্ত্ব কিন্তু দেদার ফুল দিয়েছে ভাই, খোকার বন্ধুরা এসে

সাজিয়ে দিয়ে গেল। কে বলবে সেই ঘর, চেনবার জো রাখে নি।"

হঠাৎ ভারি অবাক লাগল প্রাণতোষের। অবাক আর অরুচি। সেই একটা বাচ্চা ছেলের জন্যে ভোগের এই আবেশময় আয়োজন! এই পুষ্প আর পুষ্পসার সুরভিত ঘর, এই কুসুমাস্তীর্ণ যুগল শয্যা, অথচ দেখে লজ্জা করছে না এদের?

লজ্জা যেন প্রাণতোষেরই। ভয়ঙ্কর সেই লজ্জার তাড়নাতেই বুঝি তাড়াতাড়ি নিচের তলায় নেমে এল প্রাণতোষ, পায়ের ব্যথা ভুলে।

শিবানী অনেক দুঃখ করে বলল, "খোকার বিয়েতে তুমি খাবে না ঠাকুরপো? আমার বড় সাধ ছিল আজকের এই একটা দিন তোমাদের দুই ভাইকে একসঙ্গে বসিয়ে খাওয়াব।"

মনোতোষ বোধ হয় শিবানীর এই ধৃষ্টতায় লজ্জা পেল। তাড়াতাড়ি বলল—"না না, শরীর যখন ভাল নয় বলছে পীড়াপীড়ি কোর না। তুমি বরং একটু ভাল মিষ্টি গাড়িতে তুলিয়ে দাও।"

গাড়ি আছে বড় রাস্তায়,—গলিটা হেঁটে পার হতে হবে। সন্দেশের বাক্স নিয়ে ছুটে আসছে কানাই গাড়িতে তুলে দিতে। "শরীরটা একখুনি এত খারাপ করে ফেলেছ পানুদা যে, নেমন্তন্ন খেলে সয় না? আমার দেখছ? এখনও লোহা খেয়ে হজম করে। কে নন্তু? এই শোন শোন ইদিকে আয়! জ্যাঠামশাইকে প্রণাম কর। এইটি আমার বড় ছেলে পানুদা, গেল বছর আই-এস সি পাশ করেছিল, যাদবপুরে ভর্তি করে দিয়েছি।···মাঝে মাঝে দেখা হলে বেশ লাগে কিন্তু। তুমি তো আত্মীয়-স্বজনকে ত্যাগই করেছ—"। ছুটে চলে গেল কানাই। নন্তুও গেছে। গাড়ির কোণটায় নিজেকে নিক্ষেপ করে চোখটা বোজে প্রাণতোষ। আসার সময় নিজে বসেছিল চালকের সিটে, আর সে এনার্জি নেই।

"সিধে বাড়ি তো স্যার?"

ড্রাইভার ফুলচাঁদের প্রশ্নে "হুঁ" দিয়ে বসে রইল প্রাণতোষ দামী গাড়ির আরামদায়ক সিটের এক কোণে। ঘাড় হেলিয়ে নয়, কেমন যেন ঘাড় গুঁজে।

হাঁটুটায় অসম্ভব চিড়িক মারছে, ভারিও হয়ে উঠেছে। নামবার সময় ফুলচাঁদের সাহায্য নিতে হবে বোধ হয়। গোঁজা গোঁজা ঘাড়ের জন্যেই কি মুখটা অমন ঝোলা ঝোলা দেখাচ্ছে প্রাণতোষের? না ছেলেমানুষ খোকার ফুল বিছানো দাম্পত্য শয্যার লজ্জায় মুখটা তার অমন ঝুলে পড়েছে?

কলেজের বার্ষিক-উৎসবে উদ্বোধন সঙ্গীত গাইতে হবে বিলুকে। বিলু প্রায় অনশন ধর্মঘট করে মায়ের কাছ থেকে একটা শাড়ি, আর শাড়ি পরে উৎসবে যাবার অনুমতি, আদায় করে নিল।

না, না, কিছুতেই না।

কিছুতেই আজ বিলু ফ্রক পরে কলেজ যাবে না।

ফ্রক পরতে বিলুর বিশ্রী লাগে—ঘেন্না করে। ওদের কলেজে আবার সহ-শিক্ষার পদ্ধতি। সহপাঠিনী আর সহপাঠিদের সামনে ফ্রক পরে গিয়ে দাঁড়াতে নিজের দেহটা নিয়ে যেন অস্বস্তির শেষ থাকে না বিলুর। হাঁটুর নিচে থেকে পা দুখানাকে যেন কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না, কাঁধ দুটো কী এক কুণ্ঠায় ডানা গুটিয়ে থাকতে চায়, আর 'টাইট জামার' শাসন ব্যর্থ করা উদ্ধত বুকটাকে বিলু বুঝি হৃদয়-কোটরে আশ্রয় দিতে পারলেই বাঁচে। ক্লাসে বসে ফ্রকের ধারিটা টেনে টেনে হাঁটু দুটো ঢাকবার ব্যর্থ চেষ্টাতে সময়ই কি কম যায়?

অথচ কী সুন্দর কী অনুপম কী মনোলোভা জিনিস ওই শাড়ি। নিজেকে ওর মধ্যে ভরে ফেলতে পারলে কোথাও কোনখানে বুঝি আর কুণ্ঠার বালাই থাকে না।

তাছাড়া শাড়ির সৌন্দর্য!

ওর কি আর তুলনা আছে?

সিল্ক শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে কী পেলব কমনীয়তা, বেনারসীর পাড়ে আঁচলায় কী রাজকীয় ঐশ্বর্য! টিস্যু জামদানী-ঢাকাইতে কেমন পোশাকী পোশাকী আবেশ, মাইশোর জর্জেট শিফনে যেন লঘুপক্ষ বিহঙ্গের উড়ন্ত ভঙ্গিমা, আর সাদা ধব্‌ধবে মিহি তাঁতের শাড়ির তো কথাই নেই। পরলে নিশ্চয়ই নিজেকে পরম পবিত্র পূজারিণীর মত লাগে। অন্ততঃ বিলুর তাই ধারণা।

এই সমস্ত রকম শাড়িই বিলুর মার আছে, আছে বড়দির, মেজদির। সম্প্রতি সেজদির স্টকও বাড়তে শুরু করেছে। আর বিলুর? আলমারির একটা তাক ভর্তি শুধু ফ্রক। এগুল পরে শেষ করতে যে বিলুর পঞ্চাশ বছর লেগে যাবে তাতে আর সন্দেহ কি? হয়তো ততদিনে আরও জোগানো হবে। কারণ শাড়িতে এখনও অধিকার জন্মায় নি বিলুর। "বাচ্চা মেয়েদের" শাড়ি পরায় বিলুর মার কড়া আপত্তি।

দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী বিলু আজও তার মার কাছে 'বাচ্চা'ত্বের সীমানা থেকে প্রমোশন পায় নি। কেনই বা পাবে? বিলুর সেজদিই যে এখনও প্রায়

তাই। এই সেদিন মাত্র শাড়ি ধরবার অনুমতি পেয়েছে সে।

আজ বিলুর নিতান্ত নির্বেদ দেখে ওর বড়দির দয়া হল। সে গিয়ে মার কাছে ওকালতি—করল। "তোমারও মা অন্যায় জেদ। ছেলেমানুষ, একদিন ইচ্ছে হয়েছে, পরুকই না।"

মা গম্ভীর মুখে বললেন, "ছেলেমানুষ বলেই তো! ছেলেমানুষের এমন পাকামি ইচ্ছেই বা হয় কেন? এ বয়সে হাসবে খেলবে ছুটবে, ফ্রক পরায় স্বচ্ছন্দতা কত! তা নয় জবড়জঙের মত শাড়ি জড়িয়ে—! ছিঃ! আমায় যদি কেউ অনুমতি দেয় তো আমি শাড়ি ছেড়ে ফ্রক পরতে পারি। পরে বাঁচি।"

বলতে গিয়ে হঠাৎ মায়ের গম্ভীর মুখের রেখায় এক ছিটে হাসি উঁকি দিয়ে বসল, হয়তো সেই অপরূপ মূর্তি কল্পনা করে। আর সেই দুর্বলতাটুকুর অবসরে হেসে উঠল নীলু। বলল "স্বচ্ছন্দে মা স্বচ্ছন্দে! আমরা এ প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি—"

মা আবার গম্ভীর হলেন, "তুমি বুঝছ না নীলু, বিলুর এ একদিনের শখ নয়, অনেকদিন থেকেই শাড়ি ধরবার জন্যে ও একেবারে অস্থির। কেন? মনের মধ্যে কতকগুলো পাকামির উদয় হলেই এই রকম শখের ভূত ঘাড়ে চাপে। একদিন শাড়ি ছুঁতে দিলেই ও নিশ্চয় রোজ বায়না নেবে।"

নীলুর মন থেকে বিলুর বয়সের স্মৃতি হয়তো অনেক দিন মুছে গেছে, তাই ও কেবলমাত্র অনুকম্পার দৃষ্টিতেই দেখছে বিলুকে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই বলে, "তোমার যেমন দুশ্চিন্তা! হাঁটতে গিয়ে যখন পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাবে, তখন নিজে থেকেই বলবে, 'ছেড়ে দে বাবা কেঁদে বাঁচি।' ও সব কিছু না, আজ একটা ফাংশন রয়েছে,—একটু নতুনত্ব করতে ইচ্ছে হচ্ছে, এই আর কি।"

"বেশ পরুক! কিন্তু বিলু, মনে রেখ—মাত্র এই একদিন! রোজ রোজ এ রকম বায়না নেওয়া চলবে না।"

আলমারি খুলে নিজের শাড়ির ভাণ্ডার থেকে একখানা শাড়ি বেছে নিতে অনুমতি দিলেন বিলু-জননী।

আর বিলুকে পায় কে।

হাল্‌কা কমলা রঙের সিল্কের শাড়ি একখানা বেছে নিল সে। আর শাড়িখানা গালে ঘসে, হাত বুলিয়ে বুলিয়ে অনুভব করে নিয়ে খুশিতে উপ্‌ছে পড়ে সাজতে বসল। অবশ্য উপদেষ্টার পদটা বড়দিই নিল। সুন্দর একটা ব্লাউজও ধার দিল।

গুছিয়ে পরে নেওয়ার পর পিঠের আঁচলটা কাঁধের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিজেই বড়দি হেসে বলে, "এই বোকা মেয়ে, বুড়িদের মত জড়ভরত হচ্ছিস কেন? আঁচলটা টাইট করে কোমরে জড়িয়ে নে?"

বিলু প্রতিবাদ করে ওঠে, "না, না, কেন? এই তো বেশ।"

যেন এতদিনের নিরাবরণতার প্রতিকার একদিনেই করতে চায় বিলু।

সাজ-সমাপনান্তে আর্শির সামনে দাঁড়িয়ে আনন্দে প্রায় চোখে জল এসে গেল বিলুর। এত সুন্দর দেখতে সে? এত সুন্দর! মুখের দু-পাশে লম্বা লম্বা দুটো বেণী ঝোলানোর পরিবর্তে আলগা করে এলো-খোঁপা বাঁধলে যে মুখের গড়ন এমন অপূর্ব হয়ে ওঠে, তাই বা কবে জেনেছে বিলু?

"বড়দি-ঈ-ঈ!"

বিলু যেন শীস দিয়ে ওঠে, "কেমন দেখাচ্ছে?"

"বাঃ, এ তো খাসা দেখাচ্ছে বে। ও-মা, খোঁপাও বেঁধেছিস যে? শিখলি কোথায়?"

"এমনি! নিজে নিজে! আয়নার ওপর তোমার, মেজদির, সেজদির যতগুলো কাঁটা ছিল সবগুলো চুলে গুঁজে নিয়েছি।"

"বেশ করেছিস!" নীলু হেসে উঠে হাঁক দেয়, "ও-মা দেখ দেখ, তোমার ছোট মেয়েটি আজ একেবারে দস্তুর-মত একটি মহিলা! তুমি বলছিলে শাড়ি পরে ঠিক আছাড় খাবে। দেখ একবার ধরণটি! নিজে নিজে খোঁপা পর্যন্ত বানিয়ে ফেলেছে।"

সতেরো বছরে বিলুর নিজে নিজে খোঁপা-বানানোর বাহাদুরিতে হেসে কুটি কুটি হয়—পুরু লেন্সের চশমা-পরা, ব্রণবিক্ষত গণ্ড, কোল-কুঁজো নীলু। বিলুর বড়দি।

মা কিছু বলার আগেই হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল বিলু।

যাতে না মা-দিদিদের সামনে শাড়ি পরে স্মার্টনেসের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

বিলুর মা ওর চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে একটা নিশ্বাস ফেললেন।

ওরা কেমন করে বুঝবে মায়ের অস্বস্তি কোথায়! আগেকার আমলে মেয়েদের এত লেখাপড়ার চাষ ছিল না, শুধু কথার জোরেই আইবুড়ো মেয়েকে অনিশ্চিত কাল ধরে বারো-তেরোর সীমানায় আটকে রাখা যেত। 'চোখে আঙুল দেওয়া' জ্ঞাতি-প্রতিবেশিনীদের কাছে হিসেবের গোঁজামিল ধরা পড়ে গেলে কোঁদল করে জেতাও যেত, কিন্তু এখন যে সে পথে চাবি পড়েছে। কলেজে-পড়া মেয়েকে "বারো তেরোয়' ধরে রাখবার উপায় কোথা? তাই খাটো বয়সের সীমারেখার

মধ্যে ধরে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা চলে খাটো-ঝুল ফ্রক পরিয়ে।

আরও একবার নিশ্বাস ফেললেন বিলুর মা।

নীলু ইলু মিলু-তিনজনের নিচে বিলু।

এখন থেকেই ওর ওই ঝকঝকে তলোয়ারের মত ধারালো দীঘল ছাঁদের তনুটিকে শাড়ির শান-পালিশে ঝলসে উঠতে দিলে চলবে কেন? যতক্ষণ ফ্রকের ছায়ার অন্ধকারে পড়ে থাকে ততক্ষণই ভাল।

জলের মত মুখস্থ গান হলেও গানের বইটা সামনে রাখা ফ্যাশান, একখণ্ড 'গীতবিতানের' জন্যে লাইব্রেরী-ঘরে যেতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হল বিলুকে। একটা স্বরলিপি বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে নিরঞ্জন বেরিয়ে আসছে ঘর থেকে। লাইব্রেরীতে আসা-যাওয়ার সূত্রেই নিরঞ্জনের সঙ্গে আলাপটা বেশি। আলাপ থাকলেও বিলুর অবশ্য মনে হয় ছেলেটার বয়সের তুলনায় একটু যেন বেশি সাবালক সাবালক ভাব। বিলুকে 'আপনি' বলে কথা বললেও বিলুর প্রতি তার যেন একটু সস্নেহ করুণা।

আজ কিন্তু ব্যাপারটা ঘটে গেল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

বিলুর পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকিয়েই নিরঞ্জন যেন চমকে গেল। তারপর হঠাৎ বলে বসল, 'অপূর্ব!' বিস্ময় আর প্রশংসার অদ্ভুত একটা দীপ্তি ফুটে উঠেছে ওর চোখে।

অপূর্ব!

বুকটা কেঁপে উঠল বিলুর।

একটু আগেই ওকে দেখে নন্দিতা চেঁচিয়ে বলে উঠেছিল, "ওব্ বাবা! এ যে একেবারে নব কলেবর! সত্যি কি ফাইন দেখাচ্ছে রে তোকে! মার্ভেলাস!" কই তখন তো এমন বুক-কাঁপা অনুভূতি হয় নি!

কিন্তু তা হবে কেন? নন্দিতার মুখে চোখে তো এমন অদ্ভুত একটা দীপ্তিও ফুটে ওঠে নি।

আর উঠলেই কি—!

কিন্তু বুক কাঁপলেও বাইরে সে কাঁপন প্রকাশ করা চলে না। তাই অবোধ অবোধ মুখে বলতে হল বিলুকে—"কি অপূর্ব?"

"আপনি।"

"আমি! আমি অপূর্ব! ও হো হো হো বুঝেছি বুঝেছি—" চকোলেট

পাওয়া খুকির মত হাসিতে ভেঙে পড়ে বলে বিলু, "শাড়ি পরেছি বলে বলছেন! কেমন? তাহলে বরং অভূতপুর্ব বলুন।" অনেকটা হাসতে হয়, পাছে বুকের ধুক-পুকুনিটা শুনতে পাওয়া যায়।

"হাসছেন মানে?" নিরঞ্জন গাম্ভীর্যের ভূমিকা নিয়ে বলে, "আপনার রীতিমত শাস্তি হওয়া উচিত।"

"শাস্তি!

"হ্যাঁ! রীতিমত শাস্তি। এতদিন শাড়ি পরেন নি বলে।"

"শাড়ি পরি নি বলে শাস্তি পেতে হবে? ভারি মজার কথা বলেন তো আপনি!"

"মজার মানে? সত্যি কথা!! আমার মতে নিজেকে খারাপ সাজে রেখে দেওয়া দস্তুরমত অপরাধ। শাড়ি পরে আপনাকে এত ভাল দেখায় আর আপনি—"

পুরুষের প্রশংসা এমন ভয়ঙ্কর জিনিস? তাতে এমন দিশেহারা করে দেয়?

কিন্তু দিশে হারালে চলবে কেন?

বুককে সবলে বুকের মধ্যে নির্বাসন দিয়ে বিলু এবার পুতুল-পাওয়া খুকুর মত হি-হি করে হাসতে থাকে। "যাক, বাড়ি গিয়ে বলতে হবে বড়দিকে। বড়দিই তো জবরদস্তি একখানা শাড়ি জড়িয়ে স্রেফ্ পুঁটুলি বানিয়ে দিল আমায়। বলে 'ফ্রক পরে আবার ডায়াসে বসে গান গাইবি কি? কেউ দেখতেই পাবে না। একটা শাড়ি-টাড়ি পরলে তবু লোকের চোখে পড়বে, লোকে মনিষ্যি বলে গণ্য করবে।' বলব গিয়ে বড়দিকে।"

নিরঞ্জন তেমনি গম্ভীরভাবে বলে, "ঠিকই বলেছেন আপনার বড়দি। শাড়ি পরে বড্ড বেশি চোখে পড়ে যাচ্ছেন। চোখ সরানোই শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে।"

"বাবারে বাবা! কি সাংঘাতিক মজার কথা যে বলেন আপনি। হি হি হি!" হাসতে হাসতে কপাল ব্যথা হয়ে ওঠে বিলুর। "আরে! ওদিকে যে দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

"কোথায় দেরি? এই তো সবে তবল্‌চীদের পায়ে তেল দেবার জন্যে লোক পাঠানো হল। এখনও ঘণ্টাখানেক নিশ্চিন্ত হয়ে গল্প করা চলে।"

"বাঃ! বেশ আছেন! আমার বলে একটা গানও মুখস্থ হয় নি। একটা "গীতবিতান" নেব—"

"কোন খণ্ডটা?"

"কোন—কোনটা? দ্বিতীয়টাই বোধ হয়। দেখে নেব—"

"আসুন!"

অগত্যাই গুটি গুটি নিরঞ্জনের পিছন পিছন যেতে হয়।

বইটা বাছতে সময় যায় খানিকটা।

কিছুটা নীরবতা।

কথার চাইতে সেটা আরও ভয়ঙ্কর। নীরবতায় যেন পায়ের তলার মাটি সরতে থাকে। ধরবার খুঁটি খুঁজে পাওয়া যায় না।

"শুনুন!"

"কি?"

"আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?"

"কি অনুরোধ? যাবার সময় চা খাওয়ার দলে ভিড়তে হবে?" আবার বিলুর চোখে অজ্ঞতার অন্ধকার।

"আঃ! ও কথা কে বলছে? বলছি—দোহাই আপনার, ভবিষ্যতে আর কোনদিন ফ্রক পরবেন না।"

"ফ্রক পরব না? ও মা! কী কাণ্ড! কারণটা কি বলুন তো?"

"কারণ—কারণ—? কারণ ওটা একেবারে অসহ্য। আজ থেকে শাড়িই বহাল রাখুন, লাল নীল সবুজ সাদা—যা খুশি।"

"ওরে বাবারে—" দুই চোখ যেন ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে ওঠে বিলুর। শাড়ির আঁচলটা হাতের মুঠোয় পিষতে পিষতে দারুণ অস্বস্তির একটা ভঙ্গী করে বিলু বলে ওঠে—"তাহলেই গিয়েছি আর কি! তাহলে—আমার হাঁটা-চলা—খেলাধুলো সব খতম! উঃ, একদিনেই যা জ্বালাতন লাগছে। নিজেকে ঠিক একটি পুঁটুলি মনে হচ্ছে। কতক্ষণে যে বাড়ি গিয়ে ছেড়ে ফেলে বাঁচব,—তাই ভাবছি। বাবাঃ! কি করে যে লোকে বাইশহাত একটা শাড়ি জড়িয়ে কাজকর্ম করতে পারে।"

"আপনিও পারবেন! শাড়ির সোনারকাঠির ছোঁওয়ায় ঘুমন্ত রাজকন্যা জেগে উঠবে—"

"আরে বাস! কী আবোল তাবোল বকতে শুরু করলেন আপনি? রাজকন্যাই বা কোথায়, সোনার কাঠিই বা কি! কিছুই তো বুঝছি না।"

নিরঞ্জন হতাশ সুরে বলে "সত্যি কিছুই বুঝছেন না?"

"কি মুস্কিল!" পাঁচ সাত বছরের খুকি বুঝি আশ্রয় নিয়েছে বিলুর মধ্যে। "কি করে বুঝব? আপনি যে স্রেফ্ মাথামুণ্ডহীন কথা বলতে শুরু করে দিয়েছেন!

'শাড়ির সোনার কাঠি'—হি হি হি হি—তার চাইতে বলুন না কেন, সোনার পাথর বাটি।"

আবার হাসতে হচ্ছে বিলুকে। হেসে হেসে চোখে জল এসে যাবার জোগাড় হলেও হাসতে হচ্ছে। না হেসে করবেই বা কি? গম্ভীর হবার উপায় কোথা তার? বিলুই কি জানে না যে তার ওপরে এখনও তিন দিদি।

বছরে বছরে চশমার-পাওয়ার-বেড়ে-যাওয়া কোল-কুঁজো নীলু, দিন দিন ফুটবল-হয়ে-যাওয়া ভার-ভারীক্কি ইলু, আর নব-যৌবনের দিনগুলি সব শেষ করে এনেও কিশোরীর ভূমিকাভিনেত্রী সেজদি মিলু। এদের চাইতে যে অনেক-অনেক ছোট বিলু। এখনই শৈশব পার করে ফেললে তো চলবে না তার। শাড়ি তার মনোরম সৌন্দর্য-ভার নিয়ে আলমারির উঁচু তাকে থাকুক, নিচের দিকের তাকটা বিলুর, যেখানে রাশি রাশি ফ্রক সাজানো।

বিবি বেগমের শিবতলা

লালবাগের মাসীমা একগাল হেসে বললেন, দেখে এলি আমার শ্বশুরবাড়ির দ্রষ্টব্য জায়গাগুলো?

বললাম—দেখে তো এলাম। তবে তোমাদের ভাষাতেই বলি—সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই।

—তা যা বলেছিস। গঙ্গা যে গঙ্গা, তারও অবস্থা দেখলি তো? যেন কঙ্কালসার বুড়ি! নইলে এই মুর্শিদাবাদের গঙ্গার কী রূপই ছিল! তোরা তো ইতিহাস পড়া ছেলে, সবই তো জানিস, নবাবী আমলে এই মুর্শিদাবাদের গঙ্গার কি বোল-বোলাও। তখনকার যা কিছু রাজকার্য, সবই তো শুনি জলপথে চলত। তা আমিও কিছু কিছু দেখেছি, আমারও তো আজ কম দিন বিয়ে হয় নি? বারো বছরের মেয়ে এসেছিলাম, আজ বাহাত্তর বছর হয়ে গেল!

—সে কি মাসীমা, তোমার বাহাত্তর হল?

—হল বৈ কি! তা বলে বাহাত্তুরে ধরেছে ভাবিস নি বাছা! গঙ্গার ধারে ভিটে করে রেখে গেছেন দাদাশ্বশুর, আজীবন গঙ্গার হাওয়া লেগে লেগে মাথাটা ভাল আছে। হ্যাঁ কি বলছিলাম মা গঙ্গার রূপের কথা! আমিও যখন দেখেছি,

তখনও মায়ের যেন ভরা যৌবন। ওই—আমার শ্বশুর পাথরের ঘাট বাঁধিয়ে রেখে গেছেন দেখলি তো? এখন সেই ঘাট থেকে কতখানি বালিচড়া ভেঙে তবে নাইতে যেতে হয়। অবিশ্যি ঘাটও গেছে। খুব যেবার বর্ষা হয়, গঙ্গায় ঢল নামে—

মাসীমা কথা শুরু করলে আর থামতে চান না! বাধা দিয়ে বলি—আচ্ছা মাসীমা, এখানের সব মন্দির-টন্দিরের কাহিনী তুমি জান?

—আহা বুঝছ না, সব কিছুরই তো একটা ইতিহাস থাকে? সব জিনিসের পিছনেই থাকে কোন একটা গল্প—

মাসীমা বললেন—ওঃ সেই কথা বলছিস? তা যদি বললি, মুর্শিদাবাদের পথে ঘাটে, খোয়ায় মাটিতে, প্রত্যেকটি ধুলো গুঁড়োতেও তো গল্প ইতিহাস ছড়ানো যে বিন্দু। এই মুর্শিদাবাদের মাটিতেই তো—এতবড় একটা রাজ্যের উত্থান-পতন। তার কত হাজার হাজার গল্প। নবাবদের কবরখানা দেখতে গিয়েছিলি? পাঁচিলের ধারে পড়ে থাকা এতটুকু একটু কবরের ঢিপিরও হয়তো কতবড় গল্প আছে। ওই যে 'হাজার দুয়োরী' অট্টালিকা, আজ যার হাল দেখলে কান্না পায়—

তাড়াতাড়ি বলি,—দোহাই মাসীমা, কান্নাটান্না রাখ, বরং তোমার শ্বশুরবাড়ির দেশের একটা গল্প বল।

—আমার শ্বশুরবাড়ির দেশের? বললাম তো ওই হাজার-দুয়োরী বাড়ির মতন হাজার গল্প ছড়ানো আছে। কোনটা রেখে কোনটা বলি। আমিই কি কম দেখলাম? শ্বশুরের মক্কেল শশী বাগলকে দেখেছি, একশো তিন বছর বয়েস হয়েছিল তার! এদানি পাগল হয়ে গিয়েছিল, হাত কাঁপত, আর সেই কাঁপা কাঁপা হাত নেড়ে ভাঙা গলায় আমার শ্বশুরকে বলত—এ দেশের কিছু থাকবে না, বুঝলে উকিল, একখানি ইটও না। এই মুর্শিদাবাদের মাটিতেই যে স্বয়ং কলি তার পাপের ভরা নামিয়েছিল! তোমরা দেখ নি, আমি দেখেছি। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে উঠে কোনদিন গঙ্গার চড়ায় গিয়ে বসে থেক। দেখ, জল থেকে কারা উঠে আসে!" মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মরলও সেই গঙ্গায়, কেউ বলল নাইতে গিয়ে ডুবে গেছে, কেউ বলল ডুবে মরেছে। বুড়ো নাতির ছেলের ভাতে কী ঘটাই করেছিল। টাকার কুমীর ছিল তো, লালবাগসুদ্ধ সবাইকে নেমন্তন্ন করেছিল! আর সে কী আয়োজন! অমন খাজা আর জীবনে দেখলাম না। বড় কাঞ্চননগরের থালার মাপে এক এক খানা খাজা। আর ছানাবড়া? শুনলে হাসবি, এক একটা যেন তোদের খেলার ফুটবল। নবাবী দেশ! যজ্ঞিতে ছোট জিনিসে বড্ড নিন্দে ছিল এদেশে। লুচি করবে একখানা ডালার মত! সবাই

করত, তবে শশী বাগলের বাড়ি যেমন—

প্রমাদ গণলাম।

লালবাগের মাসীমা যদি একবার সেকালের খাবার-দাবারের আলোচনা শুরু করেন, তাহলে দিন কাবার হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়! আগে আলোচনা, তারপর একালের সঙ্গে তুলনামূলক সমালোচনা, অতঃপর আক্ষেপ পর্ব! অথচ আমি এইমাত্র যে জিনিসটা দেখে এলাম, তার নামের ইতিহাসটা জানতে ইচ্ছে করছে। নামটা কৌতূহলোদ্দীপক! বললাম—থামো থামো মাসীমা, এই এত ঘুরে এসে পেটের মধ্যে খাণ্ডবদাহন শুরু হয়েছে, এখন তোমার ওই ডালার মত লুচি, থালার মত খাজা, আর ফুটবলের মত ছানাবড়ার গল্প শুনতে গেলে হার্টফেল করে বসতে পারি। তার চাইতে তুমি বল দেখি তোমাদের ও—ই ওদিকে যে শিবমন্দির আছে, তার নামটা অমন কেন?

—শিবমন্দির? লালবাগের মাসীমা ভুরু কোঁচকালেন—জোড়া শিব-মন্দিরের কথা বলছিস?

—না গো, ওই যে 'বিবি-বেগমের শিবতলা' না কি! ওর নামের আসল গল্প জান?

মাসীমা কপাল থেকে চোখ নামিয়ে বললেন—'বিবি বেগমের শিবতলা!' ও গল্প আর এখানের কে না জানে! তা ওখানে কি করতে গিয়েছিলি? ওখানে তো সাতজন্মে পূজো হয় না!

—পূজো হয় না, তাতে দেখলামই, ভেঙে চুরে, বট অশ্বত্থের শেকড় গজিয়ে যা তা হয়ে আছে। বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে পড়েছিলাম। কাছাকাছি দু-একজন নামটা বলল, নামের মানে জানতে চাইতেই কিন্তু হেসে কুটিকুটি!

—তা হাসতে পারে। তোদের কাছে যা আশ্চয্যি, ওদের কাছে যে সে সব নেহাৎ জানা গল্প। ও শিবমন্দির হল নবাবের এক হিন্দু বেগমের প্রতিষ্ঠিত মন্দির।

বললাম—সেটা আন্দাজে বুঝতে পারছিলাম, কিন্তু ভাবছিলাম—সেকালে কোন উদার ব্রাহ্মণের কাছে এ পারমিশান পেয়েছিলেন ভদ্রমহিলা? বিধর্মীর টাকায় শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করতে রাজী হয়েছিল সেকালের বামুন?

—হয় নি! সেই তো কথা! এখানের কেউ রাজী হয় নি! তবে টাকা হল জগতের সকল দরজার চাবিকাঠি। অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে শান্তিপুর থেকে নাকি এক বামুন আনিয়েছিল, ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করতে। তা বিবির কপাল! বামুন

নাকি, প্রতিষ্ঠা-টতিষ্ঠা করে বেলা-পড়ন্তয় যেই-না মাত্তর জল খেতে বসেছে, সেই মাত্তর মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে সন্নেস রোগে মারা গেল।

বললাম—খুবই স্বাভাবিক। যতই অর্থলোভী হোক তবু সেকালের ব্রাহ্মণ। এ কাজ করতে মনের ওপর দিয়ে কম ঝড় তো বয় নি বেচারার! ব্লাড্ প্রেসার বেড়ে উঠতেই পারে। যাক, তাহলে বেচারার মন্দিরে পূজো আর হল না?

—কই আর? আর হবেই বা কেন? তুই ছুঁড়ি বামুনের ঘরের বিধবা হয়ে নবাবের বেগম বনে বসে থাকলি, আবার শখ করে গেলি কিনা শিবমন্দির গড়তে! হিন্দুদের দেবদেবী কি ছেলেখেলার জিনিস?

—আহা মাসীমা, সে হয়তো মনেপ্রাণে হিন্দু-ই ছিল! ইতিহাসে এমন আক্‌ছার দেখা যায়।

—যায় জানি। তবে যার যা কপাল! নইলে—

বললাম, মাসীমা ভীষণ খিদে পেয়েছে, খেতে দাও আগে। খেতে খেতে শুনব তোমার গল্প!

লিখছিলাম—

মুর্শিদাবাদের গঙ্গা রূপসী, রাজতরঙ্গে তরঙ্গিণী! হালিশহরেব গঙ্গাও কম নয় সাধক পণ্ডিতদের দেশ! তখনও রামপ্রসাদের সুরের ধ্বনি, হালিশহরের সুরধুনীর তীরে তরঙ্গে কাঁপছে!

সেখানে যত পণ্ডিত আর বিধানদাতার বাস। বাংলাদেশে—বিধানে নবদ্বীপের পরেই হালিশহর! তাই কূলে কূলে ভরা গঙ্গার দিকে নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে বসে ভিজে গামছা চোখেমুখে ঘষে গলার তেষ্টা মেটায় গিরিবালা। তার কপালে এই বিধান।

পনেরো বছরের স্বাস্থ্যবতী মেয়ে, দেহে যেন আসন্ন জোয়ারের কাঁপন।

কিন্তু একদিনের নির্জলা উপোসেই একেবারে কাঠ হয়ে যায় মেয়েটা।

আশ্চয্যি!

ওর পিসী রামমণি আর ছোট খুড়ি মঙ্গলা, তারাও তো দশ বছর বয়স থেকে এই নির্জলা উপোস করছে, কই গিরির মতন এমন ডানচোখা হয়ে যায় না তো? বরং তারা সংসারের যত বাড়তি কাজ বেছে বেছে একাদশীর দিনের জন্যেই রাখে, সেদিন সময় থাকে অগাধ। খাওয়াই তো কাজ! খাওয়া না থাকলে কাজও থাকে

না। নিরিমিষ ঘরে তো সেদিন শেকল তোলা থাকে, তাতে কম সময় বাঁচে?

গিরিবালা ওসব পারে না।

গিরিবালা ঘরের জানলা দিয়ে নিষ্পলক নয়নে মা গঙ্গার অথৈ জলের দিকে তাকিয়ে থাকে, আর গামছা ভিজিয়ে হাতে পায়ে চাপে, চোখে-মুখে ঘষে। কে জানে তাতে ওর কাঠ-গলা একটু সরস হয় কি না।

বাঁড়ুয্যে রামমণি নিত্য গঙ্গাস্নানে যায়। অবিশ্যি সকলেই যায় এ-অঞ্চলেই, গঙ্গাই তো এখানের সব। গিরিবালাও আজন্ম গিয়ে এসেছে, পিসীর কোলে চড়ে এতটুকু বেলা থেকে। এখনও যায়। শুধু একাদশীর দিন বাদে। একাদশীর দিন গিরিবালা গঙ্গা নাইতে পায় না। ওর বিধানদাতা জ্যেঠামশাইয়ের বিধান তিনি নাকি দেখেছেন, বয়স্থা গিরিবালার চিত্ত এখনও রীতিমত চঞ্চল। এমনও হতে পারে যে, গিরি স্নান করতে ডুবে আকণ্ঠ জল পান করে নিল!

এতবড় মারাত্মক ব্যাপার ঘটে গেলে আর রইল কি। তার চাইতে বাড়িতে তোলা জল ভাল!

সেটা মা, জ্যেঠি, খুড়ি, পিসীর চোখের উপর তবু। পাতকুয়ো থেকে জল তুলে নিয়ে চান চলবে, লুকিয়ে আকণ্ঠ জলপান করে নেওয়া চলবে না।

কিন্তু এবারে একাদশী নিয়ে এক গণ্ডগোল! একাদশীর দিন পাড়ায় ঘুরে সাত ঠাকুরের দোরে জল দিয়ে তবে বাড়ি ফেরা রামমণির অভ্যাস! তিনি নাকি আজ কোথা থেকে শুনে এসেছেন দুদিন দুরাত উপোস এবারে।

এমনটা তো হয় না। কিন্তু হয়েছে! আর কানে যখন একবার শুনেছেন উপোস ভেঙে তো পতিত হতে পারেন না রামমণি?

চৈত্রের বেলা!

একপ্রহর বেলাতেই, সূর্যঠাকুর রাক্ষসের মত জ্বলতে শুরু করছেন! মঙ্গলার ঘাড়ে আঁশঘরের হেঁসেলের ভার। সব চুকলে, আর একবার চান করে তবে রামমণির কাছে খেতে বসে মঙ্গলা। সম্প্রতি তো আবার গিরিবালা ভর্তি হয়েছে এ-ঘরে। তিনজনেই এক সঙ্গে বসে। আজ অবিশ্যি সে পাট বন্ধ।

মঙ্গলা রান্নাঘর থেকে জলন্ত কড়ায় লাফানো কটা কাটা কৈ মাছকে খুন্তি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে সোজা করতে করতে কালি হয়ে যাওয়া মুখ বাড়িয়ে বলে, কোথা থেকে শুনে এলে ঠাকুরঝি?

—ওগো যেমন তেমন জায়গা থেকে নয়, আমার কদম ফুলের গুরু এসেছেন কাটোয়া থেকে, তিনিই বিধান দিয়েছেন। আজ 'শাক্তর', কাল 'বোষ্টমের'। এসব

হচ্ছে নতুন বিধেন।

মঙ্গলা আশান্বিত মুখে বলে,—তবে আমাদের আর দুদিন কেন ঠাকুরঝি? আমাদের শ্বশুরবংশ তো মস্ত শাক্তবংশ!

রামমণি ভুরু কুঁচকে বলেন—সেই আনন্দেই তবে কাল সকালে ঘুম থেকে উঠেই দু-ঘটি জল গলায় ঢেল ছোট বৌ! তবে আমি যখন একবার কানে শুনেছি, আমার ও দুদিনই। একাদশী, একাদশী, তা কি বে শাক্তর, কি বে বোষ্টমের।

মাছগুলোর লাফানি বন্ধ হয়ে গেছে, তবু মঙ্গলা মাছগুলোকে পিটোতেই থাকে, ননদের কথার আর উত্তর দেয় না। জানে রামমণির ব্যবস্থা তাদেরও ব্যবস্থা!

গিরিবালা কাছে বসে শাক বাছছিল, হঠাৎ হি হি করে হাসতে হাসতে বলে,—কী মজা ছোটখুড়ি, কী মজা! বেশ দুদিন, দুদিন গেরস্থর চাল বাঁচল!

মঙ্গলা একবার ওর দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ধরা গলায় বলে—বাঁচলে তোর বাপ জ্যাঠার বাঁচল, আমার আর কি?

—আহা সে কি! তোমার হল গে শ্বশুরের বংশ! দূর বাবা, এ শাকের বোঝা যে আর ফুরোচ্ছে না। রাবণের গুষ্টির কি কিছুতেই কুলোয় না গা? কাল থেকে গোয়ালের বিচিলির আঁটি এনে কুচিয়ে দেব! ছোট খুড়ি, রইল তোমার শাক, আর বাছতে হবে না।

মঙ্গলা বলে, থাক্ মা থাক্। তুই যা একটু হাওয়ায় বসগে যা! যতই হোক্ তোর এখনও 'বালা'-ধাত।

গিরিবালা রান্না ঘর ছেড়ে পালায়। একখানা গামছা সপ্‌সপে করে ভিজিয়ে এদিকের দালান-কোঠায় এসে বসে। যেখানের জানালা খুলে দিলে গঙ্গা দেখা যায়। গঙ্গার দৃশ্যে চোখ জুড়োয়, গঙ্গার হাওয়ায় গা জুড়োয়। উপসী গা, পিত্তির জ্বালায় ছটফটে গা!

কূলে কূলে ভরা গঙ্গা!

নৌকো আছে ছোট বড় মাঝারি! ধারে ধারে, মাঝগঙ্গায়। মালের নৌকো, যাত্রীর নৌকো! ওই দূরে যে বড় নৌকোখানা চলছে হেলে দুলে, অথচ এমনিতে মনে হচ্ছে বুঝি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ওইরকম একখানা নৌকো বোঝাই হয়ে সেবার কাশী গিয়েছিল হালিশহরের যত বুড়িরা। কাশীর পাণ্ডা এসে নিয়ে গিয়েছিল। পিসীও গিয়েছিল তার সঙ্গে! মঙ্গলা কেঁদেছিল যেতে পেল না বলে।

গিরিবালা কবে পিসীর মত হবে ?

কবে স্বচ্ছন্দে দু-দুটো দিন নির্জলা উপোস করে, পাড়া বেড়িয়ে বেড়াতে পারবে ? কবে এক নৌকো বুড়ির সঙ্গে একটা ঘটি আর দুখানা আধময়লা থান হাতে করে ভেসে পড়তে পারবে অদেখা অজানা বিশ্বনাথের উদ্দেশে ?

নাঃ, গিরিবালা আর জীবনে কখনও ওই ভরা গঙ্গায় ভাসতে পাবে না, শুধু ওই কূলপ্লাবিনীর দিকে আকুল নয়নে চেয়ে চেয়েই দিন কাটবে তার।

ভিজে গামছাখানা আর আর একবার মুখে-মাথায় বুলিয়ে নিল গিরিবালা।

গঙ্গা আর নৌকো দেখলে গিরিবালার প্রাণ অমন হু হু করে কেন ?

জীবনে একবারও নৌকো চড়ে নি বলে ? নৌকো চড়ে নি ? না, নৌকো চড়ে নি তো গিরিবালা। জন্মেও না ! হালিশহরের কত মেয়ে বিয়ে হয়ে নৌকো চড়ে শ্বশুরবাড়ি যায়। ঘাটের ধারে গাঁয়ের ঝি-বৌ গিন্নী-বান্নী সবাই ভেঙে পড়ে। কান্নার রোল ওঠে ঘাট জুড়ে। বর-কনে বিদেয় দিতে এসে না কেঁদে বাড়ি ফিরবে এমন নির্মায়িক মেয়েমানুষ কি জগতে আছে নাকি ?

গিরিবালার শ্বশুর-বাড়ি এ পাড়া থেকে ও পাড়া। গিয়েছিল পালকী চড়ে।

সেই যাওয়া-আসায় না ছিল প্রাণ হু হু করা দুঃখ, না ছিল থৈ থৈ খুশি !

আচ্ছা, গিরিবালা যদি বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ একদিন গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে অমনি একখানা নৌকোর কানাত ধরে তার উপর উঠে পড়ে ?

দূর থেকে দেখে দেখে সেই উঠে পড়াটা খুব সোজা মনে হয় গিরিবালার। মনে হয় নৌকোর কানাটা বুঝি জলের ওপরেই ভাসছে।

গামছাখানার জল শুকিয়ে এল।

চৈত্রের টান হাওয়ায়, না গিরিবালার পিত্তি জ্বর-জ্বর হাত-পায়ের উত্তাপে ? উঠে গিয়ে আবার ভিজিয়ে আনবে, এ ইচ্ছে আর হয় না, শুধু শরীরের সমস্ত জোরটা দিয়ে গামছাখানাকে পাকিয়ে পাকিয়ে নিংড়োবার চেষ্টা করে।

গিরিবালার মা স্বামীর কাছে গিয়ে আছড়ে পড়ে—তোমার বিধেনদাতা বোনের বিধেন শুনছ ? দুদিন উপোস !

ছোট মুখুয্যে চিন্তান্বিত স্বরে বলেন—হ্যাঁ, ওইরূপ একটা আন্দোলন উঠেছে। এই শাক্তভূমি হালিশহরে 'গোস্বামী মতে'র কোন প্রতিষ্ঠা ছিল না, কিন্তু সম্প্রতি নাকি একজন গোস্বামী এসে এই বিধান দিচ্ছেন।

গিরির মা আগুন হয়ে বলে,—দিচ্ছেন বলেই মানবে তোমরা? নিজেদের শাস্তর বিধি নেই তোমাদের?

—আছে! ছোট মুখুয্যে ম্রিয়মান ভাবে বলেন,—তবে কি জান? একাদশী বলে কথা! অবশ্য বিধবার একাদশী নিষ্ফলা ব্রত মাত্র! কিন্তু না করলে অনন্ত নরক!

—আর ওই কচি মেয়েটাকে চোখের সামনে মরতে দেখলে তোমাদের অনন্ত নরক নেই?

মুখুয্যে হাসলেন।

—একাদশী করে কাউকে কখনও মরতে দেখেছ? হালিশহরে কি বিধবা নেই? বাল-বিধবা নেই? বাল-বিধবা, শিশু-বিধবা, সব রকমই আছে। আজ পর্যন্ত উপবাসে মৃত্যু ঘটে নি কারও। দিদি মরেন নি, ছোট বৌমা মরেন নি, গিরিও মরবে না!

গিরিবালার মা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে,—সবাই যদি সমান সহ্যশীল না হতে পারে? আমি হারুর মাকে দিয়ে শুধিয়ে ভাসুরঠাকুরের কাছে বিধেন নেব।

ছোট মুখুয্যে তীব্রস্বরে বলে ওঠেন,—খবরদার গিরির মা, অজগরের গায়ে হাত দিতে যেও না। এ বিধান চেয়ে পাঠালে দাদা গিরির সঙ্গে তোমাকে সুদ্ধ হালিশহর থেকে বিদেয় করে দেবে।

গিরির মা হঠাৎ মুখে কাপড় গুঁজে কেঁদে ওঠে,—ওগো মা-গো, কি কসাইয়ের ঘরে পড়েছিলাম গো! এর চেয়ে হাড়ি বাগ্‌দীর ঘরে জন্মালেও যে আমার ছিল ভাল গো!

মুখুয্যে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থেকে গম্ভীর স্বরে বলে—গিরির মা, আজ তোমারও উপবাস। তুমি আমার সামনে যে কথা উচ্চারণ করেছ তার জন্যে শুদ্ধির প্রয়োজন। তোমাকে উপবাস করে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

কান্না থামিয়ে গিরির মা অগ্নিমুখী হয়ে বলে,—বটে? প্রাচিত্তির করতে হবে? আর তুমি পণ্ডিত, ঘরে বিধবা মেয়ে থাকতে যখন—থাক আর বলব না, কিন্তু মনকে জিজ্ঞাসা কর, তখন প্রাচিত্তির বিধেন মনে আসে না? বেশ করেছি বলেছি, আবারও বলব। বামুন হওয়ার চেয়ে বাগ্দী হওয়া ঢের ভাল।

রেগে গন্‌ গন্‌ করে বেরিয়ে যায় গিরিবালার মা।

ঘরে ঢুকতেই গিরি মা-র মুখের দিকে না তাকিয়েই শুকনো গামছাখানা

বাড়িয়ে ধরে বলে,—একটু ভিজিয়ে দাও না মাগো!

গিরির মা তপ্ত গলায় বলে—গামছা ভিজিয়ে আর কি হবে? ওখানা গলায় পাকিয়ে এখনও মরতে পারছিস না?

গিরিবালা প্রথমটা চমকে ওঠে। তারপর মার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠে বলে,—কই আর পারছি? বরং গঙ্গাপানে চেয়ে চেয়ে বসে ভাবছি, কবে পরশু আসবে কখন গন্ধরাজ লেবুর রস দিয়ে ঢক ঢক করে এক ঘটি মিছরির-পানা গিলব! কখন ঝাল ঝাল পোস্তর ব্যান্নন দিয়ে মুঠো মুঠো ভাত খাব।

—চুপ কর, চুপ কর লক্ষ্মীছাড়ি! আমায় কেন খা-না তুই? তাহলে যে আমি বাঁচি?

কেঁদে ফেলে গিরির মা! গিরির দিকে তাকালেই তার কান্না পায়। গিরির বাপ অনায়াসে সকলের সঙ্গে গিরির তুলনা করে বসল? গিরির সমান মেয়ে হালি-শহর শহরে আছে?

হায়! হায়! এই তাব কাঁচা সোনার পুতুলের মত মেয়ে, যার চাঁপার পাপড়ির মত হাত-পা, মেঘের মত চুলের ঢাল, পটে আঁকা ছবির মত মুখ, গায়ে হাত দিলে মনে হয়, মল্লিকা ফুলেব খোঁপায় হাত দিচ্ছি এর সঙ্গে মঙ্গলা রামমণির তুলনা? চুলগুলো কেটে ফেলবার জন্যে আদেশ দিয়েছিলেন গিরির জ্যাঠামশাই, গিরির মা কেঁদে কেটে রসাতল করে সে আদেশ নাকচ করেছিল।

যাক, মনের কথা শোনা যায় না তাই রক্ষা!

আর মাতৃস্নেহে অপরাধ নেই তাই ভাল!

মা যশোদাও যে সকল বালকের মধ্যে থেকে, গোপালকে পৃথক করে কোমলাঙ্গ বলে ভাবতেন! গিবিব মা যদি ভেবে থাকে তার মেয়েব যেমন কষ্ট, এমন কষ্ট আর কখনও কেউ পায় নি, তাহলে অন্যায় হয় না।

গিরি বলে,—মা কেঁদে মরছ কেন? পিসী এখুনি দেখতে পেলে, তোমারও খোয়ার, আমারও খোয়ার!

পিসীর নামে জলে পুড়ে ওঠে গিরির মা। কান্না থামিয়ে সহসা দাঁতে দাঁত চেপে বলে ওঠে,—না, আর কেঁদে মরব না! তুই মরতে পারবি গিরি? সত্যি করে মরতে পারবি?

—ও বাবা গো, না বাপু না। মরতে-টরতে পারব না! মিথ্যে ভয়ের ভান করে গিরি।

—মরতেই হবে! আমি তোকে মারব! এমন করে আমার চোখের সামনে

তিল তিল করে হত্যে হতে দেব না! পাপ লাগে, আমার! কিসে পাপ, কিসে পুণ্যি নারায়ণ জানবেন, মা কালী জানবেন। জানবেন মা-গঙ্গা!

হ্যাঁ, তা শুধু মা গঙ্গাই জেনেছিলেন।

ভর-দুপুরে শুধু শুধু সেদিন ফের গঙ্গায় ডুব দিতে গেল গিরিবালার মা। বলেছিল, 'হারুর মার গোলা হাঁড়ি ছুঁয়ে ফেলেছি।'

ঝাঁ ঝাঁ দুপুর।

হালিশহরের ঘাটে জিরেন খাচ্ছিল মুর্শিদাবাদের বজরা। না, সৈন্যসামন্ত যুদ্ধরসদের বজরা নয়, সে সব তো চুকে গেছে অনেকদিন, থেমে গেছে পূজোর বাজনা। তবু নবাব বংশের 'নবাবী' কিছু কিছু রয়েছে বৈকি! আছে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'ভাতা' খেগো নবাবের নাতি বংশরা। ঠাকুর্দাদের চাইতে এরা বরং আছে ভাল। বার্ষিক ভাতাটি এসে যায় নিয়ম মত, কাজের মধ্যে খাওয়া ঘুম আর স্ফূর্তি।

সেই স্ফূর্তির খেয়ালে নবাবের এক উত্তর পুরুষ চলেছেন শখের বজরা ভাসিয়ে, কলকাতা দেখতে।

কোম্পানীর কলকাতা। সে নাকি এক আজব দেশ!

গিরিবালার মা সকালবেলা ঘাটে এসে এই বাঁধা বজরাটা দেখেছিল! আরও অনেকেই দেখেছিল। এখন আর কেউ নবাবী নৌকো দেখলে ভূত দেখার মত ছুটে পালায় না। কোম্পানীর রাজ্য হয়ে বেঁচে গেছে গেরস্তর মেয়েরা। লোকেরা বৌ মেয়ে নিয়ে নিশ্চিন্দি হয়ে সংসার করছে। জানে 'কোম্পানীর রাজ্যে' আইন আছে। 'জোর যার সব তার' নয় এখন।

অনেকের মত গিরিবালার মাও সকালবেলা দাঁড়িয়ে দেখেছিল। দেখেছিল, সকালের আলোয় বজরার ছাদে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা জলন্ত আগুনের শিখা! কাঁচা সোনার রংও এর কাছে লাগে না। তার উপর জড়ানো জরি সল্মাচুমকি রেশম ভেলভেট।

ঘাটের আর পাঁচটা মেয়ে চুপি চুপি বলল,—নবাবের নাতি, 'নেমাজ' পড়ছে! রূপ দেখ—যেন জ্বলছে!

রূপ জ্বলেছিল। আর সেই রূপে ঝলসে গিয়েছিল গিরিবালার মা। সেইদিনই দুপুরবেলা, ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে—আবার ঘাটে এল সে। ছুতো করে অবেলায় নাইতে। দেখলে চরে নেমেছে বজরার একটা দাসী। হাতছানি দিয়ে ডাকল—বলল, এই

নৌকো কলকাতায় যাচ্ছে ?

হিন্দু ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়েরা কেউ কখনও এদের সঙ্গে ডেকে কথা কয় না, দাসীটা কৃতার্থ হয়ে নম্রভাবে বলল, হ্যাঁ মা ঠাকরুণ।

—কখন ছাড়বে ?

—রাতে।

সাক্ষী রইলেন মা গঙ্গা, সাক্ষী রইলেন নারায়ণ। আর সাক্ষী—আকাশের শুধি !

তারপর ?

তারপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত।

গিরিকে গিরির মা বলেছিল,—কলকাতা দেখবি গিরি ?

কলকাতা !

এত ভাগ্যি গিরিবালার হবে ?

হবে হবে ! গিরির মার বাপের বাড়ির দেশের একজন মেয়েছেলে যে যাচ্ছে ওই বজরায় !

কিন্তু একা ?

তাতে কি ? এ ছাড়া আর কবে সুযোগ আসবে কে জানে ? হয়তো আসবেই না।

তবে চুপি চুপির দরকার। রামমণি টের পেলে যেতে দেবে না। শুধু একখানা থান-কাপড় হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়া ! বিধবার ওর বেশি দরকারই বা কি ?

তারপরের ঘটনা ?

সে আরও সংক্ষিপ্ত !

রামমণির চীৎকারে পাড়াসুদ্ধ লোক জড়ো হল ঘাটে। ভোরবেলা বুঝি গিরি আর গিরির মা নাইতে এসেছিল, দুটোতেই ডুবে মরেছে।

গিরির মার লাশটা পাওয়া গেছে, ঘাটের ধারেই ঘাড় গুঁজে কেমন হুমড়ি খেয়ে পড়ে ছিল। গিরির দেহ পাওয়া গেল না।

খোঁজা হয়েছিল একটু, কিন্তু সে তো মনকে চোখ-ঠারা ! কে না জানে, মা গঙ্গা যাকে নেন, তাকে জন্মের মতই নেন।

গিরির চিহ্ন, গিরির থানখানা শুধু আঁকড়ে-ধরা ছিল গিরির মার হাতের মুঠোর মধ্যে।

শেষ চেষ্টা করেছিল বৈ কি গিরিবালার মা, প্রাণপণ চেষ্টাই করেছিল নিশ্চয়।

কিন্তু খানখানাই শুধু ধরে রাখতে পেরেছে। পারে নি নিজের প্রাণটা ধরে রাখতে। কে জানে কত ঢেউ খেয়েছিল, নইলে ভোরের থেকে এই এতটুকু সময়ের মধ্যে অমন করে ফুলে ওঠে।

কলম নামিয়ে রেখেছিলাম—

লালবাগের মাসীমা অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে বলেন—ওমা কি কাণ্ড! সেই কখন দুটো গল্প কথা কয়েছি, সেই নিয়ে এতবড় একটা গল্প লিখে ফেললি? এত কথা তোকে বলল কে?

গম্ভীর ভাবে বললাম,—গিরিবালার প্রেতাত্মা!

—দুগ্‌গা, দুগ্‌গা! ওসব নিয়ে ঠাট্টা করতে নেই বাছা!

—ঠাট্টা নয় গো মাসীমা, সত্যি! বিবি বেগমের শিবতলার ধারে গিরিবালার প্রেতাত্মা বসে বসে নিশ্বাস ফেলছিল।

চোরা দরজা

কর্পোরেশন থেকে নোটিশ এসেছে অবিলম্বে বাড়িটার দোতলা আর তিনতলা ভেঙে নামিয়ে ফেলতে হবে। কলকাতা সহরের যে যে বাড়িগুলি এ বছরের বর্ষায় 'বিশেষ বিপজ্জনক' বলে ঘোষিত হয়েছে, পাথুরেঘাটার এই চকমিলনো বিরাট বাড়িখানা নাকি তাদের মধ্যে অন্যতম।

গত বছর বর্ষাতেও কর্পোরেশন 'সতর্কবাণী' পাঠিয়েছিল, প্রসন্ননারায়ণ গ্রাহ্য করেন নি। শেষ জীবনের একমাত্র সঙ্গী ভাগ্নে নন্দকে বলেছিলেন—দে দিকি নোটিশখানা, ওটাই আগে ছিঁড়ে ওড়াই।

তারপর এক বছরের শীত গ্রীষ্ম বসন্ত পার করে আবার বর্ষা এসেছে, প্রসন্ন-নারায়ণ বাড়িটাকে না সারিয়েছেন, না ভেঙেছেন। অতঃপর এ বছরে এই জরুরী নোটিশ। জানানো হয়েছে বাড়ির মালিক বাড়ি ভাঙানর ব্যবস্থা না করলে, কর্পোরেশন থেকেই নাকি সে ব্যবস্থা করা হবে।

এ নোটিশ আর অগ্রাহ্য করা চলল না।

এ বারের নোটিশটা আগেই প্রসন্ননারায়ণের হাতে পড়েছিল। কখন পড়েছিল

কে জানে! নন্দ ঘরে আসতেই বিনা বাক্যে মেরজাইয়ের পকেট থেকে বার করে হাত বাড়িয়ে নন্দর দিকে এগিয়ে দিলেন।

নন্দ চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়ে মনে মনে বিপদ গনলেও মুখে কাষ্ঠ-হাসি হেসে বলল, আবার! ব্যাটারা আচ্ছা ইয়ে তো! কাজ তো কিছু দেখানো চাই কর্পোরেশনের, তাই লোককে উৎখাত করার কাজ নিয়েছে। এই আপনার আবার একটা কাজ বাড়ল, নোটিশ ছেঁড়া!

প্রসন্ননারায়ণ গম্ভীর হাস্যে বললেন, নাঃ, এবার আর অত সহজে মিটবে বলে মনে হচ্ছে না। বোধ হচ্ছে পাড়ার লোক শত্রুতা করছে। নইলে কর্পোরেশনের এত ভূতে পায় নি যে, গেল বছরের নোটিশের ফল হল কিনা এ বছরে তার খোঁজ নিয়ে বেড়াবে। লক্ষ্মীনারায়ণ মজুমদারের ভিটে থেকে বাস এবার তুলতেই হবে দেখতে পাচ্ছি।

নন্দ ভয়ে মুখ চুণ করে বসে রইল।

মামার সঙ্গে এ রকম ভয়ানক আলোচনার অংশগ্রহণ করা তার পক্ষে সহজ নয়।

প্রসন্ননারায়ণ আবার একটু ক্ষুব্ধহাসি হেসে বললেন, ভেবেছিলাম বাড়িখানা হুমড়ে পড়ার আগেই এই হাড় ক-খানা হুমড়ে পড়বে, সে আর হল না।

নন্দ একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল। দেড়তলা সমান উঁচু এক একটা তলা। যত পেল্লায় লম্বা তত পেল্লায় চওড়া জানালা দরজা, ঘরের মধ্যে সিলিঙের হাতখানেক নিচে চওড়া কার্নিশের ঘের। এক কালে আগাগোড়া দেওয়ালে তেলরঙা নক্সা-কাটা ছিল, এখন শুধু দেওয়ালে দেওয়ালে ময়লা ময়লা দাগ।

বাড়ির মাথা থেকে নিচে পর্যন্ত সর্বত্রই কালের চিহ্ন সুস্পষ্ট।

তবু নন্দ মন-রাখা স্বরে বলে, কথায় বলে মরা হাতী লাখ টাকা! যতই বে-মেরামতী হয়ে যাক, তবু এ বাড়িতে এখনও নিশ্চিন্তে দশটা বছর কাটানো চলত। তিন হাত চওড়া ভিৎ, পাথর-গুঁড়োর মালমশলা!

প্রসন্ননারায়ণ হাসলেন, পাথর যারা গুঁড়ো করেছিল, তারাও তো কবে গুঁড়ো হয়ে গেছে নন্দ! নাঃ, 'মানব না' বলে লাভ নেই, বাড়ি খারাপ হয়ে গেছে বৈ কি! পঞ্চাশ-ষাট বছরের মধ্যে তো মিস্ত্রীর হাত পড়ে নি।

প্রসন্ননারায়ণের বয়েস সত্তরের কাছাকাছি, কাজেই অনুমান করা চলে মিস্ত্রীর হাতকে হাতছানি দিয়ে ডেকে তিনি কোনদিনই আনেন নি।

প্রসন্ননারায়ণের বাবা প্রবোধনারায়ণ শেষ বুঝি কবে একবার ঠাকুর-দালানটা

মেরামত করিয়েছিলেন। প্রসন্ন তখন ছোট। নন্দর বয়েসে নন্দ এ বাড়ির জাঁক-জমক কিছুই দেখে নি শুধু মায়ের মুখে গল্প শুনেছে। শুনেছে এতবড় বাড়ির আনাচ-কানাচ পর্যন্ত ভর্তি হয়ে কত লোক বাস করে গেছে এখানে, আর কেমন করে তারা মরে হেজে বংশ লোপ পেয়ে, ভয়ে অথবা নিরুপায় হয়ে এই পাথরের গুঁড়োর মশলায় গাঁথা আশ্রয় ছেড়ে পালিয়েছে। পালিয়েছে যেমন করে ভীতত্রস্ত পাখিগুলো বাসা ছেড়ে আর্তনাদ করতে করতে পালায়, বাসা-বাঁধা গাছের গোড়ায় কাঠুরের হাত পড়লে। মার কাছে শুনেই জেনেছে নন্দ এতবড় বিষয়-সম্পত্তি উড়ে-পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে প্রসন্ননারায়ণেরই অনাচারে আর অমিতাচারে।

ঠাকুর-দালানে বাইজীর নাচ দিয়েছিলেন প্রসন্ননারায়ণ, সেখানে ঝাড়-লণ্ঠনের বাহার বেশি বলে। এর পর আর বংশ থাকে? থাকে বিষয়-সম্পত্তি, জাঁক-জমক, বোলবোলাও?

শুধু বাড়িখানা নষ্ট করতে পারেন নি প্রসন্ননারায়ণ, হয়তো কোথাও কেউ বাধা দিয়েছে। কে জানে কে! মমতা? ভয়? সম্ভ্রমবোধ? লক্ষ্মীনারায়ণ মজুমদারের প্রেতাত্মা?

কিন্তু নন্দকে কে আটকে রেখেছে এই প্রেতপুরীতে?

নন্দ একটু ইতস্তত করে বলে ফেলে, এখন মনে হচ্ছে এর চাইতে সেবারে সেই কী-যেন ইস্কুলওলাদের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেই ভাল হত। তারা বরং যা হোক মেরামত করিয়ে নিয়ে—

—থামো নন্দ, বোকার মত কথা বোল না! ধমক দিয়ে ওঠেন প্রসন্ননারায়ণ।

নন্দ থতমত খেয়ে চুপ করে গেল।

কথাটা এই: বছর আষ্টেক-দশ আগে একটা স্কুল কর্তৃপক্ষ বোর্ডিংসমেত স্কুল বসবার জন্যে বাড়িটা ভাড়া নেবার অনেক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু প্রসন্ননারায়ণকে রাজী করাতে পারে নি। তাদের চেষ্টার মধ্যে নন্দরও সমর্থন রয়েছে দেখে প্রসন্ন তাকে ধমকে চুপ করিয়ে দিয়েছিলেন সেদিন। আজ নন্দ বিনীতভাবে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে সেদিনের সেই ধমকের উত্তর দিতে চাইছিল, ভাবছিল আজকে ভিতরে ভিতরে অবশ্যই আপসোস করতে হচ্ছে মামাকে সেদিনকার অবিবেচনার কথা স্মরণ করে। কিন্তু আজও ধমক দিলেন প্রসন্ননারায়ণ।

মামাকে কোনদিনই বুঝতে পারে না নন্দ।

বুঝতে পারে না যে-লোক এককালে স্ফূর্তির টাকার টানাটানি পড়ায় শহর

কলকাতার সেরা পাড়ায় অবস্থিত আট দশখানা বাড়ি বেপরোয়া জলের দরে বেচে দিয়েছে, খুরো মাটির দরে বেচে দিয়েছে দেশের জমিদারী ভিটেমাটি, ফলন্ত বাগান, ভরন্ত পুকুর,—সেই লোকই এই বাড়িখানাকে এমন যক্ষের মত আগলে বসে আছে কেন, ভাতের টাকার টানাটানি সত্ত্বেও!

যে কোন স্কুলকে ভাড়া দিলেই এখনও এ বাড়ি থেকে মাস গেলে পাঁচ-ছ-শো টাকা আসতে পারত। কিছুদিন আগে পর্যন্তও কত সময় কত বিয়ে পার্টি এক রাত্রের জন্যে দু-তিনশো টাকা ভাড়া দিতে চেয়েছে, প্রসন্ননারায়ণ রাজী হন নি। অথচ—সত্যিই আজকাল নিতান্ত দৈন্যাবস্থার মধ্যে কাটাতে হচ্ছে প্রসন্ন-নারায়ণকে। ভাতে টান না পড়ুক, টান পড়েছে অম্বুরী তামাকে, গোলাপী আতরে, চুনট ধুতিতে। তবু সামান্যতম অংশও ভাড়া দিতে রাজী নন তিনি।

দু-খানা ঘর হলেই তো চলে যায় এখন বুড়োর! তবু কি আগলানো প্রবৃত্তি!

এ বাড়িতে প্রসন্ননারায়ণের এত মায়া কেন?

বসতবাড়ি বলে? তাহলে দেশের সাত-পুরুষের ভিটে বেচলেন কি করে?

কি জানি! মামাকে বুঝতে পারে না নন্দ। তবু ছাড়তেও পারে না। মজুমদারদের বিরাট গোষ্ঠী এই গোষ্ঠীপতিকে একে একে ছেড়ে গেছে, হয় যমের আকর্ষণে, নয় মুক্তবাতাসের আকর্ষণে। নন্দ রয়ে গেছে। কিন্তু কেন? রয়ে গেছে কি প্রসন্ননারায়ণেরই আকর্ষণে?

যে কারণেই হোক তবু নন্দ রয়ে গেছে। প্রসন্ননারায়ণের ধমক খেয়ে, আর সংসারের শাঁসটি রেখে আঁসটি খেয়ে। কিন্তু আর যেন পারছে না নন্দ। এই দৈত্যের মত বিরাট জনশূন্য বাড়িটা যেন ওকে হাঁ করে গিলতে আসে। সন্ধ্যে হলেই মনে হয় যেন সারা বাড়িতে কারা সব চলে ফিরে বেড়াচ্ছে, থসমস করে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে নামছে, ফিসফিস করে কথা বলছে।

অথচ প্রসন্ননারায়ণ এই প্রেতপুরীতে থাকবেনই। কাজেই নন্দও থাকবে। অবশ্য প্রসন্ননারায়ণ তাকে বহুবার বলেছেন, এই অভিশপ্ত বাড়ি আর তার বাসিন্দা মজুমদারদের শেষ বংশধরকে ছেড়ে চলে যেতে, নন্দ রাজী হয় নি।

প্রসন্ননারায়ণ নন্দকে ধমকে দিয়েই গড়গড়ার নলটা হাতে তুলে নিলেন। অর্থাৎ আর কথা বলবেন না। নন্দ একটু উসখুস করে উঠে গেল। উঠে যেতেই প্রসন্ননারায়ণ ওর চলার দিকে তাকিয়ে মৃদু একটু হাসলেন। কৌতুকের হাসি! ছেলেটা এত বোকা! মনে করেছে কর্পোরেশনের তোড়জোড়ের মধ্যে যে নন্দরই হাত আছে বার আনা, এ বুঝি বুঝতে পারবে না প্রসন্ননারায়ণ।

পাড়াপড়শি কোথা! পাড়াপড়শি কেউ নেই এর মধ্যে। তবু রাগ করলেন না প্রসন্ননারায়ণ। সত্যি, দোষও দেওয়া যায় না ছেলেটাকে। এ বাড়িতে কি আর মানুষে টিঁকতে পারে? নেহাৎ নাকি ভালবাসার টানে পড়ে আছে। সেই ভালবাসার টানেই ও মামাকে ওর হিসেবে কোন ভাল বাসায় স্থানান্তরিত করতে চায়।

আর একবার হাসলেন প্রসন্ননারায়ণ।

বোকা-সোকা ছেলেটা! বোধ-বুদ্ধি কত কম!

ভাবলেন কথা শেষ না হতেই উঠে গেল। একবার ডেকে না হয় বলে দিই কর্পোরেশন অফিসে জবাব দিয়ে দাও, তোমরাই এসে ভেঙে দিয়ে যাও, খরচা যা পড়বে ভাঙা ইঁট কাঠ বেচেই উঠবে। কিন্তু ডাকলেন না, বসে বসে তামাকই খেতে লাগলেন।

নন্দ ও-ঘরে গিয়ে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। যাক্ বাবা, মামা কোন সন্দেহ করেন নি। আর একবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল—এ-বাড়ি থেকে মুক্তির আশায়।

মা যতদিন ছিলেন, এমন দম-আটকানো অনুভূতি কোনদিন আসে নি। ছোট-খাটো মাপের বিধবা মানুষটি, তবু তাঁর উপস্থিতিতেই যেন সারা বাড়িটা ভরাট ছিল। অন্ততঃ নন্দর কাছে তো ছিলই। মা কত ইচ্ছে করেছিলেন নন্দর বিয়ের জন্যে, তখন রাজী হয় নি নন্দ, এখন মাঝে মাঝে ভাবে করলেই হত। বোধ করি এমন দম-আটকানো ভাবটা আসত না তাহলে।

কিন্তু মাও তো কতদিন হল মারা গেছেন। সেই ইস্কুল পার্টিটা আসার আগেই। ওদেরও চেষ্টা-চরিত্র করে নন্দই আনিয়েছিল। মাঝে মাঝে বিয়ে পার্টিদেরও নন্দই খবর দেয়। আর আড়াল থেকে ফলাফল দেখে। কিন্তু ফলাফল তো আগেই বলা হয়েছে।

প্রসন্ননারায়ণ জানেন নন্দর এই দুর্বলতা। কিন্তু কোনদিনই উদ্‌ঘাটিত করে দেন নি তাকে। ও চলে ফিরে বেড়ালে, কথা কইলে কি না কয়ে চুপচাপ বসে থাকলেও, সুনীতিকে মনে পড়ে যায়। ঠিক অমনি বোকা-সোকা ছিল মেয়েটা, আর ছেলেমানুষী চালাকি খেলতে চেষ্টা করত প্রসন্ননারায়ণকে লুকিয়ে। ওর মতনই অমনি প্রসন্ননারায়ণকে যমের মত ভয় করত, অথচ প্রাণের মত ভালবাসত। মায়ের আকৃতি প্রকৃতি দুই পেয়েছে ছেলেটা।

সুনীতির কথা মনে পড়লেই শিরীষের কথা মনে পড়ে, মাতাল অবস্থায় বুঝতে

না পেয়ে যাকে গুলি করে মেরে ফেলেছিলেন প্রসন্ননারায়ণ। না, সত্যিই বুঝতে পারেন নি। রাত্তির দশটার সময় কলাপাতায় মোড়া দু-গাছা যুঁই ফুলের গোড়ে মালা হাতে নিয়ে চুপি চুপি আসছিল চোর কুঠুরির ছোট সিঁড়ি দিয়ে। ফুলের গন্ধই ধরিয়ে দিল তাকে।

নিজের ঘর থেকে দেখতে পেয়ে চোখ জ্বলে উঠল প্রসন্ননারায়ণের। গায়ের সমস্ত রক্ত মাথায় চড়ে উঠল!

চিনতে পারলেন না ও শিরীষ!

ভাবলেন সুনীতির রক্তের মধ্যেও বুঝি বংশের বিষরক্ত ছটফটিয়ে উঠেছে!

ওদের নাকি সেদিন ফুলশয্যার তিথি ছিল, তাই সুনীতি লুকিয়ে নিমন্ত্রণ করেছিল বরকে। বিনা নিমন্ত্রণে জামাই মানুষের শ্বশুরবাড়ি আসা প্রসন্ননারায়ণ পছন্দ করতেন না বলে দাদাকে লুকোবার এই চালাকি সুনীতির। চোর-কুঠুরির সিঁড়ির দরজা খুলে রেখে ঘরে এসেন্স ছড়ানো বিছানা পেতে নিঃশব্দ প্রতীক্ষায় বসে ছিল সে।

এখনও এক এক সময় ভাবেন প্রসন্ননারায়ণ, নেশার ঝোঁকে দৃষ্টিশক্তি একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল যদি, তো ঘ্রাণশক্তি অত প্রখর থেকে গিয়েছিল কি করে? যুঁই ফুলের গন্ধে অমন চমকে উঠেছিলেন কেমন করে?

আজও যেন মাঝে মাঝে সুনীতির গলা-চেরা চীৎকারটা চোর-কুঠুরীর দালানের কোণে কোণে আছড়ে পড়ে, "দাদা! এ কি সর্বনাশ করলে গো"!

তবু—

প্রসন্ননারায়ণকে ছেড়ে চলে যায় নি সুনীতি।

মায়ের স্নেহে যেন আগলে রেখেছিল তাঁকে। সেদিন থেকে মদ প্রসন্ননারায়ণ আর খান নি বলে ও কতদিন মৃদু অনুযোগ করেছে, শরীরটা যে একেবারে ভেঙে যাচ্ছে দাদা! বরাবরের অভ্যাস, হঠাৎ অমন ছেড়ে দিলে! ওষুধের মত একটু আধটু খেলেও তো হয়।

প্রসন্ননারায়ণ মৃদু হাসতেন। তুই তো দেখছি ডাক্তার হয়ে উঠলি!

না, মদ আর সে রাত থেকে ছোঁন নি প্রসন্ননারায়ণ। ছুঁতে পারেন নি। মদের চেহারা মনে করতে গেলেই গুলি খাওয়া শিরীষের রক্তটা মনে পড়ে যায়। বোতলে বোতলে সেই রক্তটাই যদি ভরা থাকে, তো সে জিনিস খাওয়া যাবে কেমন করে?

বসে থাকতে থাকতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

নন্দ খাবার ডাক পাঠিয়েছিল বামুন ঠাকুরকে দিয়ে, খিদে নেই বলে ফিরিয়ে দিলেন প্রসন্ননারায়ণ। তারপর নন্দ নিজে ছুটে এল। হাত নেড়ে 'না' জানিয়ে হাতের ইশারাতেই ওকে চলে যেতে বললেন। জীর্ণ বিবর্ণ পালিশ-ওঠা আরাম কেদারাটায় বসে থাকতে থাকতে ঢুলতে লাগলেন।

তারপর যখন অনেক রাত হয়েছে, ঠাকুব চলে গেছে, আর নন্দ একটা ঘরে খিল বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়েছে তখন চটিটা পা থেকে খুলে রেখে আলমারী থেকে ভারি এক থোলো চাবির গোছা নিয়ে, আর একটা আলো হাতে করে আস্তে আস্তে তিনতলায় উঠে এলেন প্রসন্ননারায়ণ।

বহুকালের মধ্যে তিনতলায় ওঠেন নি।

সমস্ত ঘরে ঘরে তালা ঝুলছে।

তালার চাবি চিনতে দেরি হচ্ছিল, তবু ধীরে ধীরে ধৈর্য ধরে একটির পব একটি দরজা খুললেন প্রসন্ননাবায়ণ।

পড়োবাড়ির চেহারা নিয়ে পডে আছে ঘরগুলো। কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে ঝুলের ঝুরি, বর্ষায় ছাদ থেকে অজস্র জল পডেছে, মেজের জমানো ধুলোব ওপব তার চিহ্ন! দেয়ালের গায়ে বড় বড় ফাটল! ঠিক করেছে নন্দ কর্পোরেশনকে খবর দিয়ে, ঠিক করেছে! এ বাড়ি ভেঙে নামানোই দরকার।

একটির পর একটি। খুলে ফেলে রেখেই এগিয়ে যান।

তিনতলায় সব গিন্নিদের এক একখানা ঘর ছিল। প্রসন্ননারায়ণের মার, মেজ খুড়ির, ন খুড়ির আর ছোট খুড়ির। সেজ কাকা সুবোধনারায়ণ বিয়ে করেন নি, নিচের তলায় থাকতেন তিনি। পূজোপাঠ জপ-তপ নিয়েই নাকি কাটত তাঁর। প্রবোধনারায়ণ বলতেন 'ভিটকিলেমী'! মেজ-খুড়ি বলতেন, 'নিচের তলায় থাকার সুবিধে আছে'। বাড়ির কাছে পাথুরেঘাটার যে বস্তিটা মজুমদারদেরই সম্পত্তি, সেইটার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে টেনে টেনে অদ্ভুত একটা হাসি হাসতেন মেজ-খুড়ি।

বিধবা ন-খুড়ি গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিলেন, তদবধি তাঁর ঘরে কেউ ঢুকত না সাহস করে, ঘরটা খুলতেই মনে পড়ল প্রসন্ননারায়ণের!

আর মার ঘরটা খুলতেই মনে হল মা যেন স্নেহকোমল-কণ্ঠে ফিস ফিস করে বলে উঠলেন, 'কে প্রসন্ন? আয়, বোস!' চিররুগ্ন মা, আজীবন তাঁকে বিছানায় শুয়ে থাকাই দেখেছেন প্রসন্ননারায়ণ। ছেলেমেয়েরা সহজে কেউ ঘরে ঢুকতে

চাইত না, তাই কেউ ঢুকলেই যেন বর্তে যেতেন।

আলোটা উঁচু করে তুলে ধরলেন প্রসন্ননারায়ণ।

না, কোনখানে জলে উঠল না খুশিতে উজ্জ্বল অথচ রোগে ক্লান্ত বড় বড় দুটি চোখ। পালঙ্কের ওপর বিছানা নেই। একখানা পায়া-ভাঙা ঘাড়-গোঁজা জরা-জীর্ণ পালঙ্কের ওপর যে গদির ধ্বংসাবশেষটা এখনও পাতা ছিল, তার তুলো-গুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে ইঁদুরেরা মহোৎসব করেছে। বৃষ্টির জলে সেই ছেঁড়া তুলো ভিজে ওঠায় ঘরে তীব্র একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ।

ঘরের পর ঘর! সব শেষ করে দালান বারান্দা সিঁড়ি পার হয়ে তিনতলা থেকে নেমে এলেন প্রসন্ননারায়ণ।

কিন্তু এ কি!

ঘর যে আর ফুরচ্ছে না। ফুরচ্ছে না দালান বারান্দা।

কত ঘর!

আশ্চর্য! এত ঘর আছে বাড়িটায়! চক-মিলানো বাড়ির চার চকে ভবল সারি। এই সমস্ত ঘরগুলোয় লোক ছিল!

ছিল বৈকি।

প্রসন্ননারায়ণের ছেলেবেলাতেও আনাচ-কানাচ পর্যন্ত ভর্তি লোক ছিল। বাড়ি গিস গিস করত, সবাইকে ভাল করে চিনতেনও না প্রসন্ননারায়ণ।

কোথায় গেল সেই সব লোক!

ভোজবাজীর মত মিলিয়ে গেল যেন!

এখন শুধু প্রসন্ননারায়ণ!

দোতলার সব ঘরগুলো তালা লাগানো নয়, কতকগুলো শুধু শেকল তোলা। মাঝে মাঝে বোধ হয় ঝাড়া-মোছাও হয় এগুলো! দক্ষিণের কোণের বারান্দার দিকে শুধু—

থমকে দাঁড়ালেন প্রসন্ননারায়ণ। এ চাবি কি প্রসন্ননারায়ণের এই গোছার মধ্যে আছে? লাগিয়ে লাগিয়ে দেখলেন, অস্থির হয়ে একই চাবি বার বার দেখতে লাগলেন তালাটা যেন প্রসন্ননারায়ণকে ব্যঙ্গ করে নীরব ঔদাসীন্যে ঝুলতে থাকল।
—খুলবে না, এ দরজা খুলবে না।

প্রসন্ননারায়ণের স্ত্রীর ঘর!

যে ঘরে প্রসন্ননারায়ণ—না, কই? কোনদিনই না!

সুরবালার সঙ্গে কোনদিন এ ঘরে রাত্রিযাপন করেন নি প্রসন্ননারায়ণ।

আলোটা হাত থেকে নামিয়ে বন্ধ দরজাটায় হাত রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন প্রসন্ননারায়ণ, যেন নিঃশব্দ মিনতিতে ভিতরে যে আছে তাকে দরজা খোলবার অনুরোধ জানাচ্ছেন।

না কেউ খুলে দিল না।

কোনদিনই দিত না।

মত্ততার অবসানে যদি কোন রাত্রে প্রসন্ননারায়ণ চুপি চুপি চোরের মত ঘুমন্ত পুরীর সিঁড়ি দালান পার হয়ে এ ঘরের দরজায় এসে নিঃশব্দে মিনতি জানিয়েছেন, দরজা খুলে অভ্যর্থনা জানাত না সুরবালা। ছোট ছোট টোকা ছোট ছোট ডাক দীর্ঘনিশ্বাসের মত বাতাসে ছড়িয়ে পড়ত, চোরের মতই চুপি চুপি আবার ঘুমন্ত-পুরী ডিঙিয়ে নেমে আসতেন প্রসন্ননারায়ণ নিচের বৈঠকখানায়। যেখানে কিছুক্ষণ আগেও মত্ততার দাপাদাপি চলেছে। যেখান থেকে বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে, আশ্রয় পাবার জন্যে ছুটে গিয়েছিলেন সুরবালার কাছে।

কোন কোনদিন আবার অভিনয়ের ভূমিকা থাকত আলাদা।

চোরের মত নয়, বীর দর্পে উঠে আসতেন প্রসন্ননারায়ণ। মত্ততার অবসানে নয়, মদমত্ত অবস্থাতেই। জোরে জোরে ধাক্কা দিতেন। সঙ্গে সঙ্গে খুলে যেত দরজা। দরজা খুলেই লাউডগা সাপের মত পিছলে পালিয়ে যেত সুরবালা, কোনদিন তাকে ধরে ফেলতে পারেন নি প্রসন্ননারায়ণ।

ধমকে উঠতেন, চীৎকার করতেন, সুরবালাকে খুন করে ফেলবেন বলে আস্ফালন করতেন, সেই সময় মালতী আসত।

বলত—গোঁয়ারের মত চেঁচিও না বলছি! চুপ কর!

বলেই প্রসন্ননারায়ণকে টেনে ঘরে পুরে, খিল বন্ধ করে দিত মালতী!

প্রসন্ননারায়ণের সুদূর সম্পর্কের মাসতুতো বোন মালতী! সুরবালার মাইনে করা! সুরবালাই তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে। মাইনে দেওয়ার কথাটা অবশ্য কানা-ঘুসোর কথা! অনেকদিন আগে—নাকি বালবিধবা মালতী যেদিন সুরবালার কাছে গিয়ে নালিশ করেছিল, একলা পেয়ে প্রসন্ননারায়ণ তার সর্বনাশ করেছেন, কেমন একটা অদ্ভুত হেসে সুরবালা বলেছিল, "তা একরকম শোধবোধ হয়ে গেল ঠাকুরঝি, তুমি আমার সর্বনাশ করছিলে, আমার বর তোমার সর্বনাশ করেছে! এরপর তুমি যদি আমার হয়ে খাটতে রাজী থাক, আমি তোমায় মাইনে দেব! সেও আর একরকম শোধবোধ হবে। দেখ ভেবে।"

প্রাণপণে তালাটা ধরে একবার টান মারলেন প্রসন্ননারায়ণ, খুলল না। শুধু স্থরবালার তীক্ষ্ণ হাসির মত এক টুকরো তীক্ষ্ণ আওয়াজ হল।

দেয়ালে পিঠটা ঠেসে ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন প্রসন্ননারায়ণ, স্থরবালা যদি একদিনও অমনি করে টেনে নিয়ে বলত, 'গোঁয়ারের মত চেঁচিও না বলছি, চুপ কর'—তাহলে কি পাথুরেঘাটার মজুমদার বাড়ির এমন প্রেতপুরীর মত অবস্থা হত।

অনেকদিন ভুগে ভুগে মারা গিয়েছিল মালতী! স্থরবালা নাকি প্রাণ দিয়ে সেবা করেছিল তার। প্রসন্ননারায়ণ সে সব খবর রাখেন না, তখন কেশরী বাইজী নতুন আমদানি হয়েছে লখনৌ থেকে।

অনেকক্ষণ বোকাব মত দাঁড়িয়ে থেকে অনেকদিন আগের মত চুপি চুপি দরজায় টোকা দিয়ে উচ্চারণ করলেন প্রসন্ননারায়ণ, স্থরবালা!

যেন নিভৃতে ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ করলেন।

ধীরে ধীরে নেমে এলেন প্রেতপুরীর দালান বারান্দা সিঁড়ি পার হয়ে। চক-মিলানো উঠোনের ঘেরা বারান্দা পার হয়ে এসে দাড়ালেন বৈঠকখানার দরজায়। যে ঘবে এখন বাড়ির সমস্ত ভাঙা পুরনো আসবার-পত্র 'ডাঁই' করা আছে।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন অন্ধকারে।

হাতের আলোটা স্থরবালার ঘরের সামনে নামিয়েছিলেন আর তুলে নিতে মনে পড়ে নি। সদরের দুপাশে দুটো পাথরের মূর্তি, মানুষ প্রমাণ। সঙ্গীন উঁচানো পাহারাদার সিপাইয়ের ভঙ্গী। সঙ্গীনের আগাটা শুধু ভেঙে গেছে। সেইদিকে চেয়ে একটু হাসলেন প্রসন্ননারায়ণ।···তারপর বেরিয়ে এলেন।

ও! গেট-এ চাবি দেওয়া।

আজও এ বাড়ির গেট-এ চাবি পড়ে?

কে দেয়? নন্দ? শিরীষের ছেলে? শিরীষের ছেলে এখনও মজুমদার বাড়ি আগলায়? এ চাবি তো প্রসন্ননারায়ণের কাছে নেই! লোহার গেটটা ধরে একবার ঝাঁকুনি দিতে চেষ্টা করলেন, পুরনো কজা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠল। শিউরে উঠলেন প্রসন্ননারায়ণ! নন্দ শুনতে পেল না তো!

—না, শুনতে পায় নি।

লোহার গেট অটল হয়ে থাক, চোরা দরজা আছে। প্রসন্ননারায়ণের অবিদিত

সেই দরজা। এই দরজার ওপিঠে পালকি দাঁড়াত। প্রসন্ননারায়ণের ঠাকুরমা নাকি গঙ্গাস্নানে যেতেন সেই পালকিতে। বেহারারা পালকিসুদ্ধ গঙ্গায় চুবিয়ে আনত। এ দরজা প্রসন্নর ঠাকুরমার নির্দেশে তৈরী।

তারপর পালা বদলেছে। চোরা দরজা দিয়ে কত চোরাই কারবার চলেছে। প্রসন্ননারায়ণের জানিতে, অজানিতে কত অসংখ্যবার এমনি মাঝরাতে দরজা খোলা হয়েছে।

দরজাটা খুলে ফেললেন! ঘুনধরা কাঠ আওয়াজ করল না। পথে এসে দাঁড়ালেন প্রসন্ননারায়ণ। পিছু ফিরে একবার চোখ তুলে দেখলেন বিরাট দৈত্যের মত বাড়িটাকে।

এ কী!

বাড়িটা এমন বীভৎস কুৎসিত লাগছে কেন! অনেক ছোট ছোট বাড়ির মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড বাড়ি এত কুৎসিত দেখতে লাগে, একথা তো কোনদিন জানা ছিল না প্রসন্ননারায়ণের।

ঠিক করেছে নন্দ, কর্পোরেশনকে খবর দিয়ে!

এই বীভৎস বিরাটের মাথাটা ভেঙে নামিয়ে দেওয়াই উচিত।

ধীরে ধীরে এগোতে লাগলেন প্রসন্ননারায়ণ। যে পথ দিয়ে তাঁর ঠাকুরমার পালকী যেত।

শেষ